বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

য় ভাগ] পৌষ, ১৩০৭ [৩য় সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়। লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	প্রবাদ প্রসঙ্গ। (শ্রীশিবরতন মিত্র)	৬৫
২।	বিধাতা ও মাতৃভূমি। (শ্রীমহম্মদ আজিজউস সোভান) ...	৭২
৩।	কাঠরার মসজিদ। (শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	৭৪
।	মৃগ। (শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল)...	৭৮
।	জনপদোধ্বংসে স্বাস্থ্য। (কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী ...	৮৭
।	পাখীর গান। (শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী)	৯২
।	সংবাদ ও নানা কথা। (সম্পাদক)	৯৩

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে,
বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে,
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ক মূল্য ১৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] পৌষ। [৩য় সংখ্যা।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

৭। ঘনশ্যাম মিত্র।

মিত্র কুলে জন্ম মোর গোমতিতে বাস।
ঘনশ্যাম নাম ধরি শ্রীকরণের দাস॥
নিরাবিলের প্রাণ আমি ভঙ্গ কুলের বৈরি।
শ্রীকরণের করণকারণ তুল্য মূল্য করি॥

ঘনশ্যাম মিত্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া কুল বন্ধন করেন। যথা, সিংহের কুলীনঘর কান্দী, বেলে, জমুয়া; ঘোষের পাঁচথুপী, মজান, রসোড়া; মিত্রের বেলুন ইত্যাদি। ঘনশ্যামের পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের ঘটকের কর্ম্ম, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গুড্ডো নামক গ্রামের ব্রাহ্মণেরা করিতেন। প্রবাদ এই যে, উপরি উদ্ধৃত পরিচয় সূচক শ্লোক দুইটি ঘনশ্যামের রচনা।

পরিচয়—সিউড়ীর ছয় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত গোমতি (গুমতো) নামক গ্রামে ঘনশ্যমের আবাস ভূমি ছিল। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। কয়েকটি কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যার সহিত, কান্দীর নিকট বেলে নামক গ্রামের রাজারাম সিংহের বিবাহ হয়। এই রাজারাম সিংহের পুত্র শুকদেব সিংহ ঘটক, যশোহর জেলার অন্তর্গত পুরাপাড়া গ্রামের ঘটক বংশের পূর্ব্ব পুরুষ। এই ঘটকদিগের নিকট যে কুলজী গ্রন্থ আছে তাহাতে

ঘনশ্যাম ও শুকদেব উভয়েরই ভনিতা আছে। * ঘনশ্যামের বংশতালিকা, যথা—
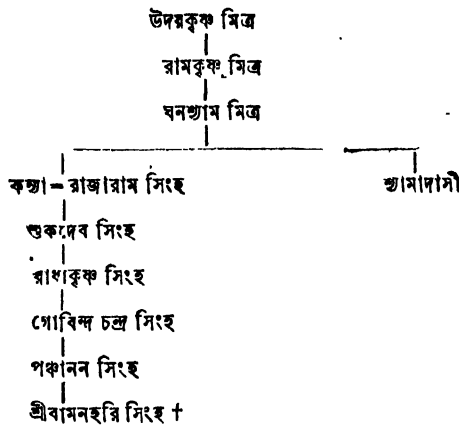
প্রবাদঃ—মাড়কলা গ্রামের কেনারাম দাস ও মোনারাম দাস লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতদুপক্ষে যে সমারোহ ‡ হইয়াছিল, তাহাতে ঘনশ্যামও উপস্থিত ছিলেন। ভোজনের সময় স্বশ্রেণীবর্গের মধ্যে কেহ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 'গোমতির মিত্র' বলিয়া চরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি বলেন, 'আমরা কি 'গু-মুত' ('গোমতির' অপভ্রংশ গুম্‌তো) লইয়া আহার করিতে আসিয়াছি'? এই রহস্যময় হুজুগে যোগদান করিবার লোকের অভাব হইল না এবং তজ্জন্য ঘণশ্যামকে বিশেষ বিড়ম্বিত হইতে হইল। যজানের উচিৎখাঁ উপাধিধারী গৌরীকান্ত ঘোষ এবং অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্বশ্রেণী কায়স্থ লইয়া একত্র ভোজন করা দোষাবহ নহে, একথা কোন ক্রমেই বুঝাইতে না পারিয়া, অগত্যা ঘনশ্যামকে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ঘনশ্যাম বলিলেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন তাঁহারা না কহিলে তিনি গাত্রোত্থান করিতে

---

* আমার নিকট কায়স্থদিগের কুলজীনামক একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত পু (খণ্ডিত) আছে, তাহাতে 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভসুত শ্যামদাসের' ভণিতা আছে।

† ইনিই অনুগ্রহ করিয়া আমার বংশতালিকাটী প্রদান করিয়াছেন।

‡ এই সমারোহ উপলক্ষে রচিত একটি সুদীর্ঘ 'ছড়া' এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

লেখক।

প্রস্তুত নহেন। অনন্যোপায় হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ সানুনয়ে তাঁহাকে বলিলেন "আপনার জন্য যখন এতগুলি 'স্বশ্রেণীর' আহার বন্ধ হয়, তখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি স্বতন্ত্র স্থানে আপনার আহারের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু তিনি আর আহার না করিয়া 'আমার পরিতোষ হইয়াছে' এই বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন এবং এই প্রকারে উপেক্ষিত হইয়া কায়স্থদিগের কুলবন্ধনে প্রতিজ্ঞা করেন। অবশেষে শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথ ধামে কঠোর 'ধর্ম্মা' দিয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলাচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হইবার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনেক স্বশ্রেণীবর্গের মনোহানি হইবে বলিয়া তাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহার কন্যার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হইবে। কান্দীর নিকট বেলে গ্রামের রাজারাম সিংহের পিতাকেও স্বীয় পুত্রের সহিত ঘনশ্যামের কন্যার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যও স্বপ্নাদেশ হয়। এই রাজারাম সিংহের পুত্র ও ঘনশ্যাম মিত্রের দৌহিত্র শুকদেব সিংহ ঘটক, বর্ত্তমান ঘটকদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বংশধরেরা এখনও ঘটকের ব্যবসা রক্ষা করিতেছে।

একটা কথা আছে।

খুঁচি নাই যাতে
কুল নাই তাতে।

অর্থাৎ যে কুলে ঘনশ্যাম হস্তক্ষেপ করেন নাই কিম্বা যে কুলের কোন উল্লেখ করেন নাই, তাহা কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে গণ্যই নহে। এই সদর্প উক্তিতে ঘনশ্যামের, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলবন্ধন কার্য্যে কতদূর প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামসুন্দর তর্কালঙ্কার।

পরিচয়ঃ—মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত ডুনোবহড়া নামক পল্লীতে রামসুন্দর তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ~~স্বীয় প্রতিভাবলে~~ তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত ও বৈয়াকরণিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ~~কবিত্বশক্তি তাঁহার এত প্রবল ছিল~~ যে, তখন যে ছন্দ শ্রবণ করিতেন, ঠিক সেই ছন্দের অনুরূপ শ্লোকে

তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

বাল্যাবস্থায়, রামসুন্দর মুর্শীদাবাদের বাণীকণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ এবং লাভ-পুরের অন্তর্গত কোতল ঘোষা গ্রাম নিবাসী হরগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে নবদ্বীপে গিয়া পাঠ সমাপন করেন।

রামসুন্দর সর্ব্বকেশী ছিলেন এবং গৈরিক বসন পরিধান করিতেন। তিনি বীরাচারী শাক্ত ছিলেন, খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। তাঁহার একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করা অভ্যাস ছিল না; সন্ন্যাসীর মত কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন এবং তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও যথেষ্ট ছিল। কোন তোষামোদপ্রিয় ধনী ব্যক্তিকে তিনি নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়। রামসুন্দর ধনীব্যক্তির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন 'তুই আমার ভাই, সেই জন্য তোকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম—তুই লক্ষ্মীর বড় বেটা, আর আমি স্বরস্বতীর বড় বেটা।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তোষামোদপ্রিয় ধনী দ্রব হইয়া গেল।

~~প্রধানতঃ~~ রামসুন্দর অনেক বড় বড় পণ্ডিত সভায় জয় লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ~~এস্থলে~~ দুইটি মাত্র সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

(১) সোনারুন্দীর রাজা রায়দানীশের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, তাঁহার চারি পুত্র কর্ত্তৃক বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইলে, এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। রুক্মিণীকান্ত সোনারুন্দী রাজার সভাপণ্ডিত, ~~সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার প্রতিপত্তি অল্প নহে।~~ মুর্শীদাবাদে কোন সভায় ~~পূর্ব্বোক্ত~~ বাণী কণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ সভাপতি ছিলেন; বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে রুক্মিণীকান্ত তাঁহার উপর কিঞ্চিৎ রুষ্ট হন। এক্ষণ তিনি সুবিধা পাইয়া বাণীকণ্ঠকে অপদস্থ করিবার জন্য সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত একপক্ষ হইয়া তাহার সহিত বিচার করিবার জন্য চক্রান্ত করিলেন। বাণীকণ্ঠ অগ্রেই চক্রান্তের কথা জানিতে পারিয়া সভায় যাইতে অসম্মত হইলে, ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপন্ন ও ন্যায় শাস্ত্রে পারদর্শী কোন শিষ্য কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া কুণ্ঠিতভাবে, স্থলে আগমন করেন। বাণী ~~কণ্ঠ স্বভাবতঃ অতিশয় বৎসল ছিলেন~~

সুন্দর, এই সময় কাটোয়ার সন্নিহিত কোন গ্রামে সন্ন্যাসী ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি এই চক্রান্তের কথা শ্রবণ করিয়া বিচারের সময়, সন্ন্যাসী বেশে সভাপ্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাণীকণ্ঠ অতিথি দর্শনে পাদবন্দনা জন্য তাহার নিকটস্থ হন; কারণ তিনি এ প্রকার বেশে স্বীয় শিষ্য রামসুন্দরকে চিনিতে পারেন নাই। রামসুন্দর বাহ্যতঃ কোন কথা প্রকাশ না করিয়া প্রতিপ্রণামের ছলে স্বকীয় পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার সহিত বিচারে যোগদান করিবার কথা বিজ্ঞাপিত করেন। রাজকুমার চতুষ্টয়কে অনুরোধের পর স্থিরীকৃত হইল যে বাণীকণ্ঠকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে যেন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়; তিনি অসমর্থ হইলে পর বাণীকণ্ঠকে প্রশ্ন করা হইবে। তদনুসারেই বিচার আরম্ভ হইল। দ্রাবীড়, পুনা, কাশী, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের কূট প্রশ্নের উত্তর রামসুন্দর অবলীলা ক্রমে সমাধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে বিচারে রামসুন্দর পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিলেন, সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে বাণীকণ্ঠ রামসুন্দরের হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজপুত্র চতুষ্টয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে আপন শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং ~~সমক্ষে~~ সভামণ্ডপে তারস্বরে এই কথা বলিলেন "যদি অনুমতি দেন তবে ~~এ সকল পণ্ডিত কি~~, রামসুন্দরকে লইয়া স্বর্গের বৃহস্পতির সহিত বিচার করিয়া আসিতে পারি!"

(২) বর্ত্তমান হেতমপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পিতামহ বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া উপলক্ষে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সমাগম হয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই সভায় সাংখ্যের বিচার হয়। রামসুন্দর ও তারানাথ এই সভার বিচারে যথা ক্রমে অধ্যক্ষ ও মধ্যস্থ বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া রামসুন্দরের সহিত সাংখ্যের বিচার আরম্ভ করেন—তাঁহারা এই বিচারের জন্য বিশেষরূপ প্রস্তুতও হইয়া আসিয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ আপনাপন মত প্রবল করিবার জন্য প্রতিপোষক স্বরূপ নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণের অবতারণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামসুন্দর স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তদনুরূপ ছন্দে (যথায় তিনি পুস্তক হইতে প্রমাণোদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইতেছিলেন) শ্লোক সাথে সঙ্গে রচনা করিয়া কোন

অজ্ঞাত পুস্তকের ধ্বনি দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিচারে তিনিই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

রাম সুন্দর ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; নৈষধ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং ন্যায়-কাব্য বলিয়া নৈষধ কাব্য তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। প্রেমচাঁদ তর্ক-বাগীশ, সেই সময় নৈষধের এক টীকা প্রণয়ন করেন। এই সভার তৃতীয় অধিবেশনে প্রেমচাঁদ স্বরচিত টীকা অনুমোদন করাইবার জন্য রামসুন্দরের নিকট উপস্থিত করেন।

প্রেমচাঁদ তখন কলেজে চাকুরী করিতেন; এই জন্য দ্বিতীয় অবসরের প্রতীক্ষা না করিয়া রাম সুন্দরকে উক্ত টীকা দেখাইয়া লইবার জন্য বাসনা করিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে রামসুন্দরের সমকক্ষ ন্যায় ও শব্দ এই উভয় শাস্ত্রে সমভাবে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত দুর্লভ ছিল। নৈষধের টীকার বিচারে 'চৈতাননং কাময়তে' ইত্যাদি শ্লোকের টীকার কাব্য লইয়া তর্ক হয় এবং রামসুন্দর টীকা ভ্রমপূর্ণ বলিলে তৎকালে প্রেমচাঁদ যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ রামসুন্দর পূর্ব্বাবধি তাহাকে তরুণ বয়স্ক যুবক বলিয়া নৈষধের টীকা করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইলেও প্রেমচাঁদ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিপ্রচরণের পুত্র, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে স্নানাহারের জন্য আহ্বান করিলে, তিনি রামসুন্দরের সহিত পুনরায় দেখা না করিয়া উঠিবেন না, এই কথা বলিলেন; কারণ তাহা হইলে তাঁহার টীকার মান রহিবে না। বিশেষতঃ তিনি ভ্রান্ত নহেন, কেবলমাত্র সময়দোষে যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। পরে, রামসুন্দর আসিয়া বলিলেন, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তোমাকে জানিতে অবসর দিই নাই। এরূপ তরুণ বয়সে প্রেমচাঁদের শব্দ ও ন্যায় শাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপত্তি দর্শন করিয়া রামসুন্দর তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এবং ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করতঃ সমধিক সম্মানিত করিলেন।

প্রবাদ আছে, তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য বলে, শুভঙ্করের আর্য্যা "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিখ্যে" ইত্যাদি শ্লোকের "ক্রূরা ক্রূরা ক্রূরা নিন্যে, কার্য্যায়াং ক্রূরা কার্য্যায়াংনিন্যে" এই ভাবে, কৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া গিয়াছিলেন এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

মহেশপুর রাজবাটী হইতে তিনি নিয়মিতরূপ বৃত্তি পাইতেন। এই বৃত্তি পাইবার একটি গল্প প্রচলিত আছে। রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের বাল্যকালে সাজ্যা

তিক পীড়া হইলে অনেক পণ্ডিত যথারীতি যাগযজ্ঞাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য আহূত হন। রামসুন্দরও এই উপলক্ষে মহেশপুরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অপরাপর পণ্ডিতদিগের ন্যায় কোন কার্য্য না করিয়া কেবল মাত্র বসিয়া থাকিতেন। এদিকে পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইলে, রাজা স্বয়ং রামসুন্দরকে বাসা হইতে আহ্বান করিবার জন্য গমন করেন; রামসুন্দর তখন প্যাজ মুড়ী ভক্ষণ করিতেছিলেন। পীড়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 'যদি যথারীতি যাগযজ্ঞাদি হইতেছে, তবে কেন না আরাম হইবে,' এই কথা বলিয়াই উচ্ছিষ্ট হস্তেই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ শিলায় তুলসী প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পীড়িতা বস্থাতেই রাজকুমারকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করাইয়া তুলসী পত্র ভক্ষণ করাইলেন, রাজকুমার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। এই সময় হইতে রামসুন্দর মহেশপুরের রাজসংসার হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন।

রামসুন্দরের ধনস্পৃহা ছিল না; তিনি যাহা কিছু পাইতেন, তাহার অধিকাংশই বিতরণ করিয়া দিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাবু তাঁহাকে একবার এক তোরা টাকা প্রদান করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন রামসুন্দর কুল খাইয়া বীচি গুলি শিবালয়ের নিকট নিক্ষেপ করিতেছিলেন দেখিয়া কোন লোক তাঁহাকে উক্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করেন। তাহাকে তিনি বীচি ফেলিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'স্থান বিচার করিয়া দেখিতে গেলে চিরকাল মলমূত্র ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অষ্টমূর্ত্তি শিব সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই শিব।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বীরভূম জেলা স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিলাল কাব্যতীর্থ মহাশয় আমার অতি আগ্রহের সহিত এই প্রবাদটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বিধাতা ও মাতৃভূমি।

১

বিধাতা-অসীম রাজ্য থাকুক কুশলে ;
প্রশস্ত আকাশ বুকে
চন্দ্রমা ভাসুক সুখে,
হীরক তারকা মালা জলুক গগন পটে,
ঝরুক নিঝররূপে বিধাতার কৃপাবারি
প্রান্তর পুলিন পার্শ্বে, বর্জ্জিত বিটপী লতা
পুষ্পিত ফলিত হোক, প্রকাশি মহান দীপ্তি,-
মানব রাজত্ব হোক সাগরের জলে।

২

ভাসুক আকাশ মার্গে সঙ্গীত লহরী,
বনের কুসুম মালা
প্রকাশি তোমারি লীলা
বায়ুভরে নেচে নেচে তোমারি মহিমা গা'ক্
উড়ুক সুমেরু চূড়ে তোমারি করুণা ধ্বজা
কন্দরে কন্দরে দেশে, বিজনে বিপিনে বনে
তোমারি রাজত্বদর্প হোক্ সুপ্রকাশ, দেব,
প্রস্তরে প্রস্তরে নাম জলুক্ তোমারি।

৩

গউক্ তোমারি নাম পক্ষী বনচর।
মন্দ্রে মন্দ্রে মুখে বুকে
তরুর পল্লব শাখে
তমঃময় অন্তহীন অতল সাগর তলে
তোমারি রহস্য প্রভু, হোক্ ব্যাপ্ত সর্ব্বময়,
দেবতা দানব মিলি পতঙ্গ মাতঙ্গ সহ
মানবের হিংসাভাব ছাড়ি হিংস্র বনচর
ঘোষণা করুক্ প্রভু মহিমা তোমার।

৪

তটিনী লহরীমালা রচি তব নাম,
চালি অঙ্গ অঙ্গ'পরি
অক্ষর রচনা করি
লিখুক তটিনী বক্ষে নামের মহিমা তব,
বেড়ি বেড়ি নভস্থল ব্যাপিয়া তারকাচয়
নদীবক্ষে মুক্তামালা হউক সজ্জিত, নাম
লিখিতে তোমারি, গ্রহে গ্রহে চন্দ্র সূর্য্য হোক্
দীপ্তিমান—সুখময় বিধাতার ধাম।

৫

রত্নের ভাণ্ডার হোক্ রাজত্ব বিশাল,
থাক সদা শূন্য' পরে
কল্পনার অগোচরে
গভীর জলদকোলে বিদ্যুতের বর্ণমালা
রচিয়ে তোমারি নাম হুঙ্কারি বজ্রস্বরে
কাঁপায়ে ধরণীধর অক্ষর লিখিয়া দিক,
শাসন তোমার ওহে জলে স্থলে শূন্যমার্গে
ঘুরুক সংসার তব চক্র চিরকাল।

৬

এই চাই——
আমার সে মাতৃভূমি সে ছায়াতলে
সেই কার্য্য ক্ষেত্র'পরি
সেই আশা বুকে ধরি
সুখময় রহে চিরকাল, সেই গান প্রেম,
সেই বাঁশী স্বরে মুগ্ধ, সহেনা কখন যেন
সবল তাড়নাভয় নাহি শিখে উৎপীড়ন ;
বহিছে জীবন যারা যপুক তোমারি গুণ;-
শান্তি দাও, প্রভু, যারা শায়িত ভূতলে।

শ্রীমহম্মদ আজিজউস সোভান

কাঠরার মসজিদ।

লেখকের একদিনের স্মৃতি।

এক দিন (১৩০৭ সালের) বৈশাখের শেষ ভাগে আমি, আমার পরমবন্ধু মুরশিদাবাদ হিতৈষীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রভূষণ সিংহ এবং আরো কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে, মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান দৃশ্য সমূহ দর্শন করিবার নিমিত্ত নৌকাযোগে বহরমপুর হইতে মুরশিদাবাদ সহরে গমন করিয়াছিলাম। তীর্থে গমন করিয়া তত্রত্য কাম্য দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন ব্যতীত যেমন সে তীর্থের ফললাভ হয় না, সেইরূপ মুরশিদাবাদের দৃশ্য দর্শনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদে গমন করিয়া মুরশিদ কুলির সমাধি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ সন্দর্শন ভিন্ন দর্শকের আশা কখনই ফলবতী হইতে পারেনা। অনেক দিন হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকায় (যদিও "হাজার দুয়ারীর" ভারত-বিখ্যাত সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কয়েকবারই দর্শন করিয়া নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলাম, তথাপি) বন্ধুবর্গের সমভি-ব্যাহারে একবার হাজার দুয়ারীর মনোরম দৃশ্য সমূহ সন্দর্শন করিয়াই কাঠরার মসজিদাভিমুখে অবিলম্বে সকলেই গমন করিলাম। সে দিন আমার মনে যে কিরূপ আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পূর্ব্ব মুরশিদাবাদের অধিকাংশ স্থান সাধারণতঃ প্রকৃতিদেবীর মনোহর আবাস-ভূমি, কোন স্থান মানবরচিত আম্র, কাঁঠালাদির বৃক্ষে এবং কোন স্থান বা স্বভাবজ বৃক্ষলতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, কোন স্থানে বনমল্লিকা কুসুম সৌরভে অলিকুল বিমুগ্ধ করিয়া সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, কোথাও বা মলয়ানিল বহুবিধ বন্য পুষ্প গন্ধে উন্মত্ত হইয়া, কখন তরুপত্র কখনবা লতা পল্লবের সহিত আলাপন ও ক্রীড়া করিয়া সমাগত দর্শকের মন বিমোহিত করিতেছে। আমরা প্রকৃতি মাতার সেই বাসভূমির মধ্য দিয়া পক্ষীকুলের শ্রবণরঞ্জন কলসঙ্গীত, সমীরণের পাস্থ বিমোহিনী শক্তি প্রভৃতির উপলব্ধি করিতে করিতে মুরশিদাবাদ সহরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে কাঠরা নামক স্থানে উপনীত হইলাম। কাঠরারও অধিকাংশই একণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। যেমন আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম, অমনি আমাদের মনে দুঃখের

সঞ্চার হইল !!! কারণ কোথায় শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে নয়ন মন সার্থক করিব, না সেস্থানেও প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন প্রাণ শিহরিতে আরম্ভ হইল। যে স্থানে ভগ্নপ্রায় মসজিদটী অসংস্কৃতাবস্থায় অদ্যাপি নিজ গৌরব প্রকাশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার প্রায় চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুতরাং মসজিদবাটীও আজ ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে। যখনই যাও, তখনি শুনিতে পাইবে যে, চতুর্দ্দিকে শিবাগণ মধ্যে মধ্যে "হুকি" রবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

মসজিদটী পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। তাহার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইতে হইলে প্রথমেই চতুর্দ্দশ সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সোপানের সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়। এই সোপান সমূহের নিম্নেই সেই বিখ্যাত মুরশিদ কুলির সমাধিক্ষেত্র। আমরা এই সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী তোরণ দ্বারের মধ্য দিয়া কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, নাতিদীর্ঘ, নাতিবিস্তৃত পথের সাহায্যে মসজিদের সমীপস্থ হইলাম। মসজিদের সম্মুখস্থ একটী খোলা বারান্দার মধ্য দিয়াই প্রস্তর-নির্ম্মিত পথটী চলিয়া গিয়াছে এবং বৃহৎ বারেন্দাটীর মধ্যস্থলে দীর্ঘ আলবালের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মসজিদটী উজ্জ্বল ধাতুময় চূড়াযুক্ত পঞ্চ গম্বুজ সমন্বিত, অসংস্কৃতাবস্থায় দণ্ডায়মান। ইহার প্রবেশদ্বারের উপর পারস্যভাষায় খোদিত একখানি প্রস্তরফলক এবং ভিতরে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলেও আর একখানি (সম্ভবতঃ পারস্য ভাষায় লিখিত) ঐরূপ প্রস্তরখণ্ড প্রথিত রহিয়াছে। আমার একটী বন্ধুর (Domiciled Bihari) পারস্য ভাষায় কিঞ্চিৎ দখল ছিল। কিন্তু তিনিও তখন স্পষ্টভাবে, শীঘ্র প্রস্তরফলকে লিখিত অংশ সমূহের অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আমরা উহার অর্থের জন্য আর অধিক সময় নষ্ট না করিয়া মসজিদের অন্যান্য দৃশ্য দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। আমরা মসজিদ গৃহের প্রবেশপথে যে প্রস্তরময় চৌকাঠ আছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া মসজিদের ভিতরের দৃশ্য দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কারণ ক্রমশঃ মসজিদের যেরূপ ভগ্নদশা উপস্থিত, তাহাতে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বিপদ ঘটিবারই বিশেষ সম্ভব, এই ভাবিয়া এবং "সতর্কের বিনাশ নাই," এই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া বাহির হইতেই মসজিদের যথাসম্ভব সর্ব্বাংশ দর্শন করিলাম। এবং এক একবার ভাবিলাম, এই বিরাট ব্যাপারে কত অজস্র মুদ্রাই না ব্যয় হইয়াছে! কত লোকের পরিশ্রমে কত আ

সময়ের মধ্যেই যে এই সুবৃহৎ মসজিদবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও একবার চিন্তা করিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয় ও অর্থের অসাধ্য কিছুই নাই, একথাও অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হয়। মসজিদটীর দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ৪২।৪৩ গজ এবং প্রস্থ ৮।৯ গজ বলিয়া বোধ হয়। গৃহের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী জানালা প্রাচীন কারুকার্য্য বিভূষিত হইয়া অধুনাপি মলিন বেশে জীবিত রহিয়াছে। এক্ষণ ভগ্ন মসজিদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি পাত করিলে স্বতঃই দর্শকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। হায়! কালের কুটীল চক্র কে ভেদ করিবে? মুরশিদ একদা যাহাকে ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যেস্থান কোরাণপাঠার্থিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইবে বলিয়া কত আশাই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, সেই মসজিদ আজ কেবল পারাবতের কলধ্বনিতে ও মধুচক্রে পরিশোভিত রহিয়াছে। এক্ষণ পারাবত, মধুমক্ষিকা এবং ষামঘোষেরাই এই প্রকাণ্ড মসজিদগৃহ অধিকার করিয়া বনের শোভা বৃদ্ধি ও নির্জ্জনের রমণীয়তা উপভোগ করিতেছে। আমরা এই মসজিদ গৃহের অধঃপতন সন্দর্শন করিয়া সজল নেত্রে জগতের অস্থায়িত্ব অনুভব করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আগমন কালে মুরশিদের সেই সোপান নিম্নস্থ সমাধি মন্দিরটী একবার মনোযোগের সহিত দর্শন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমার একটী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই মনের সহিত কাঠরার সেই ভগ্ন মসজিদ ভবনাদির দৃশ্য দর্শনেসময় নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কারণ প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য, সকল দর্শকের মনো-রঞ্জন করিতে পারে না। যেহেতু ভগ্নগৃহ, ইষ্টকস্তূপ, প্রস্তর ফলক প্রভৃতির উপরিভাগে আপাতরম্য নয়ন-মন-বিমোহন কোন দৃশ্যই বর্ত্তমান থাকেনা। আমরা যখন পুনারায় মুরশিদের সমাধিগৃহের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম, তখন কয়েকজন বন্ধু আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের দুই জনকে তথায় রাখিয়াই অন্ত দৃশ্য দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। আমরা শীঘ্র শীঘ্র সেই সোপান নিম্নস্থ মুরশিদের সমাধিমন্দির দেখিয়া সঙ্গভ্রষ্ট বন্ধুবর্গের সহিত অর্দ্ধপথে একত্রিত হইয়াছিলাম।

সোপানতলস্থ গৃহের উত্তর দিকে একটী দ্বার আছে। সেই দ্বার পার হইয়া একটী প্রকোষ্ঠ, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই সমাধিক্ষেত্র। উভয় দ্বারে যাতায়াত জন্য একটী কপাটহীন প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ আমাদের ঘটিল না। বিশেষ বন্ধুবর্গের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া শীঘ্রই

আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঠরা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্থানীয় জনৈক মুসলমানের নিকট হইতে আমরা সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়াইয়াই অনেক কথা অবগত হইলাম। যেস্থানে মুরশিদ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, সেস্থানও বহুবিধ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রত্যহ যামিনী যোগে একটী মাত্র প্রদীপের মলিন আলোক সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মুরশিদাবদ-নির্ম্মাতা নবাব মুরশিদকুলির কারুকার্য্য বিজড়িত সমাধিভূমির ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনের সহায়তা করিয়া থাকে !!! হায় ! মুরশিদ, তুমি-এক্ষণ কোথায়, তোমার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য, বাঙ্গলার একাধিপত্য এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বোপার্জ্জিত অদ্বিতীয় সম্মান সকলই যে তোমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ ? সোপানতলবর্ত্তী সমাধিগৃহটী দেখিয়া বোধ হইল যে, মধ্যে মধ্যে ইহার সংস্কার হইয়া থাকে। পরে শুনিলাম, এই সমাধি মন্দিরের কার্য্যাদি সম্পাদন করিবার জন্য একজন লোকও নিযুক্ত আছে। অতঃপর আমরা মসজিদবাটী পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদের ক্রিয়া কলাপ স্মরণ করিতে করিতে বালুচরের জনৈক বিখ্যাত জৈন প্রতিষ্ঠিত "কাঠগোলার বাগান" নামক বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের অন্যতম বিখ্যাত দৃশ্য দর্শনার্থ গমন করিলাম। পথে আরও ভগ্ন-মস্‌জিদ আমাদের নয়নগোচর হইল। জনৈক পথিককে একটি মসজিদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, মহাশয় ! ইহার নাম "ফুটী মসজিদ" তৎপর বহরমপুরে আসিয়া জানিলাম যে, "ফৌত্তি মসজিদের" অপভ্রংশে স্থানীয় লোকেরা "ফুটী মসজিদ" কহিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা সে সকল মস্‌জিদের প্রতি আর ততদুর মনোনিবেশ না করিয়াই চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম।

প্রিয় পাঠক ! যদি কখনও তীর্থযাত্রীর বেশে মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান দৃশ্য (হাজার দুয়ারী প্রভৃতি) দর্শনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদ সহরে পদার্পণ কর, তাহাহইলে যেন একবার কাঠরায় মুরশিদের স্মৃতিচিহ্নে নয়নার্পণ না করিয়া কদাচ পরিতৃপ্ত হইবে না। যাঁহার নামের সহিত মুরশিদাবাদের নামের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া একবার তাঁহার নাম না করিয়া, একবার তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ সন্দর্শনে নয়ন মন সার্থক না করিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া কি উচিত হয় ?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মৃগ।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা গোজাতি এবং মৃগ জাতি নামে দুইটি বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম বিভাগের নাম দিয়াছেন Bovine অর্থাৎ গোজাতি। দ্বিতীয় বিভাগের নাম দিয়াছেন Cervine অর্থাৎ মৃগজাতি।

পরন্তু এই দুইটী বিভাগ করিবার কতকগুলি কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন, নচেৎ শুধু শুধু শ্রেণীবিভাগ হয় নাই। কারণ গুলির মধ্যে যাহাদের লিভর, পাকস্থলী, শৃঙ্গ প্রভৃতি একরূপ, তাহারা এক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত, উহার তারতম্য হইলেই তাহাকে অপর শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে। এই হিসাবে জিরেফা, উষ্ট্র, গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি এক শ্রেণীতে অর্থাৎ Bovine বিভাগে পড়িয়া গিয়াছে। এবং হরিণ অপর শ্রেণীতে পড়িয়াছে। ইংরাজেরা কৃষ্ণসারকে অর্থাৎ (Antelope.) এণ্টিলোপকে হরিণ জাতি বলেন নাই; গো জাতি বলিয়া ধরিয়াছেন; তাঁহারা রেণ্ডিয়াকে যে হিসাবে হরিণের জাতি বলিয়াছেন, সেই হিসাবে এণ্টিলোপ বা কৃষ্ণসারকে হরিণ বলা চলিত। ইহাতে কোন কোন হিন্দু আপত্তি করেন ও তাঁহারা বলেন, "কৃষ্ণসার" হিন্দু-মতে প্রকৃত হরিণ শ্রেণীভুক্ত। ফলে যাহাই হউক, কৃষ্ণসার আমরা হরিণের শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া যাইব। উপস্থিত আমরা এই বুঝাইতে চাই যে, যাহারা রোমন্থনকারী জীব, অর্থাৎ যে জন্তুরা জাবর কাটে; এবং যাহাদের শৃঙ্গ ফাঁপা, অথচ উহার পরিবর্ত্তন হয় না, এবং সাদা সিদে শিং, উহারাই গো জাতি বা Bovine শ্রেণীভুক্ত। এবং যাহাদের শিং নীরেট, প্রতি বৎসর উহা খসিয়া গিয়া নূতন শিং উঠে; তাহারাই মৃগ জাতি বা Cervine শ্রেণীভুক্ত।

পৃথিবীর প্রায় সমুদয় বনেই হরিণ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আফ্রিকা খণ্ডেই কিছু অধিক। সমুদয় প্রাণী বৃত্তান্তেরই আফ্রিকা খণ্ডেই অধিক পরীক্ষার স্থল এবং তথায় প্রকার ভেদে এক প্রাণী বহুবিধ পাওয়া গিয়াছে, ইহা সকল প্রাণিতত্ত্ববিদেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। বানর, গরু, ভল্লুক, মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী আফ্রিকাতে নানাবিধ ভাবে পাওয়া গিয়াছে, এমনটি আর কোন মহাদেশে পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, যে হিসাবে পৃথিবীতে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহার কোনটি চূড়ান্ত ভাবে পাওয়া যায়

নাই, সেই হিসাবে মৃগ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহারও চূড়ান্ত পাওয়া হয় নাই, হরিণের বিষয় জানিবার এখনো অনেক অপূর্ণ আছে।

যাহা হউক, বসন্তকালে হরিণের কপোল দেশের দুই দিকে শুপারির মত যেন দুটি গুটি বা স্ফোটক বাহির হয়। এই স্ফোটকদ্বয় সুচিক্কণ চর্ম্মাবৃত এবং লোমাবলিতে আচ্ছাদিত থাকে। বোধ হয়, এই স্ফোটক নির্গমন জন্য উহাদের মস্তকে বেদনা হয়, এইজন্য উহারা ঐ সময় খুব সাবধানে থাকে; আততায়ী নিকটে আসিলেও কিছু বলে না। তৎপরে যখন সেই সুচিক্কণ চর্ম্ম ফাটিয়া শিং বাহির হয়, এবং সেই শিং ক্রমে পাকিয়া যখন বড় হয়, তখন উহারা শিং পাকিল কিনা, তাহার একটা পরীক্ষা করে অর্থাৎ অপর হরিণের পাকা শিঙ্গের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করিয়া যখন বুঝে, যে আর ভাঙ্গিবার নহে, তখন উহারা ইচ্ছামত স্থানে গমনাগমন এবং ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর হরিণের শিং বদলাইয়া নূতন শিং হয়।

ইহাদের অনেকের শিং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এবং কোন কোন হরিণের আদৌ শিং নাই। যবদ্বীপ এবং চীনদেশে এক জাতীয় হরিণের আদৌ শিং নাই। পরন্তু শিঙ্গের বাহার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তবে রেণ্ডিয়া এবং এল্ক জাতীয় হরিণের শিং উৎকৃষ্ট ঝাড়বিশিষ্ট এবং গুচ্ছাকার। তৎপরে লাঙ্গল ফেলো এবং শুক্রো জাতীয় হরিণের শিং যদিও ঝাড়াল এবং এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয় অপেক্ষা ইহাদের শিং অনেক ছোট। ওয়াপিতী জাতীয় হরিণের শিং বেশি ঝাড়াল না হইলেও উহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট খুব লম্বা। বোয়াক জাতীয় হরিণের শিং অনেক ছোট, আন্দাজ গো শৃঙ্গের অর্দ্ধেক; কিন্তু উহা বাঁকান নয়,—মস্তকের উপর খাড়া ভাবে দাঁড় করান। ইহা ভিন্ন হরিণীর এবং হরিণের শিঙ্গের অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে; তাহা প্রত্যেক হরিণের বিবরণের মধ্যে বলিয়া যাইব।

হরিণেরা শস্য এবং লতা-পাতা-ভোজী প্রাণী এবং শুদ্ধাচারী। অসভ্য শুওয়ারের মত দিবারাত্রি কর্দ্দমে পড়িয়া থাকে না। অনেক হরিণ অক্টোবর মাসে সঙ্গম করে। ইহাদের সঙ্গম সময় সুদীর্ঘ—তিন সপ্তাহ ক্রমাগত সঙ্গম করে। সঙ্গমের পর ইহারা শুদ্ধাচারে থাকে, অর্থাৎ যে, সে লতা পাতা ভক্ষণ করে না। এইজন্য এই সময় হরিণী কিছু কৃশ হইয়া পড়ে। সঙ্গম করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গী খুঁজিয়া লইতে হয়; ছাগলের মত স্বগোত্রে

ইহাদের সঙ্গম হয় না। অক্টোবরের সঙ্গমে গর্ভ হইলে, জুন মাসে ইহারা সন্তান প্রসব করে। বার বৎসর বয়স হইলে ইহারা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। এবং কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। সমুদয় হরিণের চক্ষুই মানুষের নিকট অতি সুন্দর। এবং কোন কোন হরিণ আদৌ জল পান করে না। কেহ বা জলের ধারে থাকে এবং জল পান করে।

কৃষ্ণসার জাতীয় হরিণের পরিচয় এইবার আরম্ভ করা যাউক।

(১)

গাজেলী জাতি।

এই জাতীয় কৃষ্ণসার পৃথিবীর চারি খণ্ডেই পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কুড়ি প্রকারের গাজেলীর দেখা পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকা, মধ্য এসিয়া, আরব এবং পারস্যে ইহাদের অনেক পাওয়া যায়। ভারতেও গাজেলী আছে। এই জাতীয় হরিণ দুই ফুট হইতে তিন ফুট পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। সিরিয়া, মিশর এবং আরবের গাজেলী খুব ছোট। মুখ মেষের মত; বর্ণ উজ্জ্বল তাম্র। শিং বাঁকিয়া বাঁশির মত হয়। ইহারা লতা, পাতা এবং তৃণ ভক্ষণ করে। ইহাদের আদৌ তৃষ্ণা নাই—বারি পান করে না। বর্ণ চিরকাল এক প্রকারের থাকে। নক্ষত্র বেগে দৌড়ায়।

(২)

স্যায়গা জাতি।

এই জাতীয় কৃষ্ণসার ২৪ প্রকারের পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মুখ লম্বা, শিং ঝাড়াল; এবং এক ফুট উচ্চ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের বর্ণ পিঙ্গল, এবং শীতকালে বর্ণ ধূসর হয়। ইহাদের নাসারন্ধ্রের প্রসরতা বশতঃ আহার কালে নাকের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করে বলিয়া ইহারা খাইতে খাইতে পশ্চাৎ হটিতে থাকে। ইহাদের নারীজাতির শিং নাই। ইহারা দ্রুত দৌড়ায় বটে, কিন্তু ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহারা দীর্ঘে প্রস্থে বেশ লম্বা হইয়া থাকে। পারস্যের লাঙ্গল ফলা হরিণের মত দেখিতে। ভারতের চিতি হরিণও এই স্যায়গা জাতি:কৃষ্ণসারের অনুরূপ।

(৩)

চাইরু জাতি।

ইহাদের বর্ণ লাল ছিটে; শিং ২ ফুট লম্বা; ইহাদের নারীগুলিরও শিং হয়। শিঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। চাইরু জাতি পর্ব্বতেই অধিক থাকে।

আকারে ইহারা খুব ছোট বা খুব বড় নহে। আমেরিকা এবং যবদ্বীপের হরিণাণুকে এই কৃষ্ণসার জাতিতে ধরা চলে।

(৪)

ইম্পালা জাতি।

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আড়াই শত প্রকারের ইম্পালা জাতি কৃষ্ণসার পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের পায়ের থাবা জিরেফার মত। চক্ষু বৃহৎ এবং সজল। মেয়েদের শিং নাই। পুরুষদের শিং কুড়ি ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের অধিকাংশের লাল রং; লোম কোমল; গলা সরু; মুখ লম্বা; উচ্চে এদেশীয় গরুর মত।

(৫)

ব্ল্যাক বাক জাতি।

এই কৃষ্ণসার কেবল ভারতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্ণ তামাটে কাল। পুরুষের শৃঙ্গ ৩০ ইঞ্চির অধিক লম্বা, এবং পাকান পাকান ভাবে স্ক্রুপের মত। মেয়েদের শিং নাই। ইহারা দেখিতে প্রকাণ্ড! মেয়েগুলা পুরুষাপেক্ষা ছোট। সচরাচর ইহারা আড়াই ফিট উচ্চ হয়। ইহাদের কাহারও চোক এবং কাহারও নাক বেড়িয়া একটা সাদা চক্র আছে। ইহাদের নাকলেজ খাট এবং নিম্নে কিঞ্চিৎ সাদা। ইহারা বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়িতে পারে। ব্যাঘ্র ভিন্ন অপর কেহই ইহাদের দৌড়িয়া ধরিতে পারে না। ইহাদের মাংস হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র। ইহাদের চর্ম্মেই উপনয়নের উপবীত প্রস্তুত হয়। মুনি ঋষিরা ইহারই উপবীত সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। মনুসংহিতা মতে ইহার মাংস শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে লাগিয়া থাকে।

"কৃষ্ণ সারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃ পরঃ॥

অর্থাৎ যতদূর কৃষ্ণসার স্বভাবতঃ চরে; ততদূরাবধিই যাজ্ঞিক দেশ, তাহার পর ম্লেচ্ছ ভূমি; কেননা, তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে পারে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। তাহা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তবে "মতামত" আছে; এবং এই কৃষ্ণসার লইয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে, ইহা বলাই এ ক্ষেত্রের কার্য্য।

(৬)

ওয়াটার বাক জাতি।

ইহাদের ভারতে এবং তির্ব্বতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের ঝরণার নিকট অধিক দেখা যায়। পুষিতে হইলে, খালে বা বিলের ধারে রাখিতে হয়। ইহারা জল পান করে। ইহাদের কপালে দুই যোড়া করিয়া শৃঙ্গ। ইহাদের নারীগুলির আদৌ শিং নাই। পুরুষগুলির শিং একযোড়া ৫ ইঞ্চি করিয়া এবং ছোট শিং যোড়া দেড় ইঞ্চি পরিমাণ। তাম্র বর্ণ। ইহাদের আর দুই জাতি পাওয়া গিয়াছে। সে জাতিদ্বয়ের নাম "সিং সিং" এবং "নাগর"। দেখিতে বেশী বড় নয়। ইহারা বড়ই চতুর কৃষ্ণসার।

(৭)

ইল্যাণ্ড জাতি।

ইহাদের দেখিতে এক একটি বলদের মত। ৬।৭ ফিট উচ্চ। কেবল আফ্রিকায় পাওয়া যায়; ইহারা বেশ স্থূলকায় বলিয়া আজ কাল ইংলণ্ডের সাহেবেরা ইহাদের পুষিয়াছেন, অবশ্য মাংস খাইবার জন্য। ইহারা লম্বায় ১৯।২০ হস্ত; এবং ওজনে ৩০।৪০ মণ মাংস পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ধূসর। জল খায় না। চক্ষু সজল, দীর্ঘ এবং চাহনি সুন্দর।

(৮)

কুডু জাতি।

ইহাদের আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। এই জাতির মত সুন্দর কৃষ্ণসার জগতে নাই। ইহারা স্বর্ণ বর্ণের। গাত্র অতীব মসৃণ। শিং ৪ ফিট লম্বা। ইহাদের নারীগুলিরও শিং আছে।

"হরিণ লোচনে।"

যেন ইহাদের সুন্দর চক্ষু দেখিয়া কবি ঐ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষে ইহাদের চক্ষু দেখিলে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে অনুমান করেন, ইহা ভারতেও ছিল। রাবণ রাজার সুবর্ণ মৃগ-মায়া দ্বারা যাহা সীতাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই জাতীয় কৃষ্ণসার।

(৯)

ব্লেস বাক জাতি।

ইহাদের আফ্রিকা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহারাও দেখিতে সুন্দর। মনোমুগ্ধকর। ইহারা প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বনভূমি আলোকিত করিয়া

বেড়ায়। ইহাদের শিং গুলি চারু চিক্কণ বাঁশরীর মত। দেখিতে এক একটি বাছুরের মত। স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। চিচ্চণ রোমাবলী। পরন্তু ইহাদের চর্ম্ম হইতে অতি উপাদেয় পুষ্প সৌরভ বিশিষ্ট ওষধি-গন্ধ বহির্গত হইয়া, পথিকের মনপ্রাণ হরণ করে। ইহাদের আর দুইটি "বণ্টিবক" এবং "ছাহাবি" নামক জাতি বাহির হইয়াছে। বোধ হয়, কিছু দিন মধ্যে ইহাদের চর্ম্ম হইতে সুগন্ধি আতর আবিষ্কার হইবে।

(১০)

নু (Gnu) জাতি।

ইহাদের আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের আকার কিছু অদ্ভুত ধরণের! যেমন অপরূপ রূপ, তেমনি লাবণ্যময় শৃঙ্গ। শিং বাঁকান এবং সুচিক্কণ। অশ্বের মত মুখ, তদুপরে মহিষের মত শিং। শূকরের মত দন্ত। অশ্বের মত পুচ্ছ। কেশরীর মত গ্রীবা বাঁকান। তুরঙ্গের মত চরণ। অনেক দিনের কথা, একবার কলিকাতায় চিরণী সাহেবের সার্কাসে একটা "নু" আনা হইয়াছিল। ঐ জন্তুটী যিনি দেখিয়াছিলেন, তিনিই হাসিয়াছিলেন; বস্তুতঃ ইহা হাস্যকর প্রাণী বটে! ইহাদের আর একটি "কোয়্যাপ" নামক জাতি বাহির হইয়াছে; কোয়্যাপ নু'র মত দেখিতে বটে, কিন্তু নুর বর্ণ কৃষ্ণাভ লোহিত; কোয়্যাপ সাদা বর্ণের, এই যাহা প্রভেদ।

(১১)

কামিং ওঠান জাতি।

ইহা ভারতীয় কৃষ্ণসার বটে; কিন্তু দেখিতে অনেকটা নু'র মত। ইহারা পাহাড়ে চরে! খুব বলবান। ছাগলের মত শিং। কাণ বৃহৎ। লেজ ক্ষুদ্র। গাধার মত গ্রীবা। গরু, গাধা, শূকর এবং ছাগল ভাঙ্গিয়া যেন ইহা সৃজিত হইয়াছে। ইহাদের ভারতবর্ষীয় নাম "গোরাল।" এবং সুমাত্রায় এই জাতীয় কৃষ্ণসার যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের "কামিং ওঠান" জাতি কহে।

(১২)

অরিক্স জাতি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় কৃষ্ণসার যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে "অরিক্স" কহে। ভারতে ইহাদের নাম "নীলগো।" অরিক্স এবং নীলগো

দেখিতে এক প্রকারের বটে; কিন্তু কামেহিলা দেখিতে ছাগলের মত, ইহা ইয়োরোপ খণ্ডে পাওয়া যায়। এই কামেহিলা নীল গো'র জাতিতে ধরা হইয়া থাকে।

নীল গো ৪ ফুটের অধিক উচ্চ হয়। বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। ইহাদের এক অঙ্গুলি পরিমিত শিং। কিন্তু নীল গাই'য়ের শিং নাই। ইহারা জিরে-ফার মত জিহ্বা দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। ওষ্ঠ দিয়া ধরে না। ইহার চর্ম্মে উৎকৃষ্ট চাম্‌ড়া হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণসারের এক যোড়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব সর্ব্ব প্রথমে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যান; নচেৎ তথায় পূর্ব্বে ছাগলের মত নীল গো ছিল। কৃষ্ণসার জাতির পরিচয় সংক্ষেপে শেষ হইল। এইবার হরিণ জাতির বিষয় বলা হইতেছে।

(১৩)

মন্তজাক জাতি।

বঙ্গীয় বনভূমিতে এই হরিণ অনেক পাওয়া যায়। ইহাদের অপর নাম "কিদাঙ্গ" ইহাদের লোকালয়ে পুষিলে বেশ পোষ মানে। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ তাম্র—শৃগালের মত আকার। এদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, শকুন্তলার পালিত হরিণটি এই মন্তজাক জাতি ছিল। ইহারা ২০ ইঞ্চি পরিমিত উচ্চ হইয়া থাকে। কর্ণ দীর্ঘ। লাঙ্গুল নাই বলিলেই হয়। নামে মাত্র আছে,—খুব ক্ষুদ্র বেড়ে লেজ অল্প টিকির মত। হিমা-লয় পর্ব্বত হইতে চীন পিকিন পর্য্যন্ত ইহারা চরিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে ৮ হাজার ফুট উচ্চে ইহাদের আবাস দেখা গিয়াছে। ইহাদের চর্ম্ম খুব উষ্ণ বলিয়া, তুষাররাশির মধ্যে ইহারা বিচরণ করিতে পারে। এই মৃগের নাভির নিম্ন স্থলে, তলপেটের বহির্ভাগে প্রথমে একটি স্ফোটকের মত হয়, পরে ঐ স্ফোটক ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একটা কমলানেবুর মত গোলাকার "আব্‌" হয়। ইহার অভ্যন্তর প্রদেশে মূল্যবান সুগন্ধি কস্তুরা সঞ্চিত থাকে। নারী মৃগের মৃগনাভি বা কস্তুরী হয় না; কেবল পুং মৃগের হইয়া থাকে। মৃগের কস্তুরী হইলে, সে সময় মস্তক স্থির থাকে না, বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে; এজন্য সে সময় ইহাদের ধরা বা স্বীকার করা বড়ই কষ্টকর। অনেক কৌশলে ধরা হয়। এবং তাহাদের কক্ষ-লুক্কায়িত অমূল্যনিধি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া লওয়া হয়, এই ছেদনের জন্য মৃগ উপস্থিত কষ্ট পাইলেও তাহার জীবন নষ্ট হয় না এবং আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, এই মৃগ গৃহপালিত হইলে, তাহার কস্তুরী প্রকাশিত হইতে প্রায় দেখা যায় না। যখন কস্তুরী ছেদন করা হয়, তখন ছেদনকারী নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া উহা ছেদন করে, নচেৎ প্রবাদ এই যে, তীব্র গন্ধে রক্ত বমন হইবার সম্ভাবনা। ইহাদের দন্ত দীর্ঘ।

(১৪)

এল্কজাতি।

ইহাদের অপর নাম মুজ। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং উত্তর আসিয়া খণ্ডে ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। ইহারা শীত প্রধান দেশে বাস করে। আট ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের বর্ণ কালচিটের উপর তামাটে। ঘাড় ছোট। লেজ খাট। ইহাদের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। ইহাদের লাফ ভয়ানক। শিং ভয়ানক ঝাড়াল—শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। লোম দীর্ঘ দীর্ঘ। মুখ মহিষের মত।

(১৫)

ওয়াপ্টা জাতি।

মিসর, পারস্য এবং কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। বর্ণ লোহিত। শীতকালে ইহাদের লোম বাড়ে। কাশ্মীরের উপত্যকাভ্যন্তর প্রদেশস্থ বনভূমি এই হরিণে পূর্ণ। মহিসুরেও ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। ১৩।১৪ হস্ত লম্বা হয়। সেপ্টেম্বরে ইহাদের শিং সুপক্ক হয়। ইহাদের বহুবিধ জাতি বাহির হইয়াছে। মুখ গর্দ্দভের মত। লেজ নাই বলিলেই হয়। গলায় লোম বেশী। ইহাদের অপর নাম লাল হরিণ। জাপান, ফোরমোসা, এবং মাঞ্চুরিয়ায় লাল হরিণ অনেক পাওয়া যায়।

(১৬)

রোবাক জাতি।

ইহাদের ঘাড় এবং গলা অনেকটা উটের মত। পা ছোট। ইহাদের শিং খুব ছোট। দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত আছে। যে হরিণের দন্ত দীর্ঘ, তাহাদেরই মৃগনাভি হয়, মস্তজের দন্তদীর্ঘ বলিয়া এইরূপ অনুমান করা হয়। কিন্তু রোবাক জাতির মৃগনাভি পাওয়া গিয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই। ইহাদের চীন এবং ইউরোপের অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এমন কি ইহাদের বিলাতী হরিণ বলা চলে। চীনে ইহার নাম "ইলাফুর।" ইহাদের বর্ণ লোহিত, বেশ উজ্জ্বল।

(১৭)

রেণ্ডিয়া জাতি।

পৃথিবীর সকল দেশেই পাওয়া যায়, তবে শীতপ্রধান তুষারময় দেশেই ইহারা ভাল থাকে। এই জন্ম লাপল্যাণ্ড এবং ফিনল্যাণ্ডে ইহাদের বেশী দেখা যায় বস্তুতঃ এই হরিণ উক্ত মহাদেশদ্বয়ের জীবন স্বরূপ। ইহারা প্রকাণ্ড হরিণ। ইহাদের বড় বড় মোটা মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট শিং দেখিতে যেন বৃক্ষ বিশেষ। ইহাদের নরনারী উভয়েই শৃঙ্গ-বতী। সচরাচর ইহাদের ঘোরাল লোহিত বর্ণের দেখা যায়, কিন্তু শ্বেত বর্ণের রেণ্ডিয়াও পাওয়া যায়। ইহাদের পদপল্লবে কৃত্রিম খুর আছে।

(১৮)

লাঙ্গলফেলো জাতি।

ইহাদের শৃঙ্গাগ্রভাগ লাঙ্গলের ফলার মত দেখিতে বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে "লাঙ্গলফেলো।' ভারতে এবং পারস্যে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম চিতা হরিণ। সর্ব্বাঙ্গ সুদৃশ্য চিতি চিহ্ন—যেন বেনারসি চেলী। ইহারা প্রকাণ্ড হরিণ। নিশাচর। ইংলণ্ডে ইহাদের পোষা হইয়াছে।

(১৯)

বিবিধ হরিণের কথা।

আফ্রিকায় অনেক রকম হরিণ আছে, তাহাদের বিশেষত্ব কোন গুণাদি না পাইয়া, উহাদের প্রত্যেক জাতি ধরিয়া বলা হইল না। "ক্লিপ্" "স্প্রীঙ্গার" "ঔরবি" "ষ্টেনবক" এবং "গ্রাইস্‌বক্' দেখিতে সুন্দর, এবং মাংসল। ইহারা ইংরাজপছন্দ হরিণ "বুসবাক" এবং "বেয় সার" ইহারা দেখিতে ছোট ছোট, নাসাগ্র গরুর মত। সর্ব্বদা সজল নয়ন। আমেরিকায় প্রায়ই ছোট মৃগ দেখা যায় এবং পাওয়া যায়; এজন্ম সচরাচর উহাদের decrlet অর্থাৎ হরিণা বা হরিণাণু বলা হয়। যবদ্বীপেও প্রায় ঐরূপ হরিণ পাওয়া যায়। এজন্ম উহাদেরও হরিণাণু বলা হয়। নীলগো এবং লাল হরিণ দেখিতে প্রায় একরূপ। হরিণের চর্ম্মে অনেক শিল্প কার্য্য হয়। হরিণের চর্ম্মে আসন হয়। লাল হরিণের লোমযুক্ত চর্ম্মে সুন্দর ইংলিশ কোর্ট হয়। হরিণ চর্ম্মের পাদুকা অতি পবিত্র!! রেণ্ডি-

য়ার চর্ম্মে জামা কাপড় প্রস্তুত হয়। হরিণ মাংস কেবল বৈষ্ণব ছাড়া পৃথিবীশুদ্ধ লোকে আহার করে; হিন্দুর নিকট হরিণ মাংস অতি পবিত্র।

বৃন্দাবনে বানর, ময়ূর এবং হরিণ স্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। একজাতি হরিণ বিশেষ সঙ্গীত প্রিয়। উহাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া শিস্ দিলে, উহারা তোমার নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়! আহা! ঐ সময় লোকে বর্ষা দিয়া উহাদের খোচাইয়া মারে!

তুমি চক্ষের চাহনী যেমন হরিণকে দিয়াছ! এমন চাহনি আর কাহাকেও দিয়াছ কি?

ফুলের শত্রুকর নাই, তেমনি হরিণের চাহনির প্রতিবাদ করে, এমন কাহাকেও সৃজন কর নাই কেন?

সুশ্রুত সংহিতায় হরিণ মাংস সম্বন্ধে এই কথা লিখিত আছে।

"হরিণ মাংস পাকে মধুর, দোষঘ্ন, অগ্নিবৃদ্ধিকর, শীতল, মল-মূত্র-রোধক, সুগন্ধি এবং লঘুপাক।

আর্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ হরিণকে "এণ" এবং তাম্রবর্ণ মৃগকে "হরিণ" ও যে মৃগ কৃষ্ণ এবং তাম্রবর্ণ নহে, তাহাকে "কুরঙ্গ' বলিতেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

জনপদোদ্ধংসে স্বাস্থ্য।

বাত বিকৃতির জন্য—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তান বিপর্য্যয় সম্বন্ধে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন;—

বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতি চলমতি পরুষমতি শীতমত্যুষ্ণ মতি রুক্ষমত্যভিষ্যন্দিন মতিভৈরবারাবমতি প্রতিহত পরস্পর গতিমতি কুণ্ডলিনমসহ্য গন্ধ বাষ্প-সিকত পাংশু ধূমাপহতমিতি।

ঋতু গুণের বিপরীত ভাবাপন্ন, অতিশয় জলসিক্ত, অতি বেগ, অতি পুরুষ, অতি শীত, অত্যুষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বেগবাহী, অতি ভীষণ শব্দ যুক্ত, অতি কুণ্ডলিত, এবং অত্যন্ত অসুখাবহ গন্ধযুক্ত, বাষ্প, বালুক

পাংশু, ধূমাদি দ্বারা দূষিত হইলে, বায়ু রোগকর হয়, এবং তদ্বায়ু সেবীদিগের শরীরও রোগপ্রবণ হইয়া থাকে।

জল বিকৃতি জন্য—

ভাব বিপর্য্যের সম্বন্ধে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

উদকন্তু খলু অত্যর্থ বিকৃতি গন্ধবর্ণ রসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্ত জলচর বিহঙ্গমুপক্ষীণ জলাশয়মপ্রীতিকরমপগত গুণং বিদ্যাৎ।

জল অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ, বিবর্ণ, বিকৃতি রস, বিকৃত স্পর্শ, ক্লেদ বহুল, জলাশয়, জলচর পক্ষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, শুষ্ক, অপ্রীতিকর,—জল, সাধারণতঃ স্বগুণ বর্জ্জিত হয়।

দেশ বিকৃতি জন্য—

ভাব বিপর্য্যের লক্ষণ হইতেছে,

দেশং পুনঃ প্রকৃতি বিকৃতি বর্ণ গন্ধরস সংস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপ ব্যাল মশক শলভ মক্ষিকা মুষিকালূক শ্মশানিক শকুনি জম্বুকাদিভিস্তৃণোলূপো পবনবন্তং প্রতানাদি বহুলমপূর্ব্ববদব পতিতং শুষ্ক নষ্ট শস্যং ধূম্র পবনং, প্রধ্মাত পতত্রিগণমুৎক্রুষ্ট শ্বগণমুদ্ভ্রান্ত কথিত বিবিধ মৃগপক্ষি সংঘমুৎসৃষ্ট নষ্ট ধর্ম্ম সত্য লজ্জাচারগুণ জন পদং শশ্বৎ ক্ষুভিতোদীর্ণ সলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাত নির্ঘাত ভূমিকম্পঞ্চ প্রতিভয়া রাবরূপং রুক্ষ তাম্ররুলসিতাভ্রজাল সংবৃতার্ক চন্দ্রতারত মভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব স ত্রাস রুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকা চরিতমিবা ক্রন্দিত শব্দ বহুলঞ্চাহি তং বিদ্যাৎ।

দেশ বা ভূমির অর্থ (তদাত্মকগুণ) হইতেছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বলিয়া ভূমির বিকারে পূর্ব্বোক্ত গুণ পঞ্চকের বিকার ও দেশের বাহ্যতঃ বিবর্ণত্ব, ক্লেদ ও নিগ্রহ সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, শলভ, মক্ষিকা, মূষিক, উলূক, শ্মশানচারীপক্ষী ও জম্বুকাদির মরণ বৃদ্ধি, দেশে নানাবিধ তৃণ ও উলূপের উৎপত্তি বিবিধ লতার প্রসার বৃদ্ধি,—পূর্ব্ব হইতে দেশের আকার প্রকারগত পরিবর্ত্তন, ভূমির অকৃষ্ট পতিত দগ্ধ বা তাহার তদ্ভাব শস্য সমূহ শুষ্ক ও নষ্ট, ধূমযুক্ত বায়ুর কুজ্ঝটিকার ন্যায় বোধ, অনুভব পক্ষীদিগের নিরন্তর বিকৃত কূজন, কুকুরের রোদন, মৃগ পক্ষিগণের উদ্‌ভ্রান্ত বধিচরণ বা ব্যথিতভাবে রোদন, মানব সমূহের সত্য ধর্ম্ম লজ্জা আচার ও গুণ হইতে বিচ্যুতি, জলাশয়ের জল কখনও ক্ষুভিত, কখনও উদীর্ণ হইয়া ক্ষণে শূন্য ক্ষণে পরিপূর্ণ হয়। উল্কাপাত ও নির্ঘাত ও ভূমিকম্প হয়। দেশের দিক্ সমূহ ভয়াবহ

শব্দে শব্দিত হইতে থাকে। আর চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাবলা কখনও রুক্ষ তাম্রবর্ণ কখন শ্বেত স্নিগ্ধবর্ণ বা মেঘাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণের হৃদয় সর্ব্বদা সন্ত্রন্ত জন্য উদ্বেগের উদ্রেক বা ভয় ক্রমে রোদন, চক্ষে অন্ধকার দর্শন, যক্ষ বিচরণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহার অনুকূল বচন তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসংগ্রহ সুগণোক্ত বচনের উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে তাহাই নির্দ্দেশে কেমন সামঞ্জস্য সুরক্ষিত—

সোম সূর্য্য বিকৃতিশ্চ গন্ধবর্ণ ব্যতিক্রমঃ
ধূম্র বায়ুশ্চতীব্রোগ্রঃ ক্ষুভিতোদীর্ণ পল্বলঃ॥
উল্কাপাতো ধরাকম্পোদিঙ্‌মালা নির্হতা সদা।
জলাভাবঃশস্য হানি রীতিনাং সমুপদ্রবঃ।
হীনচারা জনাঃ সর্ব্বে ভয়ারাবৈশ্চ শঙ্কিতাঃ।
ব্যালপ্লবঙ্গমূষিকা বিসৃজন্তি কালরবম্‌॥
ভবন্তি দুর্লক্ষণানি যত্র জনপদে যদা।
বিধ্বংস স্তস্য সম্ভাব্যো নিশ্চিতং নাত্র সংশয়ঃ॥

এই শ্লোকের সহিত চরকোক্ত বচনের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত। ব্যাল-প্লবঙ্গ, মূষিকাদির মৃত্যু সম্বন্ধে নির্দ্দেশ থাকায়, বোধ হয় ভূমি দূষিত হইলে, ভৌম বিকার ভূমি সংস্থিত জীবগণের অন্তর্ভূমিচর মূষিকগণের বিশেষতঃ শীঘ্র রোগপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্লবঙ্গ শব্দে কেহ ভেক বা উল্লম্ফনশীল জন্তু, কেহ বা শাখামৃগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাই হউক, সুগণ কথিত বাক্যের সহিত চরকোক্ত বাক্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কালবিকার জন্য—

ভাব বিপর্য্যয় লক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপ—

কালস্তু খলু যথর্ত্তু লিঙ্গাদ্বিপরীত লিঙ্গমতি লিঙ্গঞ্চাহিতঃ ব্যবস্যেৎ।

যে ঋতুতে যেরূপ লক্ষণ স্বাভাবিক, তাহার বিপরীত লক্ষণ বা ঋতুগত লক্ষণের আধিক্য বা হীনতা ঘটে।

সে যাহা হউক, জল বায়ু দেশ কাল দূষিত বা বিকৃত লক্ষণ হইলে তদাশ্রিত জীবের শরীরগত ভাবেরও বিকার ঘটে। সুতরাং রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। এই রোগপ্রবণ শরীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায় একের রোগ অন্যের শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে, অনুকূল স্থান আশ্রয় করিতে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন পায় না। ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য যে, প্লেগ একটী সংক্রামক রোগের

প্রবল প্রসারের সময় বিশিষ্ট সামর্থ্যময় শরীরেও রোগের সংক্রমণ ঘটিয়াছে, হয়ত তাহাতেই তাহার ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং সংক্রামক রোগের প্রসারের সময় সাবধানে নিয়ত সংযত ভাবে থাকিলে, রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত না হইয়া বিশুদ্ধভাবে সদ্‌বৃত্তে ব্রতী হইলে, নিরাতঙ্ক নিরাময় থাকার আশা হয় সত্য, কিন্তু স্থান ত্যাগ তাহার অপেক্ষা নিরাপদ। চরকের অনুশাসন হইতেছে।

হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥

দেশ দূষিত হইয়া রোগপ্রবণতার অনুকূল ক্ষেত্র হইলে, তাহার ত্যাগ করিয়া মঙ্গলকর জনপদের আশ্রয় গ্রহণ হিতকর, ব্রহ্মচর্য্যের ও ব্রহ্মচারিগণের সেবাও বিহিত। এই ব্যাপারের বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিলে, স্পষ্টই অনুমিত হয়, কোন সংক্রামক রোগের প্রবল প্রসারের প্রাক্‌কালে স্থান ত্যাগ সঙ্গত; কিন্তু প্রবল প্রসারের পর লোকের শরীর রোগপ্রবণ হইয়া রোগের আশ্রয় হইলে, রোগাশ্রয় হইলেও, যাহার কতিপয় দিবসের পর এমন কি পক্ষান্তেও বিকাশ পাইতে পায়, তাহাদের স্থান ত্যাগ করিতে দিয়া রোগের দেশান্তর সংক্রমণের সুযোগ করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। তৎসম্বন্ধে বোধ হয়, রোগাক্রান্ত দেশে গণ্ডী দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দেহান্তর সংক্রমণ সমর্থ রোগের বীজাণু যাহাতে দেহান্তর আশ্রয় করিতে না পারে, তাহার বিধান করা একান্ত উচিত বলিয়া সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাদ্ গাত্র সংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসার্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

মৈথুন, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, রোগীর পৃষ্ট বস্ত্র মাল্য অনুলেপনাদির ব্যবহার, এই সকল করিলে, কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষ্মা চোক্ উঠা, এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজ রোগ সকল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সকল সংক্রামক রোগে বা ইহা-দের আংশিক লক্ষণ বিশিষ্ট কোন সঙ্কর ব্যাধিতে রোগীর সহিত কথিত মৈথুনাদির সংঘটন নিষিদ্ধ। অপর জনপদবিধ্বংসী রোগ সকল প্রায়ই জ্বরাদির কথঞ্চিৎ লক্ষণ বিশিষ্ট কোন রূপ সঙ্কর ব্যাধির আবির্ভাব হয়;

আর তজ্জন্যই প্রাগুক্ত উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষণ একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রান্তর নির্দেশানুসারে কথিতরূপ কোন রোগীর প্রথম রোগের সময় দেবার্চ্চনাদি মাঙ্গল্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সেই নির্দ্দেশ মতে আরও দেখা যায়, মৃতের অবস্থান গৃহে হোমাদির অনুষ্ঠান করাও বিহিত। গৃহের রোগীর শয্যাতলস্থ ভূমির উৎখাত করিতে লৌহ শলাকার রোপণ করিতেও যে উপদেশ আছে, তাহার সম্বন্ধে আর্য্য বাক্য শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সর্ব্বভুক্ অগ্নিও সংক্রামক রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ। অগ্নিতে আহুত ঘৃতাদির সৌরভও ব্যাধিনাশক ও স্বাস্থ্যরক্ষক। সুতরাং হিন্দুদিগের এই আর্য্য উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম যে একান্ত হিতকর, তাহার অপলাপ করিবার শক্তি কাহারই নাই। সূর্য্যরশ্মিও আমাদিগের আরোগ্য বিধানের উপযোগী, আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ, এই অনুশাসনও আরোগ্যপ্রদ সবিতার অর্চ্চন সংক্রান্ত উপদেশ। আরও সুশ্রুতে কথিত আছে :—শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপঃ। তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥

চন্দ্র, পৃথিবীকে রসে আপ্লুত বা ক্লিন্ন, সূর্য্য পৃথিবীর রস শোষ ও বায়ু এতদুভয়ের আশ্রয়ে প্রজারক্ষণ করিতেছেন। সূর্য্য রস শোষ করেন, এবং বর্ত্তমান জনপদ বিধ্বংসী নগরোৎসেধকর ব্যাধি প্লেগ, ত্রিদোষজ বিকার বিশেষ হইলেও গ্রন্থি স্ফীতিতে শ্লৈষ্মিক প্রকোপের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, শোষক তেজের আশ্রয় গ্রহণ সঙ্গত। চরকে কথিত হইয়াছে :—

শীতেনোষ্ণ কৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্বিদঃ। যেতু শীতকৃতা রোগা তেষাঞ্চোষ্ণং ভিষগ্ জিতম্ ॥

বৈদ্যগণ শীতল দ্বারা উষ্ণকৃত রোগের ও শীতকৃত রোগের উষ্ণদ্রব্য দ্বারা প্রশমন করিয়া থাকেন। আর কলিকাতায় প্রায়ই বসন্তকালেই প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। আর ঋতুর বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, "হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা বসন্তে কফ রোগকৃৎ"। এই সূত্রানুসারে বোধ হয়, প্লেগে শ্লেষ্মার প্রকোপেরই প্রাধান্য প্রধানতঃ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং কফজ ব্যাধির উষ্ণ ক্রিয়া প্রশমনকর বলিয়া, সূর্য্যরশ্মি প্লেগের প্রতিষেধ পক্ষে প্রকৃষ্ট উপযোগী। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশের একটী বিশিষ্ট বিধির পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যেমন আবাসস্থান নির্ম্মল পরিষ্কৃত না হইলে আবর্জ্জনার পচনাদি জনিত পূতিগন্ধে অধিবাসিগণের

রোগপ্রবণতা অবশম্ভাবিনী। তেমনি সেই ব্যষ্টিভাবের প্রত্যেক গৃহের পরিষ্কার করার ন্যায়, সমস্ত ভাবে বহু গৃহের সমাহার রূপ নগরেরও পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। আবার গৃহের বা নগরের পরিষ্কার বা নির্ম্মলতা সাধনের চেষ্টার ন্যায় আত্ম পুরুষের আশ্রয়স্থান দেহের পরিষ্কৃতি বা নির্ম্মলতা বিধানের উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

পাখীর গান।

কিগান গাহিয়া
কোথায় যাস!
কার লাগি প্রাণ
এত উদাস!
কোন্ সুর তোর
গানেতে ঝরে,
কেন সে আমারে
পাগল করে!
আমার কত কি
পূরাণ স্মৃতি,
উগারিছে যে
ও গান নিতি!
তোর ওই গানে
মরম দেশে,
একখানি সুর
আসিছে ভেসে।
কেন তোর গানে
এমন হই,
আমি যেন আর
আমাতে নই।

বলরে এগান
পেলি কোথায়,—
আমারে পাগল
করিলি যায়।
পরাণ বাঁধিতে
পারিনা আর,
বল্‌রে ও গান
হরিলি কার!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
বড়াললেন, হুগলী।

——:():——

সংবাদ ও নানা কথা।

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর, কীর্ণহার শিবচন্দ্র ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বীরভূমের মাজিষ্টেট্। শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়া বালকগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব প্রায় এক ঘণ্টা কাল সুললিত ভাষায় বালকগণকে উপদেশ দেন। সকলেই তাঁহার মধুর আলাপে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। আমেদ সাহেবের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট্ পাইয়া আমরা সৌভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই।

কীর্ণহারের সন্নিকট ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের একটি স্ত্রীলোক, বিষপ্রয়োগে অপর কয়েক জনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছে। পুলিশ সেই স্ত্রীলোকটিকে চালান দিয়াছে।

বীরভূম জেলায় ত এ সকল উৎপাত পূর্ব্বে ছিল না। কেন এমন হইল?

———

নানা কারণে পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। সকল কথা আজ বলিতে পারিব না। আজ কেবল স্বাস্থ্যের কথাই বলিব। ইংরাজী চাল্ বচন, ডাক্তারি ঔষধ, অনুপযুক্ত আহার, ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা কারণে গ্রাম গুলিত ব্যাধির আকর হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া লোকে অজ্ঞতা বশতঃ অনেক ব্যাধিকে ডাকিয়া আনিতেছে। এখনও বীরভূমে

বিশেষত কীর্ণহার অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ লোকই প্রায়ই নিরক্ষর, অর্দ্ধ শিক্ষিত বা পুরাতন ধরণে শিক্ষিত। আধুনিক শিক্ষায় লোকের ধর্ম্মভাব হৃদয় হইতে দূর হয়, একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী মোটের উপর মন্দ জানেন না। কিন্তু যাহারা একেবারেই শিক্ষার কোন ধারই ধারে না, তাহাদের না আছে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, না আছে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি। শাস্ত্রকারগণ সকল বিষয়েরই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থ্যের কথাটাও তাঁহারা ধর্ম্মের মধ্যে ধরিয়া গিয়াছেন। কাজেই যখন লোকের ধর্ম্মভয় ছিল, তখন, সকলেই জলকে নারায়ণ জ্ঞানে অতি পবিত্র রাখিত, ছায়া ও জলদানের জন্য বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী খনন করিত। এসব করিত ধর্ম্মের টানে; স্বাস্থ্যের টানে নহে। কিন্তু দুঃসময় আসিল; ধর্ম্মভাব লোকের মন হইতে প্রায় বিদূরিত হইল। সুতরাং লোকে অবাধে পানীয় জলে শৌচ প্রস্রাবাদি করিতে লাগিল, বৃক্ষপূর্ণ প্রান্তরকে মরুভূমি করিয়া ফেলিল, জলাশয় খনন করা দূরের কথা, পুষ্করিণী ভরাইয়া জমি করিতে লাগিল। অবস্থাত এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখন উপায়? আবার সেই প্রাচীন কালের মুনি-ঋষির সংস্কৃত শ্লোকে যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহাত বোধ হয় না। অথচ আর কিছু পাই আর না পাই, পানীয় জলটা একটু ভাল খাইতে পাইব না কেন? পানীয় জলে বা জলের ধারে মল মূত্র ত্যাগ না করিলে কি লোকের সুখ হয় না? তাহা ছাড়া কাপড় পরিষ্কার ও অন্যান্য শত প্রকার উপায়ে জল নষ্ট করার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। যদি বলেন, গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে ত এ সকল নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা হয় না। অনেক লোকের এ সব বিষয়ে ততটা নজর নাই। আর এক কথা, অনেক গ্রামে কেহ প্রধান নাই। ইংরাজী হাওয়া বহায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়াছে। কেহ কাহাকে মানে না। কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় লইতে চায়। এরূপ যখন ব্যাপার, তখন কি করা উচিত? আমরা যতটুকু বুঝি, যত দিন অধিকাংশ লোক শিক্ষিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত। আরও একটা কথা আছে। পূর্ব্বে লোকে ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য পুষ্করিণী খনন করিত। এখনত ধর্ম্মের কথা কাহারও মনে নাই; অর্থের কথাই কিছু বেশী পরিমাণে দেখিতে পাই। কাজেই কেহ যে পরোপকারের জন্য টাকা খরচ করিয়া জলা-

শয় খনন করাইবে, ইহা সম্ভব নয়। আর লোকে কত খরচই বা করিবে? জিনিস পত্র সমস্ত অক্রেয়; তাহা ছাড়া নানা প্রকারে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। পোষাকের খরচ, মোকদ্দমার খরচ, বিবাহের খরচ, ট্যাক্সের, চাঁদার খরচ নানা খরচ আছে। জলাশয় খননের খরচ কেমন করিয়া কুলাইবে? স্নতরাং রাজাই এখন একমাত্র সহায়। গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন পুষ্করিণী খননের আর উপায় নাই।

রাস্তা সম্বন্ধেও দু চারি কথা বলা আবশ্যক। গ্রামের রাস্তা গুলিত অতি কদর্য্য হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান লোকেরা গ্রাম্য দেবতার দোহাই দিয়া সকলকে আপন আপন বাটীর সিমানার রাস্তা বাঁধাইতে বলিত। সকলেই গ্রাম্য দেবতার ভয়েই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, আপন আপন সিমানাস্থিত রাস্তা মেরামৎ করিত। এখন এই আইন কানুনের দিনে কেহ ত আর কাহারও হুকুম মানিবে না, কাজেই গ্রাম্য রাস্তাগুলি অতি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথ! তাহা ত আর নাই বলিলেই চলে। সে সব গুলি এখন ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উত্তম শস্য প্রসব করিতেছে। যাতায়াত ত একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যাহারা একটু আধটুকু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা ত দরখাস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌কে জালাতন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টে কিছু সেলামী না দিলে, অর্থাৎ ষ্ট্যাম্প দিয়া নালিশ না করিলে কোন ফলইত হয় না দেখিতেছি। এখন উপায়? উপায়ের মধ্যেত একটী দেখিতেছি। কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রাম্য সমিতি (Village Union) স্থাপন করা। আজকাল চাপরাশ ভিন্ন কোন কাজ হয় না। স্নতরাং গ্রাম্য-সমিতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা যে অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব গত ১৮ই ডিসেম্বর, যখন কীর্ণহারে আসেন, তখন কেহ কেহ পানীয় জলের প্রতি অত্যাচারের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। তাহাতে তাঁহার ধারণা হয় যে, এতদঞ্চলে পানীয় জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্য তিনি শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে কীর্ণহারে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন। সৌরেশ বাবুও আপনার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও পরোপকারিতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, মাজিষ্ট্রেটের নিকট গ্রাম্য সমিতি স্থাপনের এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এখন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কৃপাদৃষ্টি করিলে

আমাদের অনেক উপকার হয়। আর গ্রাম্য-সমিতি সৌরেশ বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইলে যে সুফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হিন্দু জাতির অধঃপতনের চূড়ান্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন চারি দিকেই শাস্ত্রের অবমাননা দেখিতে হইতেছে। যে সকল মহা পাপের জন্য হিন্দু জাতির এই বর্ত্তমান দুরবস্থা, গোজাতির প্রতি দুর্ব্ব্যবহার তাহাদের অন্যতম। গোচর ত আর কোথাও নাই। গরুগুলি ত জীর্ণ শীর্ণ, মৃতকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবিতাবস্থায় গরুগুলি ত এইরূপ অনাহারে থাকিয়া মহাকষ্টে মনুষ্যের উপকার করে। কিন্তু অনেক মানুষ আবার এরূপ কৃতজ্ঞ যে, সেই গরু যখন বৃদ্ধ হইয়া বা অপর কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোক সেই সকল অকর্ম্মণ্য জীবগণকে নিষ্ঠুর কসাইগণের হস্তে অর্পণ করে। হিন্দুর দেশে ইহা বড়ই বিসদৃশ্য। কোন্ হিন্দু ইহা দেখিয়া ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে? যে পারে, তাহার চক্ষু নাই, হৃদয় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বীরভূম, বড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণবল্লভ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় একটা পিঁজরা পোল স্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। অজয় নদের তীরে কোন স্থানে উহা স্থাপিত হইবে। তথায় অকর্ম্মণ্য গরুগুলিকে আশ্রয় দেওয়া হইবে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, প্রাণবল্লভ বাবু ও মন্মথ বাবুর চেষ্টা যেন সফল হয়। আর বীরভূমবাসী হিন্দু সন্তানদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য দ্বারা উক্ত মহোদয়দ্বয়কে উক্ত পুণ্য কার্য্যে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

কীর্ণহারের নিকটস্থ সুরপুর গ্রামের তিন জন লোক আবার একজনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। তাহারা সেসনে সোপরর্দ্দ হইয়াছে। এবার বীরভূম জেলায় বড় বেশী খুন হইতেছে।

কলিকাতা, ১/৩ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে

লাম, সম্রাটের বিরাগ উৎপাদন করায় আপনার প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু বিরাগের কারণ কি, তাহা জানিতে পারি নাই।"

"আলাউদ্দিন আমার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিল। প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতেই এই আদেশ হইয়াছে।"

"আমরা ইহার প্রতিশোধ লইব।"

"কিরূপে ?"

"আমি দিল্লীর সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য এখানে আসি নাই। আলা-উদ্দিনের মৃত্যু হইলেই আপনার কারামুক্তি হইবে।"

"কিন্তু একাকী অসহায়াবস্থায় তুমি কি আলাউদ্দিনের বিনাশ করিতে পারিবে ? কেননা, শত শত রক্ষিবর্গ সর্ব্বদা তাহার শরীর রক্ষা করিতেছে।"

"শত শত কেন, সহস্র সহস্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইলেও দূর হইতে নিক্ষিপ্ত সায়কে তাহার হৃদয়স্থল ভেদ করিতে পারে।"

[illegible]দাসভাবে রতনসিংহ বলিলেন, "যে কোন প্রকারে আমার কারামুক্তি হই[illegible] হইল। যদি অন্য উপায় না থাকে, [illegible]দা আমাকে যবনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে।"

ক্রোধে এবং অপমানে অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জয়পাল উত্তর করি-লেন "কখনই না"।

এই বলিয়া তিনি বেগে কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কারা-রক্ষক তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ করিল এবং ভবিষ্যতের জন্য অধিকতর সতর্ক হইল।

রতনসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়পাল অতীব চিন্তিত হইলেন এবং কি উপায়ে জয়াকে রক্ষা করিবেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের দেবী পাপিষ্ঠ যবনের অঙ্কশায়িনী হইবে, এ চিন্তা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি আলাউদ্দিনের বিনাশ সাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লেন। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইহার দুই চারিদিন পরে আলাউদ্দিন বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে বার ক্রোশ দূরে একটি বৃহৎ অরণ্যে মৃগয়া করিবার জন্য গমন করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণও তাঁহার সঙ্গে চলিল। মৃগয়ায় আমোদে সকলেই [illegible]

ধরিয়া বহুসংখ্যক পশু হনন হইল। তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে আলাউদ্দিন একটি হরিণের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া একাকী অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। হরিণটি তাঁহার লক্ষ্যপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতে পথের সন্ধান করিতে পারিলেন না। এদিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়; তাঁহার ঘোটকও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং একটি উচ্চ ভূমির উপর আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটি তীর আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিল। আলাউদ্দিন পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে দ্বিতীয় তীর আসিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিল। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

এদিকে আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইল। তাহারা সমস্ত রাত্রি অরণ্যের নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিল এবং পরিশেষে কাননপ্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরিশেষে যখন তাহারা আরোহীশূন্য তাঁহার ঘোটকটিকে দেখিতে পাইল, তখন সকলে স্থির করিল যে, সম্রাট্ কোনও হিংস্র পশুর কবলে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং সকলে বিমর্ষ চিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ আলাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র রুকুনুদ্দিনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এদিকে চেতনা সঞ্চার হইলে আলাউদ্দিন দেখিলেন যে, তাঁহার ক্ষতস্থান উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকজন ভীল তাঁহার শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি তাহাদের নিকট আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিলেন এবং আপনাকে সম্রাটের অনুচর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রায় পক্ষাধিককাল শয্যাগত থাকিয়া দিল্লীশ্বর বনবাসী ভীলগণের যত্নে ও পরিচর্য্যায় আরোগ্য লাভ করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম হইতে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পরিচয় পাইয়া দলে দলে সৈন্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। তিনি এইরূপে ৫০০ পাঁচশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য আসিয়া তদীয় পতকা মূলে সমবেত হইল। সকলেরই সন্দেহ হইল, রুকুনুদ্দিনই সিংহাসন লাভের আশায় গুপ্ত-

ভাবে সম্রাটের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। রুকুনুদ্দিন আফগানপুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হইলেন।

সিংহাসন সর্ব্বতোভাবে সুদৃঢ় করিয়া আলাউদ্দিন পুনরায় রতনসিংহকে আপন সমীপে আনয়ন করিয়া কহিলেন, চিতোররাজ! প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের পাণিগ্রহণে তোমার কন্যার কোন অবমাননা হইবে না। অতএব যদ্যপি স্বাধীনতা বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে তোমার কন্যাকে দিল্লীতে আনয়ন কর, নচেৎ অপরাধীর ন্যায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। কাপুরুষ রতনসিংহ ধীরভাবে কেবল মাত্র উত্তর করিলেন—"আমাকে স্বজাতি মধ্যে কলঙ্কিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে।"

আলউদ্দিন কহিলেন "পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান পদে উন্নীত হইবে।"

রাজপুতরাজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু তাঁহার কন্যাকে দিল্লীতে আনয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং আলাউদ্দিনের নিকট বিদায় লইয়া তদুদ্দেশ্যে যশল্মীরে লোক প্রেরণ করিলেন।

দেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ।

প্রার্থনা

১

হরি!
কি আছে আমারে আর,
তোমায় করিতে দান,
আমারি তুমি যে সব,
জানি সার ভগবান।

২

আমারি তরেতে তুমি
নিয়ত ভাবিয়া সারা,
আমারি সুখের তরে,
তুমি যে আপনাহারা!

৩

ডাকিনা তোমারে কভু
রহ তবু কাছে কাছে;
অপূর্ব্ব এ ভালবাসা
কোথা কি এমন আছে?

৪

ভালবাসা নারি দিতে,
তবু তুমি ভালবাস;
আঁধার এ হৃদি মাঝে,
নিরন্তর সুপ্রকাশ;

৫

অতি দীন দুঃখী আমি
জগতে মিলেনা ঠাই!
তোমারে দেখিনা তবু
তব কোলে সুখ পাই।

৬

দুরবল যবে হিয়া
অবসন্ন হয় প্রাণ,
তোমারি অনন্ত শক্তি
আনন্দে করহ দান!

৭

জগতে চেনেনা কেহ,
কেহ নাহি ভালবাসে,
তুমি কি ভুলিতে পার
চিনিয়া রেখেছ দাসে !

৮

যখন যেখানে যাই,
শত নদী ব্যবধান,
রহ তুমি কাছে কাছে,
বিপদে করিতে ত্রাণ !

৯

ব্যথিতেরে শান্তি দিতে,
মুছাইতে অশ্রুধার,
তোমা বিনা এ জগতে,
কেবা প্রভু আছে আর ?

১০

তুমিত রেখেছ চোখে,
তবু বলি চোখে রেখ,
তুমিত দেখিছ নীতি
তবু বলি দে'খ দে'খ।

১১

ভালবাস যেই রূপে,
শিখাইয়া দেও তাই,
তোমারে (ও) এমনি করে,
যেন বাসিবারে পাই !

১২

তুমিত পৃথক নহ,—
যেন এক হ'য়ে রই,
বারে কও যেন মনে
নাহি হয় "তুমি কই ?"

১৩

তোমার প্রেমের নদী
এ হৃদয়ে যেন বয়,
তোমারি অনন্ত ছায়া
হেরি যেন বিশ্বময়!

১৪

কাঁদিলে তোমারি পায়
হাসিলে তোমারি হাসি ;
এক হয়ে তুমি আমি
যেন প্রভু ভালবাসি !

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী,
যশাই।

সমালোচনা।

জন্মভূমি—৯ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

অনেক দিন হইল আমরা এই এক খানি মাত্র জন্মভূমি সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলিলাম। অনবধান বশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। "জন্মভূমি" এখন আর "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় না। নূতন স্থান হইতে, নূতন উৎসাহে, নূতন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। এই সংখ্যায় অনেক

সুবিজ্ঞ লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভরসা করি "জন্মভূমি" ইহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এ সংখ্যা দেখিয়াত আমাদের অনেকটা আশা হইয়াছে।

প্রয়াস—২য় বর্ষ, ডিসেম্বর।

পূর্ব্বের ন্যায় এ সংখ্যার প্রয়াসের প্রবন্ধগুলি সুলিখিত ও সুমিষ্ট। তবে এ সংখ্যার "অধিকারতত্ত্ব" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শ্রীযুক্ত ধীরাজকৃষ্ণ সোম এই প্রবন্ধ তাঁহার নিজের লেখা বলিয়া "প্রয়াস" সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্পাদকও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, ঐ প্রবন্ধ ধীরাজ বাবুর আদৌ লেখা নহে। "বীরভূমির" বর্ত্তমান সম্পাদক কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে সাওতাল পরগণা মলুটী গ্রাম হইতে প্রকাশিত "ধরণী" নামক মাসিক পত্রে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ধীরাজ বাবু হয়ত মনে করিয়াছিলেন, লোকে হয়ত ঐ প্রবন্ধের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি নিজের নাম দিয়া প্রয়াসে উহা প্রকাশিত করেন। যাহা হউক, সাহিত্যে এরূপ জুয়াচুরি বড়ই নিন্দার্হ। এরূপ [illegible]র ডাকাইত কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার অনেক ক্ষতি হইতেছে। পাঠকগণ, লোকটিকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া এত কথা বলিলাম। তবে লোকটি চোরের মধ্যে সাধু বটে, তিনি প্রবন্ধটি অবিকল নকল করিয়াছেন। এমন কি, যেখানে মুদ্রাকরের দোষে অর্থ দুর্ব্বোধ হইয়াছে, সেখানেও কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হন নাই। "বঙ্গভূমি" সম্পাদক, সেদিন সাহিত্য চোর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি এমন সাধু চোরের কথা কখন শুনিয়াছেন কি ?

প্রয়াস—২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে "প্রয়াস" "সাহিত্য-সেবক সমিতির" হস্ত হইতে "প্রয়াস সমিতির" হস্তে আসিয়াছে। এ দুই সংখ্যা কিন্তু পূর্ব্বের মত হয় নাই। ভরসা করি, নূতন পরিচালকগণ "প্রয়াসের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইবেন। প্রয়াস বেশ কাগজ ছিল।

নবপ্রভা—প্রথমখণ্ড, ১ম সংখ্যা।

সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র বাবু বহুদর্শী, সুবিদ্বান ও সুলেখক। সুতরাং আশা-

করা যাইতে পারে যে, "নব্‌প্রভা সাহিত্য-জগতে নবপ্রভা বিকীরণ করিবে। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি মন্দ না হইলে ও কোন কোনটি এত ক্ষুদ্র যে, পাঠ করিয়া কিছু মাত্র তৃপ্তি হয় না। ইহা একটা দোষ। প্রবন্ধগুলি অন্ততঃ এত বড় হওয়া উচিত, যাহাতে একমাস কাল পাঠকের মনে আকাঙ্ক্ষা বজায় থাকে। এক সংখ্যা দেখিয়া বিচার করা যায় না। সেই জন্য আমরা আশা করিতেছি যে, "নবপ্রভা" স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

মহাজন বন্ধু। মাসিক পত্র। কলিকাতা, বড়বাজার, ১নং চিনি পটী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাহিত্যালোচনার জন্য অনেক মাসিক পত্র আছে। কিন্তু ব্যবসায়িগণের কোনরূপ পত্রিকা ছিল না। আমাদের বীরভূমির পাঠকবর্গের সুপরিচিত রাজকৃষ্ণ বাবু সেই অভাব দূর করিবার জন্য এই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে ব্যাবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এই পত্রের তাহাই উদ্দেশ্য। বলিতে দুঃখ হয়, আমরা ব্যবসা আদৌ বুঝি না। ব্যবসায় কেমন করিয়া অর্থের নিয়োগ করিতে হয়, আমরা তাহা জানি না। আবার স্বদেশজাত দ্রব্যের কেমন করিয়া প্রচার করিতে হয়, সে কৌশলও আমাদের অজ্ঞাত। এই দেখুন না, এখনও ত অনেক শিল্পজাত দেশীয় দ্রব্য রহিয়াছে; আবার নিব, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যও ত আমরা প্রস্তুত করিতেছি, কিন্তু বাজারে কয়টা দেশী নিব পাওয়া যায়, বা দেশীয় কলের কাপড় কয় খান দেখিতে পাওয়া যায়? "মহাজানবন্ধু" যদি ব্যবসায়িগণের মধ্যে একটা একতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি ও দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন করিতে পারেন, তবে বড় উপকার হয়। প্রথম দুই সংখ্যা "মহাজনবন্ধু" দেখিয়া অনেকটা আশা হইয়াছে। লেখা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও মধুর। সহজ কথায় কঠিন বিষয় বুঝাইতে রাজকৃষ্ণ বাবু সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য ভরসা হইতেছে, রাজকৃষ্ণ বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা "মহাজনবন্ধু" দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে।

অমৃত তুসনিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এবে শুন ষুনিত যুক্ষ্ম পদ্ম কোঠার সিমা।
ক্রমে ২ কহি যেই সভার মহিমা॥
ভবভয়ভঞ্জন ভুগ যে করে ভজন।
সাধকসিদ্ধ সেই জন জিনে ত্রিভুবন॥
পূর্ব্বে কহিঞাছি পদ্ম কুঠা লয় হয়।
ষুনিত যুক্ষ্ম দুই তাহে সদা বিলসয়॥
বৈনিক যুসন্মা নাড়ী সম গুণ ধরে।
যুসন্মাতে ষুনিত পদ্ম বৈনিকে যুক্ষ্ম তেজকরে॥
একৈস হাত সতর য়ঙ্গুলি প্রমান নাড়ি যুন।
পাকে পাকে দেহ মধ্যে ইহার ভ্রমণ॥
দুই পাক মুল স্থানে গুহ্য দেস হয়।
পরে পাক বাম ভিতে ত[illegible]দ্ধ যায়॥
কুমদ বৈনিক কংকা নামে নামে নাড়ি।
ইড়া পিঙ্গল দুই উঠে মুল পদ্ম ছাড়ি॥
এই পঞ্চ নাড়ি পিষ্টগত উদ্ধ যায়।
বৈনিক বেষ্টিত পঞ্চ জানহ নিশ্চয়॥
একান্ন গিরাতে বৈনিক পিষ্টগত উঠে।
এক চল্লিস গিরা তার কক্ষ্যমূল হেটে॥
দুই বাহু দুই গিরা ললিতে পাক তিন।
কুন্তলেজে দুই দুই ললাটে প্রবিন॥
এই নাড়িগত যুক্ষ্ম ব্যাপে সর্ব্বস্থান।
স্বরির মস্তক আর পাদ নিরূপন॥
এবে কহি স্থিতি গতি তাহার জেমন।
বিস্তারিঞা কহি এবে যুন দিয়া মন॥
বাম কক্ষ্য হেটে এক কুমুদ কীলকা।
ষুসম্মা নাড়ির দেখ[illegible]সে তাহা সিকা॥

সেই কলি মধ্যে স্থিতি বিন্দু বাস করে।
যুনিত আশ্রয় করি সর্ব্বস্থাণ ফেরে॥
কখন মস্তকে জায় কখন গুহ্য দেশ।
কখন পায়েতে জায় কখন পদ্মেতে প্রবেশ॥
এই মত সর্ব্বাঙ্গেতে ফিরএ ব্যপিঞা।
মস্তকে কর[illegible]াস পদ্ম মধ্যে জাঞা॥
ছয় দণ্ড স্থিতি করি নামে ভুরু দেসে।
পাঁচ দণ্ড তোথা থাকি জায় চক্ষু পাসে॥
তথা তিন দণ্ড থাকি পুণরুপি চলে।
তিন দণ্ড স্থিতি করে জাঞা কর্ন্নমুলে॥
তদপরে অধরেতে গুণমন্ত্র হঞা।
সেতপদ্ম পাসে রহে তিন দণ্ড জাঞা॥
তদপরে নামে মন্দ ২ গতি করি।
মুলপদ্ম পিষ্টে রহে দুই দণ্ড ধরি॥
সেই স্থান ছাড়ি পুন চলে অধমুখে।
উরু দেসে করি [illegible]ন তিন দণ্ড থাকে॥
তবে চলে মন্দগতি শিঘ্র গতি হঞা।
দুই দণ্ড বাস বিন্ধ অঙ্গুলিতে জাঞা॥
পুণ এই মত উদ্ধ উঠে পুনর্ব্বার॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত হয় লোমে লোমে আর॥
এই মত যুনিত পদ্ম মধ্যে করে স্থিতি।
দণ্ড পল পদ্ম কুঠা জাঞা করে স্থিতি॥
সেই দুই পুরুষ নারি জুতির্ম্ময় হয়।
কাম কিড়া রসে দুহে নিরন্তর রয়॥
এই দুই নির্ত্ত দেহে কিসর কিসরি।
মনের গোচর নহে অন্যে কিবা করি॥
চন্দ্র সুর্য্যের গতি নাহি না চলে পবণ।
ব্রাহ্মণ গোচর নহে এহি নিরুপণ॥

ক্রমশঃ

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৭ [৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।	(সম্পাদক)	৯৭
২।	ঐতিহাসিক ছড়া সংগ্রহ।	(শ্রীশিবরতন মিত্র)	৯৯
৩।	আমারে ভুলালে কে ?	(শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান) ...	১০৩
৪।	ঘুমের ঘোর।	(শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে)	১০৮
৫।	জীবনী সংগ্রহ।	(শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল)	১০৯
৬।	জলপ্লাবন।	(শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	১১৭
৭।	জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন।	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ,) ...	১১৯
৮।	জয়া।	(শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ)	১২৫
৯।	নারীধর্ম্ম।	(সম্পাদক)	১৩৩
১০।	শিক্ষা।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম, এ)	১৩৬
১১।	ভারতেশ্বরীর স্মৃতিচিহ্ন।	(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ)	১৪০
১২।	সতীদাহ।	(সম্পাদক)	১৪৩

কীর্ণাহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে
বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণাহার গ্রাম হইতে,
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা ।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] মাঘ। [৪র্থ সংখ্যা।

রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

অর্দ্ধ ধরিত্রীর অধীশ্বরী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া, এই নশ্বর জগতের জালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সুখময় নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে সমগ্র পৃথিবী ঘোর বিষাদ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে; তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের সামান্য কুটীরবাসী প্রজা হইতে, ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি পর্য্যন্ত সকলেই মাতৃহীন হইয়া রোদন করিতেছে। কত মহামহিমান্বিত সম্রাট্ অলৌকিক প্রতিভাবলে, কত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, জগতের ইতিহাসে স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার ন্যায়, কেহই প্রজার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কেহই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইবার সময় তাঁহার ন্যায় সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে কাঁদাইয়া যাইতে পারেন নাই। যতদিন এ জগতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন মানব সমাজে রাজা প্রজা সম্বন্ধ আদৃত হইবে, ততদিন ভিক্টোরিয়া প্রজার হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন। অলৌকিক গুণের অধিকারী না হইলে কাহারও এমন সৌভাগ্য হয় না।

ভিক্টোরিয়া অলৌকিক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। পূতসলিলা জাহ্নবী যেমন ভগবানের শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া ধরাধামে অমৃতপ্রবাহ ঢালিয়া দিতেছেন, রাজরাজেশ্বরীর স্নেহ-জাহ্নবীও সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া অগণ্য নরনারীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। হিমগিরি যেরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভূধ্বংসকারী কম্পন নীরবে সহ্য করিয়া, অচল অটলভাবে স্বীয় তুঙ্গ শৃঙ্গ

উত্তোলন করিয়া মানদণ্ডের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, রাজ-রাজেশ্বরীও তদ্রূপ, কত রাজনৈতিক ঝটিকার প্রবল আঘাতে অবিচলিত থাকিয়া, কত দৈবী ও মানুষী আপদের নির্ম্মম কম্পনে স্থির থাকিয়া, তাঁহার এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের মানদণ্ডরূপে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে রাজোচিত গুণাবলীর সহিত রমণীসুলভ কোমলতার মধুর সম্মিলন হইয়াছিল। যিনি রাজপদ গ্রহণ করিয়া একজন অপরাধীরও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন নাই, তাঁহারা মহনীয় চরিত্র পৃথিবীর প্রত্যেক নৃপতির হৃদয়কে মহিমান্বিত করিবে; যিনি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও সর্ব্বদা দাসীভাবে স্বামী পরিচর্য্যায় শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন, তাঁহার এই পতিভক্তি পাশ্চাত্য নারীগণের হৃদয়ে পবিত্র জ্যোঃতি প্রদান করিবে; যিনি দুর্ব্বোধ্য নিয়তি প্রভাবে স্বামিধনে বঞ্চিতা হইয়া, আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে চিরদিনই পূজা করিবে; এবং যাঁহার ঈশ্বরপ্রেম জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে অন্তঃপ্রবাহিত, তিনি অপ্সরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া অনন্তকাল পবিত্র সুখের লীলাভূমি অমরাবতীতে বিহার করিবেন।

আর আমরা ভারতবাসী, মহারাণীর স্বর্গারোহণে আমাদের যে দুঃখ, তাহা অপরে বুঝিবে না।

ভারতবাসী যাঁহাকে চিরদিন দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, 'ভারত-মাতা' বলিয়া যাঁহার প্রতি চিরদিনই মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, যাঁহার শাসনে বিপ্লবক্ষুব্ধ ভারত নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, ভারত-সন্তান যাঁহার রাজত্বে সর্ব্বাপদ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার বিয়োগে যে দুঃখ, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

তবে ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, যে যতদিন ভারতবাসী ভগবান রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজারূপে হৃদয়সিংহাসনে পূজা করিবে, ততদিন ভিক্টোরিয়াও সেই সিংহাসনের এক পার্শ্বে স্থান পাইবেন; যতদিন আর্য্য সন্তান সীতা সাবিত্রীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ততদিন ভিক্টোরিয়ার নামও এই দুই রমণী রত্নের নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে।

আমরা ক্রমে এই অলোকসামান্য মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

ঐতিহাসিক ছড়া-সংগ্রহ।

গ্রাম্য কবির গ্রাম্য ভাষায় বিরচিত ছড়াগুলির স্বভাবতঃই এমনই একটী মোহিনীশক্তি আছে,যাহাতে আমরা সকলেই সেই গুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকি এবং অতি আগ্রহের সহিত উপভোগ করিয়া পতিতৃপ্ত হই। কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিকের প্রতি চিরদিনই মনের এমনই প্রিয় আকর্ষণ ও নিত্য-লালসা।

পাখী, অসম্বৃত ভাবে আপন প্রাণে আকাশে গাহিয়া চলিয়া যায়, কাহা রও অপেক্ষা করে না, অথচ তাহাতেই সকলেই মুগ্ধ ও প্রফুল্লিত। ছড়া, কবির সরল প্রাণের খোলা গান—সকলকে মুগ্ধ না করিয়া ছাড়ে না।

সুনিপুন চিত্রকরের, প্রতি বর্ণ-সম্পাতে ও তুলিকা সঞ্চালনে যেমন চিত্রটি স্ফুটতর হইয়া ক্রমশঃ সজীব হইয়া উঠে, তেমনই ছড়ার প্রতি ছত্রে সহজ ও সলীল বর্ণনামাধুর্য্যে, বর্ণিত বিষয়ের সমগ্র ছবিটি যেন আমাদের সমক্ষে যথাযথ, গতিশীল, সুচঞ্চল ও জীবন্তস্বরূপ উপনীত করিয়া দেয়। ছড়া মাত্রেরই ইহা সাধারণ গুণ।

এই গুণ আছে বলিয়াই ইহা কাব্যামোদী ব্যতীত ঐতিহাসিকগণেরও পরম আদরের বস্তু—আরাধ্য ধন। প্রবাদ, ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়ন হইয়া এমনই অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, সে বর্ণনায় ঐতিহাসিকের কিছু খুজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই ছড়া গুলি , অধিকাংশ স্থলেই, কবির প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের নিখুৎ ফটো। পাঠকগণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছড়াগুলি পাঠ করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

এই সুদীর্ঘ ছড়াগুলি আবার প্রায়ই লোকমুখে রক্ষিত আছে—স্মৃতির উপর একমাত্র নির্ভর। সুতরাং এ বিষয়ে লোকের আর আগ্রহাতিশয্য না থাকিলে যে, অচিরে এই সকল ছড়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, সে ক্ষতি আর পুরণ হইবে কি করিয়া?

এই নিমিত্ত আমরা মূল ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের সৌকর্য্যার্থ, 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধের ন্যায় এই "ঐতিহাসিক ছড়াসংগ্রহ" প্রবন্ধের অবতারণা

করিলাম। ইহাতে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বন্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে বিরচিত, অপ্রকাশিত, ছড়া সকল সংগৃহীত হইতে থাকিবে। একই বিষয়ে দুইজন কবির ছড়া প্রচলিত রহিলে আমরা উভয়ই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব। ছড়াগুলির অধিকাংশ স্থলেই ছন্দের অক্ষর সংখ্যার অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে। অক্ষর সংখ্যা অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য বেশী। আমরা কিন্তু যথাযথ প্রকাশিত করিলাম, বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি নাই। কারণ, এই ছড়াগুলি যে প্রাদেশিক শব্দ সঙ্কলনে বিশেষ উপকারে লাগিবে, তাহা বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। *

এই ছড়া-সংগ্রহ কার্য্য সামান্য হইলেও আয়াসসাধ্য—বিশেষতঃ ক্ষুদ্রশক্তি আমার পক্ষে। সাধারণের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে আরব্ধ কার্য্যে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারি। কেহ কি দয়া করিবেন না ?

১২৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে লিখিত,

ছড়া।

রচয়িতা :—শ্রীরাইকৃষ্ণ দাস।

শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে
সুভ বাবুর (১) হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে।
বেটারা কোক্ ছাড়িল জড় হইল হাজার হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হ'ল ভার।
হল সব দুর্ভাবনা রাড় কান্দনা সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।
বলে ভাই, রাখব কোথা হেথা সেথা এই কথা শুনি
রাখতে মুলুক সলা সুলুক ভাবতেছে কোম্পানি।

---

* আমরা এতদঞ্চলে প্রচলিত বহুসংখ্যক (চারিশতেরও অধিক) প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি, হয়ত ভবিষ্যতে আরও করিতে পারিব। এই সকল বিষয়, ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের "ভাষাতত্ত্বে" আলোচ্য।

(১) 'সুভবাবু' বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের নেতা ; (সুবাদারের অপভ্রংশ)।

বেটাদের শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীরে
জিনীষ ছেড়ে পলাওনা ভাই সবাই থেক ঘরে। ১০
আমাদের আছে গোরা সঙ্গীন চড়া জামা জোড়া গায়
বন্দুকেতে গুলি পোরা তুড়ুক্ সোয়ার তায়।
বেটারা থাকে কোথা সত্যকথা সুধায় তোমাদেরে
কেহ বলে দেখে এলাম ময়ুরাক্ষীর ধারে।
আছে সব জড় হয়ে পূর্ব্ব মুয়ে তীর মারিছে গাছে
কত শত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তীরে ফলা বনাতে বরাত মতে যখন যেমন কয়
হাতে হাতে যোগায় ফলি পাছে টান হয়।
বেটাদের পোষাক চড়া কপ্নী পরা লইতে (২) বেড়া বুকে
ভাড়ের উপর পূজা করে কোক্ ছাড়িছে মুখে। ২০
আগেতে লাগরা পিটে কাটে ছাটে মদে মাসে ভরা
প্রথড়ে বাঁসকুলি দিয়ে পাড়লো গায়ে ডেরা।
দেখে সব লোক পলাছে টোকাপোছে উয়ে লটাই খান
কেহ বলে রাহ্ধা রইল বড় মাছের থান।
বলে ভাই পালা পালা একি জ্বালা করে কলরব
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্ত মুখো সব।
আর কি হাকিম মানে বনে বনে রাস্তা পেলে সোজা
সাদিপুরে লুট্‌লে গিয়ে কাপড়ের বোজা
যথা উচিত, বোচ্‌কাবেন্ধে লিল কান্দে যত মনে ছিল
রাতারাতি হাতাহাতি কালিষ্টেকে গেল। ৩০
সকলি এম্নিধারা দেয় লাগরা অহর্নিশি পিটে
খাবার বেলায় সাঁওতালদের মেয়ে ছেলে যোটে।
বলে ভাই রাজা হব টাকা পাব করিয়া মন্ত্রণা
দুদিন বাদে পোড়াইল গিয়া নাঙ্গলের থানা।
এই কথাশুনে সিপাইগণে বন্দুক নিল হাতে
দারগা মুন্সীর সহিত দেখা হইল পথে।

(২) 'লইতে—দেশীয় সূত্রে নির্ম্মিত মোটা কাপড় : 'ঘর বোনা কাপড়'।

মনেতে ভয় পেয়ে পশ্চিম মুখে অমি গেল ফিরে
পড়ের গুয়ে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে।
জত সব জেলের গোলা ভাঙ্গি তালা সব বা'র করিল
মড়াপেটে চড়া দিয়া খিচুন যে লইল। ৪০
তখন সিপাইয়েরা সঙ্গীনচড়া কাপ্তান সহিত
নদীর উপান্তে আসি হইল উপনীত।
জত সব সিপাইগণে ভাবে মনে হায় সার সার
দেখে শুনে ময়ূরাক্ষী উভয়ে না হয় পার।
তীর বর্শা তৈয়ার আছে আপন সাজে রণ নাইখ বাজে
নদীরধারে সাঁওতালেরা নাগরা বাজায় নাচে।
সেখানে সাধ্য করি পারাবার দুকুল বহে বান
হাতেতে কিরিচ ধরে দেখিছে কাপ্তান।
দেখিয়া বহুত সেনা কি মন্ত্রণা করে দুই জনে
বন্দুক তৈয়ার রাখ কহে সিপাইগণে।
দণ্ড ৪।৬ পরে কয় হাবিলদারে সুবাদারেব প্রতি
নির্ণয় করিতে দুরবীন্ আন শীঘ্র গতি।
বলে উঠলো গয়ে হাওদা মাঝে নয়নে দুরবীন্
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সাঁওতাল ক্রোশ দুই তিন।
কিছু দূর পিছে হাট্ ব'লে ঝাট্ সাহেব গেল চ'লে
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পালায় পালায় ব'লে।
করিয়া বহু দম্ফ দিল ঝম্ফ পড়িল নদীর জলে
সাঁতারিয়া পার হৈল হাজার সাঁওতালে।
বলে সব মার মার ধর ধর এই মাত্র রব
আজ সিউড়ী জেলা লুটবোগিয়ে করে পরাভব। ৬০
আব সব জেহালখানা দিব থানা মুক্ত করবো চোরে
সুভো বাবু রাজা হবেন জজ সাহেবকে মেরে।
আমরা ঘুচবো মাঝি কাজের কাজি মহর করবো বসে
কৃষ্ণগৌর দোকান ভেঙ্গে সরাপ্ খাব ক'সে।
বলে শীঘ্রতর আগুধর আর বিলম্ব কেনে
কর্ত্তা পাকে পড়লো সাঁওতাল সিপায়ের মাঝখানে।

বেটারা তুচ্ছজাতি নাইখ বুদ্ধি কিবা জানে টের
আচম্বিত হুকুম হইল বলিয়া 'কায়ের'।
আলি হুকুম পেয়ে সিপাই যেয়ে বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাশ পঞ্চাশ গোলি মারে এক কালে। ৭০
যেমন তারা খসে আসেপাশে তেমনি গোলি ছুটে
পৃষ্ঠেতে বাজিয়া কারু পার হৈল পেটে।
অন্য সাঁওতাল যত কত শত পলাইয়া গেল
কুড়ি আট নয় সাঁওতাল তারা সেই দিনেতে মোল।
তখন পলায় সাঁওতাল করিয়া বিকল পিছে নাহি চায়
স'নাথ পাহাড়ে গিয়া সুভকে জানায়।
শুনে সব দুঃখমনে পয় দিমে কৈল একাকার
জঙ্গি হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার।
নাহিক মৃত্যুভয় সদা বয় ধেনুকেতে চড়া
নগর মোকামে গিয়ে বাজায় নাগেড়া। ৮০
শুনে সব লোক পালাল বিষম হল তাবলি পোদ্দার
সৎগোপ গোয়ালা পলায় কান্দে লয়ে ভার।
পলায় সব বুড়া বুড়ি দৌড়াদৌড়ি হাতে লয়ে নড়ি
মুসলমান ফকির পলায় মুখে পাকা দাড়ী।
মুখেতে বলে আল্লা বিস্‌মাল্লা একি বেটাদের তীর
এ বিপদে রক্ষা কর হে সত্যপীর।
বলে প্রাণ জায় হায় হায় কি বিপদ হইল
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মুরগী কোথা গেল।
জত সব মাথায় ঝুড়ি কেঁথা ধুকুড়ী ঊর্দ্ধমুখে ধায়
হোঁচট্ খেয়ে পড়ে কেহ গড়াগড়ি যায়।
ঐ সাঁওতাল এল সাঁওতাল কাট্‌লেরে সাঁওতালে
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে।
তখন হর্ষমনে সাঁওতালগণে রাজবাড়ী সেন্দায়
মানুষকাটা পড়্‌লো সে দিন কুড়ি দু আড়াই।
পরে সাঁওতালগণ হৃষ্টমন দেয় টাঙ্গিতে সান
লাও জোড়ে নাড়াবেটাকে দিল বলিদান।

গেল কুম্‌ড়োবাদে সকল কাদে হইল:একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা করিল ছারখার ।
পোড়াইল ধানের গোলা তিল জোল্লা (৩) সরিষা আদি জত
গরু মহিষ ছাগল ভেঁড়া পুড়লো কত শত । ১০০
পূর্ব্বে হনুমান লঙ্কাখান যেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায় ।
ঐ গ্রাম নিবাস সাধুদাস তার সঙ্গে জনা চারি
সিউড়ী আসি জজের কাছে বল্‌ছে বিনয় করি ।
আর্‌ত প্রাণ বাঁচে না কি মন্ত্রণা কর্‌ছেন হুজুর বসে
ঘরকন্না পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাট্‌লে শেষে ।
শীঘ্র উপায় কর সাঁওতাল ঘরে রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গীর বোটে মুলুক কেটে পতিত করলে বন ।
সাহেব ও সাম্‌লে সিপাইগণে বলয়ে বচন
অতি শীঘ্র যাও তোমরা কর গিয়ে রণ । ১১০
কথা শুনে তখন যত সিপাইগণ বন্দুক হাতে নিল
রাতারাতি সিপাইগণ কুম্‌ড়ো বাদ্‌কে গেল ।
যুদ্ধ যেই মতে বিস্তারিতে হবে বহুক্ষণ
আকাশের চান্দ কোথা ধরয়ে বামন ।
বেটারা ধনুক ধরে তীর মারে করে মার মার
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার
সাহেব হুকুম দিলে 'ফয়ের' বলে শুনে সিপাইগণ
হাজারে হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ ।
অম্‌নি ভাগেড়া হায় পূর্ব্বমুলয় পলাইয়া যায়
পাট্‌জোড় মোকামে আসি নাগেড়া বাজায় । ১২০
নাগেড়ার শব্দ শুনে সর্ব্বজনে পলায় সত্বরে
জনাদশ বাগিড়ে গোয়াল সেই দিনেতে মারে ।
লোকে কি যন্ত্রণা কি লাঞ্ছনা করলেরে সাঁওতালে
কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিল ছেলে ।

৩ 'জোলা' জোনারী ; ভুট্টা ।

এমনি সর্ব্বত্তরে লোট করে বেড়ায় সাঁওতাল
মনুষ্য কা কথা দেবতা পলান গোপাল।
ভাণ্ডিরবন ছেড়ে পলান দৌড়ে পুজুরির মাথায়
বীরসিংহরের কালিমায়ের বলিহারি যাই।
বারশ বাষট্টি সাল বর্ষাকাল বানের বড় বৃদ্ধি
আন্দারপুরে মানুষ কেটে কল্লে গাদা গাদী। ১৩০
কাট্‌লে বিষ্ণুপুরে হারা তাঁতিরে প্রিয়গুলার মাঠে
বিপন গোপকে তিরিয়ে মার্‌লে পখুরের ঘাটে।
লোটিলে কুলকুড়ী দৌড়াদৌড়ি নাগড়া দেয় শেষে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্লে আখবাড়ীতে এসে।
পুঙ্গাতে দেয় বাড়ী বস্ত্র কাড়ি উলঙ্গ করিয়ে
যাহুমাঝি বেনাপ্‌ ছিল তাই দিল ছাড়িয়ে।
ধল্লে চল্যা মাঠে পখুর কাটে দাসী গোয়ালিনি
কাটের ভিতরে মাগি হারাল পরাণি।
যত সব সাঁওতালগণে কাটের মোহানে যত মাটী ছিল
ওখাড়িয়া সকল মাটী চাপাইয়া দিল। ১৪০
পরে ধেনুক ধরে তার উপরে নাচিতে লাগিল
কুল্যাইপুরের ভাঙ্গালেতে সিপাই দেখতে পেল।
অগ্নি কোক্‌ ছাড়িয়ে পশ্চিম মু'য়ে পলাইয়া গেল
আলান চকের নন্দদাসের গরু ঘেরে নিল।
তখন নন্দদাস করে হুতাশ মাথায় ঘা মারে
বলে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আস্‌ব ফিরে।
তখন বস্ত্র ছাড়ি কপ্নি পরি সাঁওতাল সাজিল
চুন গুখান পাতে ভরি কড়ছে গোঁজিল।
হাতে ধনুর্ব্বাণ টাঙ্গীখান কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতালের বুলি জানি এই সাহস করিয়ে। ১৫০
সাঁওতালের সঙ্গে নানা রঙ্গে কথায় ভুলিয়ে
জল খাওয়ার ছল করি আনিল ছাড়িয়ে।
রাইকৃষ্ণদাসে ভনে সংক্ষেপনে কিছু লেখা হলো
বিস্তার লিখিতে হলে অনেক বাহুল্য।

কায়স্থ কুলে জন্ম মোর রাইকৃষ্ণদাস
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় যে নিবাস।
জেলা বীরভূম তাহে ননী পরগণা
লাটরাম তাহে লাঙ্গলের থানা।
আমি ভাবি মনে সাঁওতালগণে রাখিল যে সুখ্যাতি
যে কিছু লিখিলাম আমি সকলিত সত্যি। ১৬০
কথা মিথ্যা নয় সত্য হয় এই যে বিবরণ
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ।
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হায় ২৩ শে শ্রাবণে। ১৬৪

শ্রীশিবরতন মিত্র

আমারে ভুলালে কে?

কি ছবি দেখায়ে ভুলালে আমায়,
(শুধু দেখি বদল) চাহিল পরাণ মোর;
আপনা ভাবিয়ে তুলে দিনু হাতে,
কে জানে সে জন চোর।
এ যে কার মন আমারে দিয়েছে,
চলে না আপন বশে;
এ যে শুধু কয় আপন কাহিনী,
দুঃখ সুখ নাহি বাসে।
এ পরাণে দেখি কলঙ্কের রেখা,
আমার নিমল প্রাণ—
অতি যতনেতে পুষিয়া রেখেছি—
আমারে করেছে দান।
আমারে ভুলায়ে বাসায়েছে ভাল,
আপনি বেসেছে বুঝে,
রজত আশায়— ফুলাহার দিয়ে—
পাথরে রহিনু মজে।

জলের পরশে   শিলা হয় ক্ষয়
মনেতে ধারণা ছিল,
স্নেহের নিঝর   পাশেতে পুষিনু—
পাথর পড়িয়ে গেল।
কণা বালুকায়   বাড়িবে পাথর,
কে জানে এমন রীতি ;
স্নেহের লিখনি   বৃথায় সাধিনু
লিখিতে বরণ পাঁতি।
পাষাণের গায়   লোহার লিখনি
লিখিয়াছে কার নাম ;
এ যে তারি নামে   বিকাবে পাথর—
আমিও যে বিকালাম।
আমার কোমল   ফুলের পরাণ
তপত নিশ্বাসে দহে ;
ফুলের লতিকা   পাষাণে রোপিনু,
সে যে অধরচাপ্ না সহে।
আমার সে ফুলে   কেবল পড়েছে
আশার চাহনি রেখা ;
আমার হাসিতে   যে জন হেসেছে,
তারি হাসি আছে লেখা।
তারি হাসি দিয়ে   তাহারি আশায়
সঁপিব তাহারি করে ;
(এ যে) আপন ভবিয়ে   তারে না চিনিয়ে
সঁপিয়ে দিয়েছি পরে।
শত কোহিনুরে   সে হিয়া দিব না,
আমার আনিয়া দে
সেও মোর নয়   পরের পরাণ
(মিছে) আমারে ভুলালে কে ?

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।

ঘুমের ঘোর।

(১)

যাঁরে ভালবাসি ব'লে
কত লোকে কত বলে,
সুখের স্বপনে তাঁরি রহিয়াছি আজি ভোর।
জাগাওনা কেহ মোরে ভেঙ্গনা ঘুমের ঘোর।

(২)

যাঁহার বাঁশীর স্বরে
যমুনা উথলি প'ড়ে,
উর্ম্মিরূপী-প্রেম-বাহু করেছিল উত্তোলন ;
তাঁহারি প্রেমেতে ডু'বে ঘুমে আছি অচেতন।

(৩)

সপ্তমে উঠায়ে তান,
গাহিয়ে বাঁশীর গান,
প্রেমে মাতোয়ারা যে গো করেছিল গোপীগণ,
তাঁহারি বাঁশীর স্বরে কেড়ে নিছে প্রাণ মন।

(৪)

যাঁহার প্রণয় আশে
চাঁদ হাসে, রবি হাসে,
গগনের কোলে তারা, হাসিয়ে হাসিয়ে ভোর,
সুখের স্বপনে তাঁরি, ভেঙ্গনা ঘুমের ঘোর।

(৫)

যাঁর মৃদু-প্রেম-শ্বাসে
ফুল ফোটে চারি পাশে,
শিশিরে নোলক প'রি, পাতায় পাতায় কত,
প্রণয়ে হতাশ হ'য়ে ফেলে অশ্রুবারি শত ;

(৬)

কুসুমে উলঙ্গ করি
বসন তুলিয়ে ধরি,
রসিক পবন তার লুটিয়ে সৌরভ-ভার,
যাঁর প্রেমে দশ দিকে বিতরে অমৃতধার।

(৭)

অযুত কুসুম পরে,
মধুপ মধুর স্বরে
যাঁর প্রেম গীত গায় গুণ্‌গুণ্‌ রব করি,
ঘুমিয়ে রয়েছি তাঁরি প্রেমডালি বুকে ভরি।

(৮)

বসন্তের সনে পিক
যাঁর প্রেমে দশ দিক্‌
প্রেমের তুফান তোলে সুমধুর কলস্বরে,
ঘুমিয়ে রয়েছি তাঁরি প্রেমসিন্ধু বুকে ভ'রে।

(৯)

যাঁহার প্রেমের গীতি,
গায় দিন, গায় রাতি,
সুখের স্বপনে তাঁ'রি রহিয়াছি আজি ভোর,
জাগাও না কেহ কেহ মোরে, ভেঙ্গ না ঘুমের ঘোর।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

জীবনী সংগ্রহ।

(৬)

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই মহাপুরুষ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুড়া নামক স্থানে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বেলা ৮॥০ টার সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যু হয়, সন ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ, রবিবার, রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতাস্থ ৮ নং মাণিকতলার বাটীতে। এই ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান মহাপুরুষের নিকট বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সাহিত্য অনেকাংশে ঋণী।

ইনি পারস্য, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ইংরেজি ভাষা খুব ভালরকম জানিতেন, ইহা ভিন্ন গ্রীক্, লাটিন, ফরাসী এবং জার্ম্মণ ভাষাতেও কতকটা তাঁহার বুৎপত্তি ছিল। ইহা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে। এরূপ ভাষা জানা লোক আজ কাল বাঙ্গালীর মধ্যে আরো পাওয়া যায় বটে এবং পরিণামে আরো পাওয়া যাইবে বটে; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল কেবল ভাষাগুলি "ভাসা" "ভাসা" ভাবে শিক্ষা করেন নাই। তিনি যে সকল ভাষা আয়ত্ব করিয়াছিলেন, সেই সকল ভাষাতে বক্তৃতা এবং পুস্তক পত্রিকা লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল একজন জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ইহা ইয়োরোপখণ্ডের বিদ্যাভিমানী বিদেশী পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের জীবনী যিনি শুনিবেন বা আলোচনা করিবেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে। যিনি রাজা রাজেন্দ্রলালের জীবনী অনুকরণ করিবেন, তাঁহার জীবন অমরত্ব লাভ করিবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, এহেন মহাপুরুষের একখানি বৃহৎ জীবনবৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে কেহই বাহির করিলেন না। কয়েক বৎসর হইল, শুনিয়াছিলাম, তাঁহার কোন আত্মীয় এ কার্য্যের ভার লইয়াছেন। "রাজা রাজেন্দ্রলালের সুবিস্তৃত জীবনী সমালোচনা" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু কৈ আর ত তাহার কিছুই দেখি না।

যাহা হউক, আমাদের যাহা ক্ষমতা, সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। তিনি নিজে যে বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই,—

বংশাবলী।

কালিদাস মিত্রের এক পুত্র, নাম শ্রীধর। শ্রীধরের পুত্র সুক্তি। সুক্তিরও এক পুত্র, নাম সৌভরি। সৌভরির পুত্রের নাম হরি। হরির এক পুত্রের নাম সোম। সোমের পুত্র কেশব। কেশবের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের দুই পুত্র, ধুঁই ও গুঁই। তন্মধ্যে গুঁয়ের বংশের অনুসন্ধান হয় নাই। ধুঁয়ের তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তিন পুত্রের নাম যথা, নিশাপতি, মকরন্দ এবং চক্রপাণি।

চক্রপাণির পুত্র বিভাকর। বিভাকরের পুত্র কুবির। কুবিরে:

পুত্র লক্ষ্মীপতি; লক্ষ্মীপতির পুত্রের নাম শ্রীরাম; শ্রীরামের তিন পুত্র, কিন্তু দুইটীর নাম পাওয়া যায় নাই, অপরটীর নাম সত্যবান।

সত্যবানের তিন পুত্র যথা, বল্লভ, হৃদয় এবং রাজীব। রাজীবের পাঁচ পুত্র যথা, শিব, ভবানী (ইনি দিগম্বর মিত্রের পূর্ব্ব পুরুষ) রূপ, গৌরী এবং বিষ্ণু। ইহঁাদের মধ্যে অন্যান্যের বংশ পরিত্যাগ করিয়া, শিবচন্দ্রের বংশ হইতে রাজা রাজেন্দ্রলালের পূর্ব্বপুরুষগণ আসিতেছেন।

শিবচন্দ্রের তিন পুত্র, তাঁহাদের নাম রামচন্দ্র, রামেশ্বর এবং রামভদ্র। রামচন্দ্রের আট পুত্র, তন্মধ্যে অপরগুলির নাম অপ্রকাশিত, কেবল এক পুত্রের নাম আছে, অযোধ্যারাম।

অযোধ্যারামের পুত্র কৃপারাম। কৃপারামের চারি পুত্র যথা, পীতাম্বর, কৃষ্ণচন্দ্র, গোরাচাঁদ এবং লালচাঁদ। ইহঁার মধ্যে পীতাম্বরের সাত পুত্র, যথা, বৃন্দাবন, হরলাল, গোপীমোহন, হরিমোহন; ধরণীধর, বৈদ্যনাথ এবং বনমালী।

তৎপরে, বৃন্দাবনের একপুত্র নাম জনমেজয়। জনমেজয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতার নাম। জনমেজয়ের ছয় পুত্র অর্থাৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরেরা ছয় ভ্রাতা ছিলেন।

বংশাবলীর নিবাস নির্ণয়।

প্রবাদ এইরূপ যে, বঙ্গের রাজা আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচটী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বা আনিয়াছিলেন, কালিদাস তাঁহাদের অন্যতম অনুচর ছিলেন। অর্থাৎ সেই পাঁচটী ব্রাহ্মণের পাঁচটী কায়স্থ ভৃত্যের মধ্যে কালিদাস একটি ভৃত্য ছিলেন।

৺কালিদাসের নিবাস যে কোথায় ছিল, তাহার সন্ধান হয় নাই। কালিদাসের পোনের পুরুষ পরে সত্যবান মিত্রের নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে ছিল, তাহা জানা গিয়াছে।

বরিসা গ্রামে মিত্রবংশ সত্যবান মিত্র হইতে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন, এই জন্য "বরিসার মিত্র গোষ্ঠী" চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তৎপরে বরিসা হইতে ইহাঁদের কেহ কেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে আসিয়া বাস করেন। পরন্তু এ স্থলেও ইহাঁদের বংশাবলী রাবণের বংশের মত হইয়া উঠে। তাঁহারা "কোন্নগরের মিত্র" বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছেন, তৎপরে কোন্নগরের মিত্র-পরিবারের

মধ্যে অনেকে কলিকাতার অন্তর্গত গোবিন্দপুর (এখন এস্থানে কেল্লা) তাহার পর মেছুয়া বাজার, এবং সর্ব্বশেষে কেহ কেহ সহরতলী সুড়ায় গিয়া বাস করেন, পরন্তু ইহঁাদের মধ্যে কেহ কেহ ঝামাপুকুরেও বাস করিয়াছিলেন, ৺ রাজা দিগম্বের মিত্রের পরিবারেরাত ঝামাপুকুরের মিত্রদিগের কীর্ত্তিমান বংশধর।

বংশাবলীর মর্য্যাদা নির্ণয়।

৺কালিদাস মিত্রের আঠারো পুরুষ পরে ৺রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে দাওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু ইহাঁর পুত্র অযোধ্যারাম মিত্র মহাশয়ও পিতার কার্য্য পাইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর, অযোধ্যারামকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। অযোধ্যারামের পুত্র,—

৺ পীতাম্বর মিত্র।

এই মহাপুরুষ ১৬৬৯ শকের ৩১ শে আষাঢ়, মঙ্গলবার দিবস জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি দিল্লিসম্রাটের সেনাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম ভাগ্যের কথা নহে। যাঁহারা বলেন, বাঙ্গালীর মধ্যে যোদ্ধা নাই, তাঁহারা এই মহাবীরের বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া দেখুন। একে দিল্লীর সম্রাট, তাহাতে সে সময়ের কত মুসলমান বীরের সেনানায়ক হওয়া, বাঙ্গালীর ভাগ্যে কম কথা কি? ইহঁার অধিনায়কত্বে দশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। পরন্তু ইনি সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং দোয়ারের অন্তর্গত কড়া জেলা জাইগীর প্রাপ্ত হয়েন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ৺ বারাণসী ধামে চেতসিংহের সময়ে যখন লর্ড পামার রামনগর আক্রমণ করেন, তখন রাজা পীতাম্বর উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ইহঁার সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের খুব আলাপ ছিল। রাজা পিতাম্বর তাঁহার কাছে ৯ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছিলেন। ইনি ১৭৮৭ কিম্বা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট হইতে সামরিক কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শেষ জীবনে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

কাটাকাটির কার্য্য যুদ্ধবিদ্যা যে জীবনের এক মহাব্রত ছিল, সেই জীবন কি যাদুমন্ত্র বলে, (বলিতে পারি না, কাটাকাটির সংস্কার গিয়াছিল কি না!) শেষকালে, কাটাকাটি শক্তি ছাড়িয়া, বৈষ্ণব "বানাইয়া" গেল!!

মিত্র-পরিবারেরা কলিকাতার মেছুয়াবাজারে ছিলেন। ইনি সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, প্রথম মেছুয়াবাজারে উপনীত হয়েন। তখন মেছুয়াবাজারে মিত্রদের বাড়ীর নাম ছিল "মিত্র পারিবারিক বাড়ী।" এই বাটী তাঁহাকে বৈষ্ণব হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। এখন যেমন ব্রাহ্ম হইলে হিন্দুর জাতি যায়। তখন তেমনি বৈষ্ণব হইলে হিন্দুর জাতি যাইত। অবশ্য, এ বৈষ্ণব আমাদের শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব নহেন! ইহা দল বিশেষের ধর্ম্ম। যাহা হউক, ইনি বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সুড়ার বাগানে বাস করেন, এবং ক্রমে তথায় বাড়ী ঘর করিয়া "সুড়ার রাজা" হইলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম,—

৺ বৃন্দাবন মিত্র।

রাজা পীতাম্বর মিত্রের সময়, সুড়ার রাজবাটীর যে শ্রী হইয়াছিল, ইহার দ্বারা রাজবাটীর সেই শ্রী থাকিলেও কিন্তু ইনি কতকগুলি বিষয় নষ্ট করিয়াছিলেন, পরের জন্য জামিন হইতে গিয়া দুইবার ইহাকে প্রায় ১৮।১৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইনি মিতব্যয়ী ছিলেন না। পরন্তু ইহাঁর সময় মহারাষ্ট্রের যুদ্ধে সম্রাট প্রদত্ত কড়ার জায়গীর নষ্ট হইয়া যায়। কড়ার জায়গীরের বাৎসরিক আয় ছিল ২লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ইহাও রাজা বৃন্দাবনের গ্রহবৈগুণ্যে নষ্ট হয়। ইনি সাহিত্যপ্রিয় লোক ছিলেন। রাজা পীতাম্বরের সময়ে যুদ্ধবিদ্যা ছিল, ইহঁার সময় কেবল বিদ্যা আসিল, যুদ্ধকার্য্য এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রাজা বৃন্দাবনের সময় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হয়। এই সকল পুঁথির মধ্যে এখনও কতক কতক সুড়ার রাজবাড়ীতে পাওয়া যায়।

গোলাপ ফুলের কুড়ীটী একটী সবুজ বর্ণের ঠুলীর মধ্যে লুক্কাইত থাকে, ঐ ঠুলীকে ভাল কথায় বলে "ফুলের বৃত্তি"। উহার ভিতর পুষ্পের রঞ্জিত পত্র বা পাপড়ী প্রথম লুক্কাইত থাকে, তৎপরে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, উক্ত বৃত্তি রঞ্জিত পত্র বা পাপড়ীর নিম্নে লাগিয়া থাকে। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজা বৃন্দাবন হইলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ এবং ইহাঁর সময় হইতেই রাজসংসারে লক্ষ্মী গিয়া স্বরস্বতীর আগমন হয়।

অতএব রাজা বৃন্দাবনের বিদ্যানুরাগ যেন মিত্র-পরিবারের বিদ্যার বৃন্ত-স্বরূপ। ইহাঁর পুত্র রাজা জনমেজয় যেন বিদ্যার রঞ্জিত পত্র বা পাপ্ড়ী। পরন্তু পাপড়ী খসিয়া গেলেই "ফল।' অতএব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেন মিত্র-পরিবারের বিদ্যার ফল! ইনি টাকার জন্য কটকের কালে-ক্টরীতে দাওয়ান হইয়াছিলেন।

রাজা জনমেজয়।

ইনি পারস্য এবং সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত ভাষার গল্প এবং পারস্য ভাষার পদ্য বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণের স্থচী এবং বর্ণানুসারে ভাগবত পুরাণের নির্ঘণ্ট বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনিই আমা-দের রাজা রাজেন্দ্রলালের পিতা।

রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহাঁর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। রাজা জনমেজয়ের সময় শূড়ার রাজাদের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ ইহাঁর দ্বারা ধনক্ষয় বা প্রচুর আয় বৃদ্ধি হয় নাই। যাহা হউক, এইবার, রাজা রাজেন্দ্রলালের,—

বাল্যশিক্ষার

পরিচয় কথা, বালক রাজেন্দ্রলাল পঞ্চম বৎসরে হস্তে খড়ি দিয়া, কলিকাতার বড়বাজারে রাজা বৈদ্যনাথের বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া বাঙ্গালা এবং পারস্য ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে, পাথুরেঘাটাস্থ ক্ষেম বসুর ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। এ স্কুলের অস্তিত্ব এখন নাই। একাদশ বর্ষ বয়সে ইনি শঙ্কর মিত্রের বাড়ীতে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তৎপরে ম্যালেরিয়া জ্বরের শিবর প্লীহার রোগ-যন্ত্রণা এক বৎসর ভোগ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার ডাক্তারী শিখিতে ইচ্ছা হয়।

তৎপরে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, ইনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু ইনি ডাক্তারি পড়িয়া উক্ত বিদ্যায় পরীক্ষায় ফেল হন বলিয়া ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দেন। এই সময় ইনি ১ম বিবাহ করেন। তৎপরে ইনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, ইহাতেও রাজা রাজেন্দ্রলাল পাস দিতে পারেন নাই। কাজেই আইন পড়া ছাড়িয়া দেন।

এইবার রাজা রাজেন্দ্রলাল উর্দ্দু এবং হিন্দি পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বাড়ীতে পণ্ডিত রাখিয়া ইহা শিখিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর য়্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটরী এবং লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ পাইয়া ইহাঁর পুস্তক পাঠের প্রবল পিপাসা অনেকটা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে ইনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডের ডাইরেক্টরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।

এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রবেশ করিয়া ইনি উক্ত সোসাইটী হইতে প্রকাশিত "জর্ণাল অব এসিয়াটিক সোসাইটী" নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকাতেই ইহাঁর প্রথম রচনা বাহির হয়।

তৎপরে ইনি সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করেন। এই সময় হইতে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে উক্ত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সস্কৃত ভাষায় "কামন্দকী" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তৎপরে "নীতিসার" নামক আর একখানি সংস্কৃত পত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ইহাঁর সংস্কৃত এবং ইংরাজী লিখিয়া তৃপ্তি হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক বাঙ্গালা ভাষায় মাসিক পত্র সম্পাদিত করেন। এই মাসিকপত্রই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান রহস্যের পথ প্রদর্শক। উহা হইতেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রথম প্রাপ্ত হয়। তৎপরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক বাঙ্গালাভাষায় আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর মাসিকপত্রে এবং বহুবিধ ভাষার সংবাদপত্রে ইনি দুই সহস্রের অধিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। নিজে, ১২৮ খানা পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইখানি ইংরাজী পুস্তকের যথেষ্ঠ সুখ্যাতি ইউরোপখণ্ডে হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকদ্বয়ের নাম "বুদ্ধগয়া" এবং উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব'। ইহা ভিন্ন নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পুস্তক এবং পত্রিকাগুলি অদ্যাপিও বোধ হয় পাওয়া যায়।

(১) বিবিধার্থ সংগ্রহ (২) রহস্য সন্দর্ভ (৩) প্রকৃতি ভূগোল (৪) পত্র কৌমুদী (৫) ব্যাকরণ প্রবেশ (৬) শিল্পিকা দর্শন (৭) শিবজীর জীবনী (৮) মিবারের ইতিহাস। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত ১২৮ খানি পুস্তকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় ১৩ খানি এবং বাঙ্গালা ভাষায় ১০ খানি ভিন্ন অপরাপর গুলি অন্যান্য

ভাষায় লিখিত। ইনি "হিন্দু পেট্রিয়টের" আত্মাস্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল ইহাঁরই ছাত্র বিশেষ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হয়েন। বাঙ্গালীকে এই পদ ইনি প্রথম দেখাইয়া যান। পরন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন নামক এক স্কুল ৮নং মাণিকতলা রোডে স্থাপিত করেন। এই স্কুলে কেবল জমীদারদিগের নাবালক পুত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই স্কুল হইতে ইনি মাসিক ৫০০্ শত টাকা পাইতেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উক্ত স্কুল উঠিয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ত স্কুলবাটীকে বসতবাটী করিয়া লইয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। পরন্তু এখনো তাঁহার দুই পুত্র এই বাটীতেই বাস করিতেছেন। ইহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। তৎপরে ইনি ভবানীপুর নিবাসী ৺ কালীধন সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাঁরই গর্ব্ভোদ্ভব দুই পুত্ররত্ন—বিশেষ শিক্ষিত পুত্রদ্বয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

ইনি নিম্নলিখিত উপাধিগুলি লাভ করিয়াছিলেন "ডাক্তার অব ল," সি, আই, ই, "রায় বাহাদুর," "রাজা" ইত্যাদি।

"ব্ল্যাক এক্ট"নামক আইন যখন পাস হইবে, ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল, টাউনহলে এক সভা হয়। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই ছিল যে, দেওয়ানী আদালতে সাহেবের বিচার এদেশী জজে করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে সাহেবেরা খুব প্রতিবাদ করেন, ইংলিসমান প্রভৃতি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন, উহাঁরাই অবজ্ঞা করিয়া উক্ত আইনকে ব্ল্যাক এক্ট" নাম দিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল স্বজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া টাউনহলে, সেই সাহেবী সভাতে বিশেষতঃ উক্ত আইনের বিপক্ষদলের মধ্যে সাহেবী ভাষায় এক সুদীর্ঘ সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সে যুক্তির খণ্ডন করিতে না পারিয়া শেষে সাহেবেরা রাগান্বিত হইয়া রাজেন্দ্রলালকে প্রহারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু ইহাঁর এক বন্ধুর কৃপায় সে যাত্রায় বড়ই কৌশলে লুকাইয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী আইসেন।

তখনকার এমন সভাসমিতি ছিল না যে, রাজা রাজেন্দ্রলাল তাহার সম্বন্ধে ছিলেন না। সকল সভাতেই ইহাঁর যোগ ছিল। ইনি খুব রসিক ছিলেন।

আশা করি, এখনকার "সাহিত্য-সভা" এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সভা" ইহাঁর স্মৃতিস্বরূপ, এই মহাপুরুষের ছবি স্ব স্ব সভা গৃহে রাখিয়া দিবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

জল প্লাবন। *

("ভুবনমোহিনী প্রতিভার" সুপ্রসিদ্ধ কবি কর্ত্তৃক রচিত)

"কে'রে বীরনারী, নভঃপট যুড়ি,
মহামেঘ মালা চিকুর বিস্তারি
নিবিড় তিমিরে ভুবন আঁধারি,
ঝলকে ঝলকে উগার বিদ্যুৎ?
নিশ্বাস প্রশ্বাসে বহিছে পবন।
মহাঘোর রাব শন্ শন্ শন্।
বজ্র হুহুঙ্কার করিয়া ভীষণ,
সমস্ত ভুবনে ভ্রমিছ অদ্ভুত?

২

প্রলয়ের তরে লয়ে জলধরে?
সাজিয়াছ সৃষ্টি সংহারের তরে?
হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি বিধাত্রী সংসারে
কেন এ দারুণ বাসনা তোমার!
দয়াময়ি! তোর এই কি দয়া মা।
জগত প্রসূতি তুই যে গো শ্যামা,
প্রসবিতে বিশ্ব কত ব্যথা উমা,
সে সব কি মনে নাহিক তোমার?

৩

এক এক করি প্রকৃতি পুঞ্জেরে—
প্রসবিয়া স্নেহে পালিলা সাদরে।
ভাসালে জগতে অমৃত পাথারে
তাহাই নাশিতে হয়েছ উদ্যত?
অহো মহামায়ে। তোমার প্রকৃতি
বুঝিব এমন কি আছে শকতি?
সম্বর চণ্ডিকে প্রচণ্ড মুরতি,
প্রসীদ জননি! প্রসীদ প্রসীদ।"

৪

এরূপ প্রকারে কাতর অন্তরে
সিদ্ধ মুনি ঋষি মহাত্মাদিকরে।
বিবিধ বিধানে দেবী স্তব করে,
কেহবা সন্ত্রাসে পলায় গগনে।
কোথা কে পলায় স্থির নাই তার,
মানবমণ্ডল করে হাহাকার;
পশু পক্ষী আদি করিছে চীৎকার।
হেরি এ ভীষণ দর্শন নয়নে!

৫

মহামেঘ পরে চপলা সঞ্চারে,
ঘোর হুহুঙ্কার ঘন ঘন ছাড়ে,
ঢালে বারি রাশি অবনী উপরে,
দিবা কি রজনী না হয় নির্ণয়।
ঘোর দম্ভে বহে প্রমত্ত-পবন।
হতেছে অগ্রজ অশনি পতন।
ভাঙ্গে তুঙ্গ শৃঙ্গ বন মহাবন,
জনপদ সব হইল বিলয়।

৬

বায়ু শন্ শন্ গরজে ভীষণ,
ঘোর ঘনজালে আন্ধার ভুবন।
ঘোরতর বৃষ্টি না যায় কথন।
ভাসিল অবনী সলিলতরঙ্গে।
অবিরাম বৃষ্টি ঢালে মেঘদল।
অবনীতে আর নাহি ধরে জল,

---

* গত আশ্বিন মাসের দুর্য্যোগ দৃষ্টে এই কবিতা লিখিত হইয়াছে।

একাকার সব হল জলস্থল
ভাবিতেও চিত্ত শিহরে আতঙ্কে।

৭

অবনীর যত জীব জন্তুগণ,
সহ জনপদ পর্ব্বত কানন,
সমস্ত সলিলে হল নিমগন,
সমস্ত ভুবন একাকার জলে!
হিমাদ্রি প্রভৃতি মহাদ্রি সকল।
আশ্রয় করিলা গভীর অতল!
আকাশ ভেদিয়া প্রবাহ সকল,
ছুটে অবিরাম বিকট কল্লোলে!

৮

দারুণ প্লাবনে প্রলয় তুফানে।
বিশাল বসুধা গেল কোন্ স্থানে?
এখনো জলদ বরষে সঘনে,
এখনো পবন হুঙ্কারে গম্ভীরে।
মানব হইতে পতঙ্গ অবধি,
আচ্ছন্ন কারয়া প্রলয় জলধি,
(দুর্দ্দশার আর নাহিক অবধি)
ভাসিয়া যেতেছে কাতারে কাতারে!

৯

ভীষণ দর্শন এ জলপ্লাবন,
হেরিয়া নয়নে যত দেবগণ,
বশিষ্ঠ, নারদ আদি তপোধন
অবনীর দশা দেখিয়া, দুঃখেতে
ব্যাকুল অন্তরে ডাকিছে চণ্ডীরে,
বিবিধ বিধানে স্তব স্তুতি করে,
কহিছে "কালিকে" রাখ মা সংসারে,
এ দারুণ দৃশ্য পারি না দেখিতে।

১০

হয়ে গো আপনি, ত্রিলোক জননী
বিশ্বময়ী বিশ্ব জীবনরূপিনী
শান্তি দয়ারূপা ত্রিতাপ তারিণী,
"বিপদ বারিণী অভয়া সংসারে,
কেন এ সংহার বাসনা তোমার?
ভুলেছ এ সব রচনা কাহার?
নিজেই সৃজেছ এ বিশ্ব সংসার,
নিজ হাতে তাহা ভাঙ্গিছ কি করে

১১

"তুমি শক্তি বিশ্বপ্রকৃতি মণ্ডলে,
তুমিই চালাও, তাই বিশ্ব চলে,
তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা শূন্যে জলেস্থলে,
তোমার মায়ার ছলনা এমনি;
দেবাসুরনর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
পশুপক্ষী আদি, মুগ্ধ চরাচর।
তোমার মহিমা কি বুঝিবে নর?
প্রসীদ, প্রসীদ, প্রসীদ জননি!

১২

"পূর্ণ কর মাতঃ আমাদের আশ,
পুনর্ব্বার কর সৃষ্টি অভিলাষ,
সম্বর জলদ কৃষ্ণ কেশ-পাশ,
প্রসন্ন নয়নে নিরখ জগতে।
অমৃতরূপিণী! মৃত অবনীরে,
অতল হইতে তুলিয়া সত্বরে
বাঁচাও করুণ করস্পর্শ ক'রে,
আর জলরাশি পারি না দেখিতে।"

১৩

এইরূপে যত দেবতা সকলে
স্তব করে, আর ভাসে নেত্রজলে,
হেরি দয়াময়ী হৃদয়-কমলে,
উপজিল আশি করুণা অমৃত।
প্রলয়ের রূপ করি সম্বরণ,
সে অমৃতধারা করিয়া বর্ষণ,
কহিলেন দেবী, "হে অমরগণ।
আমার এ কার্য্যে হও না দুঃখিত।

১৪

ঘোর পাপতাপে জরাজীর্ণ ধরা,
তাই ডুবাইনু এপাপের ভরা।

ইহাতে বিস্মিত হওনা তোমরা,
উপাদান হেতু আমি এজগতে,
আমি সৃষ্টি আমি সংহার সংসারে,
আমি নিত্য সুজাগ্রত চরাচরে।
আমার অভাব না হইলে পরে,
সংসার বিলয় হবে কিরূপেতে ?

১৫

প্রতি মন্বন্তরে ঘটেছে এমন,
জগতপাবন জল-হুতাশন,
ইহাতে সংসারে করিয়া শোধন,
করি অভিনব রচনা সুন্দর।
ইহাই আমার চিরন্তন রীতি
কালে পুনর্ব্বার হবে সৃষ্টিস্থিতি,
সৃষ্টির প্রবাহ রাখিতে সম্প্রতি,
বেদ রক্ষা করা কার্য্য গুরুতর।

১৬

বেদ সনাতন হইলে মগন
মানবসমাজ করিয়া গঠন
কি ফল হইবে ? তিমিরে মগন,
থাকিবে অবনী, জ্ঞান প্রভাকর।
ভাতিবেনা ধরা হৃদয় দর্পণে।
বিবেক চন্দ্রমা মানস গগনে,
উদিবেনা, লোক পশু আচরণে
বহিবে ক্লেশেতে জীবন দুর্ভর।

১৭

তাহা কেন হবে, বলি মহেশ্বরী,
কহেন বিষ্ণুরে "মীনরূপ ধরি
রক্ষা কর বেদ মুকুন্দ মুরারী,।
রক্ষা কর সৃষ্টিপ্রবাহ আমার।'
"যে আজ্ঞা' বলিয়া দয়াময় হরি,
প্রবেশিলা জলে মীনরূপ ধরি,
ভাসমান মহাগ্রন্থে ওষ্ঠে করি,
সনাতন বেদ করিলা উদ্ধার।

১৮

বহুদিন রাত্রি প্রচণ্ড ভাবেতে
প্রলয় দুর্যোগ রহিল ভবেতে
শান্তি সমীরণ বহিল ক্রমেতে
সমস্ত বিপ্লব করিয়া বিলয়।
মেঘজাল মুক্ত হইল গগন,
ভেদিয়া অনন্ত সলিল দর্পণ,
হাসিয়া উঠিল জ্বলন্ত তপন,
ছড়ায়ে আলোক ত্রিভুবনময়।

১৯

থামিল বিপদ শান্তি সমুদিত,
কিন্তু চরাচর জলে নিমজ্জিত,
অচেতন ধরা অতলে শায়িত,
কে বুঝিবে আর সুখশান্তি কথা ?
বহুশত বর্ষ ধরা জলময়
রহিল না জল স্থলের উদয়,
জলজন্তু পূর্ণ হ'ল সমুদয় ;
"কেমন অবনী, ছিলই বা কোথা ?"

২০

অন্তলোকবাসী ভুলিল ক্রমেতে,
অহো। কি বিস্ময় পারিনা ভাবিতে।
পৃথিবী মিলাল জল মণ্ডলেতে,
অনন্ত সিন্ধুতে জলবিম্ব প্রায়।
আদ্যশক্তি বাক্যে দয়াময় হরি,
জীবহিত তরে মীনরূপ ধরি
বহুশতবর্ষ সলিল উপরি,
ভাসিলেন, বেদ রক্ষা হ'ল তায়।

২১

হইলেন হরি মৎস্য অবতার,
করিলেন জীব প্রবাহ বিস্তার,
কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবস্থার
দশ অবতারে সম্পূর্ণ স্বভাব।
এইরূপে কত শত শত বার,
হইল প্রলয়, দশ অবতার
হইল, হইবে সংখ্যা নাই তার।
ইহাই বিশ্বের নিত্য সিদ্ধভাব।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন।

যাবতীয় সৃষ্ট জীবের অন্তরেই নানা সময় নানা প্রকার ভাবতরঙ্গের উদয় হইয়া থাকে। এই জগতে জীব যতদিন বাস করে, ততদিন অহর্নিশ নানা-

রূপ অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে গতায়াত করিতে হয়, এসব সময় অবস্থানুসারে নানারূপ ভাব বৈচিত্র্যও যে তাহাদের মনোমধ্যে উদিত না হয়, তাহা নহে। ইতর প্রাণীগণেরও কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে, যে গুলির ক্রিয়ায় ফলে তাহাদের মনেও, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, ভয় উল্লাস প্রভৃতি নানারূপ ভাবান্তরের সমাবেশ হয় এবং তাহারা বাক্‌শক্তি বিরহিত হইলেও প্রকৃতিসিদ্ধ নানা প্রকার স্বাভাবিক উপায়ে তাহারা সেই সেই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের, মুখভঙ্গী, অঙ্গ সঞ্চালন, অব্যক্ত স্বর ইত্যাদিই সেই সব ভাব বাহিরে প্রকটিত করিয়া থাকে। সুতরাং এগুলিকে তাহাদের ভাষা বলা যাইতে পারে। আমরা মানুষ, আমাদের বাক্‌শক্তি আছে বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি; তাই বলিয়া ভাষাটা যে কেবল আমাদেরই একচেটীয়া সম্পত্তি, তাহা নহে। ভাষা কি? মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার একটা উপায় ও অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যে যে ভাবে সেই মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সেই ভাবকেই আমরা তাহার ভাষা বলিতে পারি। পশুগণের নানাবিধ স্বর আমরা বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই যে, তাহাদের ভাষা নাই, ইহা যদি বলা যায়, তবে পশুগণও আমাদের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া আমাদের ভাষা নাই এইরূপ স্থির করিতে পারে। অথবা আমাদের নিজেদের কথাই দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে যে, ইংরাজি কি লাটিন বা জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সমস্ত ভাষাভাষীগণের উক্তির এক বর্ণও বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার নিকট শাখা মৃগকুলের কিচিমিচির সঙ্গে ঐ স্বরের কোন পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহার ধারণা হইবে না। নিজ ভারতবর্ষেই মহারাষ্ট্রীয় বা তৈলঙ্গীয় বা উড়িষ্যাবাসীর ভাষা বঙ্গীয়েরা বুঝিতে অক্ষম হইবেন। নিজ-বঙ্গেরও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথা পশ্চিমবঙ্গীয়েরা বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং বুঝিতে না পারিলেই যে ভাষা হয় না, ইহার কোন যুক্তি নাই। এই জন্যই পৃথিবীতে নানা ভাষার সৃষ্টি। এক এক দেশীয় লোক নিজেদের মধ্যে একটা নিয়ম করিয়া কতকগুলি কথা স্থির করিয়া লইয়াছে, সেই গুলি দ্বারা তাহারা প্রয়োজনীয় বক্তব্য বলিয়া থাকে; সেই তাহাদের ভাষা। ইতর জাতীয় পশুগণের মধ্যেও সে বাঁধাবাঁধি আছে এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে সে সব বেশ বুঝিতেও পারে। গাভীর হুঙ্কার বৎস বেশ বুঝে, বিড়ালীর আহ্বান বিড়াল শাবকের বোধগম্য হইতে কষ্ট হয় না।

শাবকের কাতর ভাষা পক্ষিনীকে দূর হইতে আকর্ষণ করে। তারপর যে সমস্ত জন্তু গৃহপালিত, তাহারা সর্ব্বদা আমাদের সংসর্গে আসায় আমাদের অনেক কথা তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের অনেক ভাবও আমরা বুঝিতে পারি। তাহা না পারিলে তাহাদিগকে লইয়া কাজ করা আমাদের দুর্ঘট হইত।

কৃষকের গরু তাহার কথা মত বাম দক্ষিণ চিনিয়া চলে, 'তু' বলিয়া ডাকিলে শত হস্ত ব্যবধানস্থিত কুক্কুরও ছুটিয়া আইসে, 'পুস্ পুস্' আহ্বানে পুসি মেনী লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া গা ফুলাইয়া ঘুরিতে থাকে; কুকুরকে 'ধর ধর' বলিয়া কিছুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে ছুটিয়া যায়, বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ ভাবে 'যা' বলিলে কুকুর, বিড়াল আদি দূরে পলায়ন করে, আদর করিয়া ডাকিলে তাহারা কাছে আসিয়া লেজ নাড়ে বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, ইত্যাদি শত ব্যাপার প্রত্যেকেই প্রত্যহ দেখিতেছেন। তাহাদের ডাকে, বা অঙ্গভঙ্গীতেও যে আমরা তাহাদের শোক, দুঃখ, কি আনন্দ বুঝিতে পারি, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ পরস্পরের কতকগুলি ভাব ও ভাষার আদান প্রদান হইয়া যাওয়ায় আমরাও তাহাদের দ্বারা কাজ করিতে পারিতেছি আর তাহারাও আমাদের আশ্রয়ে থাকিতে পারিতেছে; এক্ষণে তাহাদের লইয়া বসবাস করিতে আমাদের কিছুই বিশেষ অসুবিধা হয় না; কিন্তু যদি এমন একজন মনুষ্যকে লইয়া আমাদের থাকিতে হয়, যাহার ভাষা আমরা জানিনা, তাহা হইলে এতদপেক্ষা কত বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যাঁহাদের বাসায় উত্তর পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী চাকর আছে, (অথচ বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা হিন্দি জানেন না) তাঁহারা বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই।

সুতরাং ভাষা যাহার যাহাই হউক না কেন, বুঝিতে পারিলেই কাজ চলিতে পারে, না বুঝিতে পারিলে কিছুতেই কিছু হয় না। ইতর প্রাণীগণ লইয়া যাঁহারা বেশী সময় যাপন করেন, তাঁহারা তাহাদের অনেক বিষয় তাহাদের স্বর হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের তাহা ভাবিতে গেলেও অসম্ভব ও আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইয়ুরোপীয় অনেক মনীষিগণ মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া এত অধিক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা তাহাদের সেই সব অস্পষ্ট বাহ্য শ্রুতিতে একবৎপ্রতীয়মান ধ্বনি হইতেই

তাহাদের সুখ দুঃখ ঝগড়া দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই সব অবলম্বন করিয়া উহাদের সম্বন্ধে সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। এ সব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থই আছে, যাঁহারা কৌতুহলী হন, তাঁহারা অন্যের মধ্যে লবক্ সাহেবের (Dr. Lubbock) প্রণীত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন (Wasps and Bees Insects) এইরূপ এক সাহেব বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া বানরের প্রধান আড্ডা আফ্রিকা দেশের বনে বাস করিয়াছেন এবং অনেকটা শিক্ষাও করিয়াছেন।

সুতরাং ইতর জন্তুগণের ভাষা নাই কে বলিবে? এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভাষা আছে, আমরা বুঝি না। আমাদের দেশের গৃহ-পালিত পশু পক্ষিগণ আমাদের কথা বুঝিতে পারে, ইংরাজদের পালিত পশু পক্ষিগণের তাহাদের কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বোধ হয় যে, আমাদের পশু পক্ষিগণকে ইংরাজদিগকে দিয়া তাহাদের পশু পক্ষিগুলি যদি আমরা বদলাইয়া লই, তাহা হইলে কিছুদিন উভয় পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তারপর ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে আর সে অসুবিধা থাকে না।

অনেকে বলেন, শুক, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি বিহঙ্গগণ মানবের আশ্রয়ে থাকিয়া যে সব কথা শিক্ষা করে, তাহারা তাহার অর্থ বুঝে না; কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে, সুতরাং সে শিক্ষায় কোন ফল হয় না। আমি এ বিষয় যতদূর অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে একথাও অনেকটা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। দেখুন, শিশুগণ যে কথা বলিতে শিক্ষা করে, তাহাও শুনিয়া ভিন্ন অন্য উপায়ে নহে। যদি একদল বাক্‌শক্তি বিহীন লোকের মধ্যে একটি শিশু অতি বাল্যকাল হইতে পালিত হয়, তাহা হইলে সে কখন কথা কহিতে সক্ষম হইবে না। কারণ সে কাহাকেও বাক্‌স্ফূর্ত্তি করিতে দেখিবে না বা শুনিবে না। অতএব পাঁচ জনে একটা জিনিসকে যাহা বলে, সেও তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া সেই বস্তুকে তাই বলিতে শিক্ষা করে। এজন্য অনেক পরিবারে প্রথমজাত সন্তান স্বীয় মাতাকে 'বৌ' বলিয়া থাকে, কারণ তাই বলিয়াই তাহার মাতাকে সে সর্ব্বদা আহুতা হইতে শুনিতে পায়, মাতুলালয়ে থাকিলে অনেক সময় 'মা'কে 'দিদি' বলে। পিতাকে অনেক শিশু নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে, বাটীর পাঁচ জনে তাহার

ভ্রম সংশোধন করাইয়া যাহাকে যাহা বলিতে হইবে শিখাইয়া দেন। এইরূপে তাহার অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে সে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক বস্তুর ও ব্যক্তির প্রকৃত নামকরণে অভ্যস্ত হয় এবং তদনুসারে সে সেই সব কথা ব্যবহার করে। সেই সব কথা বলিতে তত্তদ্বাচক বস্তু ভিন্ন আর কি সে বুঝিয়া থাকে? 'কাগজ' বলিলে এইরূপ জিনিস বুঝায়, ইহা ব্যতীত আর কি অর্থের আবশ্যক? সুতরাং একটা কথা শিখিয়া তাহার প্রকৃত ব্যবহার যদি করিতে পারা গেল, তাহা হইলেই তাহা শিক্ষার কাজ হইল; তাহার অর্থ বোধ হইল! 'মানব' বলিতে হাত পা যুক্ত লাঙ্গুলহীন, ইত্যাদি বিশেষণ সম্পন্ন একটা জীব বুঝায়, ইহা বুঝিয়া মানুষকে 'মানব' বলিয়া জানা হইলেই 'মানব' কথাটার কাজ হইল! এইরূপ সিংহ, 'ব্যাঘ্র' প্রভৃতি নামেও তত্তৎ আখ্যাধারী জীবকে ঠিক বুঝাইতে পারিলেই সে গুলি জানার কার্য্য হইয়া থাকে। নতুবা 'মনোরপত্যং পুমান্' মানব, হিনস্তীতি সিংহ, জিঘ্রতীতি ব্যাঘ্র ইত্যাদি অর্থ কয়জনে জানেন বলুন দেখি?

ময়না প্রভৃতি পক্ষিগণের সম্বন্ধেও আমি দেখিয়াছি, তাহারা অনেক স্থলেই জ্ঞাত বাক্যগুলির যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। ঝুলি কাঁদে ফকীর দাঁড়াইলেই সে ভিক্ষা চায়, বাড়ীর পাঁচ জনেও হয়ত ভিক্ষা দাও বলিয়া দিতে বলেন, ময়না তাহা শিখিয়া ফকীর বা বৈষ্ণব দেখিলেই 'ভিক্ষা দাও' বলিয়া চিৎকার করে। একজন ভদ্রলোক আসিয়াছে দেখিলেই সে 'বস্‌তে দাও' বলিয়া চেঁচায়। নিজের খাদ্যস্থানীতে খাদ্য না থাকি[illegible] 'খাবার দাও' বলিয়া খাবার চায়। বাটীর লোকদিগকে 'বাবা', 'দাদ[illegible] ডাকে, অনেক স্থলে বাটীর চাকরটিকে পর্য্যন্ত নাম ধরিয়া ডাকে। গোরু বাছুর বাড়ীর উপর আসিলে 'দূর দূর' করিয়া তাড়ায়, ইত্যাদি কত বলিব? এ সব দেখিয়া কি বোধ হয়, যে তাহারা শিক্ষিত কথার ব্যবহারে অক্ষম? আমার তো বোধ হয় যে, তাহারা এই কথায় এই বস্তু বুঝায়, এ বিষয় বেশ বুঝিতে পারে বলিয়াই উহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। প্রথম প্রথম শিশুগণের ন্যায় তাহাদেরও ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্রমে ঠিক হইয়া যায়। এইরূপে তাহারাও মানুষের ভাষায় নিজ মনোভাব বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রকাশে সক্ষম হইয়া থাকে।

অতএব কি ইতর প্রাণী কি মানব সকলেরই ভাষা আছে এবং সকলেই তদ্দারা মনের ভাব প্রকটিত করিয়া থাকে। শিক্ষা দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা বিভিন্ন

জাতীয় জীবজন্তু দিগের স্বেতর জাতীয়গণের ভাষায় অধিকার জন্মিয়া থাকে। এ বিষয় মানুষও ইতর জন্তুগণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছু নাই। আবশ্যক অনুসারে ভাষার বা কথার সৃষ্টি হয়। পশুপক্ষীগণের আবশ্যকের বিশেষ তারতম্য নাই বলিয়া তাহাদের নূতন শব্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন এবং ক্ষমতাও নাই। তবে বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া বোধ হয়।

মানুষ আবশ্যক মত ভাষা সৃষ্টি বা ধার করিয়া লইয়া থাকে। যে জাতীয় মনুষ্যের যে বিষয় বেশী প্রয়োজন, যাহার মধ্যে তাহাদের সর্ব্বদা বাস করিতে হয় বা যাহা লইয়া সর্ব্বদা তাহাদের কারবার করিতে হয়, সেই সব বিষয়ে তাহাদের ভাষায় অধিক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম জাতীয় বনবাসীগণের ভাষায় যত কথার প্রয়োজন, সুসভ্যগণের ভাষায় তদপেক্ষা অনেক অধিক কথার আবশ্যক হয়; কারণ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। মানুষ এজন্য সর্ব্বদাই আবশ্যক মত শব্দের সৃজন বা আহ-রণ করিতেছে। আর ইতর জীব হইতে আর এক বিষয়ে মানুষের পার্থক্য আছে—সেটা লিখিত ভাষা। এই লিখন প্রণালীও মনোভাব ব্যক্ত করিবার আর একটি সঙ্কেত। যে সব বাক্য আমরা মুখে ব্যবহার করি, তাহা মুখে ব্যবহার না করিয়া এই উপায়ে কতকগুলি অক্ষর উদ্ভাবন পূর্ব্বক তৎ সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়। এই সব অক্ষরও এক নহে, দেশ ভেদে সহস্র প্রকারের রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল প্রকার অক্ষর বা সঙ্কেত একজনের জীবনে আয়ত্ব করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই লিখন সঙ্কেত ইতর প্রাণী বা আদিম মানবগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, এখনও অনেক স্থলে নাই। তাহাদের অন্য সঙ্কেত আছে; সেও একপ্রকার ভাষা। জাহাজীয় ভাষা নিশান সম্মিলনে ব্যক্ত হয়, মুকুরে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া সাম রিক ভাষা ব্যক্ত করা হয়, পূর্ব্বে আফ্রিকার মিশর দেশে চিত্রাঙ্কন সঙ্কেতে মনের ভাব প্রকাশও প্রচলিত ছিল। যতই প্রকার ভেদ থাকুক না কেন, সকলকেই অক্ষর বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ যে কোন উপায়েই হউক, লিখিত ভাষায় মানুষ নিজ মনোভাব প্রকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে; এবং প্রত্যেক জাতীয় মনীষিগণই নিজ নিজ মনোভাব ঐ উপায়ে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, রাখিতেছেন ও রাখিবেন। এইগুলিকে আমরা গ্রন্থ বা পুস্তক আখ্যা দিয়া থাকি। এবং এইগুলির সম্মিলনই সাহিত্য। (ক্রমশঃ) শ্রীযদুনাথচক্রবর্ত্তী, বি, এ।

জয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজি জয়া নিরাশ্রয়া। তাঁহার পিতা দিল্লীর সিংহাসনে বন্দী। তাই আশ্রয় লাভের আশায় পিতার আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইতেছেন। সঙ্গে কতিপয় সহচরী ও বহুসংখ্যক শরীররক্ষক। জয়ার হৃদয় চিন্তাপূর্ণ, বদন বিষণ্ণ, নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত। কিন্তু সে অশ্রুজল শতদলগত হিমানীকণার ন্যায় তাহার নয়নকমলের সীমা অতিক্রম করে নাই। জয়া তেজস্বিনী রাজপুত কন্যা। অপরের নিকট স্বীয় হৃদয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে অপমান বোধ করেন। তজ্জন্য আশৈশবসঙ্গিনী সমদুঃখভাগিনী সহচরীগণেরও নিকট নিজ হৃদয়ভাব গোপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেবল মধ্যে মধ্যে হৃদয়ভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁহার উন্নত বক্ষঃস্থলকে অধিকতর স্ফীত করিতেছিল।

জয়ার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। কিন্তু দেখিতে পূর্ণ যুবতীর ন্যায়। জয়া সুন্দরী ক্ষীণাঙ্গী। হস্তপদাদি সুগোল, সুগঠিত ও দেহের অনুরূপ। নিবিড় আকুঞ্চিত কেশদাম বেণীবদ্ধ হইয়া আনিতম্ব বিস্তৃত। কপোলপ্রদেশ আরক্তিম। ওষ্ঠাধর সুলোহিত। ইন্দিবর বিনিন্দিত নয়নযুগল ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয় পরিবেষ্টিত। জয়া অসামান্য রূপলাবণ্যবতী। ললনাকুল নন্দনকাননের পারিজাত। এ স্বর্গীয় কুসুমের সৌন্দর্য্যসুরভি দিল্লীর পাঠান সম্রাটের সিংহাসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। জয়া মাতা পিতার এক মাত্র সন্তান। শৈশবে মাতৃহীনা, আজন্ম পিতার স্নেহে পালিতা। হায়! অভাগিনী সেই স্নেহময় পিতাকে হারাইয়া সংসার অন্ধকারময় দেখিতেছে। এই আবর্ত্তমান সংসারচক্রে একাকিনী সরলা বালিকাকে না জানি কতই নিষ্পেষিত হইতে হইবে। জয়ার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাকাশ দুঃখের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। জানি না সে মেঘ কখন অন্তরিত হইবে কিনা?

দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া, অনুযাত্রিকগণ সহ জয়ার শকট একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলে গগনমণ্ডল সহসা নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল ও পরক্ষণেই মুষলধারে বৃষ্টি

পড়িতে লাগিল। ক্ষণপ্রভা ক্ষণেক হাঁসিয়া মানব-মনের আশার ন্যায়, পরক্ষণেই বিলুপ্ত হইল ও পথিকের নয়ন ঝলসিত করিয়া দিয়া অন্ধকারকে দ্বিগুণ বাড়াইতে লাগিল। বজ্রের ভীষণ নিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে। ঘোর অন্ধকারে নিকটের লোক দেখা যাইতেছেনা। আর অগ্রসর হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িল। এই সময়ে মেঘের গর্জ্জন অতীব ভয়ানক হইয়া উঠিল ও বাতাসের শব্দের সহিত মিশিয়া এরূপ প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল যে, পার্শ্বস্থ লোকের অতুচ্চ চীৎকার পর্য্যন্তও শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। জয়ার হৃদয়ে শোকের প্রবল ঝড় বহিতেছিল, তজ্জন্য এই তুমুল ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই। তাঁহার বিষণ্ণ ও নিস্তব্ধ ভাব দর্শনে সহচরীগণও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সহসা জয়ার নেত্র রোরুদ্যমানা সঙ্গিনীগণের উপর নিপতিত হইলে তাঁহার চেতনা হইল। বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, সমস্ত প্রান্তর জলে প্লাবিত হইয়াছে। এদিকে বৃষ্টির জল শকটের আবরণ ভেদ করিয়া স্রোতের আকারে ভিতরে পড়িতে লাগিল। পাদচারী সৈন্যগণের ও শকটবাহী পশু সকলের পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। উপায়ান্তর রহিত হইয়া জয়া সৈন্যগণকে গমনে বিরত হইতে ও আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন। অনতিদূরে একটি পর্ব্বতগুহা ছিল। সেই গুহা নানাপ্রকার সরীসৃপ পরিপূর্ণ ও ভয়াল-শ্বাপদ-সঙ্কুল। মধ্যে মধ্যে তদপেক্ষাও ভয়ানক নরশোণিত-পিপাসী দস্যু-তস্করাদি ঐস্থানে অবস্থান করিয়া স্বকীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। সৌভাগ্যক্রমে একজন সৈনিক উক্ত গুহার বিষয় অবগত ছিল। সেই ব্যক্তি পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকলকে তথায় লইয়া গেল। কয়েকজন সাহস করিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ও কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। অগ্নির আলোকে গুহার অভ্যন্তর উদ্ভাসিত হইলে অসংখ্য যতুকা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কেহ ধরিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের হস্তে বা মুখে দংশন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল।

গুহার বহির্দ্দেশ ভগ্নাবস্থ হইলেও উহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য্য একেবার বিনষ্ট হয় নাই। এবং উহার প্রত্যেক অংশ বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ভারতের স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। গুহার অভ্য-

স্তর সমচতুষ্কোণ ও প্রশস্ত। ভিতরে একটি বস্ত্রের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া জয়া ও তাহার সঙ্গিনীগণ শয়ন করিলেন। সৈনিকগণ সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির চতুঃপার্শ্বে শয়ন করিল। কিন্তু হায়! হতভাগ্যদিগের অদৃষ্টে বিধাতা বিশ্রামসুখ লেখেন নাই!

বিরামদায়িনী নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত হইবার পূর্ব্বেই একজন অপরিচিত ব্যক্তি গুহার দ্বারে প্রবেশ করিল ও ইতস্ততঃ সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তাহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ দৃষ্টে তাহাকে সকলে মুসলমান বলিয়া অনুমান করিল। এই ঘটনায় জয়ার অনুচরবর্গ সাতিশয় চিন্তিত হইল, বিশেষতঃ এই সময়ে দিল্লীর সৈন্যগণ নিকটে অবস্থান করিতেছিল। রাজপুতগণ এবিষয় অবগত ছিল। তাহাদের সঙ্গে তাদৃশ যুদ্ধোপকরণ ছিল না, সুতরাং শত্রুবল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা গুহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া জয়ার সেনাপ' মুসলমানগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন অনুচরকে প্রে করিলেন ও ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে আদে' করিলেন। জয়া এসমস্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু সেনাপতি সকল বিষয় বিবৃত করিলে তিনিও গমনে অনুমোদন করিলেন।

সকলেই গমনের জন্য প্রস্তুত। এমন সময়ে যে ব্যক্তি যবনদিগের গতিবিধি পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে সহসা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সশস্ত্র মুসলমান সেনা গুহার চারিশত হস্ত অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পলায়ন অতঃপর অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রাজপুতগণ নিরাশ ও শঙ্কিত হইল। জয়া সৈন্যগণকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "মুসলমানগণ মনুষ্য বটে, তাহারা কখন স্ত্রীলোকের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না। বোধ হয়, ঝড়বৃষ্টির পর আশ্রয়লাভের জন্য তাহারা এইস্থানে আসিতেছে। আমাদের এই গুহা পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ হিন্দু ও দেবদ্বেষী যবন কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না।" বিনয়নম্রবচনে জয়ার সেনাপতি উত্তর করিলেন—"দেবি! যবন সেনাগণ দয়া মমতা বিহীন। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষ। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ত বিধর্ম্মিগণের সহিত একত্র এই গুহা মধ্যে বাস করিতে হইবে।" জয়া প্রশান্ত ও ভক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "সৈনিকগণ! নারায়ণের নাম কর,

সেই অনাথের আশ্রয়দাতা ভগবানের শরণ লও। দুর্ব্বলের বল হরি বিপৎকালে এই অসহায়া অবলাকে রক্ষা করিবেন।” জয়ার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। যবন সেনাপতি গুহার মধ্যে লোক দেখিয়া সৈন্যগণকে বাহিরে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। রাজপুতগণ শত্রুর আগমনে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। যবন সেনানী স্বয়ং গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জয়ার পটমণ্ডপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজপুত সেনা-পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, “গুহার মধ্যে কে আছে।” রাজপুত নীরব রহিল। তাহার নিস্তব্ধতা দর্শনে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া যবন কর্কশস্বরে বলিল, শীঘ্র আমার কথার উত্তর দাও। নতুবা আমি বস্ত্রাবরণ ছিন্ন করিয়া দেখিব, ইহার ভিতর কে অবস্থান করিতেছে।” রাজপুত সেনানী কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, “স্ত্রীলোক!”

“স্ত্রীলোকত বুঝিয়াছি। পুরুষে কখন এরূপ আবরিত হইয়া থাকে না। ... ল, যদি তোমার বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে, আমি নিজেই এবিষয়ের সন্ধান লইতেছি।” এই বলিয়া যবন বস্ত্রাবরণ অপসরণ করিতে অগ্রসর হইল। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার! রাজপুত সেনাপতি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বল প্রয়োগ করিয়া তথা হইতে যবনকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ যবন আরও উত্তেজিত হইয়া স্বীয় অসি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। অস্ত্রাঘাতের শব্দ ও আহতের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে জয়ার বাকী রহিল না। তিনি বিশ্রাম-স্থান হইতে বাহির হইয়া যবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রশান্ত অথচ তেজঃ-পূর্ণ বচনে বলিলেন—“আমি জয়া, চিতোর-রাজ রায় রতন সিংহের কন্যা। চিতোরেশ্বরকে তোমাদের সম্রাট কৌশলে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মুসলমান সেনাপতির হস্ত হইতে তরবারি বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জয়ার লোকাতীত রূপলাবণ্যের কথা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল। খিলিজী সম্রাট্ এই রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়া জয়ার পিতা চিতোররাজ রতন সিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং জয়ার অন্বেষণে মিবারের চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই একাল পর্য্যন্ত জয়ার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। সহসা অনুকূল দৈববলে এক প্রকার আশাতীত ফল লাভ করিয়া পাঠান দলপতি আনন্দে উৎফুল্ল এবং অধীর হইয়া বারংবার স্বীয় অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সম্রাট্ ঈপ্সিত প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন, এই বলবতী আশা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা জয়ার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ও তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণে, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং নতজানু হইয়া ধীরভাবে বলিলেন—"দেবি ! প্রায় মাসাবধি আমরা ইতস্ততঃ আপনার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। আজ সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আপনি রমণীরত্ন, প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর আপনার পাণিগ্রহণপ্রার্থী। আপনি আলাউদ্দিনের প্রধানা মহিষী হইবেন। অদ্য এই গুহা মধ্যে নিশাযাপন করুন, কল্য প্রত্যূষে আমরা দিল্লী যাত্রা করিব"।

কিছুমাত্র উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া জয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি হিন্দু, দিল্লীর সম্রাট হিন্দুর চির শত্রু, যবন—হিন্দুদেব-দেবীগণের নিগ্রহকারী, সুতরাং আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত। বিশেষতঃ আমি পূর্ব্বেই অন্য জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। অতএব আমি পরিণীতা। আপনার হৃদয় আছে—দয়া মমতা আছে, এরূপ অসহায়াবস্থায় পাইয়া কখন স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছার বিরোধী হইবেন না এবং আমার গমনে কোন রূপ বাধা দিবেন না।"

"দেবি ! মানুষের কর্ত্তব্য বুদ্ধি তাহার ইচ্ছার অনুগমন করে না। আমার ইচ্ছা থাকিলেও আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাহা হইলে প্রবল প্রতাপান্বিত খিলিজী সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হইব। তজ্জন্য অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। বিশেষতঃ আপনার পিতার বিবরক্ষণেকের

জন্য চিন্তা করা উচিত। আপনি দিল্লী গমন করিলে আপনার পিতা কারামুক্ত হইবেন, নতুবা আজন্ম তাঁহাকে কারাগারে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।”

গর্ব্বিত ভাবে জয়া বলিলেন, “আমার পিতা রাজপুত। রাজপুত প্রাণ অপেক্ষা মানকে অধিক জ্ঞান করেন। সামান্য কারাদণ্ডের কথা? আমার পিতা অনায়াসে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি নির্ম্মল শিশোদীয় কুলে কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত হইতে দিবেন না।”

অধিক তর্ক করা অনর্থক বিবেচনা করিয়া যবন সেনাপতি সৈন্যগণকে বিশ্রামের আদেশ দিলেন। এবং জয়াকেও বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন। জয়া যবনের মনোভাব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে কি আমি বন্দী?”

যবন কোন উত্তর প্রদান করিল না। পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহীর ন্যায় জয়ার সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর কিছুমাত্র না বলিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সখীগণের নিকট গমন করিলেন।

রাজপুতগণকে পূর্ব্বেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। তাহারা সেনাপতির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া একাল পর্য্যন্ত তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত ছিল। এক্ষণে যবনগণকে দূরে শয়ন করিতে দেখিয়া তাহারাও অগ্নির চতুর্দ্দিকে শয়ন করিল। এবং শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িল। জয়ার সহচরীগণও সমস্ত দিবসের ক্লান্তি প্রযুক্ত অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কেবল চারিজন সশস্ত্র মুসলমান সৈনিক অনিচ্ছাস্বত্বে সেনাপতির আদেশে গুহার বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল। অপর সকলেই নিদ্রার শান্তিময় অঙ্কে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। অভাগিনী জয়ার চক্ষে নিদ্রা নাই। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। শৈশবে মাতার স্নেহে বঞ্চিতা। পিতার যত্নে লালিত—সেই পিতা কারাগারে বন্দী; দিল্লীতে গেলে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বটে, কিন্তু হায়! কিরূপ অবস্থায়! পিতা কারারুদ্ধ, আর স্বয়ং অস্পৃশ্য যবনের অন্তঃপুরচারিণী! জয়ার শৈশবেই বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। ভাবী পতির সৌন্দর্য্যে ও গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন। আশৈশব দেবতা জ্ঞানে যে প্রণয় ভাজনের মধুর ছবি

চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ কি করিয়া সহসা তাহা মুছিয়া ফেলিবেন? এ চিন্তা শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। বারংবার নিদ্রা দেবীর আরাধনা করিয়াও তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বদন স্বেদার্দ্র ও নয়নযুগল অশ্রু-সিক্ত হইল। জয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপাধানে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার শোকের কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইল। অঙ্গুলিস্থিত একটি অঙ্গুরীয়কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন। সাহসে বুক বাঁধিলেন। মনে মনে করিলেন, ভয় কি? যদি আবশ্যক হয়, এই অঙ্গুরীয়স্থিত হলাহল পান করিয়া জীবনত্যাগ করিবেন, তথাপি অস্পৃশ্য, বিধর্ম্মী যবন কখন, তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এদিকে জয়ার অজ্ঞাতসারে নিশা অবসান হইল। উষার ক্ষীণালোক গহ্বরের দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বিহগগণ যেন জয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাকলিচ্ছলে ক্রন্দন করিতেছে। সমীরণ সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রভাতারুণঃ ক্রোধে দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া গগনমণ্ডলে উদিত হইতেছে। এই সময়ে সৈনিকগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক যৎসামান্য আহার করিয়া লইল। পরে মুসলমান সেনাপতি গমনে আদেশ দিলেন। রাজপুত-গণকে মাঝে রাখিয়া যবনসেনা পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। জয়া ও তাঁহার সহচরীগণের শকটের চতুঃপার্শ্বে সশস্ত্র প্রহরী রক্ষিত হইল। সুতরাং অতঃপর পলায়ন অসম্ভব। কিয়দ্দূর গমন করিলে অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে জয়ার শকটবাহী পশুদ্বয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। জয়ার শকটবানকে দূরীকৃত করিয়া একজন গোখাদক তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সে গোদ্বয়কে যতই কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরিশেষে আর এক পদও অগ্রসর হইল না। অনন্যোপায় হইয়া মুসলমান সেনানী জয়ার নিকট আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—"দেবি! অবাধ্য পশুদ্বয় কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। আর আমাদেরও বিলম্ব করিবার সময় নাই। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছুদূর পদব্রজে চলুন। পরে পশুদ্বয় শান্তভাব ধারণ করিলে আবার পুনরায় শকটে আরোহণ করিবেন।" এবার জয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, দলিতা ফণিনীর ন্যায়

গর্জ্জিয়া বলিলেন, "যবন? জানিও রাজপুত রমণী মরিতে ভীতা নহে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে এখনই আমি আত্মহত্যা করিব। যতক্ষণ পশুদ্বয় শান্ত না হয়, ততক্ষণ আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিব। যবন সেনাপতি রাজপুত জাতির নির্ভীকতা ও অটল প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত ছিলেন এবং কিরূপে রাজপুত রমণী হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তজ্জন্য তাদৃশ কঠোরতা প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু যখন অনেক ক্ষণের পরও গোদ্বয় পূর্ব্বমত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিয়া গমনে অসম্মত হইল, তখন, জয়াকে বলিলেন "অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আপনাকে পদব্রজেই যাইতে হইবে। আমাদের আর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিবার ক্ষমতা নাই।" এই সময়ে শকটবান্ সবলে কশাঘাত করায় গোদ্বয় এরূপ উদ্ধত হইয়া উঠিল যে, শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল ও জয়া দুইজন সঙ্গিনী সহ শকট হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। যবন সেনাপতি শশব্যস্তে জয়াকে উত্তোলন করিতে গমন করিলেন। জয়া বিরক্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, অস্পৃশ্য যবন! একপদ মাত্র অগ্রসর হইলে এই অঙ্গুরীয়কের বিষপান করিয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিব!"

ইহা দেখিয়া যবন ধীরভাবে বলিল, "দেবি! এবিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমাকে দোষ না দিয়া এই দুষ্ট পশুগণকে তিরস্কার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে পদব্রজে গমন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এ বন্ধুর ভূমি আপনার গমনের অনুপযুক্ত হইলেও আমাকে বাধ্য হইয়া এবিষয়ে অনুরোধ করিতে হইতেছে।"

জয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "আমি এস্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইব না।" এই বলিয়া করস্থিত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। চকিতের ন্যায় যবনসেনাপতি তাঁহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অঙ্গুরীয়ক কাড়িয়া লইলেন এবং বিরক্তি সহকারে বলিলেন। রাজপুত্রি! আপনি বারবার আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতেছেন। এখন যাঁহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। আমি সহসা আপনার প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করিবনা।" ক্রোধে এবং অপমানে গর্ব্বিতা রাজপুতকন্যার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তিনি কোনও উত্তর না করিয়া সখীগণ সঙ্গে দ্রুতপদে সেই বন্ধুর উপত্যকা ভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ।

নারীধর্ম্ম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (স্বরস্বতী) প্রণীত।

শিক্ষা যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন, ইহা বোধ হয় কাহাকেও আজি কালি বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষকে মানুষ করিবার জন্য মানব সমাজে সুখসাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, মানবপরিবারের সুখশান্তি আনয়নের জন্য এবং ইহকালে ও পরকালে ভগবৎকৃপা লাভের জন্য, সুশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। সুশিক্ষার অভাবে মনুষ্য পশু অপেক্ষাও অধম, নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণ্য হইয়া যায়। এহেন শিক্ষা যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অত্যাবশ্যক, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু এমনই আমাদের দুর্দ্দিন আসিয়াছে, যে আমরা একথা বুঝিয়াও বুঝি না। পুরুষের শিক্ষার জন্য কত আয়োজন হইতেছে, কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, কতই কি হইতেছে, কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারও কোন রূপ যত্ন নাই, চেষ্টা নাই, আগ্রহ নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বঙ্গের অধিকাংশ রমণীই অশিক্ষিতা হইয়া গৃহে গৃহে দুঃখ ও অশান্তির হলাহল ছড়াইতেছে, কত নন্দন, কানন স্বরূপ গৃহকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে; যেখানে সুখের উৎস ছুটিতেছিল, তথায় দুঃখের দারুণ কোলাহল উঠিতেছে; যেখানে স্বর্গীয় পবিত্রতা বিরাজ করিতেছিল, তথায় নরকের কলুষরাশি আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। এই সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তাই বঙ্গরমণীকুলের সুশিক্ষার জন্য আমাদের "বীরভূমির" পাঠকগণের সুপরিচিতা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী স্বরস্বতী (ইনি সম্প্রতি সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন) "নারীধর্ম্ম" নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যিনি এতদিন কবিতার মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গীয় নরনারীর চিত্তে আনন্দের হিল্লোল তুলিতেছিলেন, আজ তিনি শিক্ষয়িত্রীর বেশে বঙ্গের গৃহদ্বারে উপস্থিত। গ্রন্থকর্ত্রী নিজে রমণী, রমণীর দোষ গুণ তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। রমণীর মানসিক রোগের চিকিৎসা করিতে তিনি যেমন পটু, কোন পুরুষে তেমন হইতে পারিবেননা। তাই আশা হইতেছে, নগেন্দ্র বালার এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বঙ্গের প্রতি অন্তঃ-

পুরে প্রবেশ করিয়া রমণীগণের হৃদয়কালিমা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। সেই জন্য অতিশয় অহ্লাদের সহিত আমরা এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবারও প্রয়াসী হইয়াছি।

নগেন্দ্রবালা প্রথমেই স্ত্রীকে স্বামি ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন। স্বামিই রমণীর এক মাত্র গুরু, একমাত্র দেবতা ও একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং রমণীগণের স্বামি সেবাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দেশের স্ত্রীগণকে যে একথা বুঝাইয়া দিতে হইতেছে, ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়। যুগের পর যুগ অতীত হইয়াছে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আর্য্য সমাজের শাসনগ্রন্থি শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর যাহাই হউক, হিন্দুনারীগণ সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। তবে ধর্ম্মের ব্যভিচার পূর্ব্বকালেও ছিল, এখনও আছে। এসম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্মের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী হিন্দুনারীগণকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

রমণীর উপর পারিবারিক সুখ নির্ভর করিতেছে। একটি পরিবার সুশৃঙ্খলায় শাসন ও একটি রাজ্যশাসন উভয়ই একরূপ কার্য্য। রাজ্য, শাসনে যেরূপ কঠোরতার সহিত কোমলতা, ন্যায়ের সহিত দয়া, পরিণাম-দর্শিতার সহিত ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয়, পরিবার রূপ রাজ্য শাসনেও ঠিক ঐরূপ গুণাবলীর ব্যবহার করিতে হয়। রমণীগণই পরিবার রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী ; পরিবারের সুখ শান্তি সমস্তই তাঁহা-দেরই উপর নির্ভর করিতেছে। এত ক্ষমতা যাঁহাদের, এত দায়িত্ব যাঁহাদের, তাঁহাদের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু হায়! কয় জন হিন্দুরমণীর মধ্যে উপরি উক্ত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়? কয়জন কর্ত্তব্য পালন করে, কয়জন তাহা বুঝে, কয় জনেরইবা বুঝিবার শক্তি আছে? বাড়ীর যিনি গৃহিণী, তিনি জানেন না, শিশুগণের কোমল মতি কুপথে ধাবিত হইলে কিরূপ কঠোর অথচ সস্নেহ ব্যবহারে তাহাদিগকে সুপথে আনিতে হয়, কিরূপে বধূগণের হিংসাদ্বেষ নিবারণ করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, এক কথায় কিরূপে সুদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় পরিবার-তরণীকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া সুখ

সাগরের উদ্দেশে চালিত করিতে হয়। যেস্থলে একটি সুমিষ্ট কথা প্রয়োগ করিলে সকল রোষ, সকল বিদ্বেষ, বিদূরিত হয়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়, গৃহিণী হয়ত সেখানে এমন একটি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, যাহাতে সমগ্র পরিবারের মধ্যে অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অধিকাংশ বঙ্গনারীগণের মধ্যে, বাক্যে সংযম নাই, ব্যবহারে অপক্ষপাতিত্ব নাই, পরদুঃখে সহানুভূতি নাই, নিজদুঃখে ধৈর্য্য নাই। আছে কেবল পরশ্রী-কাতরতা, সঙ্কীর্ণতা, কলহপ্রিয়তা, অত্যধিক কুসংস্কার, ও অতি হেয় স্বার্থ-পরতা! যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা জানেন, এরূপ স্ত্রীলোক লইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহিণী দেখিয়া শুনিয়া, কন্যাকর্ত্তার যথা সর্ব্বস্ব লইয়া একটি পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন। ভাবিলেন, এই যে পরের কন্যা তাঁহার গৃহে আসিল, সে নামে তাঁহার পুত্রবধূ, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার ক্রীত দাসী। তাহার কোন অধি-কার থাকিবে না, কিছু সম্মান থাকিবে না, কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিবে না, থাকিবে কেবল, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা ও অবমাননা। আহা! সুকুমার বয়সে মাতাপিতার অঙ্করূপ স্বর্গ হইতে বিচ্যুতা হইয়া বালিকা কি ঘোর নরকে পতিত হয়! শিশু প্রথম অপরাধে সর্ব্বত্রই সামান্য দণ্ডে বা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পায়। কিন্তু এই বালিকা বধূর কোন দোষেরই মার্জ্জনা হয় না। কিন্তু মানব সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। বিনাপরাধে বা স্বল্পাপরাধে পুনঃ পুনঃ দণ্ডিতা হইয়া বালিকা অবশেষে শ্বশ্রুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে কত সোণার সংসার ছারখারে গিয়াছে। স্ত্রী লোকের অবিবেচনায়, অপরিণামদর্শিতায়, অন্ধ বিশ্বাসে কত স্নেহের পুত্তলি সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ কত অনর্থ যে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপরে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা অধিকাংশ বঙ্গরমণীর প্রতি প্রয়োগ করা চলে। তবে এ কথা স্বীকার না করিলে মহাপাপ হইবে, যে এখনও বঙ্গগৃহে অনেক রমণী আছেন, যাঁহারা নানা সদ্‌গুণালঙ্কৃতা ও সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের সংখ্যা বড়ই কম।

বঙ্গনারীর এই দুরবস্থা অপনোদনের উপায় কি? ইহার একমাত্র উত্তর শিক্ষা। কিন্তু কিরূপে শিক্ষা দিতে হইবে? হিন্দুর মেয়ে কখনই এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি এ, পাশ করিতে যাইবে না। তাহা হইলে আর হিন্দু-

য়ানী থাকে না। পাঠশালা প্রভৃতিতে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে বালকগণের যে কি শিক্ষা হয়, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা পাঠশালায় বা স্কুলে ছেলেদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি কিছুই হয় না। ঐরূপ স্কুলের ফাঁদে মেয়েদের আর ফেলিয়া কাজ নাই। মেয়েরা যাহাতে হৃদয়বতী হয় ও সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ হয়, এইরূপ শিক্ষা তাহাদের দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বিভিন্ন প্রণালীর স্কুল স্থাপন ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হয়। যাহাতে হিন্দুনারীকে সংসারে আবার দেবীরূপে দেখিতে পাই, এমন শিক্ষা দিতে হইবে।

নগেন্দ্রবালা তাঁহার পুস্তকে অতি বিশদ ভাবে বঙ্গীয় রমণীগণের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে শান্তি ও সুখ বিরাজ করে, তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। পুস্তক খানি সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত। আশীর্ব্বাদ করি, নগেন্দ্রবালা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া এমনি ভাবে বঙ্গনারীগণের কল্যাণ সাধন করুন।

শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেবল মাত্র পুস্তক পাঠে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয় না। পরিদর্শনের অভাব হইলে আমাদের সকল বিষয়েরই জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এক্ষণে পরিদর্শনের বিধি ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বাহ্য জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদিগকে সম্যক মনোযোগের সহিত দর্শন করিলে যে আমাদের নানা বিষয়ের জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পারাবত হইতে দম্পতী প্রেম, মধু মক্ষিকা হইতে শ্রমশীলতা, ইত্যাদি অনেক পদার্থ হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে। মানবের জীবন যদি অতি দীর্ঘ হয়, তবে মানব মনে করিলে যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা বহুশিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু নিয়তির অবিচলিত ব্যবস্থায় সকলকেই নাতিদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়। এই জন্য কেবল মাত্র জাগতিক পদার্থ পরিদর্শন দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিব,

এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সকলকেই হতাশ হইতে হইবে। সেই জন্য পুস্তকে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অগ্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতিরূপ মহাপুস্তক ধীরভাবে অধ্যয়ন কর। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে—চিত্তের প্রসাদ জন্মিবে। কিন্তু গৃহে বসিয়াও প্রকৃতির পুস্তক পাঠ করা হইতে পারে না। শিক্ষার্থীকে নানা স্থানে গমন করিতে হইবে, নানা জাতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষ ও পরিদর্শন করিতে হইবে, এবং সকল পদার্থ হইতেই কিছু না কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। তবেই পুস্তকাধীত বিদ্যা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

কিন্তু এই নিখিল জগতের যাবতীয় পদার্থ পরিদর্শন সহজ ব্যাপার নহে। কিরূপ ভাবে পরিদর্শন আরম্ভ করিতে হইবে, ইহা এক কঠিন সমস্যা। পৃথিবীর অগণ্য পদার্থ পরিদর্শন সময়ে একের সহিত তাহার অনুরূপ পদার্থের পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন এইজন্যই পরিদর্শন সময়ে যাবতীয় পদার্থকে শ্রেণীবিভক্ত করা কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীবিভাগ প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু যত্ন ও পরিশ্রমে অবশ্যই সফলতা আসিবে। স্রষ্টার আশ্চর্য্য কৌশলে সকল পদার্থেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য ও একতা দৃষ্ট হয়। আবার সেই সঙ্গে অপরের সহিত পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনুষ্য ও বৃক্ষের কথা বলা যাইতে পারে। উভয়েরই জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। অথচ, যে প্রণালীতে উহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়, তাহা একরূপ নহে। এইরূপ অনেক পদার্থেই একতার সহিত বিভিন্নতা মিলিত আছে। এই টুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আবার যাহা স্পষ্টতঃ এক জাতীয় পদার্থ বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয়, তাহার মধ্যেও পার্থক্য আছে। আপাততঃ বোধ সকল মানবেরই অবস্থা একরূপ। কিন্তু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, একজন মনুষ্য অপর মনুষ্য হইতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। সকলের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় সম্পূর্ণ একরূপ নহে। তাহা যদি হইত, তবে সকল মানবই একরূপ হইয়া যাইত। সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আমাদের পৃথক্ ভাবে আলোচ্য। এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত সকল পদার্থ আলোচনা করিলে তবে আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিদর্শন করিয়া পদার্থ সম্বন্ধে বিষয় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সংগৃহীত বিষয় সমূহের আলোচনা ও বিচার করিলে পরিদর্শন শিক্ষা পক্ষে কার্য্যকারী হয়। কারণ, পদার্থ সকলের কেবলমাত্র পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ক ধারণা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধিত হয় না। যে কোন বিষয়ই হউক না, তাহার সকল দিক বিচার করিয়া তৎ-সম্বন্ধে কোন না কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় এবং সেই মীমাংসিত বিষয় আমাদের জীবননির্ব্বাহে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া থাকে। ইতিহাস পাঠে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা। কারণ ইতিহাস বর্ণিত ঘটনাবলী পাঠ করিয়া আমরা তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি। কার্যক্ষেত্রে কখন কি উপায় অবলম্বন করিলে জয়ী হইব, সে সম্বন্ধে

বহুবিধ শিক্ষালাভে সক্ষম হই। ইতিহাস পাঠ এক প্রকার অতীত কালের ঘটনাবলীর পরিদর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অধুনা আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে ইতিহাস এইরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইতিহাস পাঠে যে বালকদিগের চিন্তা ও বিচার শক্তির পরিপুষ্টি সাধিত হয়, তাহা শিক্ষক ও ছাত্র কেহই ধারণা করেন না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই ইতিহাস বর্ণিত ঘটনাবলী স্মৃতিপথে দৃঢ়ীভূত হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও এবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে উপাধি পরীক্ষা অবধি বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে চাহেন যে, ছাত্রেরা পুস্তকে বিবৃত বিষয় উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়াছে কিনা? যে বিষয় পুস্তকে বিশেষ রূপে মীমাংসিত থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে দিয়া ছাত্রদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ভাবে ইতিহাস পাঠের উৎসাহ দেওয়া সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য। যদি আমারা এই এই ঘটনা দ্বারা এই এই ঘটনা কেন ও কি প্রকারে হইল, তাহা না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে কেবলমাত্র ঘটনাবলীর সূত্র মুখস্থ করিয়া আমাদের কি ফল হইবে?

কোন বিষয় পাঠ বা পরিদর্শন করিয়া তাহার যদি বিচার করিতে না পারি, তাহা হইলে কিছুই ফলোদয় হয় না। বিচারশক্তি মানবের প্রধান প্রয়োজনীয়। এই বিচারশক্তির পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে আমাদের সকল বিষয়েরই তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের প্রকৃতি স্বতঃই আমাদিগকে এ বিষয়ে প্রণোদিত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব ও অপর পদার্থ সকল যে প্রকারে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে একভাবাপন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই হেতু মানবও সেই এক শক্তি হইতে একই প্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যেন জীব ও পদার্থ মধ্যে সেই নৈসর্গিক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধনিচয় অনুসন্ধান করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। ইহা আমরা নিজেই জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিব। কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে আমাদের জীবনের ঘটনানিচয় পরিদর্শন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমরা সর্ব্বদাই নিজ নিজ জীবনে সাম্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র। এক ঘটনার সহিত অপর ঘটনার বৈষম্য দৃষ্ট হইলে, আমরা ধৈর্য্যচ্যুত ও হতবুদ্ধি হই এবং এই অবস্থায় উভয়ের সাম্য স্থাপন করিতে বিশেষ প্রয়াসী হই। তাহার কারণ, পৃথিবীতে সমগ্র বস্তুই কার্য্যকারণরূপে সম্বদ্ধ। তাহাদের কোনস্থলে কোন বৈষম্য ঘটিলে, প্রকৃতি স্বতঃই সেই বৈষম্য দূর করিতে চেষ্টা করে। মানবজীবন হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন। যখন আমরা নিজে কোন একটা অন্যায় কার্য্য করি, সৎ প্রকৃতির লোক হইলে আমরা অন্যায় স্বীকার করিয়া তজ্জন্য পরিতাপ করি ও পরিশেষে ঘটনাসূত্রে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া "ভ্রান্তি মানবের সাধারণ ধর্ম্ম"

এইরূপ একপ্রকার যুক্তি ও তর্ক দ্বারা নিজের মনোমধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া থাকি। অসদ্ভাব মানবের প্রকৃতিগত নহে। মানব অসদ্ভাব লইয়া জন্মপরিগ্রহ করে না। যদি কেহ বলেন যে, অসৎ পিতার ঔরসে ও অসৎ মাতার গর্ভে জন্মহেতু যে অসদ্ভাব মানবের প্রকৃতিস্থ। কিন্তু তাহা হইলেও মানব অসৎ মাতাপিতা কর্তৃক লালিত পালিত হইলে যে-প্রকার অসৎপ্রকৃতি হয়, তাহার শতাংশের একাংশও অসৎ মাতাপিতা হইতে জন্মপরিগ্রহ হেতু হয় না। পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানব যেরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকে, তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত হয়, কিন্তু এই সঙ্গে যদি তাহার শিক্ষা হইয়া ভাল ও মন্দ বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা হয়, তাহা হইলে, তাহার অসৎ সহবাসের ফল প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণে তিরোহিত হয়। সুতরাং মানব যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহার শিক্ষা-বিচারশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক। এই বিচারশক্তির পরি-পুষ্টি সাধন করাই মানবজীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিচার-শক্তি মানবের প্রকৃতিগত। পৃথিবীতে এরূপ অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা জগতের কার্য্যসমূহের কারণ অনু-সন্ধান করেন না; তবে এ বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এক বিষয় অন্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও আমরা বিচারশক্তির দৌর্ব্বল্য-হেতু একর্কে অন্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করি। যেহেতু আমরা সর্ব্বদাই এক বিষয় ঘটিবার পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই কারণসূত্রে অভিহিত করি। এবং এই জন্যই ঘটনাসূত্রে এক ঘটনার পূর্ব্বস্থিত ঘটনাকে প্রথম ঘটনার কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিই। অনু-সন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারিব যে,পল্লীস্থ গৃহস্থ মধ্যে কোন না কোন গৃহস্থের নারিকেল বা তজ্জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করা নিষেধ। কারণ ঐ পরিবারে একব্যক্তি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিবার অগ্রেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যদিও উল্লিখিত বিষয় দুইটির একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই—তথাপি ঐ পরিবারে নারিকেল বৃক্ষ রোপণই সেই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় স্বীকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু সম্যক বিচারশক্তিশালী ব্যক্তি কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন না। শোকে বিহ্বল হইলে তাঁহার বিচারশক্তি তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

বিচারশক্তির উৎকর্ষসাধন মানবজীবনের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বদা সকলকেই অতি সাবধানে বিচারশক্তির প্রয়োগ করা উচিত। বিচার করিবার পূর্ব্বে বিচার্য্য বিষয়ের সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভ একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা বিচারফল কলুষিত হইবে। বিচারশক্তির দৃঢ়তাসম্পন্ন করিতে হইলে, সকল ব্যক্তিরই গণিতশাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। গণিতশাস্ত্রের সকল বিষয়ই সুযুক্তিপূর্ণ। এইজন্য আমাদের ঐ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান ও পারদর্শিতা

লাভ হইলে যুক্তিশক্তি বলবতী হইয়া থাকে এবং তদ্দারা আমরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আরও অধিক বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এইরূপে যুক্তি-শক্তি কিঞ্চিৎ দৃঢ়তাসম্পন্ন হইলে, আমাদের বাহ্যজগতের সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া স্বীয় মনোমধ্যে তর্ক উপস্থিত করা প্রয়োজন। গণিতের নিয়ম যে প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, কার্য্যক্ষেত্রের নিয়মাবলী সেরূপ কোন প্রকার নিয়মাবদ্ধ নহে। এক ঘটনায় বিপর্য্যয় বহুবিধ কারণে ঘটিতে পারে, কিন্তু গণিত শাস্ত্রে এক কারণ দ্বারা একই প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। সুতরাং গণিতের নিয়ম হইতে কার্য্যক্ষেত্রের নিয়মাবলী অনেক বিষয়ে বিভিন্ন, তাহা সদা স্মরণ করিয়া বাহ্যজগতের বিষয়সমূহ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মানবচরিত্রের বিচারিত ফলের অনৈক্য বিচারশাস্ত্রের দোষ সংঘটিত হয় না। বিচারক বিচার্য্য বিষয়ের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য জানিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার বিচারের অন্যথা হইয়া থাকে। এইরূপে সামান্য বিষয় হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য এবং বিচারফলের অনৈক্য ঘটিলে বিচার শাস্ত্রের উপর দোষারোপ করিয়া ভগ্নোদ্যম ও নিরস্ত হওয়া সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ।

ভারতেশ্বরীর স্মৃতি-চিহ্ন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমনে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ দেশের নানাস্থানে সভা সমিতি হইতেছে। স্মরণচিহ্ন কি আকারে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে নানাস্থানে নানারূপ জল্পনা কল্পনাও হইতেছে এবং এ বিষয়ে বাদ-বিসম্বাদেরও অভাব নাই। ফলতঃ, এক শ্রেণীর লোক কোনও রূপ অট্টালিকাদির নির্ম্মাণ অথবা স্বর্গীয়া অধিরাজ্ঞীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন দ্বারা তাঁহার স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং অপর শ্রেণীর লোক ভারতের বাণিজ্য শিল্পাদির উন্নতিকল্পে কোনও রূপ স্থায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকগতা মহিষীর স্মৃতি ভারতবাসীর মনে অনুক্ষণ জাগরূক রাখিবার প্রয়াসী। বৃহতী অট্টালিকা দ্বারা স্মরণচিহ্ন স্থাপন নূতন নহে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রা সহরে ভূতপূর্ব্ব সাহজেহান বাদশাহের মমতাজমহল বেগমের সমাধিস্থান তাজমহল শুধু ভারতে নহে, সমস্ত জগতে এ বিষয়ের অদ্বিতীয় এবং অনুপম দৃষ্টান্ত।

মহারাণীর পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই, মোগল-গৌরব তাজমহলের সমতুল্য না হউক তদ্বিধ একটী অট্টালিকা দ্বারা স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরীর স্মৃতি-ধ্বজা আকাশপথে উড্ডীয়মান হউক, এইরূপ প্রসঙ্গ এ দেশীয় পাইওনীয়র-প্রমুখ প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রে আলোচিত হইয়াছিল।

আমাদের বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কলিকাতার রাজকীয় প্রাসাদের সমীপে একটী উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণের বাসনায় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসি গণ কলিকাতার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে সাহায্য করা ব্যতীত স্বীয় প্রদেশের স্থানে স্থানে মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন।

মহারাণীর রাজত্বে আমরা যে সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়াছি, সিপাহী বিদ্রোহের পরে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় প্রজার প্রতি সতত সদয় ও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহারের যে পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন জন্য কোনও রূপ প্রসঙ্গই আমাদের নিকটে অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অধিকন্তু, যে জাতি সম্রাটকে "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" বলিয়া বিশ্বাস করে, অধিরাজের প্রতি যাহাদের ভক্তি অচলা, তাহারা রাজসেবার নিমিত্ত স্বকীয় দরিদ্রতা সত্বেও অজস্র অর্থব্যয় করিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র কি?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই অতীব চিন্তার বিষয়। আমাদের মনের উপর চিরানুগত প্রথার আধিপত্য এত অধিক যে, আমরা এখনও তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন অথচ হিতগর্ভ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। দেশের লোকসংখ্যা অপ্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; অচিরেই বর্ত্তমান লোকগণনার ফলে জানিতে পারা যাইবে, এ বিষয়ে মা ষষ্ঠি আমাদিগকে কতদূর কৃপা করিয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মের অবিরাম গতিতে জীবন সংগ্রাম দিনদিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে; ভারতের জীবিকার্জ্জনের প্রধান এবং বলিতে গেলে একমাত্র উপায় কৃষি নানা কারণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং বর্ষার চাপল্যে সময়ে সময়ে মৃতপ্রায়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতির সম্বন্ধ আমাদের সহিত ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় স্মতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থ ব্যয় যদি সঙ্গত অথচ প্রয়োজনীয় রূপে করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য?

সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারা স্বর্গীয়া রাজ্ঞীর স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রশস্ততা সম্বন্ধে আমি কোনও রূপে সন্দিহান নহি। বরং ইহাকে একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় প্রকৃষ্ঠতম উপায়ই অবলম্বন করা যে বিধেয়, আশা করি, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইবেনা।

এবিষয়ে বোম্বাই প্রদেশ সকলের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীগণ ভিক্টোরিয়া ফণ্ড" স্থাপন করিয়া এই ফণ্ডের আয় হইতে "যাবৎ গঙ্গা মহীতলে" তাবৎ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতভার স্বহস্তে গ্রহণ কালে স্বর্গীয়া

মহারাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতে শান্তি স্থাপিত হইলে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রীতিমত যত্ন গৃহীত হইবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ভারতীয় শিল্পের অবনতিই ঘটিয়াছে। বোম্বাই-বাসীগণ উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয়া রাজ্ঞীর অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যই করিয়াছেন।

কোনও আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, আমাদের বীরভূম জেলার লোকপ্রিয় সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, আহমেদ সাহেব বাহাদুরের উদ্যোগে কয়েক দিন পূর্ব্বে উক্ত অভিপ্রায়ে সিউড়িতে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বীরভূমে নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন; সুষুপ্ত বীরভূমবাসীকে কিয়ৎ পরিমাণে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন; দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বিষয়ে তাহাদের উপলব্ধির উৎপাদনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আহমেদ সাহেবের প্রতি বীরভূমবাসীর কৃতজ্ঞতার ইয়ত্তা নাই।

শুনিলাম, শিউড়ির নূতন টাউনহলে মহারাজ্ঞীর মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে, তজ্জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। বীরভূম অপেক্ষাকৃত দরিদ্রবহুল স্থান; কি পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিতে পারি না। তবে হেতম্পুরের রাজা বাহাদুর, দুবরাজপুর ও বোলপুরের ব্যবসায়িগণ, সিউড়ির ব্যবহারজীবী ও কর্ম্মচারীগণ, কুণ্ডলার মুখোপাধ্যায়গণ, কীর্ণাহার, লাভপুর, বাজিতপুর, দমদমা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ চেষ্টা করিলে আবশ্যকীয় অর্থ অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। অধিকন্তু উপযুক্ত উপায়ে প্রত্যেক পল্লীবাসীর সমীপস্থ হইতে পারিলে তাঁহারাও স্বাধীনেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সাহ্লাদে এই বিষয়ে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন, এরূপ ভরসা আছে।

অবশ্যই মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি বীরভূমবাসীর রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ চিরকাল টাউন হলের শোভা বর্দ্ধন করিবে; কিন্তু কেবল শোভা বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে যদি বীরভূমের কোনও রূপ স্থায়ী উপকার সাধনের জন্য উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে কি সর্ব্বথা সুখের বিষয় হয় না?

সংগৃহীত অর্থে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া তাহার সুদের আয়ে এক বা ততোধিক মাসিক বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা রাজসাহীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের স্থাপিত রেশম বিদ্যালয়ে অথবা শিবপুর কৃষি-কলেজে প্রতি বৎসর এক বা ততোধিক বীরভূমবাসী প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককে প্রেরণ করিয়া রেশম বা কৃষি বিদ্যায় পারগ করিতে পারিলে বীরভূমের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে। অবশ্যই এই বৃত্তি জেলা বোর্ডের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। চেষ্টা করিলে বীরভূমে রেশমচাষ প্রসার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং বীরভূমবাসী তাহা হইতে লাভবান্ হইতে পারিবে। যদি সংগৃহীত সমস্ত অর্থ এইরূপে ব্যয়িত হওয়া উপযুক্ত বলিয়া

বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে কিয়দংশও এবম্বিধ প্রকারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।

সতীদাহ।

সে অনেক দিনের কথা। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, তখন হুগলি জেলার মাজিষ্ট্রেট্। একটি হিন্দুরমণীর স্বামী গতাসু হইয়াছেন; রমণী তাই সর্ব্বসন্তাপহারিণী জাহ্নবীতীরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পরলোকগত স্বামীর সঙ্গলাভ বাসনায় আসিয়াছেন। বাড়ী অনেক দূরে, সেই জন্য স্বামীর মৃতদেহ আনয়ন করা হয় নাই। তাঁহার উত্তরীয় খানি কেবল আনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখন সতীদাহ নিবারণের আইন হয় নাই। তাহা হইলে কি রমণীর ভাগ্যে স্বামীর অনুগমন ঘটিত? চিরবৈধব্য যন্ত্রণায় তাহাকে আমরণ পুড়িতে হইত।

হ্যালিডে সাহেব আপনার বাঙ্গালায় বসিয়া আছেন। দুইটী সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। একজন ডাক্তার, অপর জন মিশনারি। এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, একটি সতী গঙ্গাতীরে সহমৃতা হইবার জন্য আসিয়াছে। ডাক্তার ও মিশনারি সাহেব এই ব্যাপার দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সুতরাং তিন জনে গাড়াতে চড়িয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বহুসংখ্যক হিন্দু সমবেত হইয়াছে। চিতা সজ্জিত হইয়াছে। সতী চিতা পার্শ্বে স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। তিনজন সাহেব আসিয়াছেন দেখিয়া লোকে সসম্ভ্রমে তিনখানি চেয়ার আনিয়া দিল। সাহেবগণ তদুপরি উপবেশন করিলেন। সতী যেখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় বসিলেন। ডাক্তার ও মিশনারি সাহেবের ইচ্ছা যে, তাঁহারা কোন রূপে সতীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রাণত্যাগরূপ সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তাঁহারা জানিতেননা যে, হিন্দুরমণী কিরূপ জীব। প্রমদা যে পতিবর্ম্মগা, তাহা তাঁহারা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা সতীকে মরণ সংকল্প পরিত্যাগ করাইবার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাদের কথা সতীকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। স্থির, গম্ভীর ভাবে ও সসম্ভ্রমে সতী তাঁহাদের কথা শুনিলেন—কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। আর অপেক্ষা করা চলে না। তাঁহার স্বামী যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন। আর তিনি কতক্ষণ একাকী থাকিবেন? সতী অধীরা হইলেন। হ্যালিডে সাহেবের নিকট চিতারোহণের অনুমতি প্রার্থনা করি-

লেন। বাক্যব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া সাহেব তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু ডাক্তার ও মিশনারীর এখনও জ্ঞান হয় নাই। এখনও তাঁহাদের ইচ্ছা যে, সতীকে কোন রূপে নিবারণ করেন। সেই জন্য তাঁহাদের অনুরোধে হ্যালিডে সাহেব সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগে কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, তাহা জান ত?" সতী ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সাহেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কোন উত্তর না করিয়া বলিলেন, "একটা প্রদীপ আন ত।"

আজ্ঞা মাত্র প্রদীপ, ঘৃত ও সলিতা আনীত হইল।

সতী বলিলেন, "প্রদীপ জ্বাল।" প্রদীপ জ্বালা হইল। তখন সতী স্থির দৃষ্টিতে সাহেবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া একটি অঙ্গুলি প্রদীপের শিখায় ধরিলেন। অঙ্গুলি পুড়িতে লাগিল—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, এবং অবশেষে পালক দগ্ধ হইলে যেমন হয়, সেইরূপ হইয়া গেল, তথাপি সতীর পবিত্র মুখমণ্ডলে কোন রূপ যন্ত্রণার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। কোন রূপ যে যন্ত্রণা হইয়াছে, কোন রূপে তাহা প্রকাশ হইল না।

গম্ভীর স্বরে সতী হ্যালিডে সাহেবকে বলিলেন,"কেমন,এইবার বুঝিয়াছ? সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "হাঁ বেশ বুঝিয়াছি। প্রশান্তভাবে দীপশিখা হইতে অঙ্গুলি অপসৃত করিয়া সতী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইবার আমি যাইতে পারি কি?" সাহেব সম্মতি দিলেন। সতী চিতার নিকটে চলিয়া গেলেন। চিতা ৪½ ফিট দীর্ঘ, ৪½ ফিট উচ্চ ও তিন ফিট প্রস্থ। তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া সতী হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া চিতার উপরি শয়ন করিলেন। তাঁহার শরীরের উপর শুষ্কতৃণ বিস্তৃত করা হইল। তাহার পর বৃহৎ বৃহৎ বংশখণ্ড দিয়া তাঁহার শরীরকে চিতার সহিত বন্ধন করিবার উদ্যোগ করা হইল। হ্যালিডে সাহেব ইহাতে আপত্তি করায় উহা কার্য্যে পরিণত হইল না। সতীর ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। সতী চিতায় অনল প্রজ্জ্বলিত করিতে তাহাকে আদেশ দিলেন। ধূপ ও ঘৃত সংযোগে মহাবেগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সতী কোন রূপ আর্ত্তনাদ বা উঠিবার চেষ্টা করে কিনা দেখিবার জন্য হ্যালিডে সাহেব চিতার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন। নীরবে সতীর নশ্বর দেহ দগ্ধ হইয়া গেল; সতীর পবিত্র আত্মা অমরলোকে স্বামীর আত্মার সহিত সম্মিলিত হইল। আহা! সতী ধর্ম্মের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই পূর্ব্বে দেখা যাইত!

পাঠক, ইহা আমার নিজের কথা নহে। হ্যালিডে সাহেব স্বহস্তে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মাননীয় বক্ল্যাণ্ড সাহেব প্রণীত Bengal under the Lieutenant Governors নামক পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠা দেখুন।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। [৮ম সংখ্যা।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিবরণ।

যে বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিচালিত, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপে প্রতিনিয়তই অবস্থান্তরিত লক্ষিত হইতেছে, ইহা মূলে তিনটী মাত্র শক্তি বা গুণ আছে। ঐ তিনটী গুণের নাম, যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। এবং ইহাদেরই পরস্পর ভবাভিভব-ক্রিয়া (জয়-পরাজয়) দ্বারা বর্ত্তমান আকারে জগতের অবস্থান্তর ও বিচিত্রতার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। রজোগুণ দ্বারা উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ দ্বারা স্থিতি ও তমোগুণ দ্বারা সংহার কার্য্য চলিতেছে। এই যে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পাহাড়-পর্ব্বতাদিবিশিষ্ট স্থূল জগৎটা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থাই কিছু আদিম অবস্থা নহে; ইহারা সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু-পুঞ্জই সম্মিলিত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে। নতুবা স্থূলপদার্থকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কখনই সূক্ষ্মাকারে বিভাগ করা যাইতে পারিত না। ফলতঃ সূক্ষ্ম পরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ দ্বারাই যে, স্থূলপদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসসাধন হইতেছে; সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু পরমাণু সকলের সংযোগ-বিয়োগ হয়, কাহার বলে? নিশ্চিতই প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি নিহিত আছে। এবং সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করিতেছে; আবার বিপ্রকর্ষণ শক্তি দ্বারা ইহারা পরস্পর বিযুক্ত

হইয়া সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইতেছে। উপরে যে পরমাণুর কথা বলিয়াছি, তাহাও পদার্থ সকলের আদিম অবস্থা নহে। পরমাণু সকলকে আরও সূক্ষ্মাকারে বিভাগ করিলে, অবশেষে শক্তি বা গুণ মাত্রে গিয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ বস্তুর যাহা গুণ বা শক্তি, তাহাই সেই বস্তুর আদিম সূক্ষ্মাবস্থা। স্থূল অগ্নির আদিম সূক্ষ্মাবস্থাই হইল, তাহার দাহিকাশক্তি ; স্থূল জলের সূক্ষ্মাবস্থাই শৈত্যগুণ, ইত্যাদি। অতএব বুঝা গেল যে, এই পরিদৃশ্যমান, স্থূল জগৎটা কেবল সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য মাত্র।

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কাহাকে বলে এবং তাহাদের ভবাভিভব-ক্রিয়াই বা কি প্রকার, এখন সেই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—

"তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥
সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বগুণ নির্ম্মলতা, প্রকাশকতা ও নিরুপদ্রবতা জন্য সুখ ও জ্ঞান দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। রজোগুণ তৃষ্ণা ও সঙ্গাভেচ্ছার উৎপাদক অনুরাগযোগে জীবকে কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ

করিয়া থাকে। আর তমোগুণ অজ্ঞানাংশ হইতে উৎপন্ন ও সর্ব্বপ্রাণীর মোহজনক আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। জীবকে সত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে নিযুক্ত করিয়া রাখে। ফলতঃ এই গুণত্রয়ের কার্য্য একই সময়ে সমভাবে সম্পাদিত হয় না। কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ ও কখন তমোগুণ প্রবল হইয়া অন্য দুইটী গুণকে পরাভূত ও নিস্তেজ করিয়া দেয়; অর্থাৎ সত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠিলে রজস্তমোগুণের ক্রিয়া ও রজোগুণ প্রবল হইলে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া এবং তমোগুণ প্রবল হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণের ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া যায়। সত্বগুণের প্রবলতার সময় সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ, রজোগুণের প্রাবল্যে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, মানসিক অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি এবং তমোগুণের প্রবলতার সময় অজ্ঞানতা, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

সত্বাদি গুণত্রয়ের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াপ্রণালী উপরে দর্শিত হইল। এইবার পাঠক! তোমাদের আপন আপন দেহমধ্যে ঐ তিনটী গুণের কার্য্য মিলাইয়া লও। যখন দেখিবে, তোমার দেহমধ্যে ভক্তি বা দয়া বৃত্তির উদ্রেক হওয়ায়, মন প্রসন্ন ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিবে যে, দেহমধ্যে সত্বগুণের প্রবলতা হইয়াছে। যখন দেখিবে, ঘোর অশান্তিতে তোমার মনঃ জর্জ্জরিত, তখন রজোগুণের এবং যখন দেহমধ্যে অবসন্নতা, আলস্য বা নিদ্রাদির ভাব আসিতেছে, তখন তমোগুণেরই প্রবলতা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফলতঃ এই তিনটী গুণের স্বভাবই এই যে, অন্য দুইটীকে পরাভূত করিয়া নিজে প্রবল হইবার জন্য প্রত্যেক গুণই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে এবং উত্তেজক কারণ পাইলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করে। ইহারই নাম গুণত্রয়ের ভবাভিব-ক্রিয়া।

জীবদেহের মধ্যে সত্বাদিগুণের ভবাভিব-ক্রিয়া যে ভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহাই উপরে দর্শিত হইল। বস্তুতঃ কেবল আমাদের দেহের মধ্যে নহে, দেহের বাহিরেও জগৎব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে স্থূল, সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে ঐ ভাবেই ত্রিগুণের ক্রিয়া চলিতেছে। কিন্তু যখন উক্ত প্রকার ভবাভিভব-ক্রিয়া রহিত হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কোন গুণেরই আর প্রবলতা না থাকে, তখন তাহাকে প্রকৃতি বলে।

জগতের আদি কারণ ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতির কথা সংক্ষেপে একরূপ বুঝান হইল। এইবার জ্ঞানময় ও আনন্দময় চৈতন্যের কথা বলিব। শক্তিময়ী প্রকৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব (অবিচ্ছিন্ন) সম্বন্ধ; অর্থাৎ প্রকৃতি ব্যতিরেকে চৈতন্য ও চৈতন্য ব্যতীত প্রকৃতি থাকিতে পারে না। প্রকৃতির কর্তৃত্ব (কার্য্যকারিতা শক্তি) আছে, কিন্তু তিনি নিজে অন্ধ জড় শক্তি মাত্র; আবার চৈতন্য কেবল জ্ঞানময় ও আনন্দময় পদার্থ মাত্র, কিন্তু তাঁহার কার্য্যসাধনা শক্তি কিছুই নাই। তিনি কেবল প্রকৃতির কার্য্যে দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী মাত্র। এই প্রকৃতি-চৈতন্যের সম্মিলিত নামই পরব্রহ্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে যেখানে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, সেই সেই স্থানেই চৈতন্য পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক জীবদেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া যে, চৈতন্য পদার্থ আছেন, ইহা ত আমরা স্পষ্টতঃ অনুভব করিতেই পারিতেছি। পাঠক! তোমার দেহের যে কোন স্থানে যে কোন ঘটনাই হউক না কেন, যে জ্ঞান দ্বারা তৎসমস্তই তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ, সেই জ্ঞানের নামই ত চৈতন্য; অথবা ঐ জ্ঞানটুকুই 'তুমি' বা 'জীব'। জীবদেহ ব্যতীত জগতের যাবতীয় অচেতন জড় বস্তুতে, এমন কি অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতরেও জ্ঞানরূপী চৈতন্য পদার্থের বিদ্যমানতা আছে; নতুবা জগৎকার্য্যের শৃঙ্খলা থাকিবে কিরূপে? অন্ধ জড়শক্তির ত শৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য করিবার সমর্থ নাই। ফলতঃ ঐ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এক মাত্র চৈতন্যর সাহায্য পাইয়াই ত যেটীর পর যেটী হওয়া আবশ্যক, সেই রূপেই জগৎকার্য্য চালাইতে সমর্থা হইতেছেন। এবং সেই জন্যই জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে কোথায়ও তাহার ব্যত্যয় ঘটে না।

এই বিশ্বের যতদূর স্থান ব্যাপিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চলিতেছে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি কেবল তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ আছেন। কিন্তু চৈতন্য অসীম, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তিনি জগতের বাহিরেও সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান। জগৎ তাঁহার একাংশে মাত্র অবস্থিত। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, "হে অর্জ্জুন! আর তোমায় অধিক জানিবার প্রয়োজন

কি? তুমি কেবল ইহাই জানিয়া রাখ, এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশ দ্বারাই ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

বলা বাহুল্য যে, ঐ অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই পরমাত্মা এবং ইঁহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র যথক্রমে কারণ দেহ, লিঙ্গদেহ ও স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকায়, তাহাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ শক্তিময়ী প্রকৃতিই জগতের প্রসূতি বা মাতা এবং চৈতন্যই জগতের পিতৃ-স্বরূপ। গীতাতেও আছে,—

"মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বাযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥"

এই ভগবদুক্তির মর্ম্মার্থ এই যে, "ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার গর্ভাধানের স্থান। আমি তাহাতেই "চিদাকাস" স্বরূপ গর্ভ আধান করিয়া থাকি। এবং সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তৎসমস্তের মাতৃ-স্বরূপা এবং বীজপ্রযোক্তা, আমিই তাহাদের পিতৃস্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া "চিদাভাস" রূপ জীবাত্মাকে দেহবদ্ধ করিয়া থাকে।

উপরোল্লিখিত ভগবদুক্তি দ্বারা যেন কেহ এরূপ না বুঝেন যে, প্রকৃতি ও চৈতন্য পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। প্রকৃতি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি মাত্র। যেমন তোমার দেহ ও দেহান্তর্গত শক্তি অভিন্ন ও পরস্পরকে পৃথক করিবার যো নাই; ইহারাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃতি-চৈতন্যের পরস্পর সম্মিলিত নামই পরব্রহ্ম; এবং একাধারেই মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অথবা স্ত্রীত্ব পুংত্ব দুইই আছে। কেবল অজ্ঞান শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্যই ইঁহাদের পার্থক্য কল্পিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে,—

"সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ॥

শিবঃ * প্রধান পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত এব পরাৎপরম॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্র রূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া॥
দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥"
ভগবতী গীতা।

ভগবতী গিরিরাজকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন "হে মহারাজ! সৃষ্টির নিমিত্ত আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার রূপকে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শিব * রূপে প্রধান পুরুষ ও শিবারূপে (কালী, দুর্গা, রাধিকা ইত্যাদি) পরমা শক্তি হইয়া থাকি। এই শিব-শক্তিযুক্ত পদার্থকেই তত্ত্বদর্শী যোগিগণ পরাৎপর ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। আমি ব্রহ্মরূপে চরাচর জগৎ সৃজন করি; আবার অন্তঃকালে মহারুদ্ররূপে স্বেচ্ছাক্রমেই সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি। হে মহামতে! আমি দুষ্টদমনের জন্যই পরমপুরুষ বিষ্ণু হইয়া এই সমস্ত জগৎ পালন করি।"

প্রকৃতি চৈতন্যময় পরব্রহ্মের কথা মোটামুটি একরূপ বলা হইল; এই বার জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে।

যখন মহাপ্রলয় হয়, তৎকালে সত্বাদি গুণত্রয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ ভবাভিভব-ক্রিয়া রহিত হইয়া সত্বগুণ রজোগুণ, রজোগুণ তমোগুণে ও তমোগুণ মূল প্রকৃতিতে মিশিয়া যায়। সুতরাং তখন এই স্থূল জগতের ধ্বংস হওয়ায়, কেবল সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, প্রকৃতিচৈতন্যময় এক ব্রহ্ম মাত্র বিদ্যমান থাকেন। ব্রহ্মের এই অবস্থার নামই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়াবস্থা। তাহার পর মহাপ্রলয়ের অবসানে কালশক্তির সহায়তায় ও অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবগণের ভোগের সময় উপস্থিত হইলে, ঐ চৈতন্য তদাত্ম্য সম্বন্ধে মূল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়েন। এবং তৎসূত্রেই প্রকৃতিতে প্রথমতঃ গুণক্ষোভ (ত্রিগুণের চাঞ্চল্য ভাব) হয়; তদনন্তর বসন্তসমাগমে নবোদ্ভিন্ন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলের ন্যায় চৈতন্যযুক্ত উক্ত প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব হইয়া

* এখানে 'শিবঃ' শব্দে ঈশ্বর-পদ-বাচ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিকেই বুঝাইবে।

থাকে। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিতা হয়েন। বস্তুতঃ এই আদ্যা-শক্তি মূল প্রকৃতির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র; এবং মূল প্রকৃতির ন্যায় ইনিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও চৈতন্যের সহিত একীভূতা। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি; কিন্তু ইঁহার বিকৃতি আছে। যাহা হউক, তাহার পর ঐ আদ্যাশক্তি হইতে প্রথমেই তমোগুণের আবির্ভাব হইলে, চৈতন্যময়ী অদ্যাশক্তিও সেই তমোগুণে অনুপ্রবিষ্টা হয়েন। তন্ত্রশাস্ত্রে এই তমোগুণ 'মহাকাল' নামে ও আদ্যাশক্তি 'মহাকালী' নামে কথিতা হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা আদ্যাশক্তিকে 'রাধিকা' নামে অভিহিত করেন। তন্ত্রে যে, কথিত আছে, "আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতেই বলপূর্ব্বক বিপরীত রতিতে প্রবৃত্ত হয়েন।" আবার কালীর ধ্যানেও আছে,—

"মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং বিপরীতরতাতুরাম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যা-শক্তি স্বয়ংই অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন।

তাহার পর তমোগুণপ্রবিষ্টা ঐ আদ্যাশক্তি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্বের আর একটী নাম সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্বই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মব্রহ্মা, সূক্ষ্মবিষ্ণু ও সূক্ষ্ম মহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হয়।

এই স্থলে প্রকৃত বৈষ্ণব-মতের সহিত একটা কথার সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, "গোলোকে রাসমণ্ডলে আদ্যা-শক্তি রাধিকা একটী অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। এবং সেই অণ্ড হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব হয়।'' এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্যই এখানে মহত্তত্ত্ব। এবং পূর্ব্বে যে তমোগুণকে "মহাকাল" নামে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তিনিই বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণ; গোলোকে নিত্য রাসলীলা করি-তেছেন। গোলেক শব্দে অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ও রাসলীলা শব্দের অর্থ, বহুরূপা শক্তি সহযোগে সৃষ্টি। শ্রুতিতেও আছে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমর্ত্ততাগ্রে।"

অর্থাৎ অগ্রে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন; পশ্চাৎ তিনিই গুণভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখানে শ্রুত্যুক্ত হিরণ্যগর্ভ, তন্ত্রোক্ত মহাকাল ও বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণ একই পদার্থ; সুতরাং শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। কেবল মানবগণের প্রকৃতি

ও রুচিভেদেই শাস্ত্রভেদ হইয়াছে। কিন্তু ফলিতার্থ সকল শাস্ত্রেরই একরূপ।

তদনন্তর মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে তামসিক অহঙ্কার হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ; আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু; বায়ু হইতে রূপ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ; তেজ হইতে রস-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র হইতে জল; জল হইতে গন্ধ-তন্মাত্র এবং গন্ধ-তন্মাত্র হইতে ক্ষিতির (মৃত্তিকা) উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ।

পূর্ব্বোক্ত তামসিক অহঙ্কার হইতে যে ভাবে আকাশাদি অতি সূক্ষ্মভূত পদার্থের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাজসিক অহঙ্কার হইতেও যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ-শক্তির পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শ-শক্তির পাদেন্দ্রিয় ও তৈজস-শক্তির, পায়ুন্দ্রিয় ও রস-শক্তির এবং উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধ-শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আবার ঐ ভাবেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দ-জ্ঞানের, ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শ-জ্ঞানের, দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপ-জ্ঞানের, রসনেন্দ্রিয় ও রস-জ্ঞানের এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

উপরে যে "তন্মাত্র" শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি নামক পঞ্চভূতের পূর্ব্বাবস্থা, অতি সূক্ষ্ম ভূত মাত্র। পরে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ হইলে, ইহাদের সূক্ষ্মাংশ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল ভূতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্রতাময় স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময় অনুলোমক্রমে যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, আবার মহাপ্রলয়ের সময় বিলোমক্রমে তাহাতেই তাহার লয় হইয়া থাকে। এইরূপে অনাদি কাল হইতে সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই জগৎ মায়াকল্পিত মিথ্যা পদার্থ ও সচ্চিদানন্দময় শক্তিসংযুক্ত অদ্বয় পূর্ণব্রহ্মের বিবর্ত্ত * মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম

* যেস্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি সময়ে পূর্ব্ববস্তুর অন্যথা ভাব হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি ও শব্দ-তন্মাত্রের বিকার আকাশাদি।

ও মরীচিকায় জল-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-শক্তি মায়া কর্তৃক ব্রহ্মেও জগৎ ভ্রম হইতেছে। মায়ার একটী বিশেষণ হইল, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, অর্থাৎ ইনি অঘটনাকে ঘটাইয়া দেন, মিথ্যাকে সত্য ধারণা করাইয়া দেন; ইহাই ইঁহার স্বাভাবিক কার্য্য। যেমন সুনিপুণ বাজিকর ভোজবিদ্যাবলে অসময়ে পাকা আম্র আনিয়া উপস্থিত করে, অথচ বাস্তব-পক্ষে সেটী প্রকৃত আম্র না হইলেও দর্শকগণের দৃষ্টিতে যথার্থ আম্র বলিয়াই ধারণা হয়, তদ্রূপ জীবের মায়াপ্রসূত মনঃ ও বুদ্ধির নিকট মায়াকল্পিত মিথ্যা জগৎও স্বপ্নকালীন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

এইবার উপাস্য উপাসক সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহাপ্রলয়ের অবসানে প্রকৃতি চৈতন্যময় পরব্রহ্ম যখন জগৎসৃষ্টি করণে উন্মুখ হয়েন, তখনই তিনি সগুণ ও ঈশ্বর-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে উপহিত চৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর; এবং অবিদ্যা অর্থাৎ প্রকৃতির মলিন সত্ত্বাংশে উপহিত চৈতন্য অল্পজ্ঞ, অল্পকর্ত্তা ও অল্পশক্তিমান জীব। ফলকথা সমষ্টি-চৈতন্যই ঈশ্বর ও ব্যষ্টি-চৈতন্যই জীব। এই ঈশ্বর যখন রজোগুণাবলম্বী হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মা নামে, যখন সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, তখন 'বিষ্ণু' নামে এবং যখন তমোগুণাবলম্বী হইয়া জগৎ ধ্বংস করেন, তখনি তিনি 'মহেশ্বর' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ একই ঈশ্বর তিন গুণাবলম্বী হইয়া তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।"

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রকৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ। সুতরাং একই আদ্যাশক্তি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিবার সময়ে ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মাণীশক্তি, বিষ্ণুর নিকট বৈষ্ণবীশক্তি ও রুদ্রের নিকট রুদ্রাণীশক্তি রূপে কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। ফলতঃ শক্তি ও চৈতন্য এই উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র একের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। চৈতন্যবিরহিতা হইলে প্রকৃতি যেমন জড়-স্বরূপা হইয়া যান,

---

আবার যেস্থলে এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরের উৎপত্তি হইলেও পূর্ব্ববস্তুর সত্তা বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম বিবর্ত্ত। "জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত" বলিলে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সূচিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব অব্যাহত থাকে।

তদ্রূপ ঈশ্বর-মূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও প্রকৃতি বা শক্তিবিরহিত হইলে শবরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। যথা,—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম॥"

কুব্জিকা তন্ত্র।

অর্থাৎ ব্রহ্মাণীশক্তিই সৃষ্টি করেন, একা ব্রহ্মার সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি শব মাত্র! বৈষ্ণবশক্তিই জগৎ পালন করেন, বিষ্ণুর পালন করিবার সামর্থ্য নাই; তিনিও শব। এবং রুদ্রাণী শক্তিই সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন; রুদ্রও শব মাত্র। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন; শক্তি সমবেত বিষ্ণু পালন করেন এবং শক্তি সমবেত রুদ্রই সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে ইঁহারা সকলেই জড়স্বরূপ হইয়া থাকেন।

ফলতঃ এই সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য; ব্রহ্মের নির্গুণাবস্থা উপাসনার বিষয়ীভূতা নহে। সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপারের নামই উপাসনা। যথা—

"উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপাণি।"

তন্ত্র।

স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি-ভেদে এই ব্রহ্মপদার্থকে কেহ চৈতন্যময়ী প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীদেবতা ও কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ পুংদেবতা ভাবিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বা ইঁহাকে স্ত্রী পুংভাবের অতীত নিরাকাররূপে ধ্যান করেন। সুতরাং এক ব্রহ্মপদার্থই বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু, গোপাল ও কৃষ্ণ প্রভৃতি; শাক্তদিগের উপাস্য কালী, তারা ও ত্রিপুরা প্রভৃতি; সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য; শৈবদিগের শিব; ও গাণপত্যদিগের গণেশ নামে অভিহিত। ফলতঃ যে, যে নামেই উপাসনা করুক, এমন কি স্ত্রী স্বামিকে, পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে যে উপাসনা করে, তাহাতে যদি

ব্রহ্মভাব থাকে, তবে প্রকৃতি-চৈতন্যময় পরব্রহ্মের উপাসনাই সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ভগবদ্‌গীতা।

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, "যে যে ভাবেই আমার উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃতার্থ করিয়া থাকি।"

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে মূলে ব্রহ্মনিরূপণে কোন গোল নাই; কেবল নাম ও রূপ লইয়াই অজ্ঞান লোক ভেদ কল্পনা করিয়া পরস্পর বৃথা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকগণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্রও ভেদবুদ্ধির উদয় হয় না। তাঁহারা আপন আপন ইষ্টদেবের উপর মুখ্য বুদ্ধি রাখিয়াও অন্যান্য দেবতাদিগকে তাঁহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র ভাবিয়া তদনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন। শক্তি-সাধক সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ কি বলিতেছেন, শুন,—

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

"কালি! হলি মা রা[illegible]বিহারী।

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে॥

পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া-বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, অনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-হাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব
যমুনাবারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা-তনু, একই সকল বুঝিতে নারি।"

আবার শুন,—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগন্মনোমোহিনী মা এলোকেশী॥

কালোর গুণ না ভাল জানে, শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব, মহাদেব, কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কালো বরণ, ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী, কৃষ্ণ কালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে, তার মধ্যে কেলে মা মোর্, বিরাজে পূর্ণিমা-শশী॥
প্রসাদ ভণে, অভেদ জ্ঞানে, কালোরূপে মেশা-মেশি।
ওরে, একেই পাঁচ, পাঁচেই এক মন করোনা দ্বেষা-দ্বেষি॥"

পাঠক! এইবার একজন প্রকৃত বৈষ্ণব সাধকের কথা শুন। বৈষ্ণব-সাধক কালী দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া, কালীকে 'হরি' সম্বোধনে কি বলিতেছেন, শুন,—

বাউলের সুর—তাল খেম্‌টা।

"হরি! কই সে মোহন বাঁশরি।
কেন ভয়ঙ্করা, অসিধরা, হলে হে বংশীধারী॥
কি লাগি কেলে সোণা, দিগ্‌বসনা, লোলরসনা, হেরি।
ল'য়ে বনমালা, মুণ্ডমালা, কে পরালে শ্রীহরি॥
কেন পায় রুধিরধারা, পড়ে ধরায়, চরণে ত্রিপুরারি।
হলে কার্ ভাবে ত্রিনয়না শ্যাম! বাঁকা নয়ন সম্বরি।
কি কারণে, মত্তরণে, সুধাপানে, দৈত্যারি॥
আবার চূড়া ফেলে, পড়্‌ছো ঢ'লে, উন্মাদিনীর বেশ ধরি।
কোথায় সব ব্রজাঙ্গনা, গোপললনা, কাননে কি রূপ হেরি।
আবার শ্রীচরণে, পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন রাই কিশোরী॥
(ওহে কাঙ্গালের ধন চিন্তামণি)"

ব্রহ্মপদার্থ স্বরূপতঃ নিরাকার। এবং সে নিরাকার রূপ প্রশান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত যোগীজনেরই ধ্যেয়। আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারী, ঘোর সংসারী মানবের বিষয়কলুষিত মলিন অন্তঃকরণে নিরাকার ধ্যান হইতে পারে না বলিয়াই, ভগবান কৃপা করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট মানবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্যই বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা॥"

অতএব হিন্দু পাঠকগণ! সাবধান, যেন কালী-কৃষ্ণে হরি-হরে ভেদ -বুদ্ধি করিও না। *

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সীতাহাটী।

ঐতিহাসিক ছড়া সংগ্রহ।

(২)

Lieutenant Colonel James Watson (লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল জেমস্ ওয়াট্‌সন) এর অধীনে H. M. 14th Regiment of Food (১৪নং পদাতিক সেনা) বহরমপুর হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে, তৎকালীন বীরভূমের অধীন গোকর্ণে পঁহুছিয়া কান্দী, ছোট কপসা, আকলপুর, সিউড়ী, কৃষ্ণনগর, খয়রা শোল, আফজালপুর অতিক্রম করিয়া ১১ই তারিখে অজয় নদীর পর পারে চুড়ুলিয়ার জঙ্গল মহালে প্রবিষ্ট হয় এবং রামণালা চটী, মোতাইনি, ও বিনো রঘুনাথপুর হইয়া পশ্চিমে চলিয়া যায়। মধ্যে এই সৈন্যদলের সিউড়ী সুরুল, ইলাম বাজার, সোণামুখী ও বাঁকুড়া হইয়া যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু অসুবিধা বশতঃ এই বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হয়। পরে নগর হইয়া দেওঘর, চাকাই, নোয়াদা ও গয়া এই রাস্তাও অসুবিধা জনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কারণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ২০০০ অশ্বারোহী ও পদাতি সহ 'He Highness Amorut Row brother to the Peswah' (পেশোয়ার ভ্রাতা অমারৎ রাও) বারাণসী হইতে বীরভূম হইয়া বৈদ্যনাথ ধাম দর্শনে গিয়াছিলেন; তখন মধ্যে মধ্যে গভীর জঙ্গল ও নালা থাকায়, দেশীয় সৈন্যগণের রাস্তা অতিক্রম করা কষ্টকর হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে আরও কষ্টকর হইবে, ভাবিয়া এই রাস্তাও পরিত্যাগ করিয়া প্রথমোক্ত রাস্তাই সুবিধা জনক বলিয়া গৃহীত হয়।

* এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ ব্রাহ্মণ[illegible]ভরণে উদ্ধৃত "আগম মতে [illegible]র ব্যাখ্যা" নামক প্রবন্ধের ভাবার্থ সঙ্কলনে লিখিত হইয়াছে।

বীরভূমে তখন আর মরিসন সাহেব, সহকারী কলেকটার। তাঁহার অধ্যবসায় গুণে সৈন্যগণের রসদ আহরণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। এবং যাহাতে প্রজাগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয় ও তাহারা রীতিমত রসদের মূল্য প্রাপ্ত হয়, তাহারও বিহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে এতদঞ্চলে সৈন্যসঞ্চালনের প্রথা তত প্রচলিত না থাকায়, তদানীন্তন বীর-ভূমবাসী' অত ইংরাজ সৈন্য দেখিয়া একবারে বিব্রত হইয়াছিল। বলিতে কি, মরিসন সাহেব, বীরভূমের অধিবাসিগণ অধিকাংশ হিন্দু বলিয়া গোহত্যার পরিবর্ত্তে সৈন্যগণের জন্য ৪০।৫০ টি ভেড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ চারি পাঁচ শত সৈন্য আসিবার কথা হয়। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে Assistant Commissary General এর নিকট হইতে খবর আইসে যে, 'H. M. 14 Regiment will not move as originally intended in 2 divisions; but the whole will proceed together amounting to 900 men, exclusive of officers and camp follower's—14 December, 1814. অর্থাৎ অপরাপর লোক ছাড়া ৯০০ শত সৈন্য আসিবে। এই ছড়াটি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

'গোরার কবিতা।'

শুন সবে এক ভাবে বিপত্তের কাজ
জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাজ।
থাকে সব বরমপুরে, ফৌজ জুড়ে, কি দিব তুলনা
এক এক গোরার পিছু, সিপাই তিন জনা।
এমন নয়শ' গোরা, হাতি ঘোড়া, তার তেমন সোয়ারী
নফর চাকর, বেট্‌বেগারী, লিখিতে না পারি।
জাবে সব পশ্চিমেতে, আচম্বিতে, আইল পরওয়ানা
জমীদার লোক শুনে, করিছে ভাবনা।
তারিখ সন ১২২১ সালে অর্দ্ধেক পৌষ মাস
আচম্বিতে শুনে লোকের লাগিল তরাস। ১০

জেলা বীরভোমে, সিউড়ী গ্রামে, জজ সাহেবের থানা
লাটে লাটে জমীদার পাইল পরওয়ানা।
সাহেব ডেকে বলে, রেয়ৎ লোকে, সাবধান হও তোমরা
এই রাস্তা দিয়া জাবে বাদসাই গোরা।
তাদের খোরদানা, জত জমা কর সকল মুদি
জেলাদারে হুকুম দিল কর রাস্তাবন্দি।
হাকিমের হুকুম শুনে, সেনা বেনে, ভাবিছে অন্তরে
ভাবনায় ভাবুচি লাগে ভেকাচুকি ধরে।
বলে ভাই ফৌজ আসিবে, কিবা হবে, বিষম ফৌজের লেঠা
দেখবেক্ যাকে, বান্দবেক তাকে, মানিবেক নাই তারা ॥
দুয়ারে দুয়ারে দিল সিয়াকুলের কাঁটা।
বলে ভাই, পড়লো দায়, রৈতে নারি ঘরে
গরু জরু সকল নয়ে পলায় দোশান্তরে।
পলায় সব কলুমালি, তিলি তামলি, মনে পেয়ে ভয়
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে [illegible]য়।
তাঁতি ভাই তাঁত ছেড়ে, লুকায় তাঁতের গাড়ে।
জমীদার গ্রামে গ্রামে, পেয়দা লয়ে, আনে মণ্ডল ধরি
তোমরা, খাবার খোরদানা দাও, বেট্ আর বেগারি।
লাগিবেক বলদ সগড়, রগড় ঝগড়, না করিহ ভাই
হাঁড়ি কাট পাত খাসি বখ্রি ভেড়া চাই। ৩০
পাবে সব দাম ধরে, লেখা করে, জিনিষ দেহ আনি
চাল ডাল লবণ তৈল ঘৃত আটা চিনী।
বলদের খোরদানা চাই আউড় পোয়াল লাড়া
জিনিষ দিতে কোন কাজের ওজর না করিহ তোমরা
বিষম ফোজের লেঠা—
দুয়ারে দুয়ারে দিল সিয়া কুলের কাটা।
আনালো সূত্রধরে ইজাদারে লাগয়ে কোটাল
রাস্তাবন্দি হবে বাছা কাট গিয়া ডাল।
জাবে সব হাতি ঘোড়া, হাওদা চড়া, বিষম ফোজের লেঠা
জেতে পথে, ঠেক্‌বেক্ মাথে, মার খাবি তু বেটা। ৪০

আনালো কর্ম্মকারে, জারী করে, লাগায়ে কাটাল

গ্রামের ইজাদার।

বলে গোলমেক্ বনায়ে দাও হাজারে হাজার।

একটি জাবীন দাও, ভাল চাও, শুন কামার ভাই

তারিখ সাতাশে পৌষে গোলমেক্ চাই।

তখন কোটাল ডেকে, কেয়ট্ দিকে, আনালো তৎকাল

তারা হেষ্ট মাথে, আস্‌ছে পথে, বুস্তে বুস্তে জাল।

বলে জানছি মনে, মাছ কারণে, ডাকাইলে মোরে।

ইজাদার কৈছে তারে, মাছের তরে, ঘন নাড়ি মাথা

কেয়ট বলে, এত জাড়ে মাছ পাব কোথা।

শুনে উঠলো রেগে, মাছের লেগে, রাখ বেটাকে ধরে

দেখে দাপ, বলে বাপ্, জালে লাগলো গিরে। ৫১

আনালো ফকির যত, দেড়াল তত, সহিত খাদিম

বলে মুরগী কুখুড়ো যাহা দাও তার ডিম।

আনালো ত্বরা ক'রে, পাত নেড়ে, জত মুছলমান

সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।

এম্নি দিবা নিশি, রাস্তায় বসি, করে হিয়া চিয়া

সাতাশে পৌষের কথা সকল হৈল ভূয়া।

করে লোক পিঠা নাটা, চাল কুটা, ফোজের কথা ছেড়ে

ভুপুর দাপুর ধুপুর ধাপুর প্রতি ঘরে ঘরে।

মনে আনন্দ হল, ঘর্‌কে এল, পলায়েছিল যত

পৌষ মাস গত হইল মাঘ উপনীত। ৬১

শুন সব মন দিয়া সর্ব্বজনে মঙ্গলার স্থানে

দেয়ালে পড়িয়া লেখন, ভাবছে মনে মনে।

বলে ভাই এল গোরা, পড়লো ডেরা, সিউড়ী মোকামে

তখন রাইপুর পলায়ে গেল আস পাশ গ্রামে।

লোক সব হল হাবা, হাবা চাবা, লাগ্‌লো সভাকারে

মোট সোট, বান্ধে লোক, খাবার দাবার করে।

এমনি হুচুক হলো, লোক পলালো, ছাড়ি ঘর বাড়ী

আবাল বৃদ্ধ যুবা পলায় ঠেঙ্গা ধরা বুড়ী।

গলায় নাড়া, ব'লে গোরা রৈল ঝুলি ঝালা, জপের মালা
কোরঙ্গ কৌপীন
কেবল মাত্র রসের পাত্র চলিল বৈরাগীন। ৭১
বৈরাগী কৈছে দাপে, নবদ্বীপে, হয়েছিল যে গোরা
নিস্তার করিল জীব শচীর কিশোরা
দিয়া হরি নাম, কৈল ত্রাণ, গৌরচন্দ্র রায়
এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়।
তখন ফৌজ সিউড়ি গ্রামে, সর্ব্বজনে পড়িল ঘোষণা
নফর চাকর বেট্ বেগারী পড়লো তাম্বুখানা।
আগাড়ীর ফৌজ সকল রয় শ্রীকৃষ্ণ নগরে
বীণা বাঁশী, যন্ত্ররাশি, আস্‌ছে ভারে ভারে।
এম্নি অবিরত, আসছে কত, তুড়ুক সওয়ার
কামান গেঠান কত হাজারে হাজার। ৮১
কিবা তারা, আসছে গাড়ী, তার উপরি, দেখতে জেন ঠাঠ,
তাহার উপরে আছে ইংরাজ সর্দা।
কিবা তার রূপের ছটা, বরণ কটা, দেখিতে মাধুরী
কিবা সাহেব, কিবা গোরা, চিনিতে না পারি।
বন্দুকে সঙ্গিন চড়া, আছে গোরা, বিপক্ষ বিনাশে
কটকের পদধূলি উড়িছে আকাশে।
জোধা মোকাম পেয়ে, খানা খেয়ে, কাওয়াজ খেলে তারা
জয়ঢাক, জয় ঢোল বাজে, বাজে রণকাড়া।
বাজে সব তুরী ভেরী, ধো ধো করি, সুমুরালী বাঁশী
গোরা মেলে, কাওয়াজ খেলে, সাহেব দেখে খুসী। ৯১
বাজিছে জগঝম্ফ, মহিকম্প, বাদ্যের বাখান
দুই ভিতে, দুই ছড়ি হাতে, ফিরিছে কাপ্তান।
জত সব ফৌজের গুলি, কহি শুনি, কিছু মাত্র সীমা
ফৌজ দেখিতে শোক পেয়েছে কুখুটার নিমা।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে, কুখুটাতে, জাহার নিবাস
ফৌজের কবিতা কৈল হইয়া উল্লাস। ৯৭

শ্রীশিবরতন মিত্র

সাধু দর্শন।

শীতকালে বড় লাট সিমলা পাহাড় হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করেন। বসন্তের আগমনে কত ফুল ফুটে, চাঁদ হাসে, পাখী ডাকে; সেইরূপ বড়-লাট বাহাদুরের পদার্পণের সঙ্গে সহরে কত রাজা মহারাজা আসিয়া থাকেন। তাহার পর, শীতকাল ইংরাজী বৎসরারম্ভ। ইহাও এক ধূম ব্যাপার। পরন্তু খৃষ্টের জন্মোৎসবও শীতকালে হয়, ইহাও আনন্দের ব্যাপার। আর থাকে সার্কাস, থিয়েটর, মোহন-মেলা, কংগ্রেস, কত কি ব্যাপার এই শীতকালেই হয়। তৎসঙ্গে প্রতিবৎসর সাগর-সঙ্গমে স্নানের জন্য এই শীতকালে কলিকাতায় কত স্থানের সাধু মহাপুরুষেরা আগমন করেন, ইহাঁদের এই মেলার জন্য বিজ্ঞাপন নাই, সংবাদ পত্র নাই, কাজেই ইহা নীরবে নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ইহাও কিন্তু এক মহানন্দের অপূর্ব্ব মেলা। বাক্যহীন এক সাধুর পরিচয় দিতেছি। ইহাঁর সঙ্গে এক শিষ্য, শিষ্যও প্রায় গুরুর মত। দুই জনের পরিধান কৌপিন মাত্র। এই প্রবল শীতেও গা' আগ্‌লা। গায়ে ভস্ম-মাখা। মস্তকে বৃহৎ জটা। মুখ দু'খানি হাঁসি হাঁসি। তাঁহাদের নয়নে কি যেন আছে! গুরু শিষ্য হিন্দুস্থানী এবং সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিলে বেশ বুঝিতে পারেন। এবং তাঁহাদের হিন্দুস্থানী ভাষাও আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম। যাহা হউক, এ প্রবন্ধে তাঁহাদের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বলা হইবে। ইহাঁদের শরীর, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মতে যাহাকে "সুস্থ শরীর" বলা হইয়াছে তাহাই। পরন্তু ইঁহারা যেন সংসারীর "স্বাস্থ্য রক্ষা" পুস্তককে রহস্য করিয়া দেখাইতেছেন! "তোরা ঐ বলিস্, হিম লাগাইও না, খোলা বাতাসে শয়ন করিও না ইত্যাদি। আর আমরা দেখ, উহার বিপরীত পথে দাঁড়াইয়া কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি! অতএব জানিও, জগতের সমন্বয় ভাবেই সৎ আছে!" বস্তুতঃ তাঁহাদের দেহ দেখিলে ঐ কথা মনে হয়। আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন "জগতের মধ্যে বড় কে?" সাধুর শিষ্য উত্তরে বলিলেন" (গুরুকে দেখাইয়া) "উহাঁর অবস্থা ঠিক নাই! বালকের মত হইয়া-গিয়াছেন। উহাঁর কখন জ্ঞান হয়, কখন অজ্ঞান হয়েন। জ্ঞান এবং অজ্ঞান অবস্থা অস্থায়ী ভাবে হয়। পূর্ব্বে ইনি জ্ঞানী ছিলেন, আমার স্বামী উনি।

উহাঁর এই অবস্থা বলিয়া আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়াছেন এবং আনিয়াছেন। আপনাদের উত্তর আমি দিলে হইবে না।" এই বলিয়া তিনি এক মাটীর হাঁড়ী করিয়া জল গরম করিতে লাগিলেন, এবং আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। গুরু ঠাকুরটি চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু গভীর অন্যমনস্ক! যেন এজগৎ ছাড়িয়া, তাঁহার "মন" শূন্যে উঠিয়াছে।

শিষ্য পুনরায় বলিল, "পৃথিবীতে কে বড়, তা' আপনারই বলুন না? আপনাদের ত' এক একটা মন সকলের কাছেই আছে; আমাদের কাছে তাই আছে। সেই যন্ত্র নাড়াইয়া ত আমরাও উত্তর দিব, অতএব আপনাদের কাছেও যখন সেই এক যন্ত্র, তখন না হয়, আপনারই উহা নাড়াইয়া বলুন, আমি শুনি।" বন্ধু বলিলেন, আমাদের যন্ত্রে ও গৎ বাজে না। উত্তরে "তা হয় না, গৎ বাজালেই বাজে। তবে পাত্রানুসারে সুর মিষ্টের কম বেশী হয়।"

প্রশ্ন। আপনারা বড় দামের যন্ত্র; আপনাদের যন্ত্রটা বাজাইয়া বলুন না,"কে বড়?" শিষ্য হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ছোট ছোট যন্ত্রগুলির বাজনা হউক না শুনি। বড় যন্ত্র বাজিলে, লোকের কানে তালা লাগিবে, অনেকে বিরক্ত হইবে। আর দেখুন, নহবতের ছোট বাঁশীর বাজনা শুনে নিদ্রা আইসে, শান্তি আইসে। আপনারা কিছু বলুন, অগ্রে আমি শুনিব, নচেৎ আমি কিছুই বলিব না। কারণ উনি বলিয়াছেন, "আগন্তুকের সহিত কথা কহিবার অগ্রে তুমি যেন উপদেশ দিও না, কারণ উপদেশ দেওয়া গুরুর কার্য্য।" আমি এখন গুরু হই নাই। এজন্য আমি লোকের কাছে তাহাদের উপদেশ শুনি, তৎপরে আমার নিজের মতামত কিছু কিছু বলি। কিন্তু আমার মতামত লোকের ভাল লাগে না, যে উহা শুনে, সেই রাগ করে। আপনারা অগ্রে যেটুকু বুঝিয়াছেন,তাহাতেই বলুন, "কে বড়?" যাহা হউক, অনেক কথার পর, তিনি বলিলেন, সকল সেয়ানারই কথা এক। আমাকে এক ব্যক্তি বলেছিল, "অমুক লোক তোমাপেক্ষা অনেক বড়"; অগ্রে ভাবিলাম, "বয়সে বড়" তাই বুঝি বলিলে। তৎপরে কথার ভাবে জানিলাম, তা নয়, অমুক আমাপেক্ষা বিদ্যায় এবং টাকায় বড়, তাই বলি[illegible]। কাজেই আমি বলিলাম, "তা হতে পারে; নিশ্চয়ই সে আমাপেক্ষা বড়, [illegible]হা স্বীকার করিতেছি, এবং তজ্জন্য তাহাকে দুই শ[illegible] নমস্কার করিতেছি। [illegible]মি যেন জগতে কাহার অপেক্ষা বড় না হই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে লোক তোমা-

পেক্ষা বড় কি না? উত্তরে সে বলিল, "নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা তিনি বড়।"

তোমার বিবাহ হইয়াছে?

"হইয়াছে।"

"সে বড়, ইহা ঠিক জানিয়াছ! তবে এক কাজ কর, তোমার স্ত্রীকে উহার নিকট পাঠাইয়া গর্ভাধান সংস্কারটি করাইয়া লও না, কারণ তাহা হইলে উহা দ্বারা তোমাপেক্ষা বড় ছেলে হইবে এখন!! দেখ, ঐ এক মুটে যাইতেছে, মুটে অপেক্ষা তুমি যে বড়, তাহা আমি দেখিতেছি বটে, কিন্তু এ দেখা আমার ঠিক কি না, তাহাই বিচার্য্য। কারণ ঐ মুটের পর্য্যন্ত বিচার শক্তি আছে। মুটেও এক জনের স্বামী। তুমি বড় বলিয়া উহার স্বামিত্ব পদ টুকু তোমায় দিতে পারে না। তবেই বুঝে দেখ, জগতে "কে বড়?" সকলেই বড়—গুরু নানক বড়—ঈশ্বর বড়।

প্রশ্ন। মিথ্যাবাদী এবং জুয়াচোরে প্রভেদ কি? উহারা ধর্ম্মপথ হইতে কেন স্খলিত হয়?

উত্তরে "ইচ্ছা করিলেই উহারা ধার্ম্মিক হইতে পারে। ধর্ম্ম উহাদের ছাড়ে না। কিন্তু সংসার ধর্ম্মের নিম্ন স্তরে উহারা পড়িয়া যায়। সংসার-ধর্ম্মের মতে মিথ্যা কথার দ্বারা মিথ্যা কার্য্য প্রসব হয়, সেই মিথ্যা কার্য্যের অপর নাম "জুয়াচুরী।" পরোপকার এবং দয়া মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। চুরী কার্য্যের দ্বারা মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে হত্যা করা হয়, কাজেই উহারা নিম্নশ্রেণীর বৃত্তি পায়।

এইবার তাঁহার গুরু ঈষৎ যেন রাগিয়া বলিলেন, "আঃ কি কর! ক্ষুধা পাইয়াছে, এখনো হইল না;—কবে হইবে?" এই বলিয়া তিনি সেই হাড়ীটি ভাঙ্গিয়া দিলেন, উহার জল ধুনিতে পড়িয়া ধুনির আগুণ নিভিল। ইহা দেখিয়া শিষ্য বলিলেন, আপনাদের অদৃষ্টে ভাল হইবে। ইনি কথা কহিতেছেন। এই হাড়ী ভাঙ্গিয়া ইনি আপনাদের এই জানাইলেন যে, জল আগুনের দেহ, ঐরূপ হাড়ীর জলের মত ফুটিতে থাকে, তাহাতে নানা শব্দও উঠিতে থাকে। যতক্ষণ শব্দ উঠে, টগ বগ্ করে, ততক্ষণ মানুষের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে, ভাল মন্দের বিচার থাকে; দেশের পুতুল অপেক্ষা বিলাতী পুতুল ভাল, এ খেলা ঘরের জ্ঞান থাকে, ছোট বড় জ্ঞান হয়, সবই হয়। তাহার পর, জল আগুন ভাঙ্গিয়া এক করিয়া দিলে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আর কোন শব্দ থাকে না। এই দেখুন না, আর হাঁড়ির জলের সে ডাক নাই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

বীরভুমবাসীর কর্ত্তব্য।

বিগত পৌষ মাসের বীরভূমি পত্রিকায় আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, আহমেদ্ সাহেব বাহাদুরের উপদেশানুসারে বীরভূমের জমীদারকুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে পানীয় জলের বিশুদ্ধির সংরক্ষণার্থ কীর্ণাহারে যে গ্রাম্য-সমিতি সংস্থাপনের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, আশা করি, তাহা এত দিনে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। * পানীয় জলের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ শুধু কীর্ণাহার অঞ্চলে নহে, সমস্ত বীরভূম জেলায়, এমন কি, সমগ্র বঙ্গদেশে একান্ত প্রয়োজনীয়। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কিছু অধিক হইলেও অধিকাংশ বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর না হউক, অশিক্ষিত বলিতে হইবে। বিশেষতঃ বীরভূম জেলা এ বিষয়ে অতীব মন্দগতি। এখনও বীরভূম জেলার সদর ষ্টেসনের অনতিদূরেই এরূপ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, যেখানে বিংশতি মাইলব্যাপী গ্রাম সমূহের বালকগণের শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত একটীও মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল নয়নপথে পতিত হয় না।

পূর্ব্বকালে পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিষয়ক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া, এবং তৎকালীন মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া, উত্তম পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। অধুনা সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অথচ বঙ্গদেশের বিশেষতঃ বঙ্গীয় পল্লীসমূহের জলবায়ু দিন দিন এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে তাঁহাদের চিরপ্রদর্শিত উপেক্ষা পরিহারপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া সমবেত চেষ্টায় কার্য্যক্ষেত্রে

* লেখক শুনিয়া হতাশ হইবেন, এ সম্বন্ধে এখনও কিছুই হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্তোষের সহিত সৌরেশ বাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া মেম্বরগণের নাম চাহেন, অনতি-বিলম্বে নাম প্রেরিত হইল। তাহার পর আর ও সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাই না। বীঃ স।

অবতীর্ণ না হইলে বাঙ্গালীর শোচনীয় জীবন ক্রমশঃই শোচনীয়তর হইবে।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই, সুতরাং বীরভূম জেলাতেও, পল্লীগ্রামের বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলার সদরে অথবা তদ্রূপ কোনও সহরে আবাসবাটী ক্রয় বা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করা ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে এবং জমীদার শ্রেণীর মধ্যে রোগবিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, মফঃস্বলের জমীদারগণ কলিকাতাবাসী হইয়া পড়েন। কলিকাতার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জলবায়ুর আকর্ষণেই হউক, বাসোপযোগী অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্তির আশাতেই হউক, অথবা অশেষবিধ আমোদ প্রমোদের প্রলোভনেই হউক, কলিকাতাবাসী জনপদ জমীদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অবশ্যই বিষয় কর্ম্মের সুবিধার জন্য কলিকাতায় অথবা জেলার সদর ষ্টেসনে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করা কোনরূপেই নিন্দনীয় হইতে পারে না। যে প্রজার কষ্টলব্ধ অর্থ দ্বারা জমীদারের কোষাগার পূর্ণ হয়, তাহাদিগের উন্নতিবিধানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিয়া গ্রাম্য বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরে স্থায়িভাবে অবস্থান করা কোনও ক্রমে প্রশংসনীয় নহে।

অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই যদি এইরূপে স্ব স্ব গ্রামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, তাহা হইলে সেই সেই গ্রামের উন্নতির আশা অবশ্যই সুদূরপরাহত। উচ্চ শিক্ষায় যাঁহাদের মন প্রদীপ্ত হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মনস্বীগণের সংস্পর্শে যাঁহাদের মনের উচ্চতা সম্পাদিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য দেশোন্নতিবিধান যাঁহাদিগের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্য স্বরূপ প্রত্যাশিত হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে গ্রামোন্নতি বিধানে পরাঙ্মুখ থাকা কেবল মাত্র কর্ত্তব্যভঙ্গের নহে, পরন্তু অতীব অশিষ্টতার পরিচায়ক। ক্ষোভের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত জেলার সদরে অথবা অপর নগরে বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়েন বলিয়া সচরাচর তথায় স্থায়িভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবিকার্জ্জনের কঠোর পরিশ্রমের পর, অবকাশকালে গ্রামে গিয়া অবস্থান করিলে, স্থান এবং দৃশ্যের পরিবর্ত্তনে ও সরল প্রকৃতি গ্রাম্য সুহৃদ্‌গণের সাহচর্য্যে যে চিত্তবিনোদন হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। শিক্ষিত লোকের সংসর্গে পল্লীবাসীগণের নৈতিক ও ব্যবহারিক উৎকর্ষ ঘটিবার পথ এইরূপে

প্রশস্ত হইতে পারে, এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা বহুবিধ হিতগর্ভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, সংক্ষেপতঃ গ্রামোন্নতি-বিধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এইরূপ গ্রাম্যবাসত্যাগী জমীদার বা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সৌভাগ্যবশতঃ বীরভূমজেলায় এখনও অল্প হইলেও যখন এই অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, তখন ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

যদি মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কেবল মাত্র কীর্ণাহারে বা তদঞ্চলে পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় বিধানানন্তর ক্ষান্ত না হইয়া বীরভূমি জেলার সর্ব্বত্রই ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সর্ব্বথা সুখের বিষয় হইবে। অবশ্যই এবিষয়ে স্থানীয় লোকের সহকারিতা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং জমীদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর নিকটেই এরূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করা যায়। রাজপুরুষগণ সাধারণ প্রজার মঙ্গল বিধায়ক যে প্রস্তাব সমূহ সময়ে সময়ে উত্থাপন করিয়া থাকেন, অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানারূপ কুসংস্কার বশতঃ তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ন্যূনাধিক ৬ বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলা বোর্ডের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফিসার সাহেব বাহাদুর পুরন্দরপুর গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুল ও পোষ্টাফিসের সমীপবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীর জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার অভিলাষে পুষ্করিণীর অধিকারীগণকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং যখন বীরভূম-বাসীর সুকৃতিবশতঃ বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন আশা করি, বীরভূমের চতুঃপার্শ্বস্থ জমীদার ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আনুকুল্যে স্ব স্ব গ্রামে এক একটী সমিতি সংস্থাপন পূর্ব্বক পানীয় জলের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

এই প্রস্তাবিত সমিতির গ্রাম্যবর্ত্মের সংস্কারেও মনোযোগ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের প্রতি অসভ্য, বর্ব্বর প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইলে আমরা প্রায়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদিগের বাসস্থানের কুৎসিত পথ ঘাট ও সাধারণ অপরিচ্ছন্নতা অবলোকন করিলে আমাদিগকে উল্লিখিত আখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানসূচক বিশেষণে বিভূষিত করিতে কোনও সভ্যজাতির প্রবৃত্তি হইবে কি? অরণ্যবাসী আমমাংসভোজী সাঁও-

তাদেরাও নিজ পল্লার মধ্যস্থলে একটী সুপ্রশস্ত বর্ত্ম সর্ব্বদা সযত্নে সুরক্ষিত করে। কিন্তু মনুর বংশধর বেদোপনিষদধ্যায়ী সভ্যতাভিমানী আমরা সুযোগ পাইলেই রাস্তা চাপিয়া বাটী বা প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে, অথবা সুপ্রশস্ত গোপথকে ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক লোপ ঘটাইতে কখনও পশ্চাৎপদ হই না। আমরা এতই অধঃপতিত ও এতদূর স্বার্থান্ধ যে, উল্লিখিতরূপ নীচতা মূলক অকার্য্য দ্বারা সম্যকরূপে প্রত্যবায়ভাগী হইতে কখনও ইতস্ততঃ করি না।

এক পল্লীগ্রাম হইতে অন্য পল্লীগ্রামে শকটাদি লইয়া যাইবার পথ বীরভূমের অনেক স্থলেই একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার অভাব বশতঃ যে কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ। অনেক স্থলেই গ্রাম্য রাস্তা ও গোপথের দুর্দ্দশা এরূপ ভয়াবহ যে, বর্ষার শেষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেও সে সকল পথ ব্যবহার করা অতীব আয়াস-সাধ্য। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে কোনও বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে বাতিকার গ্রামের জমীদার বিশেষের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে আমাকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। পঙ্কিল গোপথে গোযান চক্রের ন্যূনাধিক অর্দ্ধাংশের নিমজ্জন হেতু গোযানের অচলতা, তন্নিবন্ধন শকট হইতে সেই কর্দ্দমাক্ত পথে অবতরণের পৌনঃপুন্য, চারি দণ্ডের পথে চারি প্রহরের ক্ষেপণ, এবং অবশেষে অবসাদভরে শকটচক্রের কায়া মায়া ত্যাগ চিরকাল আমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। বাতিকার যাইতে হইলে একটী ক্ষুদ্র কন্দর অতিক্রম করিতে হয়। আমার কষ্টের সীমা তখনও শেষ হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা আমাদের অসভ্যাবস্থার এবং মানসিক জড়তার চরম দৃষ্টান্ত তখনও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই বলিয়াই হউক, বাতিকার যাইবার পথে এই স্রোতস্বিনী আমার প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। নদীর উভয়কূলে শকটাদির অবরোহণ ও আরোহণের নিমিত্ত কোনও রূপ অবনম্রাভূত স্থল ছিল না। এরূপ দুরাবরোহস্থানে কোন প্রকারে অবতরণ করিয়া যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলাম, কতিপয় সহৃদয় মুসলমানের সাহায্যে শকটের উদ্ধার সংসাধিত না হইলে, ক্লিষ্টশরীরে, ক্ষুধার্ত্ত উদরে, সেই স্রোতস্বতীর জলে সমস্ত রাত্রি তাহার প্রায়শ্চিত্তের সমাধান হইত। বাতিকারের সন্নিহিত নবগ্রামে কতিপয় মুসলমানের সহিত কথোপকথনে অবগত হইয়াছিলাম যে, "দেওয়ানজী" (বাতিকারের জমীদার

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সিংহ) প্রভৃতি ব্যক্তিগণের কর্তৃত্বাধীনে তাহারা অবকাশকালে স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে ঐ সকল রাস্তার আবশ্যকীয় সংস্কার বিধান করিতে পারে। আমার বিশ্বাস, যদি জমীদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রাম্য ব্যক্তিগণের সহিত যথোপযুক্তভাবে মিশিয়া রাস্তাঘাট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করান এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট আর্থিক ও কায়িক সাহায্যের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের অনুগামী হইবে এবং একবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে প্রভূত শুভফল প্রসূত হইবে।

লোপপ্রাপ্ত গোপথগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট বিনা ষ্ট্যাম্পে দরখাস্ত করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দয়ালু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বোধ হয় উপরিউক্ত গ্রাম্য সমিতির দরখাস্ত বিনা ষ্ট্যাম্পে গ্রহণ করিবেন। যদি ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত না করিলে কোনও রূপে কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত অগত্যা তাহাই করিতে হইবে।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে উল্লিখিত সংস্কারাদির পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। অধুনা স্ব স্ব গ্রামে অথবা কতিপয় গ্রাম লইয়া সমবেত ভাবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পথ ঘাটের সংস্কার ও সংযোজন, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংগ্রহ বীরভূমবাসী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির ও প্রত্যেক জমীদারের প্রধানতম কর্ত্তব্য। আমাদের স্বভাবসুলভ জড়তার ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য আমরা ইতঃপূর্ব্বে অযথা অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আর আমাদের এরূপ ভাবে কালযাপন করা উচিত নহে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

কৃষি প্রবন্ধ।

(সঙ্কলিত)

(১)

বীজ পবন বিধি।

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠেতু মধ্যমং স্মৃতং।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধম্॥"

বৈশাখে বপনই শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম, আষাঢ়ে অধম, ও শ্রাবণে অধমাধম

বলিয়া কথিত হয়। বছরের প্রথমে মাটী নূতন হয়। তাহার প্রমাণ চাষের দ্বারা জানা যায়। বৈশাখ মাসে যত জমি চষা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে তদপেক্ষা কম, এইরূপে শ্রাবণ মাসে সে হিসাবে নিতান্ত কম জমিতেই চাষ উঠে। ইহার কারণ ক্রমে মাটী কঠিন হইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মাটী যতই কঠিন হয়, ততই ধান্যাদির বীজ হইতে গাছ হইয়া পুষ্ট হইতে বিলম্ব হয়। একারণ বৈশাখের বুনাই ভাল। খনা বলিয়াছেন;—

"বৈশাখী বুনো। ফলে দুনো॥"

শিশির, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম খাইয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিও নূতন হয়। শীত, তাপ, বায়ু ও বৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পৃথিবী নূতন শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই নূতন শক্তি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহার ফলোৎপাদিকা শক্তি নিশ্চয়ই অধিক হয়।

"বৃষান্তে মিথুনাদৌ চ ত্রীণ্যহানি রজস্বলা।
বীজং ন বাপয়েত্তত্র জনঃ পাপাশ্বিনশ্যতি॥

বৃষের (জৈষ্ঠের) অন্ত ও মিথুনের (আষাঢ়ের) আদিতে তিন দিবস পৃথিবী রজস্বলা হয়েন। ঐ সময় বীজ বপন করিবে না, করিলে বিনষ্ট হইবে।

অন্য মতে :—

"মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্র পাদেঽম্বুবাচী।
ভবতি ঋতুমতীক্ষ্মা ভাস্করে ত্রীণ্যহানি।
যদি বপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্র মাসাদ্য বীজং।
ন ফলতি ফললাভো দারুণ শ্চাহ কালঃ॥"

বরাহ সংহিতা।

মৃগশিরা নিবৃত্ত হইয়া রৌদ্রপাদ আরম্ভ হইলে (আষাঢ়ের) তিনি দিন পৃথিবী ঋতুমতী হয়েন। উহাকে অম্বুবাচী বলে। ঐ কাল দারুণ সময় জানিবে। অম্বুবাচীতে যদি কৃষক ক্ষেত্র মধ্যে বীজ বপন করে, তবে তাহা নিষ্ফল হয়।

* * * * *

রোপণ বিধি।

"রোপণার্থন্ত বীজানাং শুচৌ বপন মুত্তমম্।
ঃ শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধম্॥"

রোপণের জন্ম যে বীজ, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করাই উত্তম; শ্রাবণ মাসে অধম, আর ভাদ্রে অধমেরও অধম।

"বৈশাখী বাওয়া জ্যৈষ্ঠের জাওয়া
আষাঢ় রোওয়া, শ্রাবণে গাওয়া।"　　(খনা)

বৈশাখ মাসে বপনের পর গাছ বাহির হইয়া যাওয়াকে বাওলা বা বাওয়া বলে। জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ জন্য যে বীজ বপন করা হয়, তাহার গাছ বাহির হওয়াকে জাওলা বা জাওয়া কহে। আষাঢ় মাসের রোপণকে রোওয়া ও শ্রাবণ মাসের গাছানকে গাওয়া বলে। যদি এইরূপ হয়, তবেই চাষ ভাল হয়। সময়ে সবই ভাল আর অসময়ের কৃষি কষ্টসাধ্য এবং তাদৃশ ফলদায়কও নহে।

"বপনে রোপণে চৈব বারযুগ্মং বিবর্জ্জয়েৎ।
মূষিকাণাং ভয়ং ভৌমে শলভকীটয়োঃ॥
ন বাপয়েত্তিথৌ রিক্তে ক্ষোণে সোমে বিশেষতঃ।
এবং সম্যক্ প্রযুঞ্জানঃ শস্যবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

বপনে ও রোপণে শনি মঙ্গলবার ত্যাগ করিবে। মঙ্গলবারে মূষিকের ও শনিবারে শলভ (পতঙ্গ) ও কীটাদি ভয় হয়। আর রিক্তা তিথিতে বিশেষতঃ সোম মঙ্গলবার হইলে কদাচ বপন করিবে না। এরূপ হইলে নিশ্চয়ই শস্য বৃদ্ধি হয়।

*　　*　　*　　*　　*

"বপনহ্ রোপণঞ্চেব বীজংস্যাদ্বভয়াত্মকম।
বপনং গদ নির্ম্মুক্তং রোপণং স গদং বিদুঃ॥
ন বৃক্ষরূপ ধান্যনাম্ বীজাকর্ষণ মাবরেৎ।
ন ফলাস্ত দৃঢ়বীজা বৃক্ষা কেদার সংস্থিতাঃ॥
হস্তাগুরু কর্কটে চ সিংহে হস্তার্দ্ধ মেবচ।
রোপণং সর্ব্ব-ধান্যা নাং কন্যায়ং চতুরঙ্গনম্॥"

বপন এবং রোপণ এই উভয় প্রকারেই বীজের আবাদ করা যায়। বপন করিতে হইলে জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, যেন সোঁতা না হয়। আর রোপণের জমি জল ও কাদাযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে ধান্য গাছ শক্ত বা যাহার গোঁড়ার পাব হইয়াছে, এরূপ গাছাল বীজ লইবে না। গাছাল বীজ ও বীজক্ষেত্রের আইল পার্শ্বস্থ গাছবীজে ভাল ফল হয় না।

শ্রাবণে এক হাত অন্তর, ভাদ্রে আধ হাত অন্তর, বরং আশ্বিনে চারি আঙ্গুল অন্তর রোপণ করাই রীতি।

"কোল পাতলা ঘন গুছি।
লক্ষ্মী বলে ঐখানে আছি॥" (খনা)

রোপণ করিবার সময় বিবেচনা পূর্ব্বক গুছি গুলিতে ধানের গাছবীজ কিছু বেশী করিয়া দেওয়া হয়। রোপণ করাইলে যদিও কোল পাতলা হয়, তথাপি তাহাতে প্রচুর ধান্য জন্মে।

মদিকা দান বিধি।

বীজস্য বপনং কৃত্বা মদিকা তত্র দাপয়েৎ।
বিনা মদি প্রদানেন শস্যজন্ম ন জায়তে॥

বীজ পবন করিয়া তাহার উপর মই দিবে। বিনা মইয়ে ধান্যাদি ভাল জন্মে না। দাবিয়া মই দিলে মৃত্তিকার তেজ বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত ধান্যাদিকে ঝাড়িয়া বাহির করিয়া দেয়। এবং মৃত্তিকার তেজ আবদ্ধ থাকায়, মৃত্তিকা মধ্যস্থ ধান্য গাছের মূলে তেজ প্রদান করে। উহাতে ধান্য সত্বর বর্দ্ধিত হওয়ার আহার পায়। এতদ্ব্যতীত মই দ্বারা মাটী সমান, ও তৃণাদিও অনেক পরিমাণে জব্দ, ও ক্ষুদ্র ঘাসের অঙ্কুর বা চারাত সমূলেই নষ্ট হইয়া যায়। জমি ভিজা থাকিলে কদাচ মই দিবে না। যোয়ে মই দেওয়াই নিয়ম।

কৃষক, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

মাট কড়াইয়ের চাষ।

(২)

মাট কড়াই এক প্রকার ক্ষুদ্র মূল বিশেষ। আমেরিকা মহাদেশ ইহার প্রথম জন্মস্থান। তথা হইতে ইংরাজি ১৭১২ সালে বিলাতে সর্ব্বপ্রথম ইহার চাষ আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা যে ভারতবর্ষে এ চাষ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার চাষের ভূমির পরিমাণ অল্প নহে। বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজি ১৮৮৪ সালে এক মান্দ্রাজ প্রদেশেই দুই লক্ষ কুড়ি হাজার চারশত বিঘা জমীতে মাট কড়াইয়ের চাষ হইয়াছিল, এবং ঐ সনে নাগারি নামক একটা সামান্য রেলওয়ে ষ্টেসনে ৯[illegible] হাজার মণ মাট কড়াই বোঝাই হইয়াছিল। আরও এই মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতেই ১৮৪৮ সালের এই মাট কড়ায়ের তৈল প্রথম বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহার ব্যবহার এত

বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, যে ফ্রান্স দেশের "অলিভ" বা "জলপাই" তৈলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই চাষ যত বৃদ্ধি হইবে ততই মঙ্গল।

মাট কড়াইয়ের উপকারিতা।

মাট কড়াই হইতে প্রধানতঃ ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ বিশিষ্ট তৈল বাহির হয়। এই তৈল দেখিতে বেশ পরিষ্কার এবং অনেক দিন রাখিয়া দিলেও নষ্ট হয় না। মাট কড়াই তৈল (বাদাম তৈল নামেও অভিহিত হয়) ঔষধের জন্য, সুতা, কাপড় ইত্যাদির কল পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান ও মিঠাই করিবার জন্য বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বালানি কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ গুণ ইহাতে কালি পড়ে না। ফ্রান্স দেশে মাট কড়াই ও জলপাই তৈল লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে মাট কড়াই ভাল বলিয়া জানা গিয়াছে। হিন্দুস্থানীরা ডালা মাথায় করিয়া রাত্রে পথে পথে হাঁকিয়া যে "চানাচুর" বিক্রয় করে, তাহার প্রধান উপকরণ এই মাট কড়াই। ইহার খইল বলদ প্রভৃতির উত্তম খাদ্য এবং জমীর পক্ষেও উত্তম সার। শুকনা গাছগুলি গরুকে খাওয়াইলে গরু দুগ্ধবতী হয়। এইরূপ মাট কড়াই হইতে অনেক প্রকার উপকার হয়।

চাষ।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টি হইলেই জমিতে বেশ করিয়া চাষ দিবে, এবং যত দিন না বীজ বপন করা হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে আগাছা সকল তুলিয়া ক্ষেত্রটীকে পরিষ্কার রাখিবে। যে জমিতে ক্ষার ও চুণের ভাগ বেশী থাকে, তাহাতে মাট কড়াই ভাল উৎপন্ন হয়। পচা গোবরের সার যত অধিক পরিমাণে ক্ষেত্রে ছড়ান হইবে, ততই ফসল বেশী হইবে।

আষাঢ় মাসের শেষ কিম্বা শ্রাবণ মাসের প্রথমে অথবা বৃষ্টি না হইলে শ্রাবণের শেষে জমি আর একবার বেশ করিয়া চাষ করিয়া বীজ বপন করিবে। ভূমি উর্ব্বরা হইলে খুব পাতলা করিয়া এবং অনুর্ব্বরা হইলে খুব ঘন করিয়া বীজ বপন করা উচিত।

বপনযোগ্য বীজগুলি বেশ ভারি ও পুরন্ত শুঁটি যুক্ত হওয়া চাই। প্রথমতঃ বীজগুলি লইয়া দিবা ভাগে রৌদ্রে ও রাত্রিতে শিশিরে চার দিন রাখিবে, তাহা হইলে বীজে পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকিবে না। পালংশাকের বীজ যেরূপ পাত্রে ছাই দিয়া রাখিয়া তদুপরি খড়কুটা চাপা দেওয়া হয়, তদ্রূপ করিবে, বেশীর ভাগ উক্ত খড় কুটার উপরি খানিক

গোময় দিয়া পাত্রের মুখটি বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় ৩।৪ দিন রাখিয়া শুঁটি গুলিকে বাহির করিয়া খুব সাবধানের সহিত খোসা ছাড়াইতে হইবে। উপরকার কঠিন আবরণ সহিত পুতিলে অনেক 'কলা' বাহির হয়। কিন্তু কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া বীজগুলি বাহির করিবার সময় দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন কটা রংয়ের পাতলা ছালটী উঠিয়া না যায়। তাহা হইলে আর অঙ্কুর বাহির হইবে না। তিন বিঘা জমীতে বপন করিতে ৩০ আড়ি বীজ লাগিবে।

বীজ পোতা হইলে ইহাকে দুইটী শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করার বিশেষ আবশ্যক; নতুবা সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে। প্রথম দিবাভাগে কাকে ক্ষেত্র হইতে সমস্ত বীজ বাহির করিবে, দ্বিতীয়তঃ রাত্রে শৃগালের উপদ্রব। প্রথমটীর জন্য জমির মধ্যস্থলে একটী বংশদণ্ডে মৃত কাক কিম্বা তাহার ডানা বাধিয়া রাখিবে, দ্বিতীয়টীর জন্য—রাত্রে পাহারা দিবে। বেশী দিন থাকিতে হইবে না, চার পাঁচ দিনের মধ্যে অঙ্কুর বাহির হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে, তখন কোন ভয়ের কারণ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে জমি শুষ্ক হইলে জল দিবে। মাঘ ফাল্গুন মাসে গাছ গুলি শুকাইতে আরম্ভ করে। তখন কতকগুলি শুঁটী তুলিয়া পরীক্ষা করিবে। যদি শুটী শক্ত হয় ও ভাঙ্গিলে কুচিকুচি হইয়া যাঁয়, এবং দানার উপর ঈষৎ লাল বর্ণের ছাল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জানিবে ঠিক হইয়াছে।

মাটকড়াই তুলিবার নিয়ম :—

সন্ধ্যাবেলা একবার জমি অল্প ভিজাইয়া দিয়া, পরদিন গাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিবে। পরে ছোট খুন্তি কিম্বা নিড়ান দিয়া মাটী খুঁড়িয়া শুঁটিগুলি বাহির করিবে। পরে গাত্রস্থ মৃত্তিকা পরিষ্কার করিয়া বিক্রয়ার্থ উহা যথা ইচ্ছা প্রেরণ করা যাইতে পারে। (বলিতে ভুলিয়াছি মাটকড়াইয়ের শুঁটী জমীর উপরে না হইয়া আলুর ন্যায় মাটীর ভিতরে জন্মায়)। যাহা হউক, এখানে ১২৯২ সালের কৃষি গেজেট হইতে ইহার আয় ব্যয় উদ্ধৃত হইল।

তিন বিঘা জমীতে মাট কড়াই চাষ করিতে কম বেশী যে খরচ পড়ে, তাহার হিসাব :—

৬ বার লাঙ্গল দিবার খরচ ... ... ৪।।০
২৪ গাড়ি সার দিবার খরচ ... ... ৬৲

৩৫ গাড়ি বীজের মূল্য	...	...	...	৩॥০
বপনের খরচ	...	...	...	১।০
দুইবার হাত দিয়া নিড়ানের খরচ	...	...	...	২।০
জল সেচন খরচ	...	...	...	৮৲
জমীর খাজানা	...	...	...	৪৲
কুলির মজুরি বা আধ গাড়ি পরিমিত ফসলের মূল্য	...		...	১৭॥০
		মোট খরচ		৪৫৲

ফসলের হিসাব :—

৩ বিঘা জমীর উৎপন্ন প্রায় তিন গাড়ি কড়াইয়ের মূল্য—(৩৬/০ মণ)	১০৫৲
৫৬ মণ খড়ের (শুষ্ক গাছের) মূল্য—	১০৲
মোট—	১১৫৲
খরচা বাদ কৃষকের আয়	৭০৲

প্রতিবাসী, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

অমৃত তুসনিকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আর কহি যুন মনের কল্পনা কর দুর।
কল্পনা কৈতব দেহে হয়ত অযুর॥
আর এক য়াছে দেহে মায়া মুগ্ধ জনা।
সংসার ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলে বঞ্চনা॥
এ সব কহিব পরে এবে যুন য়ার।
অংসরূপে মহাবিষ্ণু সকলে বিহার॥
বৃন্দাবন বেহার আর গোচারণ লিলা॥
বাসুদেব দ্বারে ইহা সকল করিলা॥
প্রকট বেহার পুর্ন্ন জত বৃন্দাবনে।
কেবা কবে কার দ্বারে কেহু নাহি জানে॥
বৃন্দাবনে নন্দ যুত পুর্ন্ন সাস্ত্রে কয়।
ইহাতে সন্দেহ চিত্ত আমার অঁাছয়॥
বসুদেব পুত্র থুঞা গেল নন্দঘরে।
এই কথা সর্ব্ব সাস্ত্রে [illegible]নয়ে সংসারে॥

পুর্ন ভগবান য়বতার জেহ কালে।
অংস রূপে বিষ্ণু আসি সব তাহে মিলে॥
ইহার সিদ্ধান্ত এক যুন স্থির হঞা।
ক্ষগাক্ষগ লক্ষত্র তিথি তাহে মিসাইঞা॥
ভাদ্র য়ষ্টমি যুক্ল পক্ষ জান দুই ক্ষগ।
সময় জানিঞা দুহে হইলা সংজোগ॥
দৈবকি নন্দ জেহো য়াইলা বৃন্দাবনে।
জসদা যুতিকা মধ্যে তাহার গমনে॥
চদ্ধ্য দণ্ড রাত্তি সেসে তাহার গণন।
সেইক্ষণে মেঘে বিদ্যুত কৈল আকর্ষণ॥
লবিণ মেঘেতে জৈছে সোদামিনি খেলে।
সেই মত বিষ্ণু দেহে মদন সেবুলে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
বিষ্ণু দ্বারে করে সব জগত পালন॥
যুর্য্যের কিরণে জৈছে ব্রহ্মাণ্ড জলে স্থলে।
এই মত ভগবান সর্ব্বজিবে বুলে॥
আর এক অপূর্ব্ব কথা শুণ স্থির হঞা।
না কর প্রকা·ফরেথ হৃদএ ভরিঞা॥
মহাতেজ পুর্ন ম·ন ফেরে বৃন্দাবণে।
অন্নে নাহি জানে ইহা রাধিকা সে জানে॥
আর এক রহস্য কথা যুণ সর্ব্বজণে।
বৃন্দাবণে রাসলিলা করে দুই জণে॥
রাধাকৃষ্ণের নহে না জানে গুপিগণে।
কেবা এই নিত্ত বাস করে কার সণে॥
ইহার সন্দেহ মোর খণ্ডাহ কৃপা করি।
তব মুখে এই বাক্য সুনিব বিস্তারি॥
মদন মহন মথন করে জেই জন।
তার সঙ্গে করে বাস নবিন মদণ॥
বর্ন ভেদে জান তত্ত সিদ্ধান্তের সার।
অন্তরে বুঝিয়া রেখ্য না কর বিস্তার॥
রকারে রাধিকা রক্ত বর্ন সেই হয়।
ক:কারে কন্দর্প বিন্দু বিদ্যুত রূপি তায়॥
যেই দুই করে বাস আর নিজ নিত্য লিলা।
তে কারণে লিলা রাধাকৃষ্ণ না জানিলা॥ (ক্রমশঃ)

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২য় ভাগ]　　আষাঢ়, ১৩০৮।　　[৯ সংখ্যা।

৺কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অদ্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট, বীরভূম নিবাসী একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিব। ইনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু তিনি নিজে রচনা করিয়া নিজের প্রাণেই তৃপ্তি লাভ করিতেন, অপরকে শুনাইয়া বাহাদুরী লইবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। সেই জন্য তিনি এত দিন জনসাধারণের নিকট অপরিচিত। এমন কি, তাঁহার বন্ধু-বর্গের মধ্যেও অনেকেই তাঁহার এতগুলি সুন্দর সুন্দর গীত রচনার কথা আদৌ জানিতেন না। এই সঙ্গীত-রচয়িতার নাম কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের অন্তর্গত মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে আপন মাতামহ গৃহে সন ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, তৃতীয় দিবসে সূতিকাগারেই তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়; সুতরাং তিনি মাতামহীর যত্নে আশৈশব প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কল্সা নামক গ্রামে কালীপ্রসন্নের পিতৃ ভবন। পিতা ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুরে কোন গদীয়ানের পক্ষে মহরীর কর্ম্ম করিতেন। কালীপ্রসন্ন, তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর আদ্যজাত সন্তান। শ্বশুর কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ ও কালীপ্রসন্নের প্রতি মমতা বশতঃ, ক্ষেত্রনাথ, কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ক্ষেত্রনাথের, সত্যপ্রসন্ন, নিত্যপ্রসন্ন ও দুর্গা-প্রসন্ন, এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানটি শৈশবেই

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় উভয়েই সুশিক্ষিত—সত্যপ্রসন্ন বীরভূম জজ কোর্টে ওকালতী ও নিত্যপ্রসন্ন সিউড়ী মিউনিসিপাল আফিসে চাকুরী করেন।

কিছু কাল পর, মাতামহ কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, কালীপ্রসন্নের মাতামহী কালীপ্রসন্নকে লইয়া সিউড়ীর দক্ষিণ, অদূরবর্ত্তী আড্ডাহা নামক গ্রামে স্বীয় পিতা পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের সিউড়ীতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সুবিধা হইল—প্রত্যহ চারি মাইল পথ হাঁটিয়া সিউড়ী যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

কালীপ্রসন্নের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি সিউড়ী বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আবশ্যকীয় পুস্তক ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইলে তিনি সিউড়ী আফিসের পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই পুস্তক সমূহের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

কালীপ্রসন্নের মেধাশক্তি প্রবল ছিল; সেই জন্য অতি অল্পকাল মধ্যেই স্কুলের একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া শিক্ষক ও তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বনামখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর স্নেহময় সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। বাবু দ্বারকানাথ তাঁহাকে আপন শিশু পুত্র ও কন্যাগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। কালীপ্রসন্নও এই অভয় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে কালীপ্রসন্ন আমৃত্যু দ্বারকা নাথ বাবু বা তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেরই সমধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন।

বাঙ্গালা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চারি টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বীরভূম জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পাঁচ বৎসর মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন স্কুলে সর্ভে শিক্ষা করিতে হইত। কালীপ্রসন্ন এ বিষয়ে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত সিউড়ী মিউনিসিপালিটির ম্যাপ এখনও মিউনিসিপাল আফিসে রক্ষিত আছে।

এই সময় কেন্দুয়া-নিবাসী নবীনচন্দ্র গোস্বামীর কন্যার সহিত কালী-প্রসন্নের বিবাহ হয়, কিন্তু এই স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কালীপ্রসন্নকে F. A. পড়াইবার জন্য বাবু দ্বারকানাথ বিশেষরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে শুধু অর্থ সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ পত্র দিয়া তাঁহার বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু কলিকাতার জল বায়ু আদৌ সহ্য না হওয়ায় কালীপ্রসন্নকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হয়।

এ দিকে অর্থের অনাটনে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতামহীর সাগ্রহ অনুরোধে বৎসর মধ্যেই তাঁহাকে কাটোয়ার নিকট নওয়াপাড়া নিবাসী যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে। শিশু ভ্রাতাগুলির অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত; মাতামহী ও তাঁহার পিতা পরেশনাথ তখনও বর্ত্তমান। ফলতঃ পোষ্য সংখ্যা অল্প নহে। এই দুঃসময়ে বাবু দ্বারকানাথের অনুগ্রহে তিনি বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই চাকুরীতে তিনি আস্থাবান ছিলেন না, অর্থের দারুণ অনাটন হওয়াতেই তিনি ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময় জমীদার বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,সিউড়ী হইতে দিবাকর নামক সাপ্তাহিক পত্র ও 'শব্দ জ্ঞান কল্পদ্রুম' নামক অভিধান প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন স্কুলের শিক্ষকতা ব্যতীত, দক্ষিণাবাবুর শিশু সন্তান গুলিকে গৃহে শিক্ষাদান এবং পত্রিকা সম্পাদন ও অভিধান সঙ্কলনে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই জন্য তাহার অর্থের অভাবও কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইত। কালীপ্রসন্ন এইরূপে সিউড়ীর দুই সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলেন।

পাঁচ বৎসর বাঙ্গালা স্কুলে চাকুরী করার পর, প্রধান শিক্ষকের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি তাহা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিলেন—বিশেষতঃ পূর্ব্বাবধি তাঁহার এই কার্য্যে আদৌ আস্থা ছিল না। এদিকে দক্ষিণা বাবুরও প্রেস বন্ধ হইয়া গেল।

তদনন্তর, তিনি কুণ্ডলার অন্যতম জমীদার নবদ্বীপেন্দু বাবুর নিকট ৩ বৎসর কার্য্য করিলে, সিউড়ী জিলা স্কুলে অস্থায়ীরূপে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কার্য্যকাল ফুরাইলে, সিউড়ী ফৌজদারী আফিসে কিছু দিন শিক্ষানবীস স্বরূপ থাকিয়া, মিউনিসিপ্যাল আফিসে

২৫্ টাকা বেতনে টেক্স দারোগা ও খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন।

১৩০২ সাল, অগ্রহায়ণ মাসের উষাকালে, কালীপ্রসন্নের শয়ন গৃহের দ্বারে একটী ক্ষিপ্ত কুক্কুর অপর একটী কুকুরকে মারিয়া তাহার উপর রক্তমুখে বসিয়া আছে। কালীপ্রসন্ন যেমন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিবেন, অমনি কুক্কুরটী নিমেষ মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও দক্ষিণ হস্ত, হাঁটু ও স্কন্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। কালীপ্রসন্ন ইত্যবসরে সেই ক্ষিপ্ত কুক্কুরটীকে ধরিয়া তাহার উপর বসিয়া চাপিয়া ধরিলেন। ইতিমধ্যে, তাঁহার ভ্রাতারা আসিয়া তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু পাছে অপর কাহাকেও কামড়াইয়া দেয় বলিয়া তিনি কুক্কুরটীকে একবারে না মারা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন না। ধন্য সহিষ্ণুতা! কিয়ৎক্ষণ পর তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং ৩ দিন ক্রমাগত ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিলে পর খাঁকীবাবার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আপাততঃ বেশ আরোগ্য লাভ করিলেন। তাহার পর, তিনি রীতিমত আফিস যাতায়াত করিতেন।

এইরূপে ৩ মাস কাটিয়া গেল, ১৫ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহার উরুস্থলে বেদনা অনুভব হইয়া জ্বর হয় এবং ১৬ই প্রাতঃকাল অবধি জলাতঙ্কের সূত্রপাত হয়। এত দিনের মধ্যে তিনি একদিনও স্নান করেন নাই; কিন্তু অদ্য শরীরে বিষম জ্বালা অনুভব হওয়ায় জল সিঞ্চন করিলেন, তাহাতে অসুখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। ১৭ই সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিতে পারিলেন এবং দুই ভ্রাতা সত্য ও নিত্য, স্ত্রী প্রভৃতি সকলকে একত্র করিয়া 'গুরু' ও 'কালী' নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, এক পোয়া আন্দাজ জল গলাধঃকরণ করিলেন। কিন্তু তখন জলাতঙ্ক নাই। গৃহে, নবদ্বীপ হইতে আনিত দেব দেবীর পট, গুরুর পাদুকা ও শিবাদির পূজা, সজ্ঞানে বসিয়া সমাপন করতঃ সকলকে 'কালী কালী,' 'গুরু গুরু' বলিতে নির্দ্দেশ করিলেন এবং নিজে সত্যপ্রসন্নের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। দোল পূর্ণিমা, গ্রহণ মুক্ত হইতে তখনও পাঁচ ছয় মিনিট বাকী আছে, এমন সময় তাঁহার নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া একেবারে রোধ হইয়া গেল—বদন হইতে 'কালী' 'গুরু' শব্দ আর পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত না হইয়া অভ্যন্তরে

বিলীন হইয়া গেল—কালীপ্রসন্নের মস্তক শ্লথভাবে ভ্রাতৃক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল।

কালীপ্রসন্ন এইরূপে অকালে ৪১ বৎসর বয়সে একটীমাত্র শিশুসন্তান, বিধবা স্ত্রী ও ভ্রাতাদিগকে কান্দাইয়া তাঁহার বহু আকাঙ্খিত 'নিত্যধামে' চলিয়া গেলেন।

কালীপ্রসন্নের বংশ তালিকা যথা—১১ দৈবকিনন্দন, ১০ লোকনাথ, ৯ বল্লভ, ৮শ্রীরাম, ৭ রাজেন্দ্র, ৬ হরেকৃষ্ণ, ৫ কৃষ্ণকান্ত, ৪ রামজয়, ৩ রামধন,

২ ক্ষেত্রনাথ।

১মা স্ত্রী, কর্ত্তিকচন্দ্রের ১মা কন্যা   ২য়া স্ত্রী, কার্ত্তিকচন্দ্রের ২য়া কন্যা।

১ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।   শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

২ শ্রীনৃসিংহ হরি মুখোপাধ্যায়।   নিত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার কুলগুরুর মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসী স্বামী দুর্গানন্দ স্বরস্বতীর নিকট তিনি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে দৈনিক দুই একটী করিয়া গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্র গ্রহণের পর মোটে তিনি ৩ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দুই কিম্বা আড়াই ঘণ্টা নিদ্রার পর সমগ্র রাত্রি গৃহাভ্যন্তরে জপ ও সাধনা করিতেন। তাঁহার শিষ্য ভ্রাতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী স্থাপিত পানুড়িয়া ও চাকদহ গ্রামের হরি-সভায় তিনি নিয়মিত রূপ বক্তৃতা করিতেন ও সাধারণ গ্রামবাসীদিগকে ধর্ম্মোপাদেশ প্রদান করেতেন।

গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও কালীপ্রসন্ন স্বয়ং তত ভাল গায়ক ছিলেন না; তবে তিনি সুন্দররূপ বাজাইতে পারিতেন। উচ্‌করণ নিবাসী কালী-চরণ রায় প্রভৃতির ন্যায় দেশ বিখ্যাত গায়কগণ, তাহার নিকট গীত রচনা করাইয়া লইতেন।

কালীপ্রসন্নের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল,—তিনি সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাড়ী জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম ছিল।

এই কয়েকটী মাত্র কথা, কালীপ্রসন্নের বাহ্যিক দরিদ্র-জীবনের ক্ষুদ্র

ইতিহাস। জীবনে বিশেষ কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, কেবলমাত্র দারিদ্র্যের সহিত নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের দারুণ অশান্তি। কিন্তু এই সংগ্রামে কে জয়ী হইয়াছিল, পাঠকগণ, কালীপ্রসন্নের রচিত সঙ্গীতাবলী হইতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অর্থহীন জীবনের কি সুন্দর চিত্র দেখুন।

বাউলসুর।

১। অর্থহীন জীবনে কি কাজ আছে।

২। তার কি কাজ বেঁচে।

৩। অর্থ নাই কাছে, কেবল নাম আছে, যেমন থাট সাড়ী কুলবালায় ব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

৪। যার হাতে অর্থ নাই, কেউ কথা কয়না ভাই, লক্ষ্মী ছাড়া বাড়া পাপ আর সংসারেতে নাই; ধর্ম্মকর্ম্ম গণ্য মান্য অর্থের পাছু সব গেছে।

৫। অর্থহীনের সংসারে সুখ নাই, মুখে অযাত্রা সদাই, মায়ে নিন্দে লজ্জাভয়ে ভাই বলেনা ভাই; পুত্র কন্যা কাছে যায় না আদর নাই বাপের কাছে।

৬। দৈবাৎ অর্থহীন নরে, গেলে সুহৃদের ঘরে, তারা কয়না কথা তুলে মাথা আদর থাক্ দূরে; তারা ভেবে সারা, লক্ষ্মীছাড়া আমার কিছু চায় পাছে।

৭। ঘরে গিন্নীর কাছেও তাই, কথা বলে আর কাজ নাই, মিষ্ট কথায় কষ্ট সদাই শিষ্ট আলাপ নাই; বলে, ছারকপালে ম'রে গেলে হাড় জুড়ায় আর প্রাণ বাঁচে।

৮। আবার যদি তারই অর্থ হয়, অমনি হেসে কথা কয়, (তখন) কর্ত্তা ছাড়া নাইকো কথা, কর্ত্তা সমুদয়; এখন ভাল মন্দ সকল কথাই হচ্ছে সব কর্ত্তার কাছে।

৯। গতিক সব দেখে শুনে, কালীপ্রসন্ন ভনে, অর্থ বিনা সব অনর্থ জান্লাম এত দিনে, আমি গুরুর চরণ ধরব এঁটে, পরমার্থ যাঁর কাছে।

'অর্থ নাই' অথচ 'নাম আছে' এমন ব্যক্তির সহিত, থাট সাড়ী-পরিহিতা কুলবালার ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত ভাবের সহিত উপমা কত স্পষ্ট ও জীবন্ত। তিনি স্বয়ং অর্থহীন, তাই তিনি মাথাকে বলিতেছেন,

সুরট মল্লার—একতালা।

১। নাই মা আমার টাকার তোড়া, ব'লে কিগো তারা, ভবদারা পূজা নিবে না নিবে না

২। দিতে নানা উপহার, করি স্তূপাকার, কিনিবার আমার সাধ্য ত হ'লো না।

৩। কোথা পাব গো মা রত্ন অলঙ্কার, মুক্তকেশী মুণ্ডমালী মুক্তাহার, রতন খচিত মুকুট মাথার, নুপুর রচিত মরকত সোণা।

৪। শববাসনা কোথা স্বর্ণাসন পাব, দিগ্বসনা কোথা কাশ্মীরী রাঙ্কব, অট্টহাসা কোথা পট্টবাস পাব, জেনেও কি কিছু জান না ;
(আমায়) যা দিয়েছ দিতে তাই দিব শঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী কোথা আনব চুরী করি, জবা বিল্বদল অর্ঘপাদ্যবারি, দিতে পারি যদি কর মা করুণা।

৫। মনঃপ্রাণ ভক্তি ক্ষিতি অপ্ শূন্য, অনল অনিল, তত্ত্ব অন্য অন্য জগন্ময়ী জগন্মধ্যে তোমা ভিন্ন, কে আছে দিব বল না ;
বারিনিধি বারি বারিদে যেমন, বারম্বার আকর্ষণ-বরিষণ, 'গঙ্গাজলে' যথা গঙ্গার অর্চ্চন', তোরি দিয়ে তেমনি তোরি উপাসনা।

৬। যাকে যা দিতে দিয়েছ সেত তাই দিয়েছে, বেশী দিতে কে কোথা পেয়েছে, তোর মনোমত কে দিতে পেরেছে, জগতে কি ছাড়া তোমা, মুদ্রাহীন অতি ক্ষুদ্র আয়োজনে, কালীপ্রসন্নের তরে পূজা কেনে, নিবে না জননী কেন কি কারণে, সে শ্রীপাদ পদ্ম পূজিতে পাবে না।

আবার,—

পিলু—পোস্তা।

১। যেমন আছে আমার কাছে তেমনি দিব ব্রহ্মময়ী

২। চাইলো বেশী কোথায় পাব দিস নাই ত মা ইহা বই।

৩। তোরি নিয়ে তাকেই দিব আমার কেবল ঢেঁড়া সই,
যেমন দিবি তেমনি দিব বেশী দিতে পারি কই।

৪। করেছ ভিখারীর ছেলে, পুঁজী রাঙ্গা পদ ঐ ;
সাধ করে কি সাধেশ্বরী ভূতের বোঝা মাথায় বই।

৫। মা আমার ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী লোকে বলে কৃপাময়ী
বুঝিতে নারি এ চাতুরী, আমি কি তোর ছেলে নই।

৬। ভোগাতে ভোলাবে কালীপ্রসন্ন তায় ভুলে কই,
(যেন) মরণকালে, কালী বলে চরণ পানে চেয়ে রই।

স্থানান্তরে,—

রামপ্রসাদী সুর।

১। চাইনে তারা টাকার তোড়া।

২। এ যে বিষের হাঁড়ি দিশেহারা।

৩। অকিঞ্চিৎ অনর্থ অর্থ পরমার্থ পথের খাঁড়া;
ভজলে তারে বিপদ বাড়ে, অহঙ্কারে পূর্ণ করা।

৪। মুদলে আঁখি, সকল ফাঁকি, থাকবে চাকী ঘরে পুরা;
রাঙা চরণ, অমূল্য ধন, হৃদে যেন হই না হারা।

৫। শ্রীনাথ দত্ত, পরমার্থ, আছে আমার হৃদে ভরা;
সে যে নিদানের বল, পথের সম্বল, কি ধন আছে ইহার বাড়া।

৬। কাজ কি আমার এমন ধনে নিধনে যার সঙ্গ ছাড়া;
(আমায়) দিস্ যদি ধন, অভয় চরণ, তবেই জানি কৃপা করা।

৭। কালীপ্রসন্ন কয়, কাজ কি সুখে, পাছে তোকে ভুলি তারা।
আমি থাক্‌বো দুঃখে, ডাক্‌ব তোকে, হাঁক্‌বো মুখে তারা তারা।

কালীপ্রসন্ন 'মুক্তি' অপেক্ষা 'ভক্তি' ধনেরই সমধিক প্রয়াসী,

রামপ্রসাদী সুর।

১। কাজ কি আমার মুক্তি লয়ে।

২। ও সে বেশী কিসে ভক্তি চেয়ে।

৩। সালোক্য সামীপ্য তারা, সারূপ্য সাযোজ্য পেয়ে;
আমার কি কাজ আছে জলধিতে জলবিম্ব মিশাইয়ে।

৪। চাঁদের শোভা চাঁদ কি জানে, চকোর জানে সুধা পিয়ে;
চিনিতে কি স্বাদ বুঝে মা, খাদক বুঝি চিনি খেয়ে।

৫। ভক্তের হৃদে কি আনন্দ, বুঝে বা কে বুঝায় ক'য়ে;
মা জানে না সে আনন্দ চিদানন্দময়ী হ'য়ে।

৬। ভবানী ভ্রূকুটী ভঙ্গী, ভূধর তার পিতা হ'য়ে
জানে না, তা শিব জেনেছেন, ভক্তি ভরে হৃদে থু'য়ে।

৭। চ'লে মুক্তি মুক্তকেশী, শ্রীনাথ দিলেন যুক্তি কয়ে
কালীপ্রসন্নের কর মা কৃপা, শ্রীচরণে ভক্তি দিয়ে।

গৌরী রাগিণীতে কালীপ্রসন্ন গাইতেছেন।

১। একি তেমনি ধারা মেয়ে।
২। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁর চরণ পানে চেয়ে।
৩। তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত, (যাঁর) অন্ত না পায় ক'য়ে,
তুমি কি করিবে অন্ত দিনান্তে তাঁয় ধেয়ে।
৪। ব্রহ্মাণ্ড গঠিলা ব্রহ্মা (যাঁর) চরণধূলি পেয়ে,
তত্ত্বরূপার তত্ত্ব কেবা সমর্থ নির্ণয়ে।
৫। পঞ্চ প্রেত মঞ্চে যাঁরে মরে ব'য়ে ব'য়ে;
থাকেন যখন যেমন, তখন তেমন, নানা সৃষ্টি হ'য়ে।
৬। কালীপ্রসন্ন কয়, কালী আমার ভবার্ণবের নেয়ে;
অকূল-নিস্তারী চরণ তরি দিবেন বেয়ে।

'মা'য়ের ছেলে' কালীপ্রসন্ন, মায়ের বলে কত বলীয়ান দেখুন।

একতালা—জঙ্গলা।

১। চেন না আমারে শমন, তাই কি তুমি নিতে এলে।
২। আমি কালা মেয়ের ছেলে, থাকি মায়ের কোলে,
বদন ভরে ডাকি মা মা ব'লে।
৩। দাঁড়াও দাঁড়াও একবার মা মা বলে ডাকি,
এলেন কি জননী নয়ন মুদে দেখি,
কাল ভয় হরা কাল হৃদি চড়া, তারা আমার এই বিপদ কালে।
৪। মহাকাল ধরেন যে সম্পদ হৃদে, যে পদে বিপদে পতিত বিপদে
(সেই)শমন দমন পদে, শমনরে বিপদে,শরণ লয়েছি ভয়কি কালে।
৫। চাইলে ছুতে যদি পারিস রে কৃতান্ত, বৃথা যপি তবে কালী সোঢ়া মন্ত্র
বৃথা অহঙ্কার, করি শ্যামা মার, কালী কালবারিণীর ছেলে ব'লে।
৬। বৃথা ধরি কালী নামের কবজ পাটা, বৃথা ধরি হৃদে কালী রূপের ছটা
(বৃথা) কালী নামের মালা,হৃদি করি আলা, কালীপ্রসন্নের গলে দোলে।

এমন মা যে কালীপ্রসন্নের আদরের তাহার আর কথা কি? তাই তিনি আদর করিয়া ডাকিতেছেন।

রামপ্রসাদী সুর।

১। আদরিণী শ্যামা মা'রে।
২। ডাক দেখি মন আদর করে।
৩। আদর মুখে আদর হাসি, আদর রাশি সুধাধরে
(তাইতে) আদর করে সদানন্দ প্রেমানন্দে হৃদে ধরে।
৪। আদর মাখা তনু মায়ের, অনুমানে বুঝে কেরে
সেই আদরিণীর আদর পেলে অনাদরের আদর বাড়ে।
৫। কালীপ্রসন্ন কয় এ আদরের, কদর বুঝি সাধ্য কিরে;
যাঁর আদর তাঁর পদে দিয়ে, শরণ লওগে চরণ ধরে।

একস্থানে বলিতেছেন।

পিলু—জৎ।

১। ভেবেছ কি কথার কথা খেপা হওয়া খেপা মন।
২। খেপা সাজা, নয়ক সোজা, কত রোজা খেপার বোঝা ব'ন।
৩। কপ্নি ঝুলি নামাবলী, ছেঁড়া কাঁথায় সেজে সঙ্;
বল্লে খেপা, হয় না খেপা, কেবল, খেপায় তারে খেপা জন।
৪। ভিতরে কাজল, বাইরে আজল, বদমাইসির নিদর্শন;
এ খেপামি খেপ্হারান, সে খেপানয় সাধারণ।
৫। খেপার মত যে খেপেছে, সে করে কি আড়ম্বন;
সে অন্তরেতে চিন্তা করে চিন্তামণির শ্রীচরণ।
৬। অন্তরে অন্তরে খেপা, খেপা খেপীর সঙ্গে রণ,
খেপার খেপা গুরুদত্ত পরমার্থ রত্নধন।
৭। ধরবে কালী প্রসন্ন সেই, খেপা খেপীর শ্রীচরণ;
যেন ফিরতে না হয়, ফের খেপে আর, এই খেপেই খেপের মতন।

কালী প্রসন্ন নানা বিষয়ের উপমা দিয়া গান রচনা করিয়াছেন; সেই বিষয় গুলি তাঁহার একান্ত আয়ত্তাধীন।

মুলতান—একতালা।

১। ওষুধ খেয়ে দেখ মন।
২। হবে ভবব্যাধি একবারে নিবারণ।
৩। মন তোমারে বলি ত্যজরে সন্দেহ, হরি নাম মধু কর অবলেহ,
সংসার বাসনা চূর্ণ তাহে দেহ, দেহ হবে রে শোধন।

৪। নিবৃত্তি লঙ্ঘন কর দেখি মন, বিপাক অপাক হবে না,
ত্যজ বিষয় কুপথ্য, হরি তত্ত্বতথ্য, সুপথ্যেতে পিত্ত রবে না;
চিন্তামনি চূর্ণ অষ্টমূর্ত্তি রসে, চতুর্ম্মুখ তাহে জ্ঞান খলে মিশে
অভয়া বটিকা বেন্ধে অবশেষে, কর দেখিরে সেবন।

৫। মনরে বালামৃতে গুরু মন্ত্র মথে মর্দ্দন কর রে,
(তবে) যাবে রে যন্ত্রণা, বলি সুমন্ত্রনা, ভালবাসি ব'লে মন তোরে,
কালী প্রসন্ন এ ভব রোগে চিররোগী, ঔষধ সেবনে সতত বিরাগী,
শ্রীনাথ অনাথ নাথ বিধানেন তার লাগি নিদানে শ্রীচরণ।

কৃষ্ণ-কালী বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করা গেল;—

মুলতান—আড়াঠেকা।

১। একবার দেখিহে বাঁকা আঁখি।
২। কাল এলোকেশী রূপে দাঁড়াও দেখি।
৩। (একবার)বাঁশী ত্যজি অসি ধর কালশশী, করাল বদনে অট্ট অট্টহাসি,
রণ মত্ত বেশে রণ রঙ্গে ভাসি, রুধির ধারে মাখি।
৪। বিপরীত রসে, মাতি রতি রসে, মহাকাল হবেন শ্রীমতী।
(তোমার) শ্রীরাস মণ্ডল, সহস্র কমল, রাসময় হবে সংপ্রতি;
ধরিয়ে ঐ পদ হৃদয়কমলে, শবছলে দেহ রবে ক্ষিতি তলে,
দৈত্য দর্পহারী রিপুদৈত্য দলে সমুলে নাশ দেখি।
৫। (আমার) স্নেহ মায়া হবেন নন্দ যশোমতী, ব্রজাঙ্গনা যত সুমতি,
প্রণয় সুঠাম, দাদা বলরাম, ভক্তি হবেন শ্রীবৃন্দা দূতী;
আশা নদী হবে যমুনা পাথার, রাখাল বেশে সব ইন্দ্রিয় আমার
দাস হ'য়ে সবে লবে সেবাভার, কিছু না রবে বাকী।
৬। মনোজবা ফুলে ভক্তি বিল্বদলে, তুলব মনে মনে যতনে,
(করি) মনোজ্জরকত চন্দন চর্চ্চিত অর্চ্চনা করিব চরণে;
প্রেম অশ্রুজলে অর্ঘ্যপূর্ণ করি, পূর্ণানন্দে পাদ পদ্মে দিব হরি,
কালীপ্রসন্নের বাঞ্ছা দিগম্বরী, সতত হৃদে রাখি।

আবার, সামান্য বিষয়ের সহিত গভীরতর বিষয়ের তুলনা কেমন প্রাঞ্জল।

বাউল সুর।

কৃষ্ণপ্রেম অতলনদী, নিরবধি স্নান কর আনন্দ হয়ে।
।। দেহমন ঠাণ্ডা হবে, দেখতে পাবে, পাপের ময়লা যাবে ধুয়ে।

প্রেমের হিল্লোলে ভেসে, হেসে হেসে, যাও যদি উজান বেয়ে,
বারেক তায় মগ্ন হ'লে, অগাধ জলে, থাকবেরে আনন্দে শুয়ে।
নদীতে যে নেমেছে, সেই ডুবেছে, তবু লোকে যাচ্ছে ধেয়ে ;
ছাড়েনা কোনও মতে, ছুট্‌ছে পথে, উঠ্‌ছে আবার আছাড় খেয়ে
জলেতে কুমীর আছে, ধরবে পাছে, ইষ্ট কবচ নাওরে গায়ে ;
কালীপ্রসন্ন শরণ, শ্রীনাথ চরণ, বইছে·তরি ভবের নেয়ে।

ঐ

১। শ্রীগুরু মন্ত্র ইঁটে,জ্ঞান ঢেঁকিতে, সুর্কিঃকুটে দালান করিরে।
২। রিপু ছয় ঋতু যোগে, কিসের লেগে, ভবরোগে ঘুরে মরিরে।
৩। শ্রীগুরুতত্ত্ব কাঠে, দাওনা এঁটে, বিবেচনা সূত্র ধরি ;
সাধনা করাৎ ধরে, দাওনা চিরে, বেশ হবে বিশ্বাসের কড়িরে।
৪। ভক্তিচূণ খাসা সাদা, গাদা গাদা, মনভাঁটিতে জড় করি ;
লাগিয়ে দশটি রাজে, চিত্ত মেজে, সোজা কর মাটাম ধরিরে।
৫। সুষুম্না শিকল আঁটা, চৌকাঠাটা, মিছে কেন থাকে পড়ি
চিত্ত সংযম কপাটে, দাওরে এঁটে, একদমে দম, কজা জুড়েরে।
৬। শ্রীচরণ টালীযুড়ে, ছাত পিটারে, বদলাতে হবে না কড়ি ;
কালীপ্রসন্ন ভনে, এক কাঠামে, কাল কাটাব মজা করিরে।

আবার,—

বাউল সুর।

১। ভাবরে কিসের জন্য, নূতন ধান্য, কেটে আয় নবান্ন করিরে।
২। খাঁটি শ্রীচরণামৃত, দুগ্ধকত, রেখেছি মন বাটী পূরিয়ে।
৩। পূর্ণপ্রেম অশ্রু জলে, নারিকেলে ছড়াও কুচি কুচি করি ;
কর তায় মুঠোখণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, তত্ত্বকাণ্ড খণ্ড করিরে।
৪। কৃষ্ণনাম সস্তা চিনি, নাওরে কিনি, দিয়ে পরমার্থ কড়ি,
মাখতায় ভক্তি কলা, মনরে ভোলা, এই বেলাতে যোগাড় করিরে।
৫। রাধানাম নবাৎ মেখে, মনের সুখে, আনরে পান ফল চারি,
কালীপ্রসন্ন বলে, কাজ কি গোলে, ব'সে যানা তাড়াতাড়িরে।

ঐ

১। ধোঁদার উপর খোদ্‌কারী তোর চল্‌বে না।
২। ব্রহ্মাকল্পতরুর কলম কোনও মতে টল্‌বে না।

৩। কর্ম্মফলে খণ্ডিবারে করছ যত ক্রম, সেটা কেবল মনের ভ্রম,
তোমার লণ্ডভণ্ড কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড পরিশ্রম;
তোমার মুঠোর উপর ছুটো দিলে, পড়বে—হাতে ধরবে না।

৪। মরুস্থলে রত্ন মিলে থাক্‌লে কপালে, ভাঙ্গা কপালের ফলে,
মেরু শিরে খুঁজলে কানা কড়ি না মিলে, ঘরে বসে রত্ন ফলে,
ধাইলে ধন ত মিলবে না।

৫। গেলে ছট্‌কে ঘটী হাতে ক'রে সাগরের কূলে,
বেশী জল তুলবেরে বলে;
ছুট্‌লে দৌড়ে ক' হাঁড়ী জল তুল্‌তে পারিলে,
(তোমার) যেমন ঘটী তেমনি পাবে, বেশী জল ত তুলবে না।

৬। অকার্য্য অসাধ্য কিছু নাইক তোমাতে, কেবল ধনমদে মেতে
ভাবছ মনে আর সেখানে, হবে না যেতে,
কালীপ্রসন্নের মন ভুলছে কালে, কালত তারে ভুল্‌বে না।

সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে কালীপ্রসন্ন বড়ই ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাই

একতালা—মুলতান।

১। (তারা) আর কতদিন দীনে, কৃপাক্ষে হেরিবিনে, কৃপাময়ী তাই বল না।

২। (আর) ক'দিন এমন করে, কান্দব মা সংসারে,
আমার আসার আশা কিছু হলো না।

৩। (ঘোর) সংসারে বিবাদ, হলো প্রতিবাদ, প্রতিবাদ কিছু করলি না;
(তারা) বাঁচতে ভবে আর, তিলার্দ্ধ আমার, নাইক সাধ গো ত্রিলোচনা।

৪। পরিবার বর্গের, পূরল না মা সাধ, দিবা রাত্রি এই গঞ্জনা;
আমার কপালের দোষ, সবাই করে রোষ,
(কেউ) দোষী কি অদোষী দেখ্‌লে না।

৫। প্রভাত কালে উঠি, অর্থ লাগি ছুটি, দিনান্তেও ছুটী মিলে না;
উপায় কর'লাম যা মা তারা, কর'লাম উদর সারা,
উদরের দ্বার আর পূরলোনা।

৬। (হাতে) নাই মা পুঁজি পাটা, ঘট্‌ল বড় লেঠা,
গরিব বলে যমেও নিলে না;
(ওমা) আসলে উষুলে, ফাজিল উঠ্‌লো ঠেলে,
হিসাব দিব কিসে মিল্‌লো না।

৭। আমার সদাই প্রাণ জ্বলে, বাঁচি একবার ম'লে,
(দেখ্‌ছি) প্রাণান্তেও প্রাণত গেল না ;
কালীপ্রসন্নে বিদায় দিয়ে ভবদায়, মুক্তি কর হর-ললনা।

প্রবন্ধের কলেবর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। কালীপ্রসন্নের নানাবি বিষয় অবলম্বনে ছয় শতেরও অধিক গান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সে সমুদয় গীতাবলী হইতে দশ পনরটি গানে রচয়িতার ক্ষমতার সম্যক্ পরিচ প্রদান করা অসম্ভব। এই নিমিত্ত আমরা যথা তথা হইতে তাঁহার সাংসারি ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাপক কয়েকটি মাত্র সঙ্গীত উপহার দিয়া অদ্যকার মত ক্ষান্ত থাকিলাম। কালীপ্রসন্নের সমস্ত গীতাবলীই অপ্রকাশিত কেবল মাত্র একটি কালীকৃষ্ণ বিষয়ক গান 'বঙ্গবাসী'র 'সঙ্গীতসার সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আরও দুইটি গান শুনুন,—

রামপ্রসাদী সুর।

১। মা আমায় কাঁদাবে কত।
২। যত হ্যাঁচকন্দুলে ছেলের মত।
৩। মা মা বলে কেন্দে তোরে, ডাকলে আর কান্দতে হয় নাত ;
মা তোর নামে, কান্নার সীমে, ভবকান্না নয় মা হত।
৪। মায়ে মেলে মা মা বলে, মায়ের পিছুই ধায় মা স্থত ;
অম্‌নি বাহুতুলে, নেন্‌ মা কোলে, শান্ত করেন কত মত।
৫। দিস্‌বা না দিস্‌, অভয় চরণ, ডাক্‌তে তবু ছাড়ব নাত ;
(আমার) আর কে আছে, যেতে কাছে,
(হয়) পর কি পরের অনুগত।
৬। কান্না শুনে কান না দিলি, কেবল কান্না দিলি যত তত ;
কি দোষেতে দোষী কালীপ্রসন্ন তোর পদে এত।

আড়া মুলতান।

১। আমার অশৌচ হয়েছে।
২। শমন এসনা, এসনা এসনা কাছে।
৩। পিতা দুটি মাত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম পুত্র, জন্মমাত্র তারা হত হয়েছে ;
(ভাই) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সপত্নি দুজনে পুত্রশোকে পরলোক গিয়েছে।

৪। ওরে ক্রিয়াকর্ম্ম যত, হয়েছে সব হত, অনুগত যত গতরে;
ওরে সেই শোক ভরে, বৃদ্ধ পিতা ঘরে, মোহ নামে তিনিও হতরে;
পিতৃশোকে আমার মায়া মা মরেছে;
সন্ধ্যাদি বন্দনা সব বন্ধ করেছে;
শুনরে কৃতান্ত, হতে অশৌচান্ত কালান্ত বাকী আছে।

৫। আমার অজ্ঞানান্ধ ঘোর, হয়েছেরে ভোর,
জ্ঞানালোক দেখা দিয়েছে,
আনন্দ কোকিল কাকলি কূজনে দুরাশা কুতন্দ্রা গিয়েছে।
দেখে শুনে সব হয়েছি বিরাগী, হয়েছিরে গতকালী গৃহত্যাগী
কালীপ্রসন্নে ছুঁওনা, তাইতে করি মানা, কি জানি ছোও পাছে।

কালীপ্রসন্নের গুরুতত্ব, মানসপূজা, বৈরাগ্য, ব্রহ্মসঙ্গীত, শিব সঙ্গীত; আগমনী, কৃষ্ণকালী, কালীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, গঙ্গা, কালী, ষট চক্রভেদ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে অতি সুন্দর সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদী ও বাউল সঙ্গীতগুলি অতি সুমিষ্ট। পাঠকবর্গের কৌতুহল হইলে আমরা ক্রমশঃ কালীপ্রসন্নের সমগ্র সুন্দর সুন্দর গীতাবলী বীরভূমিতে প্রকাশিত করিতে পারি।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

প্রণয়।

১

রতন স্বরগ চ্যুত—পবিত্র প্রণয়,
স্বরগে তোমার জন্ম
স্বর্গীয় তোমার কর্ম্ম
দুর্গম তোমার মর্ম্ম—
মধুর নিশ্চয়,
তোমার প্রকৃত সুখ মানবের নয়।

২

প্রণয়রে! শুনেছি তুমি স্বর্গের সোপান,
কত ঋষি তপোবনে
কত যোগী যোগাসনে
কত সাধে নিশি দিনে—
পায়না সন্ধান,
কখন কি ভাবে তুমি কোথা অধিষ্টান।

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী যুক্ত বাবু নিত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এই জীবনী সংগ্রহে আমার সম্পূর্ণরূপ সাহায্য করিয়াছেন এবং কালীপ্রসন্নের রচিত সমগ্র প্রকাশিত গীতাবলী আমার যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন।

৩

অন্ধের নয়ন তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান,
তুমি কৃপা কর যারে
সংসার ভুলাও তারে
শিখাইয়ে দাও তারে
সুখের বিধান,
বিরলে বসিয়ে গায় তব গুণগান।

৪

নির্ম্মল প্রণয় চায় পবিত্র পরাণ,
রূপের প্রণয় নয়
গুণের প্রণয় নয়,
কুলের প্রণয় নয়
কিম্বা ভাগ্যবান,—
সে পথে অভাগা কত পেয়ে যায় ত্রাণ।

৫

বুঝেনা মানব কিসে অঙ্কুর তোমার,
বুঝেনা তোমার গতি
জানেনা তোমার রীতি
কি ভাবে তোমার স্থিতি
বুঝে উঠা ভার,
জানেনা মানব তুমি কিসে হও কার।

৬

অনুমানে বুঝি তুমি কঠিনের নও;
কঠিন স্বভাব যার
বিফল সাধনা তার
মিছা সহে দুখ ভার
(তবে) কেন আশা দাও,
তুমিও কঠিন আহা আশ্রিতে কান্দাও।

৭

কুটীল সংসারী মিছে করে আবাহন;
সংসারে ডুবিয়া থাকে
তবু মনে সাধ রাখে
তব [illegible]ণ গায় মুখে
প্রণয়ী যে জন;—
রাখিতে তোমার মন দিতে নারে মন

৮

প্রণয় পবিত্র নিধি সংসারের সার;
সরল প্রণয়ী জন,
পবিত্র প্রণয়ী মন
অমূল্য প্রণয় ধন—
সৃষ্টি বিধাতার,
যে বুঝে তোমায় তার মর্ম্ম বুঝা ভার।

৯

অস্তিত্ব তোমার বুঝি সংসারেতে নাই
গঠিত শূন্যের ধূলে
পালিত শূন্যের কোলে
স্থাপিত প্রেমের মূলে—
তব ভিত্তি নাই,
স্থায়িত্ব, ভিত্তির সনে সচঞ্চল তাই।

১০

তবে কেন তব নামে এহেন মাধুরী;
সংসারী বিরাগী বেশে
বিজনে বিপিনে পশে
ভূপতি তোমার বশে
পথের ভিখারী,
পাগলের বেশে যাপে দিবস শর্ব্বরী।

১১

এ হেন পবিত্র ভাবে কলঙ্ক প্রকাশ;
দম্পতী তটিনী তটে
তোমারি ক্ষমতা রটে
তোমারি মাধুরী বটে
বাড়ায় উচ্ছ্বাস
পারেনা লভিতে, কেন লয় অবকাশ।

১২

প্রণয়রে ঐটুকু কলঙ্ক তোমার,
সাধিয়ে একান্ত মনে
পুলিনে প্রান্তরে বনে
কেন্দে কেন্দে দুটি জনে
আসেনাক আর;
মূর্খতায় রাখে শুধু কলঙ্ক তোমার।

১৩

রে প্রণয়! ও কলঙ্ক ধরি না তোমার
প্রণয়ে কান্দিতে হয়
সে দোষ তোমার নয়
ধর্ম্ম তুমি, প্রেমময়
নামটি তোমার
অমূল্য রতন তুমি সংসারের সার।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান

বীরভূমে সেন্সস বা জনসংখ্যা।

১৯০১

প্রথম প্রস্তাব।

দশ বৎসর পরে আমাদের দেশে আবার সেদিন সেন্সস বা জনসংখ্যা হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে ১৮৭২,-৮১,-৯১ সালে আরও তিন বার রীতিমত সেন্সস হইয়া গিয়াছে। রাজার পক্ষে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় অবগত হইবার, সেন্সসের ন্যায়, আর কোন কার্য্যকরী অনুষ্ঠান আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান রাজত্বেও 'আদম স্রুমারী' বা লোক সংখ্যা হইত।

এই সেন্সসে যে শুদ্ধ প্রজার সংখ্যা অবগত হওয়া যায়, তাহা নহে। ইহাতে, দেশের সমাজতত্ব, ভাষাতত্ব, জাতিতত্ব, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি বা অবনতির কারণ, জাতীয় ব্যবসায় বা জাতীয় অবলম্বন প্রভৃতি জটিল ঐতিহাসিক তথ্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিবার, সেন্সস প্রধান উপকরণ।

বর্ত্তমান ১৯০১ সালের সেন্সসের ফলাফল আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। ইহাতে বীরভূম জেলার ১৮৯১-১৯০১ এই দশ বৎসরের ইতিহাস প্রকটিত আছে।

এই প্রবন্ধটি সমগ্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত বীরভূম জেলার সেন্সস রিপোর্টের মর্ম্মানুবাদ। এই রিপোর্ট বা বিবরণীর আকার বৃহৎ, আমরা ক্রমশঃ সমগ্র রিপোর্টের, সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিবার আশা করি। এই রিপোর্টখানি ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমাদের সদাশয় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার শ্রীযুক্ত এ, আহাম্মদ এস্কোয়ার সি, এস্, বাহাদুর তৎ-পূর্ব্বেই 'বীরভূমি'তে প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে

সমধিক উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট যে আমরা কি পরিমাণে ঋণী, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাস্তবিকই অক্ষম। *

জেলার ইতিহাস (১৮৯১-১৯০১) এবং জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি।

সীমানা পরিবর্ত্তন—বিগত দশ বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৯১ সালের সেন্সসের পর, জেলার সীমানার বা আয়তনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সিংনগর, রাজবাড়ী ও গোপালপুর, এই তিনখানি গ্রাম বীরভূম জেলার সীমানার মধ্যে অবস্থিত হইলেও, পাকুড় সবডিবিজনের শাসনাধীনে ছিল। শুদ্ধ এই তিনটি গ্রাম, ১৮৯৫-৯৬ সালে বীরভূমের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া নলহাটী থানার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আয়তনের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না, পূর্ব্ববৎ ১৭৫৩ বর্গ মাইলই রহিল। কিন্তু ঐ তিনখানি গ্রামের লোক সংখ্যা (৪২১ জন), গত সেন্সসে পাকুড়ের অধীনে হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণ তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, বীরভূমের সেন্সসের জনসংখ্যা ৭৯৭৮৩৩+৪২১=৭৯৮২৫৪ ধরিয়া লইতে হইবে।

নলহাটী ব্যতীত জেলার অধীনস্থ থানা গুলিরও সীমানা বা আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্বে মুড়ারই একটি আউট্‌পোষ্ট ছিল; ১৮৯৯ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নলহাটীর কতকাংশ মুড়ারই আউট্‌পোষ্টের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া নলহাটী ও মুড়ারই এই দুইটি স্বতন্ত্র থানার সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই জন্য, পূর্ব্ব সেন্সসে ৮টি থানা দেখান হইয়াছিল, এবার হইল নয়টি, যথা সিউড়ী, দুবরাজপুর, বোলপুর, সাকুলীপুর, লাভপুর, রামপুরহাট, মৌড়েশ্বর, নলহাটী ও মুড়ারই। তবে, আউট্‌পোষ্টের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ছিল ৮টি, এক্ষণ হইয়াছে ৪টি। দুনিগ্রাম, বেঙ্‌চাতরা, ও সাঁইথিয়ার যে আউট্‌পোষ্ট ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে,—আর মুড়ারই ত স্বতন্ত্র থানা হইয়াছে। বর্ত্তমান ৪টি আউট্‌পোষ্টের মধ্যে, রাজনগর ও মহাম্মদবাজার সিউড়ী থানার, ইলামবাজার বোলপুর থানার এবং খয়রাশোল দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত।

---

* বীরভূমির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবার জন্যও ইনি দয়া করিয়া আমায় কালেক্টারী ও ফৌজদারী উভয় আফিসের পুরাতন দপ্তর হইতে আবশ্যকীয় কাগজ পত্র দেখিতে পাইবার এবং কালেক্টরী লাইব্রেরীর পুস্তক সমূহ আবশ্যক মত ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। জানিনা, এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত কি বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। লেখক।

বীরভূম জেলার অধীনস্থ থাকিয়াও কোন কোন মহাল মুর্শীদাবাদে রাজস্ব প্রদান করিত, ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বীরভূমে রাজস্ব প্রদান করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতেও অবশ্যই জেলার সীমানা বা আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

আভ্যন্তরিক উন্নতি—এই কয় বৎসরে সমগ্র জেলায়, ১৮৭০ সালের ৬ আইন প্রচলিত হওয়ায় এবং ঘাটোয়ালী জমি, জমীদারগণকে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়ায় জমীদারগণ অবশ্য লাভবান হইয়াছেন।

আলোচ্য এই দশ বৎসর মধ্যে, নূতন সব্‌রেজেষ্টারী আফিসের সৃষ্টি, দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, সহরে ও পল্লিগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিবিধ আয়োজন, বিদ্যালয় এবং সাধারণের হিতকরী অন্যান্য অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, কোন নূতন রেলরাস্তা নির্ম্মাণ অথবা আম্‌দানী রপ্তানী করিবার কোন সুবিধাজনক বন্দোবস্ত ও সাধারণের অভ্যাসগত প্রকৃতির উন্নতিকল্পে কোন পরিবর্ত্তন, এ সকল কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য ঃ—বিগত দশ বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর দুইটি তালিকা প্রদত্ত হইল—

মৃত্যু তালিকা।

বৎসর	জ্বররোগে	বিসূচিকা রোগে	উদরাময় রোগে	বসন্ত রোগে	অন্যান্য কারণে	মোট সংখ্যা	প্রতি মাইলে মৃত্যু সংখ্যার হার।
১৮৯০-৯১	১২৯৯৪	৪৩৫	১৪৪	১৭	৫৮৮৪	১৯৪৭৪	......
১৮৯১-৯২	১৮৮৫৬	১১১৪	১২৯	৪	৬২৩৩	২৬৩৩৬	৩০·৭২
১৮৯২-৯৩	১৮৭৮৯	২০৯৬	১৫৮	২৩	৫২৩১	২৬২৯৭	৩২·৯৬
১৮৯৩-৯৪	১৬০৩০	৩৮০	১১১	৫	৬৬৪৬	২৩১৭২	২৯·০৪
১৮৯৪-৯৫	১৯৮৯০	২৫১৭	১৫১	৮	৬১২০	২৮৬৮৬	৩৫·৯৫
১৮৯৫-৯৬	১৯০২১	১৫৭৬	১১৭	৩৮	৫৬৯৬	২৬৪৪৮	৩৩·১৫
১৮৯৬-৯৭	১৮৬৫৮	১৪১৬	১১৭	১৯৯	৫৭৩০	২৬১২০	৩২·৭২
১৮৯৭-৯৮	১৫৬৪৪	১২৮৪	৮৯	১৭৪	৬৫৪৭	২৩৯৩৮	২৯·৭৩
১৮৯৮-৯৯	১১৩৮৩	১৭২	৭৩	৩৯	৫৪৯[illegible]	১৭১৫৭	[illegible]·৫০
১৮৯৯-১৯০০	১৩৪৩৫	২৯২	৬১	৪	৬৭৩৪	২০৫২৬	২[illegible]৭১

জন্ম তালিকা।

বৎসর	মোট	প্রতি মাইলের জন্ম সংখ্যার হার।
১৮৯১-৯২	...	২৭·৮৩
১৮৯২-৯৩	...	৪০·৬২
১৮৯৩-৯৪	...	...
১৮৯৪-৯৫	...	৩২·৪৯
১৮৯৫-৯৬	২৮৮৮৮	৩৬·২০
১৮৯৬-৯৭	২৯৫৩০	৩২·৭২
১৮৯৭-৯৮	৩১৯৮৩	৪০·০৭
১৮৯৮-৯৯	৩৫০৫৪	৪৩·৯১

মারিভয় অথবা দেশব্যাপী অপর কোন সংক্রামক পীড়া এই দশ বৎসর মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। ১৮৯১—৯২ সালে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিবাসীগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা হীনতর ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের সূত্রপাত হইয়া নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তদন্তর কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মার্চ্চ মাসে (১৮৯২) পুনরায় আবির্ভূত হয়। জেলার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক এই জ্বর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; সুখের বিষয়, মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, তত লোক হানি হয় নাই। ইহার পর বৎসরও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সমভাবেই প্রচলিত ছিল। উপরন্ত, লাভপুর, সাকুলীপুর ও বোলপুর থানায় বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আজীমগঞ্জ ও কাটোয়া হইতে প্রত্যাগত তীর্থযাত্রিগণ সেই রোগ আনায়ন করে, পরে সংক্রামতা প্রযুক্ত, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ১৮৯০-৯১ সালের বীরভূমে অত্যল্প বারিপাতেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের এতাদৃশ প্রাচুর্ভাব হইবার কারণ বলিয়া সূচিত হয়।

১৮৯৩-৯৪ সালে অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ভালই ছিল—মৃত্যুসংখ্যাও কম। সাধারণতঃ জ্বর রোগেই অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এই বৎসর জ্বর রোগে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম।

১৮৯৪-৯৫ সালে জন সাধারণের স্বাস্থ্য আবার অবনতি প্রাপ্ত হয় এবং জ্বর ও বিসূচিকা রোগে বহু লোকে প্রাণত্যাগ করে। অন্যান্য বারের ন্যায় বোলপুর থানায় জ্বর রোগে মৃত্যু সংখ্যাই অধিক। রামপুরহাটে বিসূচিকার

প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—২৫১৭ জন রোগীর মধ্যে ১৯৮৫ জনের মৃত্যু ঘটে।

১৮৯৫-৯৬ সালে স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়; বিসূচিকার প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও জ্বর পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে।

১৮৯৬-৯৭ এই বৎসর অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল। কিন্তু বোলপুর, সিউড়ী, লাভপুর ও দুবরাজপুর, এই কয় থানার অন্তর্নিবিষ্ট গ্রাম সমূহে জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া লোক হানি হয়। বোলপুর, লাভ-পুর, সাকুলীপুর ও নলহাটী থানায় জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত বিসূচিকা রোগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

ইহার পর, তিন বৎসর ধরিয়া, জন সাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবশ্য ভালই ছিল বলিতে হইবে। এই দশ বৎসরের তালিকায়, ১৮৯৮-৯৯ সালের মৃত্যু সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। পূর্ব্ব দুই বৎসর সামান্য বৃষ্টিপাতের পর ১৮৯৭ সালে সর্ব্বত্র সমভাবে ধীরে সুস্থে বৃষ্টিপাত হওয়ায় স্থানে স্থানে জল জমিয়া দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি করিতে পারে নাই ; অধিকন্তু, লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অবস্থার সচ্ছলতা হইয়া উঠিল। ১৮৯৬-৯৭ সালের শেষাংশে এবং ১৮৯৭-৯৮ সমগ্র বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ ও আহার্য্য দুর্ম্মূল্য হইলেও সাধারণ মৃত্যু সংখ্যার তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই।

জন্মতালিকা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বড় একটা আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ প্রথম কয় বৎসরের। কারণ জন্ম বিবরণী সংগ্রহ প্রণালীটাই তত কার্য্যকারক নহে। তত্রাচ আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে, মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা জন্মসংখ্যা বরাবরই অধিক ; এমন কি, শেষ দুই বৎসরের অর্থাৎ ১৮৯৮-৯৯ ও ১৮৯৯-১৯০০ সালের মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা জন্মসংখ্যা প্রায়ই দ্বিগুণ। পূর্ব্ব সেনসসের জনসংখ্যা অপেক্ষা এবার যে ১০৩২৭৫ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে, বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দেশের বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা, বিশেষতঃ মারিভয় বা অপর কোন দেশব্যাপী সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

বীরভূম জেলা মধ্যে সিউড়ী মিউনিসিপালিটি ভিন্ন অপর কোন মিউনি-সিপালিটি নাই। এই দশ বৎসর মধ্যে এই সহরের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি তত মনোযোগ করা হয় নাই। জেলার প্রাকৃতিক গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্যাংশে পয়ঃপ্রণালী

বা জল নিকাসের অসুবিধার কথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সার-ডোবা, গৃহস্থের ব্যবহৃত ময়লা জল, অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও অন্যান্য আবর্জ্জনা প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়, এই গুলিই অস্বাস্থ্যের মূল। গ্রাম-বাসিগণ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তাঁহারা স্বয়ং এই সকলের প্রতিবিধান করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

অধিবাসিগণের বৈষয়িক অবস্থাঃ—বীরভূমের অধিবাসী কৃষিজীবী; সেই জন্য ইহাদের বৈষয়িক অবস্থার বিষয় অবগত হইতে হইলে জেলার কৃষিকার্য্যের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নেত্রপাত করিতে হয়। বীরভূম জেলার অধিকাংশ স্থলই উন্নতাগত, এই জন্য এখানে কখনই অজন্মা হয় না, সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেও 'জোল' জমীতে আবশ্যকমত শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্যের জন্য এই প্রকার ভূমিই উপযুক্ত, ধান্যও সেইজন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মোটামুটী বলিতে গেলে, এই কয় বৎসর লোকের অবস্থা ভালই ছিল বলিতে হইবে, এবং অনেক উন্নতি লাভও করিয়াছেন। তবে এক্ষণ জমিদার হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সকলেরই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদিগেরই যত কিছু কষ্ট—তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়ে সঙ্কুলান হয় না, এদিকে তাহাদের বাবুয়ানীর আদর্শ সামান্য কৃষকদিগের ন্যায় ছোট খাট নয়। ফলে, ইহাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হইতে পাইতেছে না।

১৮৯১-৯২ সালে প্রায় চতুর্থাংশ ফসল উৎপন্ন হইল না। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদন হওয়ায় সমগ্র জেলার খরচ সঙ্কুলান হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত ছিল। তদনন্তর তিন বৎসর ধরিয়া শস্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী ৩বৎসরেও শস্য সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও অত্যন্ত মহার্ঘ ও সুবিধামত দরে প্রজারা শস্য বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হইয়া উঠিল। তবে, দৈনিক মজুর ও সাধারণ ভদ্রলোকদিগের চূড়ান্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কারণ মজুরের দৈনিক বেতন অথবা যে সকল ভদ্রলোকের তত ভূসম্পত্তি নাই, অধিকাংশ চাকুরীর উপর নির্ভর, তাহাদের বেতনের বৃদ্ধি নাই, অথচ আহা-রীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াও উঠিয়াছে; ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৭-৯৮ সালে ত প্রায় দুর্ভিক্ষই হইয়াছিল। ১৮৯৭—৯৮ সালে গভর্ণমেণ্ট অনেক

টাকা দান দিয়া ভদ্র সাধারণ ও সমর্থ মজুরদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

এদিকে অসমর্থ, খঞ্জ, অন্ধ ও বৃদ্ধ নীচ জাতিদিগকে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার হইতে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে শস্যোৎপন্ন হইলে এই কষ্টের মোচন হয়। কিন্তু অন্যত্র দুর্ভিক্ষ প্রশমিত না হওয়ায় দ্রব্যাদির মূল্যের বিশেষ কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইল না। তবে পরবর্ত্তী কয় বৎসর ধরিয়া প্রচুর শস্যোৎপন্ন হওয়ায় অধিবাসিগণের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে; কর্ম্মচারী ভদ্রলোক, দৈনিক মজুর ও অপরাপর সকলেই এখন সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং সর্ব্বত্রই উন্নতির মৃদু হাস্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

অধিবাসীগণের স্থানান্তরে গমন ও ভিন্ন দেশ হইতে বিদেশীয়গণের আগমন ঃ— বীরভূমে বাস করিবার জন্য ভিন্ন জেলা হইতে আগত লোক সমূহ গণনা করিবার নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি সাঁওতাল মজুর জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বীরভূমে আসিয়া চিরস্থায়ী রূপে বাস করিয়াছে। ১৮৮১ সালে এই জেলায় সাঁওতাল সংখ্যা মোট ১৪১৭২ জন ও ১৮৯১ সালে ৩৪১৮৪ জন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সেন্‌সসে যে সকল সাঁওতাল 'হিন্দু' বলিয়া অভিহিত, 'ক্রিশ্চিয়ান' নহে, শুদ্ধ তাহাদেরই সংখ্যা ৪১৫০০ জন, এতদ্ব্যতীত সাঁওতাল পরগণার সন্নিহিত গ্রাম সমূহে ধান্য ছেদনের সময় অনেক সাঁওতাল মজুর খাটিতে আসিয়া বর্ষারম্ভে প্রত্যাগমন করে।

রেল থাকায়, বিহার অঞ্চলের কতক লোক এদেশে আসিয়াছে। পশ্চিম দেশ হইতেও অনেক লোক রেল-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আসিয়া দোকান খুলিয়া ব্যবসায় করিতেছে, আবার কেহ কেহবা ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিবার কোন উপায় নাই।

বীরভূম হইতে যে সকল লোক স্থানান্তরে গমন করে, তাহার কোন হিসাব রাখা হয় না। চা-বাগানে অথবা ভিন্ন জেলায় খাটিবার জন্য অনেক মজুর বিদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু সংপ্রতি এখানে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন 'কুলীডিপো' বর্ত্তমান না থাকায়, সেই সকল কুলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। রামপুরহাটে পূর্ব্বে একটি কুলীডিপো বা কুলী সংগ্রহের আড্ডা ছিল, কার্য্যাভাবে এক্ষণ তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ সেখানে

কয়েকটি মাত্র বিশ্রাম-গৃহ (Rest-house) আছে; ভিন্ন স্থান হইতে আনীত কুলীদিগকে রেলে চালান দিবার পূর্ব্বে এই গৃহে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিবার অবসর দেওয়া হয় মাত্র।

১৮৭২ সাল হইতে মোট লোক সংখ্যার এবং ১৮৯১ সাল হইতে প্রতি থানার লোক সংখ্যার তারতম্য ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ বা আলোচনা—

বীরভূমের জন সংখ্যা।

১৮৭২ সালে	৮৫৩৭৮৫
১৮৮১ সালে	৭৯২০৩১
১৮৯১ সালে	৭৯৮২৫৪
১৯০১ সালে	৯০১৫২৯

১৮৯১ সালের লোক সংখ্যা অপেক্ষা এইবার লোক সংখ্যায় ১০৩২৭৫ বা শতকরা ১২·৯ জন হিসাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বারের সেন্সসে (১৮৮১ সালের) যে, ১৮৭২ সালের সেন্সস অপেক্ষা লোক সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল, ১৮৭৯-৭২ সাল হইতে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া যে ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি দেশ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। ১৮৮১-৯১, এই দশ বৎসর ধরিয়াও জেলার দক্ষিণাংশে জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্য লোকক্ষয়ও বিস্তর হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৮৮৪ সালে বীরভূমে রীতিমত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৯১-১৯০০, এই দশ বৎসর মধ্যে, কিন্তু ঐরূপ বিশেষ কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; উপরন্তু অধিবাসীগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা বরাবরই অত্যন্ত ভাল ও বৈষয়িক অবস্থা বর্দ্ধিষ্ণু দেখা যাইতেছে। এই সকল অনুকূল কারণ পরম্পরা বর্ত্তমান থাকায়, এই দশ বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এক কথা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেন্সেস অপেক্ষা এবার সেন্সসের কার্য্য প্রায়ই যথাযথ শুদ্ধ রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, বাদ পড়িতে পায় নাই। জন সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া, ইহাও একটি প্রধান কারণ সন্দেহ নাই।

অগ্রেই বলা হইয়াছে, কেবল মাত্র নলহাটী থানাটি, মুড়ারই ও নলহাটী এই দুই স্বতন্ত্র থানায় বিভক্ত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত অপর সকল থানারই আয়তন পূর্ব্বেরই আছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৯১ সাল হইতে প্রতি থানার লোক সংখ্যার তারতম্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

থানার নাম	১৮৯১ সাল	১৯০১ সাল	বৃদ্ধি			
সিউড়ী	১২৬২০৮	১৩৯৮১৭	১৩৬০৩	অর্থাৎ	শতকরা	১০.৮.
দুবরাজপুর	১১৯৪৭২	১৩৭৯৬৪	১৮৪৯২	„	„	১৫.৫০
বোলপুর	৯৮৭৮১	১১৫৭৪৯	১৬৯৬৮	„	„	১৭.২.
সাকুলীপুর	৬৮১৪৫	৭৭৫৫৮	৯৪১৩	„	„	১৩.৮.
লাভপুর	৫৭৬২৩	৬৪২৮১	৬৬৫৮	„	„	১১.৫
রামপুরহাট	৯৩৪৩৪	১০২৮১০	৯৩৭৬	„	„	১০.
মৌড়েশ্বর	৮৬৪২৮	৯৩৮৩৯	৭৪১১	„	„	৮.৫
নলহাটী ও মুড়ারই	১৪৮১৬৩	১৬৯৫১১	২১৩৪৮	„	„	১৪.৫

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সকল থানায় বৃদ্ধির হার সমান নহে। জ্বর এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির নিমিত্ত, দুবরাজপুর, বোলপুর ও সাকুলীপুর এই তিন থানায় ১৮৮১ সালের সেন্সস অপেক্ষা ১৪৯১ সালের সেন্সসে লোক সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি থানাতেই এইবার সর্ব্বাপেক্ষা জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। লাভপুর, মৌড়েশ্বর, রামপুরহাট ও নলহাটী থানায় ১৮৯১ সালের সেন্সসে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বর্ত্তমান সেন্সসেও বৃদ্ধির হার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী। মৌড়েশ্বরে এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। মৌড়েশ্বর থানার পশ্চিমাংশ সমগ্রই অনুর্ব্বর ও জঙ্গলময় এবং আবাদী অপেক্ষা পতিত জমীই অধিক, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কম হইবার ইহাই যে প্রধান কারণ, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গত সেন্সসে নলহাটী থানায় জনসংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; এবারেও বৃদ্ধির হার কম নহে। জেলার মধ্যে এই অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে রবিফসলের চাষ হইয়া থাকে, জমীও উর্ব্বরা; এই থানার মধ্যে (লুপ্ ও আজীমগঞ্জ) দুইটি রেললাইন বর্ত্তমান। এই সকল কারণ বশতঃ এখানে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মোটের উপর বলিতে গেলে, বীরভূমের প্রকৃতিগত সুবিধাই এতাদৃশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

প্রতি থানায়, বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যার হার এবং

হ্রাস-বৃদ্ধির কারণঃ—এই স্থানে ১৮৮১ সাল হইতে প্রতি থানার প্রতি বর্গমাইলে কত লোক, তাহার একটী তালিকা প্রদান করা গেল।

থানার নাম	১৮৮১ সাল	১৮৯১ সাল	১৯০১ সাল	
সিউড়ী	৪০৭.৫২	৪০৫.৮১	৪৪৯.৫৭	(৮)
দুবরাজপুর	৪৬০.২৪	৪৩৪.৪৮	৫০১.৬৮	(৬)
বোলপুর	৪১৯.২৩	৩৮৪.৩৬	৪৫০.৩৮	(৭)
সাকুলীপুর	৫০৪.৬১	৪৬০.৪৪	৫২৪.০৪	(৪)
লাভপুর	৪৫২.৫৭	৪৯৩.৫০	৫৪৯.৪১	(৩)
রামপুরহাট	৪৬৯.০৩	৫০৩.৭৯	৫৪৯.৭৯	(২)
মোড়েশ্বর	৪৪৮.৬৬	৪৭৫.৭২	৫১৫.৫৯	(৫)
নলহাটী ও মুড়ারই	৪৮৫.১৩	৫২৫.২৯	৬১৪.১৬ { ৬০৮.৮৩ / ৬২০.৮২	

দেখা যাইতেছে, নলহাটী থানাতেই বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তা হইবারই কথা,—নলহাটী থানার মত সুবিধাজনক স্থান আর কোন থানার মধ্যে নাই। ইহার ভূমি উর্ব্বর ও পূর্ব্বাংশে সমতল, দুইটি রেল লাইন থাকায় গমনাগমনের সুবিধার ত কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। রামপুরহাট ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে—নলহাটীর ন্যায় নানাবিধ সুবিধা এই থানাতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে, লাভপুর; লাভপুর থানার পূর্ব্বাংশ সমতল এবং কৃষিকার্য্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী। আর এক কথা; লাভপুর এলাকা মধ্যে গণুটিয়া রেশমের কুঠী থাকায় তথায় অনেক মজুর কর্ম্ম করিবার সুযোগ পায়। গতবারের সেন্সসে লাভপুরে লোক বৃদ্ধির ইহা একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাকুলীপুর, বোলপুর ও দুবরাজপুর থানায় অপরাপর থানা অপেক্ষা দেশব্যাপী জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই জন্য সমতল উর্ব্বর ভূমি, বিশেষতঃ অজয় নদীর তীরবর্ত্তী শস্যপ্রসূ উর্ব্বর ভূমি থাকা সত্বেও, এই সকল থানায় জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই। এই তিন থানার অন্তর্নিবিষ্ট স্থান সমূহে যে সকল নীলকুঠী ও গালার কারবার ছিল, তাহা এক্ষণ একপ্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। তদ্ব্যতীত, অজয় নদীর পরপার হইতে কয়লার খনি আরম্ভ হওয়ায়, অনেক মজুর চলিয়া গিয়া বর্দ্ধমান জেলার অধীনস্থ স্থান সমূহে একপ্রকার চিরস্থায়ী রূপে বাস করি-

তেছে। কৃষিকার্য্য এ অঞ্চলের লোকের প্রধান উপজীবীকা হইলেও, অবশ্য স্বীকার করেতে হইবে যে, বীরভূমের পশ্চিমাংশ, পূর্ব্বাংশের ন্যায় উর্ব্বর, সমতল ও চাষের পক্ষে তত উপযোগী নহে। এই নিমিত্ত, এই সকল থানার লোক সংখ্যার হার, পূর্ব্বাংশে অবস্থিত থানা সমূহ অপেক্ষা তুলনায় ন্যূন হওয়া বিবিত্র নহে। সিউড়ী থানার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ সাঁওতাল পরগনার সংলগ্ন। এই জন্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ বশতঃ সিউড়ী থানার লোক সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা কম বলিয়া বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

পৌরাণিক চিত্র।

নলদময়ন্তী।

নলের প্রায়শ্চিত্ত।

এ সংসার বড়ই ভীষণ স্থান। তুমি যে কোন কার্য্য কর না কেন, তোমার কার্য্যে সকলে সন্তুষ্ট হইবে না। কেহ নিন্দা করিবে, কেহ বা প্রশংসা করিবে। এই জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী উদ্দেশ্য দেখিয়া কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করেন। কার্য্যের ফল যাহাই হউক না কেন, তোমার উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তবে তাঁহাদের মতে তুমি নিন্দনীয় নহ। আর তোমার কার্য্যের ফল যতই শুভদায়ক হউক না কেন, যদি তোমার উদ্দেশ্য অসাধু হয়, তবে তুমি নিন্দনীয়। অপর শ্রেণী ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করে। তোমার উদ্দেশ্য সৎ হইতে পারে, কিন্তু তোমার কার্য্যের ফল যদি কাহারও পক্ষে অনিষ্ট-কর হইল, তবে তুমি তাহাদের চক্ষে শত ধিক্কারের পাত্র হইলে! আর এক কথা, সকল কার্য্যের ভালমন্দ দুইটা পার্শ্ব আছে। সাধুগণ তোমার ভাল দিক্‌টাই দেখিবেন, দুষ্ট ব্যক্তি মন্দ দিক্ ভিন্ন ভাল দিক্ দেখিতে পাইবে না। মনে কর, তুমি একজনকে একটা পরামর্শ দিলে। ইহাতে তোমার ভাল মন্দ দুই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কেহ ভাবিল, তোমার উদ্দেশ্য সৎ, আবার কেহ বা ভাবিল, তোমর উদ্দেশ্য অসৎ ভিন্ন হইতে পারে না। এই-রূপে দুই ভাবে কার্য্যের বিচার হওয়ায় সংসারে কত অশান্তি, কত মনো-মালিন্য, কত লাঞ্ছনা ও কত প্রতারণা অহরহ ঘটিতেছে। নল ও দময়ন্তীর

কার্য্য সম্বন্ধে দুই শ্রেণীর লোক দুই প্রকার বুঝিল। নলের প্রতি দময়ন্তীর ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন। আর নল যে দৌত্য কার্য্যে তাঁহাদের সহিত কোন রূপ প্রতারণা করেন নাই, দেবগণ ইহাও বুঝিলেন। এইজন্য তাঁহারা প্রণয়ী যুগলের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কাল কিন্তু অন্যরূপ বুঝিল। তাহার মতে, দেবগণ উপস্থিত থাকিতেও দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। অতএব নলদময়ন্তী দণ্ডার্হ। নলকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও দময়ন্তী সঙ্গ হইতে বিচ্যুত না করিলে কলির ক্রোধের শান্তি হইবে না। এখন একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, নল বা দময়ন্তী কলির ত কোনরূপ অপমান বা অপকার করেন নাই। তবে তাঁহাদের প্রতি কলির ক্রোধ হয় কেন? যাঁহাদের অপমান হইয়াছে বলিয়া কলির এত ক্রোধ, তাঁহারা ত কৈ অপমান বোধ করেন নাই। তাঁহারা ত নলদময়ন্তীর প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছেন। তবে কলির ক্রোধের কারণ কি? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, পরের অনিষ্ট করাই দুষ্টের স্বভাব। তুমি তাহার অনিষ্ট না করিলেও সে তোমার অনিষ্ট করিবে। সে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধে কেমন করিয়া কার্য্য করিবে? তাই কোন দূরদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন,

অপরাধো নমেঽস্তীতি নৈতৎ বিশ্বাস কারণম্।
বিদ্যতে হি নশংসেভ্যো ভয়ংগুণবতামপি॥

কিন্তু সংসারে পাপের প্রাধান্য যতই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, আর পুণ্যের যতই অনাদর হউক না কেন, যদি কেহ সামান্য মাত্রও অধর্ম্মাচরণ না করিয়া অবহিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সহজে কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। নল ধার্ম্মিক হইলেও একবারে নির্দ্দোষ ছিলেন না। শাস্ত্র-বিগর্হিত দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার অত্যধিক আসক্তি ছিল। তাহা ছাড়া, ধর্ম্মকর্ম্মাচরণের সময় বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও তিনি যে খুব সতর্ক ছিলেন, এমন বোধ হয় না। কলি তাঁহার এই শেষোক্ত অতি সামান্য দোষ পাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। সংসারের ইহাই নিয়ম। দুষ্টেরা অতি সামান্য ছল পাইলেই অনিষ্ট করিয়া বসে। সুতরাং যাহাতে অতি সামান্য মাত্রও পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে অতি সতর্ক হওয়া উচিত। নলের উপরি উক্ত দুইটি দোষ ছিল বলিয়াই কলি তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিয়াছিল।

দ্যূতক্রীড়ায় অত্যধিক আসক্তি থাকায়, নল হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেন। তিনি "সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র বস্ত্র পরিধায়ী ও অনাবৃতাঙ্গ হইয়া সুহৃদ্গণের শোক-বৃদ্ধি করতঃ অতি বিপুল সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন"। প্রজাগণ ধীরভাবে নলের এই নির্ব্বাসন দেখিল। নূতন রাজা ঘোষণা করিল, "যে ব্যক্তি নলের প্রতি সম্যক আস্থা করিবে, সে আমার বধ্য হইবে।" পৌরগণ পুষ্করের এই ঘোষণা দ্বারা নলের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বিবেচনা করিয়া নলকে আর কোন রূপে সমাদর করিল না। রাজা নল নগরের বহিঃপ্রদেশে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকিলেন, কিন্তু তিনি সৎকারার্হ হইয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সৎকৃত না হইয়া ত্রিরাত্র কাল জলমাত্র আহারে জীবন ধারণ করিলেন।" ভারতীয় প্রজাবৃন্দের এইরূপ এক দিকে অন্ধ রাজভক্তি ও অপর দিকে স্বাধীনতার একান্ত অভাব দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই। যে রাজা এতদিন তাহাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তিনি নিঃসম্বল, পথের ভিখারী। নূতন রাজার ভয়ে কেহই তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! আপন জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকার করা পাশ্চাত্য দেশে বিরল নহে; আমাদের দেশেও নহে। তবে রাজাদেশ অবহেলা করিয়া অপরের সাহায্য করা ভারতে বিরল। ভারতে কয়জন ফ্লোরা ম্যাক্ডোনাল্ড দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার প্রধান অথবা একমাত্র কারণ এই যে, রাজা হিন্দুর চক্ষে দেবতা, তাঁহার আদেশ যতই অন্যায় বলিয়া বোধ হউক, তাহা অবহেলা করিলে মহাপাপ! এই জন্যই নল বা যুধিষ্ঠিরের অন্যায় নির্য্যাতনে প্রকৃতিপুঞ্জ নীরব ছিল। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পানিপথ বা পলাশী প্রজার হৃদয় বিচলিত করিতে পারে নাই। আজি যদি অপর কোন রাজা ভারত আক্রমণ করেন, তবে ইংরাজ যে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট কোন সাহায্য পাইবেন, তাহাত আমার বোধ হয় না। আর ইংরেজকে দূর করিয়া অপর কেহ যদি ভারতের অধীশ্বর হয়েন, তবে ভারতের প্রজা যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে, ইহাই বা কিরূপে মনে করি? দুই চারিজন কঙ্গ্রেস করিয়া চীৎকার করিলে প্রজার হৃদয় হইতে বহু সহস্র বৎসরের সংস্কারের অপনোদন হইবে না। দেশের সমস্ত লোককে সাহেব না করিতে পারিলে যে তাহারা রাজনীতি বুঝিবে, তাহাত বোধ হয় না। তাহাতে সুফল হইবে কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

যাহা হউক, নলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তিনি নানা কষ্টে পতিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বা অপর কেহ বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা তাঁহারই দোষে হইয়াছে, তিনি স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতেছেন। তাঁহার নিজের কোন দোষ নাই, সমস্তই কাল কর্ত্তৃক ঘটিতেছে, এই বিশ্বাসেই নল হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বন মধ্যে যখন তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি হারাইলেন, তখন দময়ন্তীকে বুঝাইলেন,

যেষাং প্রকোপাদৈশ্বর্য্যাৎ প্রচ্যুতোঽহমনিন্দিতে।
প্রাণযাত্রাম্নবিন্দেয়ং দুঃখিতঃ ক্ষুধয়ান্বিতঃ॥
যেষাংকৃতে ন সৎকারমকুর্ব্বন্ ময়ি নৈষধাঃ।
ইমেতে শকুনা ভূত্বা বাসোভীরু হরন্তি মে॥

"আমি যাহাদের কোপহেতু ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি এবং ক্ষুধা-পীড়িত দেহে অতিকষ্টেও প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি না; হে ভীরু যাহাদের নিমিত্তে নিষধবাসী প্রজা সকল আমার সমাদর করে নাই, তাহারাই পক্ষী হইয়া আমার বস্ত্র হরণ করিলে।"

আবার নিজদোষ স্খালনের জন্য দময়ন্তীকে বলিতেছেনঃ—

হে ভীরু, আমার যে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করি, এ সকল আমি স্বয়ং করি নাই, কলি করিয়াছে।"

মমরাজ্যং প্রণষ্টং যন্নাহং তৎকৃতবান্স্বয়ম্।
কলিনা তৎকৃতং ভীরু যচ্চত্বামহমত্যজম্॥

নল পুষ্করকে বলিতেছেন,—"আমি যে পূর্ব্বে তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছিলাম, তাহা তোমার শক্তি দ্বারা হয় নাই, কলি সেই কার্য্য করিয়াছিল।"

কর্কোটক নামক নাগেরও ঐ বিশ্বাস।

ন ত্বয়াতৎকৃতংকর্ম্ম যেনাহং বিজিতঃপুরা।
কলিনাতৎকৃতংকর্ম্ম ত্বঞ্চমূঢ় ন বুধ্যসে॥

"হে নল, আপনি যাহার নিমিত্তে প্রবঞ্চিত হইয়া মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন, সে মদীয় বিষ দ্বারা কষ্ট ভোগ পূর্ব্বক আপনার শরীরে বাস করিবে।"

আর দময়ন্তী স্ত্রীলোক, তিনিত বলিবেনই, নলের কোন দোষ নাই,

"ক্ষুদ্রাশয় দ্যূতনিপুণ কুটিল কোন নীচ প্রকৃতি প্রবঞ্চকেরা সেই সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ রাজাকে আহ্বান পূর্ব্বক অক্ষক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়াছে।"

অদৃষ্টে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই নল এত কষ্টেও একবারে বিষণ্ণ হয়েন নাই। তাঁহার নিজের দোষে যে এত অনর্থ ঘটিল, নল তাহা বুঝেন নাই। অদৃষ্টে এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে বড়ই প্রবল ছিল। ইহাতে সুফল ও কুফল উভয়ই ফলিত। আমার বিশ্বাস, কোন মত যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক না কেন, তাহা হইতে যে কোন মঙ্গল হইবে না, এমন নহে। সংসারের কোন পদার্থই একবারে সম্পূর্ণ অনিষ্ট-কর নহে। অদৃষ্ট বা দৈবের শক্তির নিকট পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নহে, এই বিশ্বাসে, একদিকে যেমন মানবকে বিপদে চঞ্চল ও অভিভূত করিতে পারে না, অপর দিকে তেমনি তাহাকে স্বকীয় দোষের সংশোধনে অনবহিত করিয়া উন্নতির পথ রোধ করে। সেই জন্য অক্ষ ক্রীড়া যে মহা দোষের, এত নির্য্যাতনেও নল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বৃহদশ্ব মুনিও তাহা বুঝেন নাই। তিনি নলের সমদশাপন্ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—

"হে নৃপতে পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নহে, এই ভাবিয়া তাহার উৎপত্তি বা বিনাশে আপনার চিন্তা করা উচিত হয় না। আপনি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। দৈব্য-বৈষম্য-প্রযুক্ত পুরুষকার বিফল হইলে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ব্যক্তিরা আত্মাকে বিষাদিত করেন না।"

নলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলিই যত অনর্থের মূল, পুষ্করের কোন দোষ ছিলনা। এই ভাবিয়া পুষ্করকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। পুষ্করকে দোষী জানিয়া নল যদি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ ভারতের নিত্য ঘটনা হইয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসরই ভারতের কোন না কোন স্থানে স্বল্পাধিক শস্য হানির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শুভ সংবাদ এই যে, মহাপ্রাণ ইংরাজজাতি, জীবন রক্ষার্থে সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন, এবং অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের আয়োজন বিপুল। ইংরাজ বণিক ও ধনীগণও ভারতের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোটী কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দান করিতেছেন। এই দৈব বিড়ম্বিত দেশের সাহায্য বিষয়ে ইংরাজ রাজপুরুষ এবং ধনি সন্তানগণ যে প্রকার মহানুভবতা, পরদুঃখকাতরতা এবং সার্ব্বজনীন প্রেম দেখাইয়াছেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য। যাহাতে দুর্ভিক্ষ ভবিষ্যতে সংহারক-মূর্ত্তিতে প্রকাশ না হয়, তাহার জন্য রাজপুরুষগণ যথোচিত চিন্তিত। নানা প্রকার উপায়ের প্রস্তাবনা ও সমালোচনা হইতেছে। ইউরোপের জাতিমাত্রেরই একটী বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্য তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র অগ্রণী ও বিজয়ী। কোন রূপে বাধাবিঘ্ন বা দুর্ঘটনা তাঁহাদের পথরোধক হইতে পারে না। সকলই নিয়তির নির্ব্বন্ধ বলিয়া তাঁহারা বদ্ধহস্ত থাকিবার লোক নহেন। তাঁহারা কর্ম্মবীর, আর আমরা বাক্যবীর। 'উদ্‌যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' এই তাঁহাদের মূল মন্ত্র, "দৈবেন দেয়ম" এ কথা তাঁহাদের কোষ্ঠীতে স্থান পায় না। তাই আজ ইংরাজ রাজপুরুষগণ দুর্ভিক্ষের মূল অন্বেষণ ও তন্নিবারক উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত আছেন। সম্প্রতি যে শিক্ষা-সংস্কারক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ দমনেচ্ছা সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সবিশেষ বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য মতামত সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু যিনি যতই বলুন বা করুন, ভারতের দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র কৃষিজাতই যে দেশের সম্বল, সে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব কখনই একেবারে নিবারিত হইতে পারে না। অবশ্য কৃষিব্যাঙ্ক ও কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দ্বারায় বহু পরিমাণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষি প্রধান দেশে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান বৎসরে রুসিয়ায় কৃষকবর্গকে যে দুর্ভিক্ষ নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। দুর্ভিক্ষের শোকাবহ ফল নিবারণের জন্য রুসিয়ার জার (সম্রাট) নানাপ্রকারে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতবর্ষেও যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ হইত না, এখনই কেবল অনাহারীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এরূপ নহে। দুর্ভিক্ষও হইত, লোকক্ষয়ও প্রচুর হইত। তবে বর্ত্তমান সময়ে দুর্ভিক্ষ যেমন নিত্য ঘটনা হইয়াছে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তেমন ছিলনা। এতৎ সম্বন্ধে বাবু পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে আগামী বারে প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন পৃথ্বীশ বাবুর দুর্ভিক্ষ বিষয়ক পুস্তিকা পাঠ করেন। ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, এম এ।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

২য় ভাগ] শ্রাবণ, ১৩০৮। [১০ম সংখ্যা।

সরফরাজ খাঁ।

সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালের শেষ সময় হইতেই তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯১ খৃঃ যখন পারস্যাধিপতি নাদের সাহ বিপুল বিক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে বিচরণ করিতে-ছিলেন, তখনই সুজাউদ্দীন পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎ-পুত্র সফররাজ অবিরোধে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করিয়া, নাদেরের অনুমতি পত্রানুসারে, পিতৃ প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীসভার পরামর্শ ক্রমে ঃগত বর্ষ ত্রয়ের বাকী রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য মধ্যে নাদেরের নামে মুদ্রা প্রস্তুত ও স্তোত্র পাঠের অনুমতি প্রদান করেন। মাতামহের অনুকরণে সরফরাজও বাহিরে ধর্ম্মনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন। কোরাণ পাঠার্থী ও অন্যান্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে সরফরাজ বেতন প্রদানে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহার বাহ্যাড়ম্বর মাতামহ মুরশিদের অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক ছিল। এমন কি, তিনি সর্ব্বদাই দুই সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত করিতেন।

পুত্র, মাতৃস্নেহের অধিকার লাভে কখনই বঞ্চিত হয় না সত্য, কিন্তু সরফ-রাজ, জননীর নিকট হইতে যে পরিমাণ বাৎসল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সকল পুত্র মাতার নিকট লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সরফরাজের জননী, জিনেত্ অলনিসা, পুত্রকে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করাইতে ভালবাসি-তেন না। এই কারণেই সুজার শাসন সময়ে, সরফরাজ, সর্ব্বদাই মুর্শিদা-বাদে বাস করিয়া স্নেহময়ী জননীর অকৃত্রিম স্নেহসম্ভোগ দ্বারা দীর্ঘকাল

অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ বিহারের শাসনকর্ত্তার পদশূন্য হইলে সুজা, স্বীয় পুত্রকে সেই পদ প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হন, কিন্তু বেগম জিনেত্ অলনিসার অগাধ স্নেহবাৎসল্য কোন ক্রমেই পুত্রের স্থানান্তর বাসের সম্মতি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াও সরফরাজ মাতৃস্নেহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে প্রতিনিধি দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।

ইতিহাস পাঠে সরফরাজের দুই একটী রাজোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহার অসদ্গুণের তুলনায় সে গুলি অকিঞ্চিৎকর বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সত্য বটে সরফরাজ কিঞ্চিৎ তেজস্বী ও সাহসী বীরপুরুষের ন্যায় অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সত্য বটে—সময়ে সময়ে তিনি "কার্য্যের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্রের অনুসরণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার দেহে যে সকল অসদ্গুণ অবস্থিতি করিত, তাহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর মূল্য অতি অল্প সন্দেহ নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন যে, সরফরাজের প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে এই ছিল যে, তিনি সুরাপান করিতেন না বা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। * তাঁহার স্বল্পকাল ব্যাপী রাজত্বকালের পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, সুজার যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, সরফরাজ তাহাদের অধিকাংশেরই উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় পরায়ণতারূপ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সরফরাজ অন্তঃপুরের আমোদে বিশেষ অনুরক্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে, তাঁহার অন্তঃপুরে বহু প্রকারের পঞ্চদশ শত স্ত্রীলোক রক্ষিত হইত। সেই সকল রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নবাব, রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সুখভোগে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। * ইন্দ্রিয়দোষ বাঙ্গলার নবাবগণের নিজস্ব ও অনুল্লঙ্ঘনীয় হইলেও সরফরাজ এবং

* "In short all that could be said in this favour was that he was neither a drunkard nor an oppressor." History of Bengal, by C. Stewart. p. 271.

* "He was also much addicted to the pleasure of *haren*; and his seraglio is said to have consisted of 1500 women of various discriptions; amongst whom he dissipated much of his time and entirely neglected business."

History of Bengal, by C. Stewart, p. 271.

সিরাজদ্দৌলা এই দোষের অধিকারী সূত্রে নবাব সমাজের যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কোন কালে যে সে কলঙ্ক রাশির ক্ষয় হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এই ভয়ঙ্কর দোষের জন্যই উক্ত নবাবদ্বয়ের শাসনকালে বাঙ্গলায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। দেশে যত কিছু বিপ্লব, যত কিছু ষড়যন্ত্র, যত কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় সমস্তেরই প্রধান কারণ উক্ত নবাবদ্বয়ের কলুষিত চরিত্র। সিরাজের চরিত্র বর্ণন বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অদ্য আমরা সংক্ষেপে সরফরাজ খাঁর প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকবর্গকে প্রদান করিব।

সরফরাজের ঔদ্ধত্যে ও অসচ্চরিত্রায় সুজাউদ্দীনের সযত্ন প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রী-সভার সভ্যমণ্ডলী ও বাঙ্গলার তৎকালীন অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ নবাবের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুজাউদ্দীন মন্ত্রীসভার সভ্যগণের পরামর্শ ব্যতীত কদাচ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরফরাজকেও উক্ত সভার সভ্যমণ্ডলীর মন্ত্রণাক্রমে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দিয়া যান। কিন্তু "চোর না শুনে ধরম কাহিনী"। পিতার মৃত্যুর পরই পুত্র বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলেন। কমলা যখন যাহার প্রতি অপ্রসন্না হন, তখনি তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং বন্ধু ও গুরুজনের সদুপদেশ তাহার কর্ণে কর্কশ ও বিষবৎ প্রতীয়-মান হয়। সে তৎকালে হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিপদ সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে। সরফরাজেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। নবাব ইন্দ্রিয় লালসা ও বিদ্বেষ বুদ্ধির তাড়নায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়াছিলেন। পিতার আমল হইতে যাঁহারা রাজদ্বারে বিশেষ সম্মানিত হইয়া আসিতে-ছিলেন, যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব নবাবের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ পরিগণিত হইতেন, সরফরাজ একে একে তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশকেই অপমানিত করিতে আরম্ভ করেন। প্রভুশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি পুঞ্জের মাননাশে প্রবৃত্ত হইলে স্বতঃই প্রজাকুল অচিরে সে শক্তির অনিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া থাকে। সে কালের জমীদার ও পদস্থ প্রজাগণের দিল্লীর দরবারে বিশেষ সম্মান, প্রতি পত্তি এবং পদমর্য্যাদা ছিল। দেশের লোকের একতা ছিল; দশে মিলিয়া বাদসাহের নিকট কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিলে সম্রাট সে প্রস্তাব কোন-মতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু সে সময়ে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ নানা কারণে নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং তৎকালে

সরফরাজের অনিষ্ট চিন্তায় প্রজাবর্গের চেষ্টা কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নহে। কি কারণে সরফরাজের প্রতি মুর্শিদাবাদবাসী ব্যক্তিগণ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এইবার আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শেঠদিগের সহিত মনোবিবাদ, এবং হাজি আহাম্মদের প্রতিকুলাচরণই সরফরাজের রাজ্যচ্যুতি, এমন কি মৃত্যুরও প্রধান কারণ। শেঠদিগের সহিত নবাবের মনোবিবাদের কারণ সম্বন্ধে শেঠেরা বলেন যে, মুরশিদ কুলী খাঁ মৃত্যুকালে শেঠদের নিকট ৭ কোটী টাকা জমা রাখিয়া যান। সরফরাজ সেই টাকার জন্যে ফতেচাঁদ জগৎশেঠকে * বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন এবং একদা এই সূত্রে নবাব উক্ত জগৎ শেঠকে অপমান সূচক বাক্যও প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য যে, সেই জন্যই ফতেচাঁদ সরফরাজের অনিষ্ট চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। সরফরাজের প্রতি জগৎশেঠের বিদ্বেষের কারণ সম্বন্ধে হলওয়েল, অর্ম্মে ও ষ্টুয়ার্ট প্রমুখ প্রধান প্রধান ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী † রূপের গৌরবে তৎকালে বাঙ্গলায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠেন। প্রস্ফুটিত পুষ্পভারাবনতা লবঙ্গ লতার মনোমোহন সৌগন্ধ যেরূপ সমীরণ সঞ্চালনে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই জগৎ শেঠের পুত্র বধূর অনুপম রূপলাবণ্যের কথাও লোকপরম্পরায় দেশ বিদেশে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। এমন কি, একদা সেই শেঠ রমণীর রূপলাবণ্যের কাহিনী নবাব সরফরাজেরও শ্রুতিগোচরে আইসে। নবাব সেই একাদশ বর্ষীয়া হিন্দু রমণীর অশ্রুতপূর্ব্ব রূপমাধুরীর কথা অবগত হওয়ায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কেবল মাত্র একবার সেই রূপের ছবিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দর্শন লালসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ফতেচাঁদকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য যে, ফতেচাঁদ এই হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণে বিশেষ ব্যথিত হইয়া নবাবকে এরূপ অন্যায় অনুরোধ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দেন এবং ইহাতে হিন্দুর জাতিনাশ ও বংশ মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়াও নবাবের নিকট প্রকাশ করেন, কিন্তু দুর্বৃত্ত সরফরাজ কিছুতেই ক্ষান্ত হন নাই। অধিক কি, অবশেষে বলপূর্ব্বক জগৎশেঠের বাটী

* হীরানন্দের অধস্তন ৩য় পুরুষ ও মাণিক চাঁদের পোষ্যপুত্রই প্রথম জগৎ শেঠ হন।

† অর্ম্মে, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতির ইতিহাসে এই রমণী ফতেচাঁদের পুত্রবধূ এবং হলওয়েলের [illegible] ফতে' 'দের কনিষ্ঠ পৌত্রের স্ত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হইতে সেই লাবণ্যময়ী শেঠ রমণীকে আনয়ন করাইয়া দর্শনান্তে পুনঃ প্রেরণ করেন। অনেকে উক্ত শেঠ রমণীর প্রতি সরফরাজের অসদ্ব্যবহারের ইচ্ছা ও তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিবার কথাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। * যাহাই হউক, ইহাতে শেঠদিগের মর্য্যাদার বিশেষ হানি হয় এবং সরফরাজের এই ব্যাপারে বঙ্গভূমি চমকিত হয় ও দুর্বৃত্ত নবাবের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত সকলেই বদ্ধপরিকর হন।

তিন চারিজন বিশ্বস্ত বন্ধুর কুপরামর্শে সরফরাজ হাজি আহাম্মদের প্রতিকূলেও হস্ত প্রসারণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। হাজি আহাম্মদ এক সময়ে একটী রমণীকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণার্থ স্থিরসংকল্প হইলে সরফরাজ স্বীয় পুত্রের সহিত সেই কামিনীর পরিণয় সম্পন্ন করেন। ইহাতে সরফরাজের প্রতি হাজি আহাম্মদের ক্রোধের সঞ্চার হয়। এইরূপ নানা কারণে সরফরাজের পিতার মিত্রবর্গ (মন্ত্রীসভার সভ্যগণ) সরফরাজের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন। এমন কি, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত অবশেষে বিপক্ষদল সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সময় দিল্লীশ্বর বিশেষ হীনপ্রতাপ হইয়াছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বেই পারস্যরাজ নাদের সাহ ভারতের রুধির পান পূর্ব্বক তাহাকে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট রাখিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন মাত্র।

তিনি দিল্লীশ্বরকেও অব্যাহত রাখেন নাই, দিল্লী জয় করতঃ ৯ কোটী মুদ্রা, বহুসংখ্যক মণিমুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহু মূল্য অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বর দুর্ভাগ্য মহম্মদ সাহকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত পরিত্যাগ করেন। সুতরাং দিল্লীশ্বরের তৎকালীন দুর্ব্বলতা সহজেই অনুমেয়।

এসময়ে, দেশের দশ জনে মিলিয়া উক্ত বাদসাহের নিকট একটা অন্যায় প্রস্তাব করিলেও যে তিনি সহসা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইবেন,

* "The young woman was sent to the Palace in the evening, and after staying there a short space, returned, unviolated indeed, but dishonoured to her husband, History of Bengal, by C. Stewart. p. 271.

[ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের এ উক্তির অনুকূলে আমরা মত প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ কোন মুসলমান গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তির পোষকতা দৃষ্ট হয় না।]

এরূপ আশা কখনই করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, সরফরাজের ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া ও মন্ত্রি-সভার সভ্যগণের উত্তেজনায় মুরশিদাবাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্র যোগে বিহারের বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁকে মুরশিদাবাদের নবাবের মস্‌নদে উপবেশন করাইবার পরামর্শ করিয়া দিল্লী দরবারে উপস্থিত হন। যথাকালে তাঁহাদের আবেদন সম্রাটের শ্রুতিগোচর এবং অচিরে তাঁহাদের প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত হয়। তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে আলিবর্দ্দীর স্বপক্ষে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা তিন প্রদেশের সুবাদারীর সনন্দলাভ করেন। আলিবর্দ্দীও রাজ্যলাভের আশায় সম্রাটকে বার্ষিক নির্দ্ধারিত রাজস্বের অধিক ১ কোটী মুদ্রা ও সরফরাজের সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এ দিকে সরফরাজের বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রই একরূপ স্থির হইয়া গেল, কিন্তু সরফরাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

এই সময় বাঙ্গলার বহুসংখ্যক সৈন্যকে তাহাদের কার্য্য হইতে অপসৃত করা হয়। পরে সেই অবসর প্রাপ্ত সৈন্যগণ পাটনায় প্রেরিত হইয়া আলিবর্দ্দীর অধীনে নিয়োজিত হয়। অতঃপর শুভদিনে, শুভক্ষণে আলিবর্দ্দী, সরফরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পাটনা পরিত্যাগ কালে আলিবর্দ্দী এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, তিনি ভোজপুরের জনৈক জমীদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। নবাব সরফরাজের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত কপট-সদ্ভাব প্রদর্শনে ক্রটী করেন নাই। পাটনা হইতে কিছু দূরে পৌছিয়াই আলিবর্দ্দী নিজ পক্ষ সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দকে এক স্থানে সমবেত করেন এবং হিন্দু কর্ম্মচারীগণের এক হস্তে তুলসীপত্র অন্য হস্তে গঙ্গাজল পাত্র ও মুসলমান কর্ম্মচারীর তরফে কোরাণ:প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে, "আপনি যাহাকে আপনার শত্রু বলেন, আমরাও তাহাকে আমাদের শত্রু বলিয়া এবং আপনার মিত্রকে নিজের মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিব। আপনার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে, আমরাও তাহার অংশ গ্রহণ করিব। আপনি আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন, আমরা অদম্য উৎসাহের সহিত তাহাতেই প্রবৃত্ত হইব।" অতঃপর আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ বাঙ্গলার দিকে ধাবিত হইলে আলিবর্দ্দী সরফরাজকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে—

"আপনি আমাদের পরিবারবর্গের প্রতি যথেষ্ট অপমান প্রদর্শন

করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ অপমানের হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অন্যত্র রাখিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, কিন্তু এখনও আমি আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহি।" *

এ দিকে হাজি আহম্মদ, আলিবর্দ্দীর সহিত রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয় সম্পাদনের নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিবার ব্যপদেশে মুর্শিদাবাদ হইতে বাহির হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আলিবর্দ্দী সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। আলিবর্দ্দীর প্রশংসনীয় চরিত্রে আমরা প্রধানতঃ দুইটি কলঙ্কের রেখা দর্শন করিতে পাই। প্রথম—প্রভু পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান এবং নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গিরিয়ার সমরাঙ্গনে অবতরণ ও প্রভু পুত্রের জীবননাশের হেতু ; দ্বিতীয়—মনকরার ময়দানে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ-বধ। আলিবর্দ্দী প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার দ্বিতীয় কলঙ্ক উল্লেখ করিব।

অসচ্চরিত্রতার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সরফরাজ ও সিরাজের নাম সমধিক পরিজ্ঞাত, মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী তীরস্থ বিশ্ববিখ্যাত পলাশী প্রান্তরে যেমন আলিবর্দ্দী দৌহিত্র সিরাজের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইয়াছিল ; ভাগীরথী তটবর্ত্তী সুবৃহৎ গিরিয়া প্রান্তরেও সেইরূপ মুর্শিদ কুলীর দৌহিত্র সরফরাজেরও সৌভাগ্য-তপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবলীলার অবসান হয়।

আলিবর্দ্দী ও সরফরাজের সৈন্য, মুর্শিদাবাদের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে প্রসন্ন সলিলা ভাগীরথীর তীরে এক প্রশস্ত ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। এই সুবিস্তৃত ময়দানে গিরিয়া নামক একটী পল্লী আছে, তদনুসারে এই সমগ্র ময়দানটীও গিরিয়া নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণ গিরিয়া জঙ্গীপুর সবডিভিসন হইতে অধিক দূরে নহে। এই গিরিয়ার নাম স্মরণ হইলেই এখনও সেই দুর্ভাগ্য সরফরাজকে মনে হয়, কারণ এই গিরিয়াই সেই হতভাগ্য নবাবের স্মৃতিচিহ্ন ও বধ্যভূমি। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ গিরিয়া প্রান্তরেই মুরশিদ কুলীর বংশের সহিত মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের সকল সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য নিঃশেষিত হয়। এই গিরিয়া যুদ্ধে † আলিবর্দ্দী চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা কিছুতেই লয় হইবার নহে। দেশের হিত

* Stewert's History of Bengal, P. 273-74.

† এই গিরিয়া প্রান্তরেই ১৭৬৩ খৃঃ মীর কাশিমের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাঠক যথাস্থানে তাহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

ও দেশের মঙ্গল সাধনের মূলে যদি আলিবর্দ্দীর বাসনা না থাকিত,তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ ক্ষেত্রেও আলিবর্দ্দী চরিত্রের প্রশংসাই করিতাম। সত্য বটে, সরফরাজ অসচ্চরিত্র ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার অসদ্ব্যবহারে দেশের অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই বলিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ নবাব,—যাঁহার পিতার অন্নে আলিবর্দ্দী চিরজীবন প্রতিপালিত, সেই প্রভু পুত্র নবাব সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার বিরুদ্ধে সামান্য কারণে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া অস্ত্রধারণ, আলিবর্দ্দীর ন্যায় ইতিহাস বিখ্যাত ধর্ম্মভীরু নবাব চরিত্রে চিরদিনই কলঙ্ক ঘোষণা করিতে থাকিবে, যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে গিরিয়া প্রান্তর রণবাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি মাংসলোলুপ জন্তুগণ ভবিষ্যতের আশায় মনে মনে মহানন্দ পোষণ করিতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত,তুরঙ্গমের হ্রেষারবে অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ সরফরাজের প্রধান সেনাপতি গাওস খাঁ আলিবর্দ্দীর সৈন্যের বিরুদ্ধে ভাগীরথী পার হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হইলে একবার সন্ধির কথাবার্ত্তা হয়। আলিবর্দ্দী সরফরাজকে বলেন, যদি আপনি আপনার মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে আমি আপনার আজ্ঞাধীন থাকিতে পারি। সরফরাজ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহার নবীন বন্ধুবর্গ কিছুতেই তাঁহাকে উক্ত সন্ধির সর্ত্তে বাধ্য হইতে দিলেন না, সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষই যুদ্ধার্থ পুনরায় প্রস্তুত হইল। আলিবর্দ্দীর সেনাপতি নন্দলালের সহিত গাওস খাঁর যুদ্ধারম্ভ হইলে আলিবর্দ্দী স্বয়ং দুই দল সৈন্য লইয়া সরফরাজের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজও স্বয়ং এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বীরের ন্যায় কিছুক্ষণ সমরাঙ্গনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিপন্ন হন। তাঁহার হস্তীচালক প্রভুকে বিপন্ন দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগে উদ্যত হয়, কিন্তু রণে মত্ত প্রভুর তিরস্কারে সে হস্তীপৃষ্ঠে প্রভুকে লইয়া সমর ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়। সরফরাজ মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য সমরপিপাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনবায়ুর অবসান কাল ক্রমশঃই অপ্রশস্ত হইয়া আসিতে আরম্ভ হইল। জগৎ শেঠের কুলবধূর অব্যর্থ অভিসম্পাতের ফলে ও অশীতিপর স্থবির জগৎ-

শেঠের দুঃখাশ্রুপাতে সরফরাজের রাজ্যলক্ষ্মী বিচলিতা হইয়াছিলেন, সুতরাং জগদীশ্বর শীঘ্রই যেন তাঁহার পাপের প্রতিফল প্রদানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অনতিবিলম্বেই আচম্বিতে একটী বন্দুকের গুলি সরফরাজের মস্তকে পতিত হইল! নবাব তৎক্ষণাৎ সেই হস্তিপৃষ্ঠেই মৃত্যুর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। হস্তিপালক সরফরাজের শবদেহ লইয়া রাজধানীতে গমন করিল। গোরাস খাঁর অধীনস্থ আফগান সৈন্য ব্যতীত সকলেই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ১৭৪১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সরফরাজের মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবস প্রাতে (১৫ই সাকার ১১৫৩) আলিবর্দ্দীও নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি রাজপ্রাসাদে গমন না করিয়া প্রথমতঃ সরফরাজের মাতা জিনেত্ অলনিসার বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বেগমের বাসভবনের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণানন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক জনৈক খোজাকে উক্ত বেগম সকাশে প্রেরণ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন—

"ভাগ্যে যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। আপনার অবজ্ঞাত ভৃত্যের অকৃতজ্ঞতার কাহিনী ইতিহাসে অক্ষয় ভাবে চিরদিন লিখিত থাকিবে, কিন্তু আপনার অধম ভৃত্য শপথ করিয়া বলিতেছে যে, যতদিন তাহার জীবন থাকিবে, ততদিন সে কোন প্রকারে আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবে না।

আপনার ভৃত্য এ আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতেছে যে, আপনি স্বীয় ক্ষমাগুণে কালক্রমে অধীনের কুকার্য্য বিস্মৃত হইবেন। অধীনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রমাণ স্বরূপ এ দাসের সম্পূর্ণ অধীনতা, চিরবাধ্যতা, ও প্রগাঢ় ভক্তি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" (Stewart)

এদিকে হস্তিপালক সরফরাজের মৃত দেহ লইয়া রাজধানীতে পৌছিলে সরফরাজের পুত্র মীর্জ্জা আমানি নাক্টাখালি নামক স্থানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পিতার সেই মৃত দেহ সমাধিস্থ করেন। *

---

* At midnight his (Sarfarez's) son Mirza Amany caused it to bee buried in a private manner at Nuktakhaly.

নাক্টাখালি নসীপুরের সন্নিকট, সাহানগরের থানার পূর্ব্বাংশে, আপাততঃ জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। এখানে কতকগুলি সমাধি রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী যে সরফরাজের সমাধি, তাহা এক্ষণ নির্ণয়ের উপায় নাই।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান শাসনকর্ত্তা (নবাব) গণের সমাধিগুলি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন রাজধানীর অনেক প্রাচীন কথা মনে আনিয়া দেয় ও বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের শ্মশানত্ব প্রতিপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে।

কাঠরার ধ্বংসমুখে পতিত মসজিদের সোপানাবলীর নিম্নদেশে মুর্শিদাবাদ স্থাপয়িতা চির নিদ্রায় অভিভূত, তদীয় জামাতা অশেষ গুণালঙ্কৃত মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ ডাহাপাড়া গ্রামের রোশনীবাগ নামক রমণীয় উদ্যানে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। লালবাগের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম কুলে খোসবাগ নামক স্থানে বঙ্গের আদর্শ নবাব সুপ্রসিদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজের সহিত চিরশায়িত রহিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগ্য সরফরাজের সমাধির এক্ষণ অনুসন্ধান করা বড়ই কঠিন।

ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ মাস কাল রাজত্ব করিয়া সরফরাজ সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে মুর্শিদাবাদের কোন নবাবই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রধান প্রধান দুর্ভিক্ষের তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ	শাসনকর্ত্তা
১৭৬৯-৭০	গঙ্গা নদীর নিম্ন উপত্যকা	কার্টিয়ার
১৭৮৩ ৮৪	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	ওয়ারেণ হেস্টিংস্
১৭৯০-৯২	মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিয়দাংশ	লর্ড কর্ণওয়ালিস্

যাঁহার অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা প্রভাবে মুর্শিদাবাদের বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, অল্পদিন হইল, আমাদের মুর্শিদাবাদের সেই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় বি এ, মহোদয় সরফরাজ বংশীয়দের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের ৩য় নবাব হতভাগ্য সরফরাজের সমাধির কতকটা অনুসন্ধান পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম।

খৃষ্টাব্দ	দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ	শাসনকর্ত্তা
১৮২৩-২৫	মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কতকাংশ	লর্ড আমহার্ষ্ট্
১৮৩২-৩৩	মান্দ্রাজ, বোম্বাই, হায়দারাবাদ	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্
১৮৩৭-১৮৩৮	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ রাজ পুতানা	লর্ড অক্ল্যাণ্ড্
১৮৬০-৬১	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব	লর্ড ক্যানিং
১৮৬৫-৬৬	উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর বঙ্গ, মান্দ্রাজ, মহীশূর, হায়দারাবাদ, বোম্বাই	সার্ জন্ লরেন্স্
১৮৬৮-৬৯	রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, পঞ্জাব	লর্ড লরেন্স্
১৮৭৩-৭৪	বিহার, বাঙ্গালা, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	লর্ড নর্থব্রুক্
১৮৭৬-৭৮	দাক্ষিণাত্য, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা পঞ্জাব	লর্ড লিটন্
১৮৯৬-৯৭	পশ্চিম ভারতবর্ষ, মধ্য প্রদেশ,	লর্ড এল্‌গিন্
১৮৯৯-১৯০০	পশ্চিম ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কতকাংশ	লর্ড কর্জ্জন্

এতদ্ব্যতিরিক্ত স্বল্পস্থানব্যাপী দুর্ভিক্ষ অনেকগুলি ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদের উপায় ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে। যাহাতে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন আক্রমণ অথবা প্রচণ্ডতা কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়, তাহাও সাদরে গ্রহণ করা উচিত, এবং তদ্বিষয়ক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। কৃষিশিক্ষা বিস্তার ও কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাবনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সকলেরই সবিশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছেন। কৃষি ও কৃষক উভয়েরই উপর রাজার সস্নেহ দৃষ্টি সূচিত হইতেছে। আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে।

গবর্ণমেণ্টের সাধু সঙ্কল্পে আহ্লাদিত হইয়া কেবল মাত্র জয়ধ্বনি করিলে চলিবে না। ডাক্তার ঔষধ নির্দ্দেশ করিলেই ব্যাধি দূরীভূত হয় না; রোগীরও যথা সময়ে এবং যথা মাত্রায় ঔষধ সেবন করা চাই। রাজা আমাদের উপকার করিতে প্রস্তুত, আমাদেরও উপকৃত হইবার জন্য সমধিক প্রস্তুত

হইতে হইবে। কঠিন প্রস্তরময় স্থানে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয় না, কিন্তু সুকর্ষিত ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফলদায়ক হয়। আমরা যদি রাজার সাধু উদ্দেশ্যের জন্য সম্যক্ রূপে প্রস্তুত না হই, তবে সমস্তই পণ্ড হইবে। এবং নিরাশার নিবিড় তিমির নিবিড়তর হইবে। রাজার সহকারী হইলেই নিশ্চিত সুফল লাভ করিব, অন্যথা অদ্য যে হাহাকার, কল্যও সেই হাহাকার! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শত বৎসর পূর্ব্বে কি দুর্ভিক্ষের কারণ সজীব অবস্থায় ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়েই সহসা তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে? অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সম্ভব কি তখন ছিল না? কোন নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ফলে অনতিব্যবহিত ঋতুবিকার বর্ত্তমান কালে উপর্য্যুপরি সংঘটিত হইতেছে কি? বিজ্ঞানবিৎ উত্তর দেন যে, এত অল্প সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। সে কালেও অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ছিল, এখনও অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে তৎকালে দুর্ভিক্ষ পরম্পরা সুদূর-ব্যবস্থিত ছিল, এখনই বা তাদৃশ হয় না কেন? ইহার কারণ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন। কিন্তু এই কারণ নির্দ্দেশ অযথা সংক্ষিপ্ত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক।

মোগল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি। একেবারেই ছিল না। যে শস্য হইত, তাহা সমস্তই দেশের ব্যয়ে নিয়োজিত হইত, এবং অতিরিক্ত দেশেই সঞ্চিত হইত। অগত্যা কোন সময়েই শস্যের মূল্য অত্যধিক হইত না। সাধারণ লোকেরা যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য শস্যের বিনিময়ে ক্রয় করিত। বস্ত্রের জন্য নগদ পয়সা ব্যয় করিতে হইত না। জমিতে যে কার্পাস জন্মিত, তাহা হইতে স্ত্রীলোকেরা অবকাশমত সূতা প্রস্তুত করিত, এবং ঐ সূতা হইতে তন্তুবায় দ্বারা ধান্যের বিনিময়ে বস্ত্রবয়ন করান হইত। অবশ্য সে বস্ত্র এখনকার মত চাকচিক্যশালী হইত না, কিন্তু অধিককালস্থায়ী হইত।

চাকর নিযুক্ত করিতে হইলে তাহার জন্য ধান্য বা জমির বন্দোবস্ত করা হইত। যে প্রকারেই হউক, ধান্যের ব্যয় ও হস্তান্তর দেশের মধ্যেই হইত। এক ছটাকও বিদেশে যাইত না। কয়েক মাস গত হইল, ষ্টেট্স্‌ম্যান সংবাদ পত্রে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ধান্য সঞ্চয় সম্বন্ধে কতকগুলি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদকের মত এই যে, ধান্য সঞ্চয়ে প্রজা সাধা-

রণকে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরাজ সম্পাদকেরা আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন। অবাধ বাণিজ্যের স্রোতে ধান্য সঞ্চয় কখনই সম্ভবপর নহে। যে দেশ হইতে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময়েও বিদেশে প্রায় সমভাবে শস্যের রপ্তানি হইতে থাকে, সে দেশে কখনই ধান্য সঞ্চয় হইতে পারে না। যাহারা সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারা নিজের আবশ্যক মত সঞ্চয় করে। যাহারা শ্রমজীবী, দরিদ্র, এবং স্বল্পমাত্র জমি অধিকার করিয়াছে, তাহারা সঞ্চয়ের উপযুক্ত শস্য একত্র করিতে কোন কালেই পারে না। দুর্ভিক্ষ কাহাদের ? যাহারা সঞ্চয়ক্ষম, দুর্ভিক্ষ তাহাদের কেশ-স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা দরিদ্র,এবং সঞ্চয়ে অক্ষম, তাহারাই দুর্বৎসরে নিষ্পিষ্ট হয়। সামান্য অর্থনীতির মত অনুধ্যান করিলেই প্রস্তাবিত বিষয়ের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সহজেই জ্ঞানবান্ হওয়া যায়। আমার প্রচুর শস্য আছে, আমি কেন অতিরিক্ত সঞ্চয় করিব ? যখন কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন লক্ষাধিক মণ শস্য বিদেশের জন্য ক্রীত হইতেছে, তখন সময় বুঝিয়া অতিরিক্ত শস্য উচ্চ দরে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ অন্য কোন ব্যবসায় নিয়োজিত করিয়া ক্রমাগত লাভবান্ হওয়া শ্রেয়ঃ, না কীট পতঙ্গ ও অগ্নি দ্বারা শস্যহানির সম্ভাবনা স্কন্ধে করিয়া নিরর্থক সঞ্চয় করিয়া রাখা শ্রেয়ঃ ? এরূপে সঞ্চয় করিলে, পরিশেষে ঘটিবে এই যে, দেশে বহুল শস্য সঞ্চয় হেতু দুর্বৎসরেও আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ইহা এক্ষণে সুস্পষ্ট যে, যাহারা দুর্ভিক্ষের করায়ত্ত, তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা নাই, এবং যাহারা দুর্ভিক্ষের বহির্ভূত, তাহাদের অতি-সঞ্চয়ে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ইহাতে কি সঞ্চয় হইতে পারে ?

এই ত গেল শস্য সঞ্চয়ের কথা। অবাধ বাণিজ্যের অনুগ্রহে আরও যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে সকল সম্যকরূপে বিবৃত করা অসাধ্য। বিদেশীয় কল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় আমাদের দেশীয় শিল্প একেবারে বিধ্বস্ত। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রভাবে দেশী তন্তুবায় 'হা হতোস্মি' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, কত কোটি টাকার ব্যবসা ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রাস করিয়াছে। এ দেশ হইতে পাট যাইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমরা কেবল পাটগাছ পচাইয়া জলবায়ু দূষিত করিতেছি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ দেশব্যাপী ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছি। এবং এই প্রকারে যৎসামান্য অর্থের জন্য যকৃৎ

প্লীহার দোষে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু তাহাকে পরিপাটি করিয়া সূত্র প্রস্তুত করি, এ ক্ষমতা নাই। এমন কি রেড়ির বীজ এ দেশ হইতে চালান হয়, এবং বিলাত হইতে পরিষ্কৃত তৈল আমাদের দেশে আমদানী হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার হরীতকী প্রভৃতি অতি সামান্য জিনিষ এ দেশ হইতে রপ্তানী হয়, এবং তাহা হইতে টিংচার, রঙ্ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ বিলাতে প্রস্তুত হয়, আমরা কিন্তু সে সকল এ দেশে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারি না। আমাদের অক্ষমতা সকল দিকেই পরিলক্ষিত হয়!!! ছুরি, কাঁচি, কল্‌কব্‌জা, গ্ল্যাস, টিন্ ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য বিদেশ হইতে আসিতেছে। আমাদের এখনও কিন্তু একটী প্রধান বিষয়ে যথেষ্ট সাহস আছে। এখন পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে ধান্য রপ্তানী হইয়া ইংলণ্ড কি জর্ম্মণি হইতে চাউল প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আসিতেছে না, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়!! পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা অনায়াসে বিনা অর্থব্যয়ে পাওয়া যাইত, সে সমস্তই আজকাল ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়াছে। সুতরাং অর্থের আবশ্যক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থ ভিন্ন সামান্য অভাবও পরিপূরণ করিবার উপায় নাই। অর্থাগমের উপায়ও সঙ্কীর্ণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, যে সময় সূতা কাটিতে, কাপড় প্রস্তুত করিতে, এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় হইত, সেই সময় এক্ষণে অপর কোন অর্থকর বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নাই।

এ স্থলে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যথেষ্ট সংখ্যার ধনাগমের পথ আছে কি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এ দেশ হইতে ধান্য রপ্তানী হইয়া বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী হয় না, এইমাত্র আমাদের অহঙ্কারের কারণ আছে। যদি সকল পথই কণ্টকাকীর্ণ হয়, তবে কোন্ পথই বা অবলম্বন করা যায়। সূতা ও কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব নহে, ছুরী, কাঁচি, কাচ প্রভৃতি আমাদিগকে বিদেশ হইতে আনিতে হয়। তবে কি কেবল কতকগুলি শস্য উৎপাদন করিয়া বিদেশে পাঠাইলেই ধনবান্ হওয়া যায়? কেবল মুটে মজুরের কার্য্যে আর কত অর্থ আছে? নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আনীত হইলে, ধনক্ষয়ের পথ যে বিস্তৃত হইবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যখন ধনাগমের পথ অপ্রশস্ত, অথচ সকল জিনিষই ক্রয় করিতে হইবে, তখন সে অভাব বোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে,

এবং জীবন-সংগ্রাম অধিকতর কষ্টকর হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? ক্ষুদ্র জাপান জাতীয় জীবনের গূঢ় তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইয়াছে। তাই আজ জাপানের সর্ব্বস্থানই সজীব। জাপানের চেষ্টা এই যে, আবশ্যকীয় দ্রব্য মাত্রেই জাপানে প্রস্তুত করিতে হইবে। বিদেশ হইতে যত অল্প জিনিষ আনীত হয় ততই মঙ্গল। জাপান স্বাবলম্বন মন্ত্রে দীক্ষিত,এবং জাপানের যুবকগণও নবীন উৎসাহে উৎসাহিত। বৎসর বৎসর অনেক ধীমান যুবক রাজকোষ হইতে সাহায্য পাইয়া শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতেছেন। ধনিসন্তানগণ নিজ ব্যয়ে দলে দলে জর্ম্মাণি ও আমেরিকা প্রভৃতি বিশ্বকর্ম্মার দেশে যাইয়া নানাবিধ কার্য্যে সুশিক্ষা লাভ করিতেছেন। আমাদের যে ব্যক্তির বৎসরে ৩৬৫৲ টাকা আয় আছে, তাঁহার শ্যালক পুত্রও ঘোর বাবু ও গর্ব্বিত হন, এবং তাঁহার পরিচয়ে সকলেরই মুখে একই কথা—ত্রিশ দিনে ত্রিশ টাকা!!! যাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্যরূপ সংস্থান আছে, তাহার বাড়ীতে সকলেই স্ফীতোদর, শীতাতপাসহিষ্ণু, প্রবাস-ভীরু, আলস্য পরায়ণ ও অকর্ম্মণ্য। পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি ঘরে বসিয়া মাথায় মাথায় ঠুকিতে থাকে, এবং পরস্পর গণ্ডগোলে অগ্নি উৎপাদন করিয়া ও পরিশেষে মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া সোণার সংসারকে শ্মশানে পরিণত করে। এই প্রকারে কত সম্ভ্রান্ত পরিবার যে পথের ভিখারী হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভ্রাতৃদ্রোহ ভারতের একটী প্রধান রিপু। জাপানে কেহই অপরের অনিষ্ট চেষ্টা করে না। সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে ব্যস্ত। অনলস কর্ম্মপ্রাণ জাপান যুবক মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে আগ্রহান্বিত। আমরা সৎকর্ম্মে নিশ্চেষ্ট, এবং পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তায় আসক্ত। ইংরাজীতে একটী সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে—সয়তান অলস ব্যক্তির জন্য সর্ব্বক্ষণ একটা না একটা দুষ্কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে, আর গবর্ণমেণ্ট চিরকালই আমাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায়। পরের দয়ার উপর জোর জবরদস্তি নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি পুনঃ পুনঃ বিরাট সাহায্য না করেন, তবে আমাদের আর কি উপায়ে নিস্তার আছে? ভিক্ষা দেওয়া না দেওয়া যখন গৃহস্থের ইচ্ছাধীন, তখন ভিক্ষা না পাইলে অনুতাপ করা নিরর্থক। যাহাতে ভিক্ষা না করিতে হয়, তাহারই উপায় করা উচিত। কিন্তু এই উপায় চিন্তার

ভাণ করিয়া কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টকে সকল দিকে গালি দিলে কোনই সদুপায় হইবে না। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সময়ে অসময়ে, কারণ সত্ত্বে ও নিষ্কারণে গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়া শান্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। হোম চার্জ্জ—কখন কেহ কাগজ কলমের দ্বারা নিবারণ করিতে পারিবে না। রাজকীয় উচ্চকর্ম্মে ইংরাজ মণীষিগণ গবর্ণমেণ্টের মেরুদণ্ড স্বরূপ অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবেন। সুলভ পূণ্যের বিজয় পতাকা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে উড্ডীন থাকিবে। কেবল মাত্র আক্ষেপ উক্তিতে এবং লেখনী পরিচালনে অভাব মোচন হইবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষত্ব দেখাইতে হইবে। শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্যের বিস্তার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সকল সময়ে স্মরণ রাখা উচিত, যে কেবল কৃষির উন্নতি হইলেই, দুঃখের অবসান হইবে না। কৃষি যাহাদের প্রধান উপজীবিকা, কোন কালে তাহারা সম্পূর্ণরূপে দুর্ভিক্ষের আয়ত্ত্বের বহির্ভূত হইতে পারিবে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, দেশে যদি কৃষির উন্নতি দ্বারা প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা যায়, তবে দুর্ভিক্ষ কিরূপে হইতে পারে? ইহা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, যে যখন যখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তখন দেশ পালনোপযোগী শস্যও দেশে ছিল, দুর্ভিক্ষের কালে কেবল শস্যের মুল্যেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং অর্থাভাবে নিম্ন শ্রেণীর লোকে শস্য ক্রয় করিতে পারে না। যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল, সে কখনও দুর্ভিক্ষে প্রাণবিসর্জ্জন করে না।

আজ কাল যেরূপ রেলপথের বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে একস্থানের শস্যাভাব অপর স্থানের উপচয় দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যে দুর্ভিক্ষ হইত তাহাতে স্থানীয় শস্যাভাব সম্ভবপর ছিল এবং প্রায়ই ঘটিত। এক্ষণে সেরূপ শস্যাভাব স্থায়ী হইতে পারেনা, কেবল শস্য দুর্মূল্য হয়। দুর্ভিক্ষ আর সুভিক্ষ, যে দেশ হইতে সকল সময়ে চাউল, গম, বুট প্রভৃতি অজস্র রপ্তানি হইয়া থাকে, সে দেশে দুর্ব্বৎসরে শস্যের মহার্ঘতা একটী নিশ্চিত বিষয়। যদি বলি যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে রপ্তানি স্থগিত করা কর্ত্তব্য, অমনি চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইবে "অবাধ বাণিজ্য!!। অবাধ বাণিজ্য!!!" সুতরাং দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় ভিন্ন আর নিস্তার কিসে? শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতিরেকে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পন্থা কি আছে! যতই দেশে অর্থের অভাব হইবে, ততই

দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবও নিরবচ্ছিন্ন ঘটিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, "আমরা যথেষ্ট করিয়াছি এবং করিতেছি—দেশে শান্তি আনিয়াছি—যাহাতে আপামর সাধারণ সুশিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং আমাদের অধ্যবসায় তোমাদের সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিয়া রাখিয়াছি। তোমরা চেষ্টা কর সুফল পাইবে, স্বাবলম্বন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও,'দেহি দেহি' শব্দ ত্যাগ কর, ভিক্ষা বৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখ"। আমাদের দুর্বুদ্ধি ও আলস্যে সমস্ত বিনষ্ট হইতেছে, এবং সোণার ভারতে আমরা সোণা ছাড়িয়া কেবল মাটীর বোঝা বহিয়া মরিতেছি। কত শত দিকে কত শত প্রকার অর্থাগমের উপায় আছে, তাহা দেখিয়াও দেখি না। এস্থলে একটী সুন্দর গল্প মনে পড়ে। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিরস্কার করিতেছে, এমন সময়ে হরপার্ব্বতী এক গ্রামের মধ্যে দিয়া যাইতেছেন। অদূরে এক ভিক্ষুক দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলেন। ভিক্ষুক সবল ও প্রৌঢ়বয়স্ক, হস্তে ভিক্ষা-পাত্র, এবং তাহাতে মুষ্টিমেয় চাউল আছে। ভিক্ষুককে দেখিয়া পার্ব্বতী হরকে বলিলেন, "হে দেবাদিদেব! তোমার দয়া বিচিত্র! কেহ বা অট্টালিকায় শয়নে, এবং অসংখ্য বিলাস সম্ভোগে আপ্যায়িত, কেহ বা এই প্রখর রৌদ্রে এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত। কেহ বা সুখে বিভোর, কেহ বা দুঃখে ভর্জ্জিত। কেন এরূপ অসম ব্যবহার?" মহাদেব উত্তর করিলেন--"দেবি, আমার দয়া সর্ব্বত্রই সমান। ভোগসুখের উপায় সকলের সমক্ষেই বিস্তৃত রহিয়াছে। কেহ বা চেষ্টা ও কর্ম্ম দ্বারা সুখলাভ করে, আর অলস মন্দধীগণ অবহেলা করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের দক্ষিণ হস্তের উপান্তে রত্নভাণ্ডার থাকিলেও তাহারা ঐ রত্ন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না।" এই বলিয়া, মহাদেব পথিমধ্যে সহস্র মুদ্রাপূর্ণ এক ভাণ্ড রাখিলেন। ভিক্ষুক দূর হইতে দেখিল যে, অপূর্ব্ব কান্তি দুই জন স্ত্রী পুরুষ বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। সে তখন ভাবিল যে, ইঁহারা নিশ্চয়ই বিপুল ধনের অধীশ্বর, সুতরাং অন্ধ হইয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে করিতে চলিলে, ইঁহাদের আর দয়ার সীমা থাকিবে না। আজ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া জীবনের সঞ্চয় করিয়া লইব, এই সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষুক দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধতার ভাণ করিল, এবং চীৎকার করিতে করিতে হরপার্ব্বতীর

সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তখন হরপার্ব্বতী রত্নভাণ্ডার প্রত্যাহার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ।

জয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জয়পাল দিল্লী হইতে নির্ব্বিঘ্নে যশল্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিরূপে আলাউদ্দীনের জীবন বিনাশের জন্য অলক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং আলউদ্দিনও শরাঘাতে আহত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন; তৎসমুদায় বিবৃত করিলেন। খিলিজী সম্রাটের মৃত্যু হইলেই যে রতনসিংহের মুক্তি হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে সোৎসুকনেত্রে তাঁহারা চিতোররাজের অবরোধ মোচন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে রতন সিংহের নিকট হইতে পত্র আসিল, রাজপুতরাজ জয়াকে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দিল্লীগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন। প্রেমিক যুগলের হৃদয়াকাশে যে ক্ষীণ আশালোকের সঞ্চার হইয়াছিল, সহসা তাহা ঘোর বিষাদ তমসে আচ্ছন্ন হইল। এই আকস্মিক দুঃসংবাদে সকলেই চিন্তান্বিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। জয়ার আত্মীয়গণ কুলে কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জয়াকে দেবালয়ে আত্মবলি দিয়া বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়াও জয়া প্রশান্ত বদনে কহিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, যখন দেখিব আর কোন উপায় নাই, তখন নিশ্চয়ই আমি এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি পবিত্র রাজপুতকুলে কলঙ্করেখা স্পর্শ করিতে দিব না। কিন্তু এখনও বিপদ দূরে—এখনও আমার প্রিয়তম জয়পাল নিকটে থাকিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কেন এ জীবন পরিত্যাগ করিব?"

তখন সকলে একমত হইয়া শীঘ্র জয়পালের সহিত জয়ার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন এবং তজ্জন্য আয়োজনও হইতে লাগিল। পরে বিবাহের দিন চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন। জয়ার

মাতুল কন্যা সমর্পণ করিলেন এবং রীতিমত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। এই ঘোর বিষাদেও দম্পতিযুগলের বদনমণ্ডল আনন্দশ্রী ধারণ করিল।

বিবাহের পরদিবস জয়া বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য একটি প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে দুই জন ব্যক্তির অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং এই কথোপকথনের মধ্যে স্বীয় নাম ও জয়পালের বিষয় শ্রবণ করিয়া উৎসুক হইয়া কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শুনিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মাতুল ও মাতুলানী তাঁহাদেরই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। জয়ার মাতুল তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"জয়া কোথায় ?"

তাঁহার পত্নী উত্তর করিলেন, "তাহারা অন্য দিকের বারাণ্ডায় আছে।"

"নিশ্চয় বলিতেছ ?"

"হাঁ নিশ্চয়ই। আমি এই মুহূর্ত্তে দেখিয়া আসিলাম, নব দম্পতী কথোপ-কথনে অতিশয় মত্ত। সম্ভবতঃ তাহারা এখন সেই স্থানেই থাকিবে।"

"এ বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?"

"এ বিবাহের লক্ষণ শুভ নহে। যতদিন জয়া জীবিত থাকিবে, ততদিন দিল্লীর সম্রাট তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে, সুতরাং আমাদের কুলে কলঙ্কসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী।"

"তবে দুই জনেরই বিনাশ সাধন করা কর্ত্তব্য। কেন না, জয়পাল জীবিত থাকিলে অবশ্যই ইহার জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে।"

"জয়পাল প্রকৃত রাজপুত—মরণে তাহার ভয় নাই—মৃত্যু তাহার ক্রীড়ার সামগ্রী।"

"কিন্তু উহাদের বিনাশ সাধনের উপায় কি ?"

"উপায় আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, কল্য আহারের সময় আমি তাহা-দের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিব এবং সন্দেহ নিরাকরণের জন্য সেইরূপ খাদ্য তোমার জন্যও স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র তাহাতে বিষ থাকিবে না। তাহারা এক্ষণে আনন্দে উন্মত্ত, সুতরাং এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সেই বিষ মিশ্রিত খাদ্য আহার করিবে এবং আমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া করিয়া ক্রোধ, ভয় এবং ঘৃণায় জয়ার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় গৃহস্থিত একটী তক্তপোষের নীচে লুকায়িত হইলেন এবং

তাহার উপর এরূপ ভাবে একখানি কাপড় ফেলিয়া দিলেন যে, কেহ তাহার ভিতর লুকাইয়া আছে, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায় না। পরক্ষণেই জয়ার কক্ষের দ্বারে পদধ্বনি শ্রুত হইল, এবং জয়ার মাতুল কক্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ষড়যন্ত্র নিরাপদ ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে জয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া জয়পালের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণনা করিলেন। ক্রোধে জয়পালের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু জয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—'জয়পাল! এ ক্রোধের সময় নহে, আমাদিগকে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে, তোমার ও মাতুলের খাদ্য একপ্রকার হইবে, সুতরাং কৌশলক্রমে সেই খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া মাতুল মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, এবং তাঁহার পত্নীকে তাঁহার অনুমৃতা হইতে হইবে, সুতরাং অনায়াসেই আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে।"

জয়পাল এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দাবানল পরিপূরিত প্রশান্ত সাগরের ন্যায় বাহ্যাকৃতিতে হৃদয়ভাব গোপন করিয়া জয়ার আত্মীয় ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সহাস্য মুখে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রথমে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের সম্মান জন্য ঐকতান বাদ্য আরম্ভ হইল। পরে সুন্দরী ষোড়শী নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরিশেষে যাদুকরেরা আসিয়া নানাবিধ ভোজবিদ্যা দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করিল। প্রথমে তাহারা একটি লোককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উপর একখানি চাদর দিয়া মাটীতে রাখিয়া দিল ও কিছুক্ষণ পরে চাদরখানি অপসারিত হইলে সেই লোকটি সুস্থ শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হইল, যেন তাহার শরীরে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই। তদনন্তর দুইটি পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেকটিতে এক একটি লোক প্রবেশ করিল এবং সমাগত জনগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আপনারা যে জন্তু দেখিতে চাহিবেন, আমরা তাহাই দেখাইব।" তৎপরে দর্শকগণ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, সেই সেই জন্তু দেখাইতে আদেশ করিলেন, ঐন্দ্রজালিকেরা একে একে তাহাই দেখাইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা

নানা প্রকার কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ার মাতুল সকলকে আহারের জন্য আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ সকলে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। এই গোলমালে জয়পাল খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন এবং সন্দেহ দূর করণের জন্য অতীব আগ্রহের সহিত আহার করিতে লাগিলেন। জয়ার মাতুলও অসন্দিগ্ধ চিত্তে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল জয়া খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতুলপত্নী তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "জয়া এই প্রকারে কি তুমি নিমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনা করিবে? তুমি আহার না করিলে সকলেই ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত বিবেচনা করিবেন।"

জয়া। "এই খাদ্য দ্রব্যে কেমন একটী গন্ধ। আমার ইহা ভাল লাগিতেছে না।"

"সে কি? তুমি ইহা ভালবাস বলিয়া তোমার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। বিশেষত আমি স্বহস্তে পাক করিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

"যদি অতি উপাদেয়ই বিবেচনা কর, তুমিই ইহা ভক্ষণ কর।" তখন জয়ার মাতুলানীর মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। এদিকে তীব্র বিষের প্রভাবে জয়ার মাতুল অল্পক্ষণ মধ্যেই হতচেতন হইয়া পড়িলেন এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমাগত ব্যক্তিবর্গ সকলেই বিচলিত হইলেন। কেহই কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না। মৃতের পত্নীও লোকলজ্জা ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তখন সকলে দৈব বিড়ম্বনা মনে করিয়া সৎকার জন্য মৃতদেহ নদীতীরে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ মৃতের পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জয়ার মাতুল পত্নীকেও সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ভয়ঙ্কর শ্মশানদৃশ্য মনে করিয়া তিনি প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন। পরে লোকগঞ্জনা ভয়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করিল। চিতার উপর মৃতদেহ স্থাপন করিয়া চিতাকাষ্ঠে তাঁহাকে বদ্ধ করিল এবং পরে অগ্নি সংযোগ করা হইল। দেখিতে দেখিতে চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগিনীর চীৎকার সেই শব্দে মিশিয়া গেল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে রতনসিংহের আদেশই নব দম্পতীর একমাত্র উদ্বেগের কারণ হইল। কিরূপে কৌশলে আলাউদ্দিনকে প্রতারিত করিয়া চিতোর-রাজের উদ্ধার সাধন করিবেন, সতত তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জয়া দিল্লী গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। রতনসিংহ সম্রাটকে পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলে দিল্লীশ্বর পুনরায় রতন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "হিন্দুরাজ! এতদিন পরে তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়াছ। তোমার কন্যা দিল্লীশ্বরী হইবে, ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে এবং তোমাকেও আমি দিল্লীর অমাত্যগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিব।"

বিনীতভাবে রতনসিংহ উত্তর করিলেন "দিল্লীশ্বর! আমি অন্য সম্মানের প্রার্থী নহি। কেবল স্বাধীনতার জন্য আমাকে এই ঘোর অপমাননাজনক কার্য্যে সম্মত হইতে হইল।"

তোমার কন্যা দিল্লীর প্রাকারের মধ্যে আসিলেই তুমি স্বাধীন হইবে, কিন্তু তোমার কন্যা কখন আসিবে, জানিতে চাই।"

যবনরাজ! শুনিলাম, আমার কন্যার বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং সে পরাধীনা। তাহার স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কখনই সে আসিবে না। কিন্তু জয়া রাজপুত কন্যা, কখন পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না।"

রতন সিংহের কথায় আলাউদ্দীনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন, চতুর রাজপুত তাঁহার সহিত চাতুরী করিতেছে। তজ্জন্য গম্ভীর হইয়া বলি-লেন, "রাজপুত! যদি তোমার কন্যা অদ্য হইতে সাতদিনের মধ্যে না আইসে, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে ও তোমার রাজ্য ছারখার করিব।"

এই বলিয়া সম্রাট্ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজ-পুতরাজও ভাবিতে ভাবিতে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর চারিদিন গত হইল। পাছে জয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, এই ভয়ে রতন সিংহ ভীত হইলেন। তাঁহার কারাযন্ত্রণা দ্বিগুণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন রাজপুত সৈন্য জয়ার নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসিল। পত্রে চিতোররাজ জানিতে পারি-লেন যে, জয়া পরদিন অপরাহ্নে দিল্লীতে উপনীত হইবে এবং তাহাতে কৌশলে তাঁহার মুক্তির অভাব ছিল। পত্রানুসারে তিনি সম্রাটের নিকট

জয়া ও তাহার সঙ্গিগণের নির্ব্বিঘ্নে নগর প্রবেশের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দিল্লীশ্বর এই সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। অধীর হইয়া কল্পনার নেত্রে কত সম্মোহন ছবি দেখিতে লাগিলেন। বিস্তৃত রাজপ্রাসাদের একাংশ সজ্জিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং নানা প্রকার বেশভূষা করিয়া সোৎসুক নেত্রে জয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জয়ার অভ্যর্থনার জন্য একদল সশস্ত্র সৈন্য নগরের বহির্ভাগে সংরক্ষিত হইল। তিনি রতন সিংহকেও অনেকটা স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। দিল্লীর নানাস্থানে মহোৎসব হইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে একজন দূত আসিয়া জয়ার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এবং জানাইল যে, জয়া প্রথমতঃ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। রক্ষিবর্গ সম্রাটের বিরাগোৎপাদনের ভয়ে কোনও আপত্তি না করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। দেখিতে দেখিতে একশত শিবিকা দিল্লার ভিতরে প্রবেশ করিয়া রতন সিংহের কারাগারের দিকে যাইতে লাগিল। প্রত্যেক শিবিকা একজন করিয়া আরোহী ও চারিজন বাহক ও দুইজন সশস্ত্র রক্ষি-পরিবেষ্টিত। শিবিকার অভ্যন্তরে স্ত্রলোকের পরিবর্ত্তে রাজপুত বীরগণ অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বাহকগণও শিবিকা ছাড়িয়া তরবারি গ্রহণ করিল ও জয়পালের আদেশে কারাগৃহের রক্ষিবর্গের উপর পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলকে বিনাশ করিল। রতন সিংহও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনিও স্বভাবজ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই কার্য্য একরূপ নিস্তব্ধতার সহিতই সম্পন্ন হইল। এবং রতন সিংহের কারাগৃহ নগরের প্রান্তভাগে স্থাপিত হওয়ায় তখন কোন প্রকার গোলযোগ হইল না। তৎপরে জয় সিংহ, রতন সিংহ ও জয়াকে মধ্যে রাখিয়া সাতশত রাজপুত সৈন্য লইয়া প্রবল বেগে নগর দ্বারের বহিঃস্থিত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হওয়াতে মুসলমানগণের অধিকাংশ হত হইল ও অবশিষ্টাংশ পলায়ন করিল। অদূরেই তিনটি অশ্ব সজ্জিত ছিল। জয়পাল, জয়া, ও রতন সিংহ তাহাতে আরোহণ করিয়া তীরবেগে দিল্লী হইতে বাহির হইলেন। এবং ঐ সাতশত রাজপুত সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে রাজপুতানা অভিমুখে গমন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই জয়ার ও রতন সিংহের পলায়ন দিল্লী-

শ্বরের শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। পলাতকগণের অনুসরণার্থ চতুর্দ্দিকে সৈন্যদল প্রেরিত হইল। কিন্তু এইরূপে প্রতারিত হওয়াতে হর্ষবিষাদে আলাউদ্দিনের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। তিনি প্রতিহিংসার জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে, তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক হইল।

এদিকে জয়পাল পঞ্চাশৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া প্রায় বিংশ ক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বতে বিশ্রামার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সেই দিবস রাত্রে একজন সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রায় দুইশত মুসলমান সৈন্য পর্ব্বতের অতিদূরে আসিতেছে। শুনিবা মাত্র জয়পাল একটি অন্ধকারময় স্থানে পঞ্চবিংশতি জন রাজপুত সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং অবশিষ্টগণ সহ একটি উন্নতপ্রদেশে আরোহণ করিয়া যবনদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনাদল দুই দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রপশ্চাৎ আসিতেছিল। নিকটস্থ হইবামাত্র প্রথম দলের পঞ্চবিংশতি জন গুপ্তস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে হতাহত হইল। অবশিষ্টেরা পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া দ্বিতীয় দলের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত আসিতে লাগিল। কিন্তু এবারও পর্ব্বতের সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র পূর্ব্বের ন্যায় অনেক সৈন্য হতাহত হইল। কোথা হইতে তীর আসিতেছে, নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, যবন সেনাগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মনস্থ করিল। কিন্তু শত্রুদল সংখ্যায় অল্প, ইহা অবধারণ করিতে পারিয়া প্রবলবেগে পর্ব্বত সমীপে উপনীত হইল এবং একটি পার্ব্বত্যপথ দেখিতে পাইয়া তদ্দ্বারা উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে জয়পাল স্বীয় দলবল লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অপর দলও পশ্চাদ্দিক হইতে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। যবনদল পূর্ব্ব হইতেই ভীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের অনেকেই হতাহত হইল। অতঃপর জয়পাল নির্ব্বিঘ্নে চিতোরে উপনীত হইলেন ও সম্রাটের সহ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যে অরাজকতা ঘটিল, জয়পালও নিষ্কণ্টক হইলেন। রতনসিংহ মুসলমান করে কন্যা সমর্পণে প্রতিশ্রুত

হইয়াছিলেন বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজ্যভার জয়পালের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজে অবসর লইলেন। তিনি বনগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু জয়া ও জয়পাল কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি রাজপ্রাসাদেই বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই ক্ষুদ্র শিশুর হাস্যে রাজভবন পরিপূরিত হইল।

সম্পূর্ণ।

শ্রীদেবিদাস চট্টোপাধ্যায়।

এ হেন বারতা তুলোনা।

১

যে হাসি গরবে কমলিনী মরে,
সে হাসি কি প্রিয়া জানে না?
পাছে সে ভ্রমর দংশয়ে অধরে
তাই ভেবে প্রিয়া হাসে না।

২

যে তারার হারে নিশা-দেবী সাজে,
সে কি তা সাজিতে পারে না?
কোমল কুসুম পাছে ব্যথা পায়,
তাই ভেবে মালা পরে না।

(৩)

কমলিনী সুখী ভ্রমর ঝঙ্কারে
তারে কি তা ভাল লাগে না?
ভানু ডুবে যায় যখন সে হাসে,
ভ্রমর তখন জাগে না।

(৪)

চকিত হরিণী যে নয়নে চায়,
সে কি সে নয়নে দেখে না?
ব্যাধের তাড়না সহেনি বলিয়ে
তাই মনে ভয় রাখে না।

(৫)

যে রবে কোকিল কানন মাতায়,
সে কি তা গাহিতে জানে না?
পাছে সে কোকিল শুনে লাজ পায়
তাই ভেবে প্রিয়া গাহে না।

(৬)

যে সুধার ধারা সুধাকর ঢালে,
সে কি তা ঢালিতে পারে না?
পাছে সে চকোর করে জ্বালাতন,
তাই ভেবে দান করে না।

(৭)

কুসুমের বনে ভাসে পরিমল
সে কি তা ভাসাতে পারে না?
পাছে সে পবনে ফুল ভেসে যায়,
ভাল বুঝে সেথা আসে না।

(৮)

কলঙ্কী চন্দ্রমা, পঙ্কজ কমল,
সে মুখে এ মুল তুল না!—
সে যেন শুনে না কেন্দে মরে যায়,
এ হেন বারতা তুলো না!

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।
সিউড়ী।

জীবনী সংগ্রহ।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

কলিকাতার খিদিরপুর হইতে আন্দাজ ৪ ক্রোশ দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতা নামক স্থানে এই মহাপুরুষ সন ১২২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রই আমাদের পণ্ডিত দ্বারকানাথ ছিলেন। পরন্তু দ্বারকানাথের আর কয়েক ভ্রাতা এবং ভগ্নী ছিল। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। কিন্তু তিনি দেবভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। দ্বারকানাথের পিতা গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তি দ্বারাও কিছু কিছু পাইতেন।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ প্রথমে পিতার পাঠশালে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎপরে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। ইঁহার সময় সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। তাহা না থাকিলেও মধ্য বয়সে নিজের অধ্যবসায় গুণে বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী পড়িয়া উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কালেজ হইতে বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করিয়া তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে একটী সামান্য পণ্ডিত রূপে তথায় কিছু দিন চাকুরী করেন। তৎপরে উক্ত কালেজ ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে ইনি বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গুণের বিষয় সংক্ষেপে জানাইতেছি। পাঠক মহাশয় এ প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন যে, গুণের সঙ্গে কার্য্যের অথবা কার্য্যের সঙ্গে গুণের কেমন সুন্দর সম্বন্ধ। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল,—

শ্রমশীলতা।

এই জন্য তিনি বহুকাল একরূপ স্বাস্থ্যে ছিলেন, সর্দ্দি জ্বর ইত্যাদি পীড়া ছিল না। ২৫ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত কালেজে ২৫ দিনও ছুটী লয়েন নাই। ঝড় বৃষ্টি, হর্ষ শোক, যাহা কিছু সংসারের বাধা বিঘ্ন পড়ুক না কেন, ইনি সে সমুদয় কাটাইয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে সংস্কৃত কালেজে নিজের কার্য্যে

উপস্থিত হইতেন। এবং শেষদশায় বৃদ্ধ বয়সেও সকলকে সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আরো বলিতেন, "আমি চোর ডাকাতকে যত ঘৃণা না করি, তাহাপেক্ষা আল্‌সে অকর্ম্মণ্য কুড়ে লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি।"

সংস্কৃত কালেজের চাকুরীর পর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংসারে ভ্রাতা ভগ্নী, পুত্র কন্যা প্রভৃতিতে একটী বৃহৎ পরিবার হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যহ নিজে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন। ইহার আর একটী গুণ ছিল,—

গাম্ভীর্য্য।

এই গুণের জন্য ইনি নাটক নভেল গ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই। উক্ত পুস্তক সকলে ছেলে খেলার কথা লিখিত হয়, উহা আবার লোকে পড়ে, ইহাই তাঁহার সংস্কার ছিল। কিন্তু ইতিহাস, জীবন-চরিত, মনো বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল। কোন হাল্‌কা বিষয় পড়িয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন না। লেখা পড়া করা তাঁহার জীবনের এক মহাব্রত ছিল। কখন অন্যায় রূপে সময় নষ্ট করিতেন না; কালেজ হইতে আসিয়া হয় পুস্তক পাঠ, না হয় প্রবন্ধ রচনা করিতেন। এই অভ্যাস জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। রাত্রে ৪ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। যখন ইনি লেখাপড়া করিতে বসিতেন, তখন ইঁহাকে ডাকিতে কেহই সাহস করিত না। পড়িতে বা লিখিতে বসিলে, তাঁহার ষোল আনা মন উহাতে ব্যয় হইত; কিছু মন কোন দিকে থাকিত না, কাজেই এসময় ডাকিলে, উত্তর দিতে হইলে ঐ লেখাপড়ার মন তুলিয়া তবে ত উত্তরের জন্য কিছু মন ব্যয় করিবেন। কিন্তু এ ব্যয় করিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। কি যেন আটার জোরে মনটা লেখাপড়ার ভিতর এমন আট্‌কান থাকিত যে, উহা তুলিতে গেলে আটার চাড়ে মনটা চড় চড় করিয়া উঠিত, তাহাতে বোধ হয় কষ্ট হইত, তাই কেহ লেখা বা পড়ার সময় তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিতেন। এই জন্য লেখাপড়ার সময় তাঁহার পুত্র কন্যা কিম্বা মাতা পর্য্যন্ত নিকটে গিয়া ডাকিতে সাহস করিতেন না। অন্য সময়ও

প্রায় গম্ভীর ভাবে থাকিতেন। এ গাম্ভীর্য্য ভাব পুস্তকের পাঠক অপেক্ষা পুস্তক বা প্রবন্ধাদি লেখকদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ সহজেই সময়ে সময়ে আসিয়া পড়ে। "লেখকদিগের সাময়িক গাম্ভীর্য্যাবস্থা ভাবী প্রবন্ধের গর্ভাবস্থা" ইহা তিনি বলিতেন, এই জন্য অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন, তখনও কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। পরন্তু তাঁহার অপর গুণ,—

ন্যায় পরায়ণতা।

নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেন এবং নিজের দেনা কদাচ রাখিতেন না। কোন প্রতিবেশীর নিকট কেহ পাইবে বলিয়া তাগাদায় আসিলে, ইনি সে প্রতিবেশীকে ঘৃণা করিতেন এবং মনে মনে রাগিয়া উঠিতেন। কেহ কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইলে ইনি তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন। ইঁহার চক্ষের উপর দুর্ব্বলের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে ইনি তাহাকে সহজে ছাড়িতেন না, যে প্রকারে হউক, তাঁহার প্রতিবিধান করিতেন। এ সময় মিতব্যয়িতা উল্টাইয়া যাইত, এজন্য অনেক অর্থ আদালতে অকাতরে ঢালিয়া দিয়া, তবু অত্যাচারীকে দণ্ড দেওয়াইতেন।

ন্যায়পরায়ণতার আর একটী দৃষ্টান্ত এই যে, সংস্কৃত কালেজে চাকুরী হইবার পূর্ব্বে ইঁহার পিতার যেরূপ বার্ষিক, বৃত্তি বিদায় এবং দান প্রভৃতিতে পাওনা ছিল, সে সময় ইঁহারও সেইরূপ পাওনা ছিল, কিন্তু স্বক্ষমতায় অর্জ্জন করিতে শিক্ষা করিয়া সে সকল বৃত্তি লওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "লাখ টাকায় বামন ভিখারি" এ দুর্নাম তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি বলিতেন, "চলিবার শক্তি হইলে আর কিছু ধরিতে হয় না।" এমন কি, সংস্কৃত কালেজে কেহ কখন বৃত্তি পাঠাইয়া দিলেও তিনি উহার অংশ লইতেন না, অপরাপর শিক্ষকেরা উহা অংশ করিয়া লইতেন।

স্বাধীনতা।

ন্যায়ের উপর কিছু নিজের মত দিলে, যেরূপ স্বাধীনতা আসিয়া থাকে, ইঁহার সেইরূপ একটু স্বাধীনতা ভাব ছিল। এজন্য ইনি পুরা সমাজ সংস্কারক না হইলেও, লোকাচারের ব্যাধিযুক্ত কার্য্যগুলি ভাল বাসিতেন না। আচার বেশী হইলেই শুচি বাই রোগে পরিণত হয়, সেইরূপ লোকাচার বহুদিনের হইলে উহার ভিতর অনেক দোষ ধরিয়া যায়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সমাজের প্রথা এই যে, কোন গৃহস্থের কন্যাসন্তান জন্মিবা মাত্র একটী পাত্র স্থির করিয়া উহার বিবাহের সম্বন্ধ ধার্য্য হইয়া যায়। এমন কি, এই সমাজে তিন মাসের বালিকা এবং চারি মাসের বালকের সঙ্গে বিবাহ পর্য্যন্ত হইত দেখিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রথা তুলিয়া দিতে উদ্যত হয়েন, এজন্য অনেক লিখিয়াছেন, অনেক কলহ সহ্য করিয়াছেন ; এমন কি নিজের পরিবার মধ্য হইতে এ প্রথা উঠাইয়া দিয়া দেখাইয়াছেন, এজন্য সে সময় তাঁহার সমাজে কত গোলযোগ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইঁহাকে সমাজে পতিত করিয়াছিলেন, ইনি কিছুতেই উক্ত বিষয়ে প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এক্ষণে উক্ত সমাজে পূর্ব্বের কুৎসিত প্রথা আর নাই বলিলেই হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৎকীর্ত্তি।

ইঁহার প্রথম কীর্ত্তি এই যে, নিজ গ্রামে একটী ইংরাজী স্কুল খুলেন। কিন্তু উহা অর্থাভাবে বন্ধপ্রায় হইয়া উঠে। এজন্য ধনীদের তোষামোদ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ভাল ফল হয় নাই। শেষে "নিজে যাহা পারিব সেই মত করিব" এই বলিয়া স্কুলটী নিজের পরিবারভুক্ত মত করিয়া লইয়া, মাসে মাসে উহাতে অনেক অর্থ দিতেন। উক্ত স্কুল বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে আসিলে উহাকে কেবল ইংরাজী স্কুল না রাখিয়া, সংস্কৃত এবং ইংরাজী স্কুল করা হয়। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি,—

সোমপ্রকাশ।

ইহা সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র। এই সংবাদ-পত্রের পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ছিল, তাহারা মার্জ্জিত রুচি লইয়া পরিচালিত হইত না। সোমপ্রকাশ সে সময়ে বাঙ্গালীদের, বিশেষ শিক্ষিত সংবাদ-পত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যেমন এডুকেশন গেজেটের "মত" গভর্ণমেণ্ট শুনিয়া থাকেন এবং লোকেও এডুকেশন গেজেটের "এই বিষয়ে" কি মত শুনিবার জন্য যেমন আজকাল ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশের ঠিক এই অবস্থা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সময়ে ছিল।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ৺অক্ষয় কুমার দত্ত এই দুই মহাপুরুষের যত্নে বাঙ্গালা ভাষা যেমন পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বারা

বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সেইরূপ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। এখনও "সোমপ্রকাশ" জীবিত আছে। কিন্তু ইঁহার পর হইতে আর সে "সোমপ্রকাশ" নাই। এখন বুড়া সোমপ্রকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, ইনি বৃদ্ধাবস্থায় পীড়িত হইয়া জব্বলপুরের সন্নিহিত সাতনা নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তথায় সন ১২৯১ সালে ৮ই ভাদ্র, সোমবারে বিস্ফোটক রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

ফুল ও ফুলের ভাষা।

(পাশ্চত্য সংস্কার)

পশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিরীষকুসুম, নবমল্লিকা, চুতমুকুল, বনলতিকা, মাধবী প্রভৃতির সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই সমস্ত লইয়াই আমাদের গৌরবের ধন মহাকবি কালিদাস। সাধারণ মনুষ্যশরীর পঞ্চভূতে নির্ম্মিত; কালিদাস যে যে উপাদানে গঠিত হউক না কেন, আমরা তন্মধ্যে এই কয়েকটিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি। বলিতে কি, এই সমস্ত কালিদাসের প্রাণ; শুদ্ধ তাহাই কেন, প্রাণ হইতেও প্রিয়তর।

কাহার সহিত কাহার তুলনা! আবার দেশকাল পাত্র ভেদে রুচি পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সকল বিষয়ের মাত্রা আছে; অবস্থানুযায়ী অতিরিক্ত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

করুণাময় জগদীশ্বর প্রকৃতি রাজ্যে কি মহদুদ্দেশ্যে পুষ্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞান বলে এ রহস্য কতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না। কিন্তু সংসারাসক্ত মানব নিচয় যখন সংসারের বিষম জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া যায়, প্রাণমন ক্ষুণ্ণ এবং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন প্রস্ফুটিত কুসুম অথবা তত্তুল্য কোন মনোরম বস্তু দেখিলে, দেহে কি জানি কেন, কি এক সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হয় এবং মনপ্রাণ উল্লাসিত এবং উৎসাহিত হইয়া উঠে। অপরের কথা কেন, ক্ষুদ্র মানব শিশু হইতে দেবতা পর্য্যন্ত ইহার গুণে মুগ্ধ, রূপে বিমোহিত। দেবতা গন্ধর্ব্ব, মানব, ভাবুক এবং কবি, সকলেরই মনে উচ্ছ্বাস জন্মাইতে পুষ্পের অপ্রতিহত প্রভাব ও অদ্বিতীয় ক্ষমতা।

সুনির্ম্মল মৃদুমন্দবাহি নদীকন্দর বিধৌত, শাদ্বল সমাচ্ছাদিত, শৈলরাজি পরিবেষ্টিত নিভৃত বনভূমি প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্র। তথায় বিবিধ কুসুম

স্বতই প্রস্ফুটিত হইয়া সুরভি বিতরণ করে। এই স্থানে আগমন করিলে মনে এক অপার্থিব সুদুর্লভ স্বর্গীয় ভাব বিকশিত হয় এবং উচ্ছ্বাসের সুখউৎস সদা উছলিতে থাকে। জীবন্মুক্ত অনাসক্ত যোগী ঋষি তপস্বীগণের এরূপ স্থল সেই কারণে সমধিক অভিলাষানুরূপ। কিন্তু যোগী কিম্বা তপস্বীদিগের কথা স্বতন্ত্র। মানব সংসারে বাস করিয়া নিয়ত বিবিধ ঝঞ্ঝাটে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠে; এই কারণে নগরে অথবা তদ্বৎ অপরাপর জনপদ সমূহে যথায় প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে—মনের শান্তি লাভের নিমিত্ত, জগতের সমগ্র সভ্য সমাজে তত্তৎ স্থানে ফুলের বাগান রাখিবার প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত আছে।

যখন বর্ণ, জাতি বা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের অন্যান্য জাতি নগ্নাবস্থায় গিরিগুহায় পশুবৎ বিচরণ করিয়া কেবল মাত্র উদরপূর্ত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তখন ভারতের আর্য্যগণ উন্নতির ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর সোপানে অধিরোহণ করিতেছিলেন। সুতরাং তৎকালে আর্য্যগণের নিকট পুষ্প অথবা পুষ্পোদ্যানের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই ইহার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকুঞ্জ কানন, কাম্য বন, কেলী কানন, বৃক্ষ বাটিকা প্রভৃতি মনোহর সুসজ্জিত উদ্যান সমূহ, প্রাচীন কালে নৃপতিগণের অবসর সময়ে সন্তোষ বিধান করিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, সমগ্র ইউরোপখণ্ড আজকাল যে সমস্ত বিচিত্র মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিপূরিত, তন্মধ্যে অধিকাংশ পুষ্পই ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে নীত হইয়াছে।

গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি অমূল্য বিদ্যাসমূহ পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট প্রথমতঃ শিক্ষা করিয়া, কালক্রমে যেমন অনেক স্থলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ এই নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়না। অধুনা, নিকুঞ্জ কানন বলিলে বুঝিতে পারি না, কাম্য বন কি জিনিষ, মনে ধারণা হয় না; আবার পুষ্পোদ্যান বলিলে একটা বিষম ধাঁধা আসিয়া উপস্থিত হয়। আজকালকার আমাদের ফুলের বাগান এক একটী বিলাতী নার্সারী। বিলাতী ফুল এবং 'পাতার' সংখ্যাই অধিক—আগাছার মধ্যে যদি কচিৎ দুই একটা ভুলক্রমে দেশী গাছ থাকিয়া যায়, তা বলা যায় না। অশোক কাঞ্চন, চম্পক বকুল, জবা গন্ধরাজ, যুথী মল্লিকা, সূর্য্যমুখী অপরাজিতা প্রভৃতি আর বড় দেখিতে পাই না—ইহারা নার্সারীর তালিকায় স্থান পাইবার কোন প্রকারেই উপযুক্ত নহে। শিরীষ কুসুম, চুতমুকুল ত দূরের কথা! এমত ক্ষেত্রে যে ইহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ শিথিল হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? কিন্তু অশোক, চুতমুকুল, নবমল্লিকা, নীলোৎপল অরবিন্দ লইয়াইত পর্ব্বতন মনীষীগণ কন্দর্পের পঞ্চ শর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

'The old order changeth yielding place to new," এটি পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার একটি মূল মন্ত্র। অস্মদ্দেশীয় অনেকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত। অবশ্য যিনি যাহা সুবিধা বুঝেন অথবা যাঁহাতে যাঁহার অভিরুচি, তিনি সেই পথ অবলম্বন করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্য নাই। কিন্তু যে কথার স্পষ্টতঃ জাজ্বল্য ভাবে যাথার্থ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। পুরাতন হইলেই যে একবারে অস্পৃশ্য হইল এবং নূতন হইলেই যে তাহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার এমন বিশেষ বিধি কি আছে? নূতন ভাল হইলে গ্রহণ করিব, কিন্তু পুরাতন ভাল হইলেও শুদ্ধ পুরাতন বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিব কেন? ফরাসী গ্রন্থকার Boilean বলিয়াছেন, "পুরাতন এককালে নূতন ছিল, কিন্তু নূতনেরা যে কালে পুরাতন হইতে পারিবে, তাহার স্থিরতা কি"। * কথাটা ঠিক; আর্য্য ঋষিগণ নানাবিধ গভীর গবেষণা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের কৃত কীর্ত্তি সকলের আলোচনা করিয়া, এমন কি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, যাহাতে আমাদের কার্য্য সমুদয় একবারে বিলুপ্ত না হইয়া ভবিষ্যতে 'পুরাতন' বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে?

ফল কথা পুরাতন ভাল থাকিতে তাহা উপেক্ষা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতনের সম্মান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পুরাতনের যথাযথ সম্মান রাখিয়া, নূতনের সমাদর করাই যথার্থ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এ বিষয়ে Sidonius Apolonaris একটি সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা— 'we should read the ancient with respect and the moderns without envy'। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে দেশীয় পুষ্পের এমন কি দোষ দৃষ্ট হইল, যে তাহাকে এক বারে নগণ্য করিতে হইবে? গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বভাবতঃ পুষ্পনিচয় যেরূপ সুন্দর ও সুরভিযুক্ত হয়, তদ্রূপ আর কোন দেশে হয় না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের পুষ্পবৃক্ষ সকল এ দেশে সচরাচর যে প্রকার বিকৃত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। একথা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিলেও সেই একটানা স্রোতের গতি ফিরিয়া বহে না, ইহাই বড় পরিতাপের বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* Curiosities of Literature—"ancient and modern" p. 27. Routeldge's Edition.

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ]　　ভাদ্র, ১৩০৮।　　[১১শ সংখ্যা।

অনুস্মৃতি।

"অসুর বিবুধ সিদ্ধৈর্জ্জ্ঞায়তে যস্য নান্তং"
"সকল মুনিভিরন্ত শ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ"
"নিখিল হৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী"
"তমজ মমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি।" গারুড়ে॥

দুঃখ নিবৃত্তির পর সুখ প্রাপ্তি হউক ইহাই সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু সুখ প্রাপ্তির উপায় অপরিজ্ঞান বিধায় ইচ্ছা করিলেও সকলেই প্রকৃত সুখের সুখী হইতে পারেন না। সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতে হইলে, সুখ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। পরে তাহার প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে মনুষ্য প্রকৃত সুখের সুখী হইতে পারেন এই মনুষ্য-জীবন-কালই প্রকৃত সুখের তথ্য জানিয়া লইবার উপযুক্ত অবসর। সুখ কাহাকে বলে, দেখিতে গেলে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব যে, সঙ্কল্পাত্মক চিত্তের সাময়িক বৃত্ত্যন্তর বশতঃ সময় বিশেষে বস্তু বিশেষের অভাবের অসদ্ভাবই সুখ শব্দবাচ্য হয়। মনে করুন, যাঁহার সুন্দর গৃহ নাই, তিনি একটি উত্তম গৃহ পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন; যাঁহার পশু নাই, তিনি কতকগুলি পশু পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন; যাঁহার রমণী নাই, তিনি একটি সুন্দরী রমণী পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন; যাঁহার ব্রীহি ও রতন নাই, তিনি ব্রীহি ও রতন পাইলে

করিতে হইলে, জীবনের কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত করিলেও জীব কখনই প্রকৃত সুখের সুখী হইতে পারিবেন না; জীবনকালে জীবের অভাবের ইয়ত্তা নাই, একটি অভাব পূর্ণ হইলেই আবার একটি নূতন অভাব স্বতই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; জীব-সৃষ্টির ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রবাহ, ইহার গতিরোধ হইবার নহে। সেই জন্য সুধী ব্যক্তিগণ যাহার আদি নাই, অথচ যিনি সকলেরই আদি, যাহার কারণ নাই, অথচ যিনি সকল কারণের কারণ, সেই ঈশ্বর, পরম কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সুমনোহর নখকিঞ্জল্কাবধি উচ্চ হাস্য পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ বা আপন আপন সম্প্রদায়ানুসারে চক্রাদি ক্রমে ধ্যানযোগ দ্বারা সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত-বৃত্তি সকলকে বিকল্পাত্মক চিত্ত-বৃত্তি সকলে হোম করতঃ প্রারব্ধ ভোগ মাত্র করিয়া আনন্দ-মনা হইয়া থাকেন।

ইহদৃষ্টিতে যাহাকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহাকে প্রকৃত সুখ বলিয়া লওয়া হয় না বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি দৃশ্য বস্তু মাত্রই জীবের সুখের জন্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্তুতঃ মিথ্যা জানিয়াও জীব মাত্রে উহাতে লিপ্ত হয় কেন? ইহার উত্তরে ইহাই দেখিতে পাইব যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, সেই সমস্তই বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও কোন এক অনির্ব্বচনীয় সত্য পদার্থের চির সত্বা বশতঃ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জলপতিত চন্দ্র ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকৃত চন্দ্রের মধুরিমা যেমন নয়নপথের অতীত হয়, তদ্রূপ জগতীস্থ মায়িক বস্তু সকলে মমতা স্থাপন করিয়া গুরুরূপী পরব্রহ্মের সন্নিধান হইতে দাস বা বন্ধুরূপী জীব সুদূরে পতিত হইয়া থাকেন।

এবম্প্রকার চিত্তবৃত্তি সকলের বিক্ষেপজনিত অভ্যাসই কাল ক্রমে গাঢ় হইয়া অজ্ঞান নামে কথিত হয়। এই অজ্ঞানই সমস্ত দুঃখের জনক। যখন চিরমুনী সকলও কদাচিৎ ধ্যানাভাব হইয়া থাকেন, তখন স্বতঃ ভ্রান্ত জীবের কা কথা!

পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমে আত্মা, কর্ম্ম করিবার জন্যই চিরানুবদ্ধ, এবং কর্ম্মই জীবের সুখ বা দুঃখের হেতু। এবং চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তির পরিচালনই কর্ম্মপ্রবৃত্তি। কর্ম্ম ক্ষয় করিতে না পারিলে দুঃখ নিবৃত্তির অন্যবিধ উপায় নাই। অতএব চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তির পরিচালন যতই ক্ষীণ হইবে, জীবও ততই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবেন।

ইহজগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, তমঃ রজ ও সত্ত্ব এই তিনটি গুণের একত্রাবস্থা ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্ট হয় না। কালে ইহাদের প্রত্যেকই প্রধান হইয়া থাকে; অর্থাৎ সত্ত্বের উদয় কালে জীব সাত্ত্বিক, রজোগুণের উদয় কালে জীব রাজসিক, ও তমঃগুণের উদয় কালে জীব তামসিক আচরণ করিয়া থাকে। জীব বহুতর চেষ্টা করিলেও কখনই কালের গতি রোধ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের চিদংশ বিশেষ আত্মা জীবরূপে আকাশে, বায়ুরূপে বায়ুতে, তেজরূপে অগ্নিতে, জলরূপে জলে ও পৃথিবীরূপে পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু কি পৃথিবী, কি জল, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আকাশ কেহই ইহাকে জানে না; তবে আকাশে যে শব্দ গুণ আছে, বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, পৃথিবীতে যে গন্ধ গুণ আছে, অগ্নিতে যে দাহিকা শক্তি আছে ও জলে যে রস পদার্থ আছে, তাহা উক্ত ভূত সকলে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট থাকা বশতঃ হইয়া থাকে। জড়পদার্থে চিদংশের সন্নিধান না হইলে উহাতে চৈতন্য হইতে পারে না। যত প্রকার চেতন পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য জীবনই উত্তম দৃষ্টান্তস্থল; কেন না, মনুষ্য জীবনে মনুষ্য সকলকে হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট দেখিতে পাই, অন্য জীবে হিতাহিত জ্ঞান থাকিলেও তাহা কেবল ভয় বশতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্য জীবনে কাহাকেও ভয় করিতে হইতেছে না, নিজ শরীরে নিজে নিজে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার হইবার সুবিহিত উপায় রহিয়াছে। অন্য কোন জীবের সেরূপ ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। হরিস্মৃতিই সমস্ত সুখের একমাত্র জনক। হরিস্মৃতি অভয়দা, শুভদা ও বিঘ্ননাশিনী; অপর

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদি মধ্যেচ অন্তে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"

হরি স্মরণ করিলে কখনই কোন কার্য্যে ব্যর্থমনোরথ হইতে হয় না, হরি সকল দুঃখ কর্ষণ করিয়া সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী রাধার প্রতি মনোধারণা করাইয়া থাকেন, রাধার প্রতি মনোধারণা করিতে পারিলে সকল আপদ দূর হইয়া গেল, সুতরাং তখন সর্ব্বপ্রকার সুখ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সুখ সুখ করিয়া সুখান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয় না; কিন্তু বাঞ্ছনীয় বিষয় লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গুরুভক্ত বিশ্বাস

"দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

আরও—

"ধ্যানং দৈবত পূজনং জপতপো দানাগ্নিহোত্রাদয়ঃ।
"পাঠোযোগ নিষেবণং পিতৃমখোঽভ্যাগতার্চ্চা বলিঃ।
"এতেব্যর্থ ফলা ভবন্তি নিয়তং যস্যোপদেশং বিনা,
"তং বন্দে শিবরূপিণং নিজ গুরুং সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদং॥"

অর্থাৎ ধ্যান, দেবতা-পূজা, জপ, তপস্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ যজ্ঞ, স্তোত্রাদি পাঠ, যোগ সেবা, পিতৃ পূজা, পিতৃ যজ্ঞ, অতিথি সৎকার ও বলি-প্রদান, যাঁহার উপদেশ ব্যতিরেকে এ সমস্তই ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয়, সেই শিব-রূপী অভীষ্টদাতা গুরুদেবকে আমি নিত্য নিত্য বন্দনা করি। আরও যথা,

"গুরু বক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎ প্রসাদতঃ।
"স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনাং।
"অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুবদনস্থিত পরমব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীগুরু প্রসাদেই লাভ হয়, অতএব স্বাশ্রমোক্ত বর্ণ ধর্ম্ম এবং পুষ্টি বর্দ্ধিনী স্বীয় কীর্ত্তি প্রভৃতিকে বরং পরি-ত্যাগ করিবে, তথাপি গুরু ভিন্ন অন্য ভবনা ভাবিবে না। পুনশ্চ শ্রীভগবদুক্তৌ যথা—

"আচার্য্যং মাং বিজনীয়ান্নাব মন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্ব-দেবময়ো গুরুঃ॥"

অর্থাৎ আমাকেই (ভগবানকে) আচার্য্য জ্ঞান করিবে, কদাচ মৃত্যু সমাকুল মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না। কেননা, গুরু সর্ব্ব-দেবময়।

বিশেষতঃ কলিকালে শ্রুতি সকল পাষণ্ড ভয়ে গুপ্তা হইয়াছেন, আচার্য্য বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অন্যত্র বিশ্বাস স্থাপনা করিলে আমরা আমাদের অভীষ্ট-সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারিব না। গুরুতে বিশ্বাস করিতে না পারিলে চিরকালই অসুখী থাকিতে হইবে, সংসাররূপ কূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে, গুরু ভিন্ন ত্রিজগতে আর কেহ নাই—

"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।

অর্থাৎ গুরু বিদ্বান হউন আর নাই হউন, স্বপথে চলুন আর বিপথেই চলুন গুরুদেবই সদাকাল গ তি হইয়া থাকেন। অন্যত্র চ—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে নকশ্চন।

"তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুরেব প্রসাদয়েৎ॥"

অর্থাৎ হরি রোষ করিলে গুরু ত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রযত্ন সহ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে।

আমার কিন্তু গুরুতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। হরি স্মৃতির কোন ক্রমও অবগত নহি। এমতাবস্থায় দিন যায় রাত্রি আইসে, আবার রাত্রি যায় দিন আইসে, কত দিন কত রাত্রি চলিয়া গেল, আমি যে অসুখী, সেই অসুখী; এমতাবস্থায় একদিন মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মন! তুমিত দেহেন্দ্রিয় সকলের রাজা, কৃপা করিয়া আমায় হরি দেখাইতে পার? তখন মন আমাকে সঙ্গে লইয়া জগতীস্থ নানা স্থানে লইয়া গিয়া নানা মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল, কিন্তু কোন মূর্ত্তিই আমার মন ভুলান না হওয়ায় পুনরায় মনকে বলিলাম, মন! তুমি আমাকে অনর্থক ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াও কেন? বঞ্চনার ফল কি? তখন মন বলিল, তুমি যাহাকে দেখিতে চাও, তাহাকে কি এই প্রথম দেখিতে যাও, না আর কখন দেখিয়াছ? কেননা যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে, পূর্ব্বে সে বিষয়ের অন্যবিধ জ্ঞান চাই; প্রত্যক্ষ হউক, অনুমান হউক, আর শব্দ বোধই হউক, এই জাতীয় জ্ঞান না থাকিলে স্মরণ হইতেই পারেনা। প্রথম অনুভব, প্রত্যক্ষাদি তাহার পর, তাহার পর সংস্কার, তাহার পর স্মৃতি, তাহারই ফল ধর্ম্মশাস্ত্র, এই জন্যই উহার নাম স্মৃতি না এই প্রথম দেখিতে চাও? আমি বলিলাম আমার মনে হয়, যখন আমি মাতৃগর্ভে নিহিত ছিলাম, তখন একবার দেখিয়াছিলাম; মাতৃগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আর দেখিতে না পাইয়া কাহা কাহা করিয়া কান্দিয়া উঠিলে জননী মুখে স্তন্য দিলেন। স্তন্য পান করিবা মাত্র সেই মন, প্রাণ নয়ন ভুলান রূপ আর দেখিতে বা দেখিবার চেষ্টা পাইলামনা। ভাই মন! আমায় কে ভুলাইল? তখন মন বলিল, তুমি যাঁহার রাজ্যে আসিয়াছ, তিনিই তোমাকে তোমার হরি ভুলাইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কে? কোথায় থাকেন? তখন মন বলিল, তিনি মায়া, সর্ব্বত্রই বিরাজমানা। আমি

লইয়া আমার চক্ষুদ্বয়ে সেচন করিবা মাত্র দেখিলাম, এক তপ্ত কাঞ্চন বরণা সুন্দরী যুবতী আলুলায়িত কেশে দিগ্‌বসন পরিধান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তাঁহার কপালে অরুণ-বিনিন্দিত সিন্দূর বিন্দু, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে কমণ্ডলু, অধর ফলকে মৃদু মন্দ হাসি ও তাহাতে এমনি প্রকাশ, যেন প্রার্থিগণকে বরাভয় প্রদান করিতে সদাই উদ্যতা।

আমি দেখিয়াই প্রণতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো! তোমার রাজ্যের ব্যবহার ও নিয়ম কি? বলিলেন

আপনার বল যারে, সেতো তোমার মন্দ করে,
আপনারে জানায়ে তোমার
আর, পুত্র, পৌত্র, পরিবার আর শত শত,
আমার রাজ্যের ধন তারে বিধিমত;
প্রদান করিয়া নিত্য তাহারে ভুলাই,
আমার আমার মাত্র তাহারে শিখাই;
সে যে কার, কে তাহার নাহি দিই অন্ত,
সর্ব্বদা তাহারে রাখি এই মতে ভ্রান্ত;
মৃত্যুকালে মম বশে আমারে ধেয়ায়,
পুনর্ব্বার জন্ম হয় আমাতে বেড়ায়।

তখন আমি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো! তোমার রাজ্যে আসিয়া পড়িলে নিস্তারের কি কোন উপায় নাই? উপদেশিলেন

ত্যজ, ত্যজ, রে বৎস ঘৃণা লজ্জা ভয়,
আর নিন্দা জাতিকুল শীল কর ক্ষয়;
আদি, মধ্য অন্ত্য বৎস কররে বর্জ্জন,
সর্ব্বদা আনন্দে তুমে কররে স্থাপন;
রহ, রহ, রে বৎস, নিত্যতত্ত্ব স্থানে,
তা হলে কি ভব ভয় আছে কোন স্থানে;
নির্ব্বিকার হবে তবে, সাধুজন সঙ্গ পাবে,
হবে তব সুকৃতি উদয়।
(হবে সৎপথে ভক্তি, অনায়াসে পাবে মুক্তি,
সংসারের আর কিবা ভয়;

এই স্থলে বল হরি, পুনরে বদন ভরি,
হরি, হরি, হরি কর সার,
সুভক্তি উদিত হবে, পুন নাহি জন্ম পাবে,
এড়াবে সংসার কারাগার।

বলিলেন বৎস! শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাক্যে অটল বিশ্বাস করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া অগ্রসর হও। বস্তুত কোন অভাব থাকিবে না, সকল কামনাই পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া কি জানি কোন্ পথ দিয়া কোন্ নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন—আর দেখিতে পাইলাম না, আমি আবার যে কে সেই—সেই অসুখী এবং না হইবই কেন? গুরু ও হরিতে অভেদ জ্ঞান স্থাপনা করিতে না পারিলে ত আর কোন উপায় নাই—যথা ব্রহ্মণোবাক্যং

"যোমন্ত্রঃ সগুরুঃ সাক্ষাৎ, যো গুরুঃ সহরিঃ স্মৃতঃ ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ।

ফুল ও ফুলের ভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিলাতী পুষ্পের জন্য যে প্রকার যত্ন, পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয়িত হয়, দেশীয়ের জন্য তাহার কণাংশ মাত্র হইলেও যে বিশেষ উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে একথা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইবে। 'স্থলপদ্ম আশ্বিন মাসে ফুটিতে আরম্ভ হয় ও ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্ত ফুটিয়া উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করে, ইহার বড় বড় ফুল হয় দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ হয়; কিন্তু আমরা ইহার আর একটি গুণ দেখিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বর্ষারম্ভের কিছু পূর্ব্বে ইহার মোটা শাখা ছাটিয়া দিলে সেখানে অনেক গুলি শাখা বাহির হয়। এই নবীন শাখাগুলি অতি অল্প দিনেই পাটের গাছ হইতেও লম্বা হয়। যে সময়ে পাট কাচিয়া পচান হয়, সেই সময়ে এই ডাল গুলি কাটিয়া সেইরূপ পচাইয়া ধুইয়া লইলে অতি উৎকৃষ্ট পাট হয়, যেমন শক্ত তেমনি দীর্ঘ ও পরিষ্কার। যদি ইহার রীতিমত চাষ করা হয়, তাহা হইলে আরও সুন্দর ও অধিক পরিমাণে জন্মে,

আর একটি কথা, পাটের ন্যায় ইহার গাছ বৎসর বৎসর সমূলে নষ্ট করিতে হয় না। একবার হইলে বহু বৎসর থাকে। ... গবাদির উৎপাত, বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি দ্বারা ইহার নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। কার্ত্তিক মাসের শেষে, অর্থাৎ বর্ষা ক্ষান্ত হইলেই, ইহার ছোট শাখা বিতস্তি প্রমাণ করিয়া পুতিলে দুই বৎসর মধ্যেই আশানুরূপ বৃক্ষ হয়, তখন কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে।" * অধিক কি এক ভারত ক্ষেত্রে চেষ্টা করিলে ২৫৪ প্রকার গোলাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। †

পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে অধুনা পুষ্প ও পুষ্পোদ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য অবসর কালে বা সময় অসময়ে মনের একটু শান্তি লাভ করা,—ক্ষুণ্ণ মনে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তির বিকাশ করা। দুর্লভ মানসিক শান্তি ও স্ফূর্ত্তির জন্য এত যত্ন, এত আয়াস ও এত অর্থব্যয়। কিন্তু বহু কষ্টে রচিত সেই বিচিত্র শোভাময়ী bower এ বসিয়া, আশানুরূপ হৃদয়ের শান্তি কয়জনে লাভ করিয়া থাকেন?

যে কবি?

'প্রকৃত তাহার সব অধিকার
আকাশ কানন কন্দর গিরি,
তার অন্তর্গত রাজ্য দেশ কত
সকলি তাহার আনন্দ পুরি।'

তাহার আবার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পুষ্পোদ্যানের আবশ্যক কি? সে—

'আসিলে বৃক্ষের পত্র
অনিমেষে চেয়ে রয়—
বনের পাখীর রবে
বিমুগ্ধ।'

তাহার আবার bower এর দরকার কি, তাহার আবার হার্ম্মনিয়ম্ ফ্লুটের কি কাজ? ভাবুক প্রকৃতি প্রেমে বিভোর, সে বলে

'যা দেখি যা বুঝি, সতি
তাই যেন নিয়মিত
ভুলাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণ'

* হিতবাদী ৩০ ভাদ্র ১৩০১।

† The Indian amateur Rese gardener—ch xI.

তাহার আবার দেশী বিদেশী ভালমন্দ বিচার কি? তাহার নিকট

"যার পানে চাই　　　সেই মধুময়
　সরলতা গুণে ভুলিয়ে রই।'
'জল নিরমল　　　যা কিছু সরল
　সকলি আমার সুখের মূল।'
'চাঁদের কিরণ　　　কাননের ফুল
　যখন যে ভাবে যেখানে দেখি।'
'ভুলে যাই দুঃখ　　　ভুলে যাই জ্বালা
　আপনা ভুলিয়ে চাহিয়ে থাকি।"

প্রকৃতির সর্ব্বত্রই মধুময়, প্রতি অনুপরমাণু উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ-ঠল্ ঠল্ করিতেছে; তবে প্রবেশ করা চাই, নচেৎ অন্ধের মত সকলই শূন্য এবং অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহার একটি মাত্র চক্ষু আছে, সে চর্ম্মচক্ষে সমগ্র বাহ্যপ্রকৃতি দেখিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারে কয় জন? আর এক কথা, প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের এমনই গুণ যে, যতই আলোচনা করি, ততই অভিনব সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে। সেই জন্য কবি, স্তব্ধ প্রকৃতি লইয়াই সুখী, প্রকৃতি পাঠেই মাতোয়ারা। কিন্তু এইরূপ কবি হইতে পারে কয়জন,—এই সুখ কয়-জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে?

জগদীশ্বরের বিশাল রাজ্যে সকলে সমান নহে—সকলে সমভাবে সুখী হইবে কোথা হইতে, সকলে কবি হইবে কেমন করিয়া। সুখ দুঃখ ভাগ্যাভাগ্য সকলেরই তারতম্য আছে। কবি প্রকৃতিরাজ্যে যাহা দেখে, তাহাতেই উন্মত্ত; আমি একজন সাধারণ সঙ্কীর্ণচিত্ত ক্ষুদ্র মানব, বিচিত্র কৃত্রিম শোভাযুক্ত বিবিধ বর্ণের পত্র পুষ্প পরিপূরিত সীমাবদ্ধ অল্লায়ব উদ্যান ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর কি।

ভাল কথা;—কিন্তু আমরা বিষয়ান্তরে নিযুক্ত ছিলাম। বলিতেছিলাম, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে মনোরম পুষ্পোদ্যান অত্যাবশ্যক বটে, তবে উদ্যান রচনা সম্বন্ধে দেশীয় পুষ্পের প্রতি একটু নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হইতেছে। উদ্যানে বিদেশী পুষ্পের আমদানী হওয়ার পক্ষে, আমরা বিরোধী নহি; বরং ইহার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই আমরা সুখের বিষয় বিবেচনা করি।

কিন্তু, এটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক, যেন দেশীয় পুষ্পের প্রতি কোন মতে গর্হিতাচরণ করা না হয়।

সুখের ও গৌরবের কথা, যে ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে উদ্যান-রচনা, কৃষিকার্য্য প্রভৃতির প্রতি কিঞ্চিৎ শুভদৃষ্টি পতিত হইতেছে। এই সকল সম্বন্ধে আলোচনা একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছিল; পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং তাহাদিগের অপরাপর বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যার প্রতি অতিশয় অনুরাগ দেখিয়া—কত গ্রন্থকার এ বিষয়ে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন—আমাদেরও অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়ে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশীয়ের প্রতি টান্ একটু বেশী। তা হইবারই কথা; আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি একবারে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন,—বাঙ্গালার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। কিন্তু ক্রমে এক্ষণ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?—ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়া অনেক মহাত্মা এক্ষণ বাঙ্গালা ভাষা ও বিজ্ঞানের পুষ্টি-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহা কিছু অভাব আছে, পূরণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্য পুষ্পোদ্যান রচনা সম্বন্ধে বিদেশীয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বেশী টান্ দেখিলে তত দুঃখিত হইবার কারণ নাই—দেশীয়ের উন্নতির আশা করিবার সময় অতিবাহিত হয় নাই, এমন কি উন্নতির আশা করিবার সময় হয় ত এক্ষণে বহুদূরে অবস্থিত।

পুষ্প ও পুষ্প বৃক্ষের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুষ্পের উৎকর্ষসাধন করা সামান্য কথা নহে; এ সকল বিষয়ের জটিল বিজ্ঞানশাস্ত্র আছে, বহু যত্ন এবং আয়াসে শিক্ষা করিতে হয়। কে বলিবে, যে বিদেশীয়দিগের নিকট বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে দেশীয় পুষ্প-বৃক্ষাদির উন্নতিকল্পে এবং দেশীয় বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনায়, অনেকেই বিশেষ যত্নপর না হইবেন।

এক্ষণে আমরা পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে ফুলের যে ভাষা সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা এবং উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

নিম্নাবস্থায় অবস্থান করিয়া যিনি যত যত্ন ও পরিশ্রম করিবেন, তিনি ততই ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। এ কথার যাথার্থ্য

ব্যষ্টিগত অথবা জাতিগত, উভয় অবস্থায় সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক অথবা পরমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এ বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইবেন, আমরা তাহাকে ততই ভালবাসা হইতে সম্মান এবং সম্মান হইতে ভক্তি করিতে আরম্ভ করি। সেই জন্য আমরা বাল্মীকি ব্যাসকে শুদ্ধ কবি বলিয়া ক্ষান্ত হই না,—দেবতা তুল্য জ্ঞান করি। ইংরাজগণও Milton ও Shakespearকে Divine শব্দে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেইরূপ আবার দাম্পত্য প্রণয় এবং ভালবাসা হইতে ঈশ্বর প্রীতি ও প্রেম প্রাপ্ত হইবার সম্ভব, তবে যিনি যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই হেতু পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা আমরা আপনাদিগকে অধিকতর উন্নত মনে করি। 'পুষ্প' শব্দটি উচ্চারণ করিলে, হিন্দুহৃদয়ে দেবভাবেরই সমধিক স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তদেতর ভাব বড় একটা মনকে অধিকার করিয়া বসিতে পারে না। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে এখনও ইতর ভাবই প্রবল; অধিকাংশ স্থলেই পুষ্প, শুদ্ধ প্রণয়ীর ভালবাসা দেখাইবার নিদর্শন মাত্র—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিলাস সামগ্রী। কিঞ্চিৎ পরে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যদি কোন প্রকার পুষ্পের ভাষা প্রচলিত থাকে, তবে তাহা নীরব ও অব্যক্ত। নীরবে ও নির্জ্জনে, প্রাণভরা প্রাণের ভাষা, পুষ্পের অব্যক্ত গভীর ভাষায় বিমিশ্রিত হইয়া, হৃদয়ের প্রেম-অশ্রুতে লিখিত হইলে, তাহাই বাগ্মী প্রবরের অকাট্য বাক্‌প্রপঞ্চের ন্যায় ক্রিয়া করিতে থাকে; শুদ্ধ পুষ্প অথবা বৃক্ষপত্র, কথিত ভাষার ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিতে পাই না। শকুন্তলাকে শুকোদর সুকুমার নলিনী পত্রে নখ দ্বারা বর্ণ অঙ্কিত করিয়া 'মদন লেখ' প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল; সুন্দরকে রতির ফুলময় তনু গড়িয়া, কেঁয়া পত্রে চিত্র শ্লোক লিখিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিতে হইয়াছিল —পরিশ্রমের এক শেষ! পাশ্চাত্যগণের কিন্তু এইরূপ স্থলে বিশেষ সুবিধা। ইংলণ্ডে ফুলের ভাষা বহুদিবসাবধি প্রচলিত আছে। Spencer, Ben Jonson হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবিদিগের গ্রন্থে পর্য্যন্ত, ইহার বিস্তর আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যেস্থলে হৃদ্গত বা মনোগত ভাব সমূহ বাক্য দ্বারা পূর্ণ বিকশিত করিতে অসমর্থ হয়, তথায় পুষ্পের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

"All those token-flowers which tell
What words could ne'er express so well."

Mary Worthy Montague তুরস্ক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই প্রথা ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তুর্কেরা নাকি এ বিষয়ে সমধিক পটু।

লিখিত ভাষা মাত্রেরই যেমন ব্যাকরণ প্রচলিত আছে এবং স্থলবিশেষে তাহার ও আবার সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট থাকে, ফুলের ভাষা সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই প্রথা অবলম্বন করিবার যত্ন করা হইয়াছে।

সর্ব্বনাম সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কেত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন বিশিষ্ট ফুলকে বাম দিকে নত করিলে ক্ষেত্রানুসারে 'আমি' অথবা 'আমাকে' বুঝিতে হইবে এবং দক্ষিণ দিক নত করিলে 'তুমি' অথবা 'তোমাকে' বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন প্রকৃত ফুল না দিয়া, কেবল মাত্র তাহার চিত্র প্রেরণ করা হয়, তখন ঐ ফুল পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেতের বিপরীত ভাবে অঙ্কিত করিতে-হয় 'তুমি' ও 'তোমাকে' বুঝাইতে হইলে, বাম দিকে নত করিয়া চিত্রিত করিতে হয়।

যে ফুল যে ভাব পরিস্ফুট করে, সেই ফুলটিকে উল্টাইয়া ধরিলে, অর্থাৎ বোঁটাধার উপর করিয়া ধরিলে, ঠিক্ তাহার বিপরীত ভাব বিজ্ঞাপিত হয়। পত্র ও কণ্টক সহ গোলাপ কোরক প্রেরিত হইলে, বুঝিতে হইবে, যে আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে, কিন্তু আশাও করিতে পারি; কোরকটি উন্নতানত করিয়া প্রেরিত হইলে "তোমার আশা বা শঙ্কা কিছুই করিবার দরকার নাই।" আবার কোরকটি কণ্টক বিবর্জ্জিত করিলে, 'আশা করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে' ('There is everything to hope') এইরূপ এবং পত্র শূন্য করিলে শঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে (There is everything to fear) এইরূপ বুঝিতে হইবে। কোন এক প্রকার ফুল (Pausy) সোজাভাবে ধরিলে 'হৃদয়ের শান্তি' (Heart's ease) এবং উচ্চ ভাবে ধরিলে তাহার বিপরীত অর্থ বুঝায়। আবার এই ফুল যখন কাহাকেও হাতে হাতে সোজাভাবে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তখন সে ব্যক্তি' আমায় মনে রেখো ('Think of me') এইরূপ এবং উল্টাভাবে প্রদত্ত হইলে 'আমায় ভুলিয়া যাও' (Forget me), এইরূপ বুঝে। Amaryllis নামক এক প্রকার ফুল, অহঙ্কারের সংজ্ঞা বলিয়া নিদ্দিষ্ট; পূর্ব্বোক্ত প্রথা অনুসারে 'my pride is humbled', 'your pride is checked' এই দুই ভাব উর্দ্ধাধঃ এবং বামদক্ষিণ দিকে নত করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

Wall-flower দুর্ভাগ্যের সময় অনুরক্ত থাকার চিহ্ন (Fidility in misfortune) বোঁটা ধরে উন্নত করিয়া কাহাকেও প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি দুঃখের সময় অবিশ্বাসের (unfaithful in trouble) কার্য্য করিয়াছিল, এই রূপ সূচিত হয়। আবার mary gold Flower হস্তে রাখিলে 'মনের কষ্ট (Trouble of mind) হৃদয়ে ধারণ করিলে বিপত্তি অথবা প্রীতি '(trouble or love) এবং বক্ষে ধারণ করিলে ক্লান্তি (weariness) বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

A, An এবং The এই তিনটি ইংরাজী (Article) শব্দ এক, দুই ও তিন শাখা বিশিষ্ট লতাগ্র ভাগ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবারও সহজ উপায় আছে। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা, যথাক্রমে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যক পত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এগার হইতে উনবিংশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বুঝাইতে হইলে,দশটি পাতায় অতিরিক্ত ফল সংযুক্ত করিতে হয়; যথা ১৩ তের বুঝাইতে হইলে, দশটি পত্র যুক্ত শাখায় তিনটি ফল সংযুক্ত করিতে হয়। ২০ হইতে ৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভিন্ন নিয়ম; যত দশক হইবে, দশ সংখ্যা পত্র বিশিষ্ট শাখায় ততটি যুক্ত পত্র সংলগ্ন করিতে হয়, বক্রী সংখ্যা ফলের দ্বারা জ্ঞাপিত করিতে হয়। যথা ৫৫ বুঝাইতে হইলে, দশ পত্র বিশিষ্ট শাখার অগ্রভাগে পাচটী যুক্ত পত্র সংশ্লিষ্ট করিলে পঞ্চাশ হইল, তাহাতে পূর্ব্বকার মত পাঁচটি ফলযুক্ত করিলে সর্ব্ব সমেত ৫৫ হইল। একশত হইলে দশটি দশপত্র বিশিষ্ট শাখা একটি বৃহৎ শাখায় সংযুক্ত থাকে, তাহাতে আবার যতটি পৃথক পত্র থাকিবে, তত শত বুঝিতে হইবে। খুচরা সংখ্যার নিয়ম পূর্ব্বকার মত। এই প্রকারে এক শত হইতে নয় শত নিরানব্বই: সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দশটি কারণ পত্র থাকিলে সহস্র এবং তাহাতে যতটি অপর অপর পত্র সংলগ্ন থাকিবে, ততগুণ সহস্র বুঝিয়া লইতে হয়। এইরূপ ফল ও পত্রের দ্বারা, বয়স, জন্ম তারিখ প্রভৃতি অনায়াসেই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

কোন প্রণয়ী নিজ প্রণয়িনার অষ্টাদশ জন্মোৎসবে পুষ্প ও পত্রের দ্বারা কিরূপ মনের অস্ফুটভাব, জলন্ত ও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। একটি চির সবুজ (চির ভালবাসার নিদর্শন) পত্রে, মাল্যের ভিতর দশটি পত্র বিশিষ্ট শাখায় আটটি ফল সন্নিবেশিত করিয়া (অষ্টাদশ প্রণয়িণীর বয়ঃক্রম), তাহাতে একটি লাল গোলাপ

কোরক (নির্ম্মল এবং সুন্দর) অথবা শ্বেত-পদ্ম (পবিত্র ও বিনীত) স্থাপিত করিবে ; ইচ্ছা হইলে তাহাতে আরও পীচ মুকুল (=আমি তোমার বন্দী), কারণ (=সরলতা) প্রদান করা যাইতে পারে।

সপ্তাহের সপ্ত বার ও বৎসরের দ্বাদশ মাস জ্ঞাপন করিবার ভিন্ন ব্যবস্থা আছে ; সপ্তাহ যথা—সোমবারঃ—পদ্ম পত্র ; সোমবার হইতে সৃষ্টির আরম্ভ, পদ্মপত্র সূর্য্যোদয়ে দিবারম্ভে প্রস্ফুটিত হয়।

মঙ্গলবার ঃ—অর্দ্ধ শুভ্র ও অর্দ্ধনীল বর্ণ পত্র ; শুভ্র ভাগ স্বর্গ এবং নীল অংশ সমুদ্রের চিহ্ন। সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

বুধবার ঃ—ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পত্র ; শুভ্রাংশে স্বর্গ, নীলাংশে জল এবং হরিতাংশে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিবসে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

বৃহস্পতিবার ঃ—হরিদ্বর্ণ পত্রের উপর একটি পুষ্প ; কারণ সৃষ্টির চতুর্থ দিবসের কার্য্য Luminary

শুক্রবার ঃ—একটি কীট অধিষ্ঠিত একটি পত্র, শুক্রবার হইতে জীবের সৃষ্টি।

শনিবার ঃ—ফলযুক্ত পত্র ; শনিবার দিবস শাক্ সব্জী ও ফল মূলের সৃষ্টি হয়।

রবিবার ঃ—একটি অলিভ (Olive) পত্র ; বিশ্রাম ও পবিত্রতার চিহ্ন।

মাস যথা ঃ—

জানুয়ারী ঃ—সাময়িক পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত একটি রবিন্ পক্ষী ; এই সময় রবিন্ পক্ষীর আবির্ভাব হয় এবং সাময়িক পুষ্প সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠে।

ফেব্রুয়ারী ঃ—সাময়িক পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত, একটি (Gold-finch) পক্ষী ; এই সময় এই সকল পক্ষী সঙ্গমে রত হয়।

মার্চ্চ ঃ—বাদাম শাখা সমন্বিত একটি পক্ষীর বাসা।

এপ্রেল ঃ—ঝোপের মধ্যে একটি লিনেট পক্ষীর কুলায়।

মে ঃ—পুষ্পবিশিষ্ট একটি ঝোপে কুলায়, আহার-লোলুপ পক্ষী শাবকের চিত্র।

জুন ঃ—অঙ্কুর জনিত পরিপক্ক Stradberry ফল।

জুলাই ঃ—সুগন্ধী বেগুনে Thyme জড়িত, লাল রঙের cherry গুচ্ছ।

আগষ্ট ঃ—পক্ক বদরী সংলগ্ন যব ও গমের গুচ্ছ।

সেপ্টেম্বর :—অঙ্কুর সংযুক্ত hops নামক বৃক্ষপত্রের মাল্য।

অক্টোবর :—বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট চীন Asters এবং hazel-nuts গুচ্ছ।

নভেম্বর :—গাজর ও সালগম সংশ্লিষ্ট আইবি লতার মাল্য।

ডিসেম্বর :—Holly পুষ্পমাল্যে চাকচিক্যময় সবুজ পাতা এবং সিন্দূর বর্ণ ফল ও তাহার মধ্যে আনন্দপ্রদ mistaletoe এতগুলি একত্র রহিলে ডিসেম্বর মাস বুঝিতে হয়।

প্রবন্ধটি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে চলিল। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভব; বিশেষতঃ এইবার ক্ষান্ত না হইলে বীরভূমির বহুমূল্য স্থানের অপ-ব্যবহার করা হইবে। এই জন্য আমরা আপাততঃ আরও কয়েকটি বিলাতী ফুল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া অদ্যকার মত বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

Chamomile :—'দুঃখে সাহস,' এই পুষ্প যতই নিষ্পেষিত হয়, ততই মনোরম ঘ্রাণ উৎপাদন করে।

Dodder :—"নীচতা"; এই পুষ্পলতা সাধারণ মৃত্তিকায় আগাছার মত জন্মায়। অন্য বৃক্ষ বা গুল্মে সংলগ্ন হইলে তাহাতেই জড়াইয়া থাকে; তখন ইহার মূল নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ বৃক্ষ বা গুল্ম হইতেই পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

Buckbean :—"স্থির ও শান্তি"; যখন আকাশ নির্ম্মল হয় এবং সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতে থাকে, তখন এই শ্বেত পুষ্প সকল গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত হয়। সচরাচর এই পুষ্প জলাশয়ের নিকট জন্মে, এই জন্য ইহার শ্বেত পুষ্প নির্ম্মল জলে প্রতিফলিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখায়।

Darnel :—"পাপ"; মানবের মনে পাপ প্রবেশ করিলে যেরূপ সদ্বৃত্তি নিচয় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই পুষ্প, শস্যক্ষেত্রে জন্মিয়া শস্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। ইত্যাদি

শ্রীশিবরতন মিত্র।

কোথা শান্তি ?

হেথা, সদা জ্বলে শোকানলে, এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর,
সদা উঠে হাহাকার ;
হেথা, বিষে হৃদি জর্ জর্ হয়ে আছি মর্ম্মাহত
হৃদি পুড়ে ছারখার ;
হেথা, কিবা নিশি দিনমান সদা বহে এক টান
দুঃখ-স্রোতে হৃদি ভাসে,
হেথা, কোথা হ'তে অলক্ষিতে অশান্তি যাতনা আসি,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় গ্রাসে ;
হেথা, সদাই আকুল প্রাণ, হৃদে তৃষ্ণা বলবান,
শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায় ;
হেথা, প্রবল অশান্তি বাতে উৎপাটিত শান্তি তরু
ফুলে ফল ঝরে যায় ;
হেথা, সংসার-বিটপী তলে, খুঁজিয়াছি যতবার
শান্তির শীতল ছায় ;
শেষে, হতাশে ভেঙ্গেছে বুক, লাঞ্জনা, গঞ্জনা সহি
ফিরিয়াছি পায় পায়,
তাই, বিষম বিপাকে পড়ি, ডাকিতেছি বার বার
ওগো দেবি শান্তি রাণি !
ওমা, তোর আশে সযতনে রেখেছি আপন মনে
এ হৃদি আসন খানি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বালী।

জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ব।

অনন্ত-শক্তির অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডল অন্যতম। প্রভাতে রক্তরাগ রঞ্জিত পূর্ব্ব গগনে 'জবাকুসুম সঙ্কাশ' তপন দেবের উদয়, পৌর্ণমাসীর সান্ধ্য নিশায় জগৎ-মনোহর রূপে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ, অমা-নিশার তামসী রজনীতে সুনীল নির্ম্মল আকাশে সুরবালা দীপরাজি সদৃশ তারকাবলীর আবির্ভাব আমরা আজন্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই এই জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিদ্যমান আছে। সমুদ্র-সৈকতের ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সুবিশাল মহীধর, প্রভাত তৃণদল সংযুক্ত ক্ষুদ্র শিশির কণা হইতে অনন্ত অসীম নীল অম্বুধি, চক্ষুর অগোচর সামান্য কীটাণু হইতে জীবকুলশীর্ষ মানব প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই যাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক, গণনাতীত জ্যোতিষ্কমণ্ডলও এই বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা যুগযুগান্তর ঘোষণা করিতেছে। সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মহাতেজা তপনদেবই সর্ব্ব প্রথমেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কোটী ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত রাজ্যে তপনদেবের ন্যায় বা তাঁহা অপেক্ষা মহীয়ান কোটী কোটী জ্যোতিষ্ক বিদ্যমান থাকিলেও নৈকট্য নিবন্ধন, বাল্যকাল হইতেই তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া তিনি আমাদের চক্ষে মহান। শৈশবে 'দিদিমার' মুখে তাঁহার বৃদ্ধ সারথি পরিচালিত অষ্টাশ্ব যোজিত বিশাল স্যন্দনের কথা শ্রবণ করিয়াছি, পৌষের দারুণ শীতে সতৃষ্ণ নয়নে পূর্ব্ব গগনে তাঁহার উদয়ের প্রতীক্ষা করিয়াছি, কখনও বা তাঁহাকে মাতুল সম্বোধনে, কখনও বা তাঁহার অতি বৃদ্ধা মাতাকে উৎকোচ-প্রদান প্রলোভনে তাঁহার শীতাপহারক প্রখর কর-প্রার্থী হইয়াছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রকার-মুখে তাঁহার দেবত্বের কথা শুনিয়াছি, পৌরাণিক মুখে তাঁহার অমিত পরাক্রমশালী বিস্তৃত বংশের বিষয় অবগত হইয়াছি, আর সেই অনন্ত শক্তিমান মহান্ জ্যোতিষ্মানের চক্ষু স্বরূপ এই অমিত-তেজা জ্যোতিষ্ক-পুঙ্গবের অনুপম রূপে ও অপার শক্তি দর্শনে আত্মহারা হইয়া 'জবা-কুসুম সঙ্কাশং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভক্তিভরে শত সহস্র বার তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়াছি। এই

তপন দেব হইতেই জগতের উদ্ভব, তাঁহা ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব, সেইজন্য তিনি 'সবিতা' বা 'জগৎ প্রসবিতা'। সুতরাং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের আলোচনা করা অসম্ভব। তাঁহার বিষয় যথাশক্তি আলোচনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মানব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যদেবকে বিভিন্ন চক্ষে দর্শন করিয়াছে, সে সমুদয়ের অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতিকালে বিজ্ঞান শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া সূর্য্যের ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা পৌত্তলিকতা মাত্র। সুতরাং আমিও বিজ্ঞানবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক-চক্ষে সূর্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা চর্ম্মচক্ষে সূর্য্যকে একখানি গোলাকার রৌপ্য থালার ন্যায় ক্ষুদ্র ও সমতল দেখিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড ও পৃথিবীর ন্যায় বর্ত্তুলাকার। যেমন কোন গোলকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে উহার এক অংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, অপর সমুদয় অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে, সেইরূপ আমরা সূর্য্যেরও অংশমাত্র দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যের আয়তন এত প্রকাণ্ড যে, উহার পরিমাণের বিষয় সম্যক ধারণা করা এক প্রকার অসম্ভব। বহু দিন পরে পুত্র-কন্যার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণেচ্ছু বা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর প্রণয়-সম্ভাষণ-লিপ্সু প্রবাসী পাঠক বোম্বে বা পঞ্জাব মেলের বেগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। "ছয় দণ্ডে ছয় দিনের পথ" অতিক্রম করিয়া সুদূর ব্যবধানস্থিত প্রিয়তম-পুত্রের সুখ-সংস্পর্শে আত্মহারা হইয়া বা প্রণয়িণীর সুকোমল বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া বাষ্পীয় শকটের ঐশশক্তি সম্পন্ন আবিষ্কারকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার দ্রুতগামী যানে আরোহণ করিয়া যদি একবার সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতে হয় তাহা হইলে দিবারাত্রির মধ্যে একবার বিশ্রাম না করিলেও দশ বৎসর লাগিবে! পৃথিবীর আয়তনকেই আমরা অতি প্রকাণ্ড বলিয়া জানি কিন্তু সূর্য্যকে দশ লক্ষ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগও পৃথিবী অপেক্ষা বড়! সূর্য্যের তাপ পরিমাণও আয়তনেরই অনুরূপ, বৈজ্ঞানিক রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে, কৃত্রিম উপায়ে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করিতে পারেন, তাহা সূর্য্যতাপের সামান্যাংশ মাত্র প্লাটিনম,

নামক ধাতুখণ্ডে তাড়িৎপ্রবাহ চালিত করিলে উহা অত্যুত্তপ্ত ও অত্যুজ্জ্বল হইয়া দ্রব হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত যাবতীয় তাপের মধ্যে এই গলনশীল প্ল্যাটিনমের তাপ পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু সূর্য্যতাপের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সূর্য্য এত প্রকাণ্ড হইলেও আমাদের চক্ষে এত ক্ষুদ্র কেন? সূর্য্যতাপ এত অধিক হইলেও আমরা তাহাতে ভস্মীভূত হই না কেন? পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বই ইহার কারণ। সূর্য্য আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই দূরত্ব নিবন্ধনই আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি, এই দূরত্ব নিবন্ধনেই সূর্য্যতাপের অতি সামান্যাংশ মাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছছে। কোন প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই আমরা উহার তাপ অধিক অনুভব করি এবং উহা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, উহার তাপও তত হ্রাস হয়, আমরা এই অসীম তাপরাশি হইতে ৯ কোটীরও অধিক মাইল দূরে অবস্থান করিতেছি বলিয়া সেই অনমুমেয় তাপের প্রভাব অনুভব করিতে পারি না। যদি কোন উপায়ে সূর্য্যের সন্নিহিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ভীষণ দাবানলে ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত বা বাষ্প-পুঞ্জ মাত্রে পরিণত হইতাম, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠিব, ততই সূর্য্যের সন্নিহিত হইব, সুতরাং তাপ পরিমাণও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা ঘটে না। যাঁহারা কখন শৈলারোহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কখন হিমাদ্রির উচ্চ-চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে আরোহণ করা যায়, তাপের পরিমাণ সেই পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। সাগরতল হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত দার্জ্জিলিংএ সমস্ত বর্ষব্যাপী ঘোর শীত, পৃথিবীস্থ যাবতীয় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ চিরনিহারাচ্ছন্ন। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে এই ব্যাপারটী তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা সূর্য্য হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে তাপ প্রাপ্ত হই, তাহার পরিমাণ এত অল্প যে, উক্ত তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইবার কোন উপায় না থাকিলে পৃথিবী চিরবরফাচ্ছন্ন হইয়া প্রাণীবাসের অযোগ্য হইত। কথাটা একটু বিশদরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রখর রবি-করোজ্জ্বল দিবা-

ভাগে কোন দেওয়াল শূন্য কাচনির্ম্মিত সাসী পরিবেষ্টিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে গৃহের মধ্যভাগ বহির্দ্দেশ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত বোধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, যে পরিমাণ তাপ কাচ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সে পরিমাণ তাপ আর বাহির হইতে পারে না, সুতরাং তথায় তাপ ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপে ক্ষুদ্র গৃহে অধিক পরিমাণে তাপ সঞ্চিত হওয়ায়, গৃহের অভ্যন্তরভাগ বহির্দ্দেশ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়। পৃথিবীতল সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। যে পরিমাণ সূর্য্যতাপ বায়ুরাশি ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছে, সেই পরিমাণ তাপ আর বায়ুভেদ করিয়া শূন্য দেশে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। ভূভাগ উক্ত তাপ গ্রহণ করিয়া উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে থাকে ও তন্নিকটবর্ত্তী বায়ুরাশিও উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ সংস্পর্শে উপরিস্থিত বায়ুরাশি অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। এখানে বায়ু-রাশিকে কাচ নির্ম্মিত সাসী ও পৃথিবীপৃষ্ঠকে গৃহাভ্যন্তর বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। আমরা এই সাসীরূপী বায়ুভেদ করিয়া যতই উর্দ্ধে উঠিতে থাকিব, ততই অধিক শৈত্য অনুভব করিব। যদি কোন প্রকারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠে চিরহিমানী বিরাজ করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"শশাঙ্ক কলঙ্কী" বলিয়া ভুবনবিখ্যাত। চন্দ্রের নিজের রূপ নাই—পরের রূপ লইয়া তাঁহার রূপ, সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণই তাঁহার মধুর রূপের মূলীভূত, তাই তিনি ধার করা রূপে আপন কলঙ্ক গোপনে অক্ষম। সেই জন্য আমরা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পল্লবিত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট 'কদম্ব বৃক্ষ':তলদেশে রজ্জুবদ্ধ "হরিণ শাবক" ও সকার্য্য তৎপরা অশীতি-পরা "বৃদ্ধার সূত্র নির্ম্মাণ" প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সূর্য্যের কলঙ্কের কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাড়িবার পাত্র নহেন, যন্ত্রদৃষ্টিতে সূর্য্যের এই ভুবন আলোকরা রূপের মধ্যেও কলঙ্ক আবিষ্কার করিয়াছেন, দূরবীক্ষণ সাহায্যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ কিছু দেখিয়াছেন। যিনি সূচাগ্রস্থিত রক্তবিন্দুতে দশ লক্ষ কীটাণুর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি যে সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি! ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক দিয়াছেন, সুকোমল জনমনোহর কুসুম-কোরকে কীট দিয়াছেন, সূর্য্যও তাঁহার সৃষ্টি, সুতরাং সূর্য্য নিখুঁত হইবে কেন? ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নই সূর্য্যের কলঙ্ক। বিশ্বচক্ষুর চক্ষুরোগ বড়ই বিচিত্র

কথা! কিন্তু সূর্য্যের পক্ষে যাহা কলঙ্ক, বিজ্ঞানবিদের পক্ষে উহা অমূল্য কৃষ্ণমণি, কারণ ঐ সকল কৃষ্ণ চিহ্নের সাহায্যেই তিনি সূর্য্য সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা লেখকের সাধ্যাতীত, তবে এই চিহ্ন সম্বন্ধে যথাশক্তি দুই একটী কথা বলিয়া এ অংশের উপসংহার করিব।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যমধ্যস্থ এই সকল কৃষ্ণচিহ্নের মধ্যভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও চতুঃপ্রান্ত ঈষদুজ্জ্বল এবং এই সকল চিহ্ন একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না। পরন্তু কোন একটী চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, উহা সূর্য্যের একপ্রান্তে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ অপর প্রান্তে গমন করিয়া অন্তর্হিত হয় এবং এইরূপে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতে যে সময় লাগে, ঠিক সেই সময় পরিমিত সময় দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রান্তভাগে প্রকাশ পায়। স্থানভেদে ইহার আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রান্তদেশে প্রথম আবির্ভাব কালে ইহা রেখাকৃতি প্রতীয়মান হয়, ক্রমশঃ যত মধ্যে দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যের কেন্দ্র প্রদেশে অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখভাগে আসিলে পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এবং আবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ সমুদয় কৃষ্ণ চিহ্নের এইরূপ গতি একই দিকে এবং একই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্নের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না, কখন অধিক, কখন অল্প, কখনও বা একবারে কিছুই থাকে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সকল কৃষ্ণ চিহ্ন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত বস্তু বিশেষ মাত্র। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এ মত সমীচীন নহে। অনেকে এই সমস্ত কৃষ্ণ চিহ্নকে সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ গভীর গহ্বর বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপ অনুমান করিলে বিষয়টী কিছু সহজ হইয়া যায়। সূর্য্যপৃষ্ঠ অত্যুজ্জ্বল হইলেও উহার অন্তর্দ্দেশ অন্ধকারময় হইতে পারে। কোন গভীর গহ্বরের পার্শ্বদেশ সমূহ আলোকময় করিলে দেখা যায়, উপরিস্থ আলোক গহ্বরে প্রবৃষ্ট হইয়া উহার চতুর্দ্দিকের কিয়দংশ কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করে, কিন্তু তলভাগ অন্ধকারময় থাকিয়া যায়। সেইরূপ সূর্য্যের উপরিভাগে কোন গর্ত্ত থাকিলে সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ আলোকরাশি উক্ত গহ্বরে প্রবৃষ্ট হইয়া চতু-

দিকের কিয়ৎ অংশ কথঞ্চিৎ উজ্জ্বল করিতে পারে, কিন্তু উহার তলভাগ অন্ধকারময় থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে।

মনে করুন এক প্রকাণ্ড ভূগোলকের উপরিভাগে বিষুবরেখার নিকটে একটী গর্ত্ত খনন করা আছে। যদি ঐ গোলকের সম্মুখে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্দ্ধাংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং অপরাংশ দৃষ্টির অগোচর থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তটী যদি আমোদের দৃষ্টির অগোচর থাকে ও গোলকটীকে নিয়মিত বেগে আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করান যায়, তাহা হইলে উক্ত গর্ত্ত দৃষ্টিসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশের প্রান্তভাগে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অপরপ্রান্তে অন্তর্হিত হইবে এবং যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল, ঠিক ততক্ষণ দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া আবার পূর্ব্ববৎ দৃষ্টিপথে আসিবে। আরও দেখা যাইবে যে, গর্ত্তটী যখন প্রথম দৃষ্টিগোচরে আইসে, তখন আমরা উহার একপ্রান্ত মাত্র দেখিতে পাই, ক্রমশঃ যত সম্মুখবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহার অধিক হইতে অধিকতর অংশ দেখিতে পাই, এবং আমাদের ঠিক সম্মুখভাগে উহা পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় ও আবার অসম্পূর্ণ হইতে অসম্পূর্ণতর ভাবে দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে অন্তর্হিত হয়। গোলকের যে অংশেই গর্ত্তটী থাকুক না কেন, ঠিক ঐরূপই ঘটিবে, একের অধিক গর্ত্ত থাকিলে বা কোন অংশে অধিক সংখ্যক ও কোন অংশে অল্প সংখ্যক থাকিলে ঐ গুলি পর্য্যায়ক্রমে আমাদের নয়নপথে আসিবে—আমরা কখন অধিক দেখিব কখন অল্প দেখিব। পূর্ব্বে বলা যাহা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ কৃষ্ণ চিহ্নগুলি সম্বন্ধেও প্রায়ই ঐরূপ ঘটে এবং সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় বর্ত্তুলাকার। এক্ষণে যদি কল্পনা করা যায় যে, সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, তাহা হইলে উহার উপরিস্থিত কৃষ্ণ-চিহ্নগুলির আবির্ভাব, গতি ও তিরোভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা আর কঠিন হয় না। যেমন কোন বেগে ঘূর্ণিত লাটিম হইতে দূরে দণ্ডায়মান হইলে উহা নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার উপরি-ভাগে কোন চিহ্ন থাকিলে সেটী গতিশীল প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আম-রাও দূরত্ব নিবন্ধন সূর্য্যের আবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি না, কেবল উহার উপরিস্থ কৃষ্ণ চিহ্নগুলিকেই গতিবিশিষ্ট মনে করি। বস্তুতঃ চিহ্ন-গুলি সূর্য্যের অংশরূপে উহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া উহার সহিত আবর্ত্তন করে।

পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের বিষুবরেখার নিকটস্থ চিহ্নগুলি প্রায় ১৩ দিন দৃষ্টিগোচর থাকিয়া অদৃশ্য হয়। কিন্তু ৩০ অক্ষাংশ সন্নিহিত চিহ্নসমূহ তাহা অপেক্ষা প্রায় ১২ ঘণ্টা অধিক দৃষ্টিগোচর থাকে। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থ নহে; কারণ তাহা হইলে ঐরূপ সময়ের বিভিন্নতা অসম্ভব। ফলতঃ ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্য কঠিন বা তরল নহে, জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীআদ্যনাথ রায় বি, এ।

অমৃত তুসনিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রকট বিহার রূপে বিলাস জাহার।
তেহোর সফলা এই শাস্ত্রের বিচার॥
ইহো পুর্ন নহে কভুহএ পুর্নতর।
নহে কেনে গতায়াতে ফিরে নিরন্তর॥
কার্জ্যরভাবর্ত্তে লোকে কক্ষ স্থানে জনময়
এই মত পুর্নতর সর্ব্ব ক্ষণে বিলসয়॥
জেহো পুর্ন ভগবান তিহো পুরুরূপ।
স্থলেতে তাহার বিলাস গুণ অপরূপ॥
কার্জ্যাদি স্বরির এই স্থল রূপ বলি।
এই দেহে ঘুণিত স্বুক্র দুই করে কেলি॥
নিত্ত স্বরির ঘুণিত স্বুক্র নিত্ত কৌসর হয়।
ইশ্বর গোচর নহে সাস্ত্রে কিবা কয়॥
আর কহি সুন সর্ব্ব সাস্ত্র স্বনুভব।
অপ্রাকৃত ধাম বৃন্দাবন কহে সব॥
প্রাকিত কাহারে বলি অপ্রাকিত যার।
সাস্তবেদ বহি মরে বলদ আকার॥
ষোল ক্রোস বৃন্দাবন সর্ব্ব সাস্ত্রে জান।
বৈকুণ্ঠের পর হয় কহি এ কারণ॥

ক্রোসকে অঙ্গুলি বলি করিলা সিদ্ধান্ত।
গর্গবাক্য এই কথা জানিবে য়েকান্ত॥
ইহার পরেতে জেই সেই নিত্যস্থান।
নিত্য লিলা তোথা করে স্বয়ং ভগবান॥
দিগ মধ্যে সেই নিত্য কোন দিগ নয়।
সিদ্ধান্ত করিয়া বুঝ ইসান কুণ হয়॥
বেদ বিধিয়গোচর সেই নিত্য ধাম।
কন্দর্প মোহন স্থান য়তি অনুপাম॥
স্বরসেতে রস হয় নিরসেতে রস।
সেই রসোদিপ্ত করে জগত করে বস॥
দিবা নিসি নাহি তথা চন্দ্র সুর্য্যের গতি।
ক্রোটি থনি নিরাকার করি স্থানের হয় র্জুতি॥
জদি কহ নিভিত কুঞ্জে স্থান বিলক্ষণ।
তোথা সেবা করে কেবা সেই কোন জন॥
তাহার বিসেস কথা সুন এক মনে।
রূপবতি রস স্রেবা করে তিন জনে॥
সেই নিত্য সির্দ্ধ সর্ব্বসক্তি ধরে।
অভিমত জানি ইহার মন হিত করে॥
জথন জেমত রূপে মদন বিহরে।
সেই ভাবে তিণ জন পরিতোস করে॥
জথন শ্রিজিল শ্রিষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ইশ্বর।
রাত্রি দিন নাহি ছিল ঘোর অন্ধকার॥
তথন য়াছিল নির্ত্ত কেমন প্রকারে।
কেমনে য়াছিল মদন কহিবে য়ামারে॥
কোন রূপে ছিলা তোমা সক্তি নিত্য স্বরি।
এই সব তত্ত্ব মোরে কহিবে বিচারি॥
সুনহ একান্ত করি য়াগম বচন।
ইহাতে করহ সব সন্দেহ ভঞ্জন।
সুন ২ সর্ব্বজন হঞা একজন।
ইহার শ্রবণে সুদ্ধ সর্ত্ত হয় মন॥

কহিলে ব্রহ্মাণ্ড জবে য়ন্ধকার ছিল।
কেবা তাহে য়াসি ঘোর সব দুর কৈল॥
সে সব সিদ্ধান্ত কথা সুণ এক মনে।
ঘুচিবে সংসার ফাস হবে তত্ত্ব জ্ঞানে॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত পঞ্চাসঃ সত ক্রোটি হয়।
তার মধ্যে চৌরাসিতে জিবের উদ্ভব নিশ্চয়।
সুনহ অপূর্ব্ব কথা বচন আমার॥
সোল ক্রোস খণ্ড ভিতর হয় সর্ব্বসার॥
তার মধ্যে ষষ্ট ক্রোস দেখ বিচারিঞা।
অষ্ট পদ্ম আছে তথা মুদিত হইঞা॥
তার উর্দ্ধে এক পদ্ম জ্যোতির্ম্ময় হয়।
তাহাতে মদন স্থির জানিহ নিশ্চয়॥
সেই পদ্ম বিকসিত হৈল জেই কালে।
অন্ধকার দুরে গেল দিপ্ত সর্ব্ব স্থলে॥
তথাহি গর্গ বাক্যঃ॥
আব্রহ্মঃ ব্রহ্ম লক্ষ জোজনস্থিত।
পরৎপরে উদিত ভানু ঘোর সর্ব্ব বিনাসিত॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরে সুর্য্য লক্ষ যোজন গুণি।
তোমা উদয় হঞা দিপ্ত করয়ে অবনি॥
এই মত পদ্ম জ্যুতি সুন সর্ব্বজন।
বিকসিত হঞা য়ালা করে ত্রিভুবন॥
পূর্ব্বে জে কহিলাম জত সব ফাকি জান।
ঘোর অন্ধকার কেবল মনের করণ॥
অজ্ঞান পাষণ্ড মায়া মুগ্ধ জত জন।
ঘোর অন্ধকারে তারা থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
জেমত কুলুর বলদ ফেরে চক্ষে নঞা ঠুসি।
পাকে পাকে ফিরে,সেহ গলে নঞা ফাঁসি॥
এইরূপে জিবের ফাঁসি কন্যা পুত্র গলে।
চক্ষ্যে ঠুলি দিল নারি নানা দিগে বুলে॥
এই সব জিবের দেখ ঘোর অন্ধকার।

যুর্য্যের কিরণে দিপ্ত না হয় তাহার ॥
আর কহি স্থন প্রাণি হঞা একমন।
উদ্ধে কেনা দেখে জেন যুর্য্যের কিরণ ॥
এই সব জিব জিবের হয় অদিষ্ট নিত্য স্থান।
বিনা সাধু সঙ্গে ইহার নাহি হয় গান।
তথাহিঃ ॥
মেবা সাধক রূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রি হি।
তদ্ভাব নিস্পণা কার্য্যঃ ব্রজলোকানুসারদ ॥ ইতি ॥
ব্রজ জনের সাদ্রিসি সাধু এক যঙ্গ ধরে।
এক যাত্মা এক প্রাণ ফিরয়ে সংসারে ॥
সহজ ভাবেতে তেহো সহজ মানুষ হঞা।
ভ্রমণ করয়ে খেতি তলে বিলসিঞা ॥
তাহার করহ সেবা আত্ম সমর্পণ।
তবে খোর অন্ধকার হইবে মোচন ॥
তবে নিত্য দেখিতে পাবে নিকুঞ্জ ভুবন।
তবে জ্যোতির্ম্ময় সেই করিবে দরসন।
গোপি ভাবগ্রাহি হঞা সাধে সেই কর্ম্ম।
সেই জন চাহিবে ব্রেজে যুনে যার মর্ম্ম ॥
লিলা নির্ত্ত দুই গোপি ক্রম তাহা বলি।
অন্তর বাহ্য দুই ইসত বুঝহ সকলি।
লিলাকারি গোপি সেবি লিলা যুখ রসে।
নিত্য গোপি লিঙ্গ পুজি নিত্য রস সোষে ॥
নিস্পলা সাধকে ভাব এই কার্য্য মত।
নির্গুন নিষ্কামি হঞা যুখ ভূঞে কত ॥
অস্যার্থ ॥ তথাহি ॥ লিঙ্গপুরাণে অস্র না ॥
জোতির্লিঙ্গ কাম্যলিঙ্গ দিব্ব্য লিঙ্গ ব্রহ্ম
কৈলাস দিষ্ট বাসুদেবঃ দিব্ব্য রতন মুনি ॥
অনাদি অনন্তঃ মধ্য পরিবেদ ভেদঃ বর্ণ্ণনঃ
শ্রীহৃৎ লিঙ্গ পুর্ন্নব্রহ্ম সক্তি আদ্যা সেবনঃ ॥ ইতি ॥
এই মত নিত্য গোপি লিঙ্গ আরাধিঞা।

জ্যোতির্ম্ময় নিকট জায় বসে মিসাইঞা ॥
আর কহি ভগবাণের অপার মহিমা।
ভব বিরিঞ্চিত জার নাহি পায় সিমা ॥
ভগের নিকটে নিত্য আইসে য়ার জায়।
তব স্তুতি করি বলে তুমি সর্ব্বময় ॥
ভবভয় ভঞ্জন তুমি জগত ইশ্বরি।
কি জানি তোমার অন্ত কি বলিতে পারি ॥
সত্য গুণে বিষ্ণু ভজে রজগুণে ব্রহ্মা।
তমগুণে ভজি হর না পাইল সিমা ॥
তমাতে প্রলয় হয় তোমাতে জিবন।
এত কহি ভগ পূজা করে ভগবান ॥
তথাহি ॥
তিকুণ মণ্ডলাকারঃ ব্যাপ্ত লোক চরাচরঃ
তৎরূপ দর্সন সর্ব্ব শ্রজ্য নিত্য বিলাসনঃ ॥ ইতি ॥
তোমার দর্ষনে স্থির নারে হৈতে নরে।
পর্ষ করি সেই জন জায় ক্ষম ঘরে ॥
তোমার ষন্দর্য্যরূপ বিদ্যুত য়াকার।
চক্রে আশ্ছাদন আছে বাহিরে চর্ম্মাকার ॥
তথাহি ॥ জাদ্রিসি ভাবনাশ্চৈবঃ তাদ্রিসি প্রাপ্তি সংভ্বঃ
জগত বঞ্চণা হেতু তোমার এই কায়।
জিবের নাহিক সক্তি স্থির হবে তায় ॥
তুমি তো জগতের মাতা পুন জে রমণি।
এ কথা নাহিক জানি দেব সিরোমণি ॥
মোহিনি হঞা তুমি মহিলে তিনলোকে।
অগ্নি সিখা দেখি জেন পুড়ে ক্ষুদ্র পোঁকে ॥
যথা রাগ ॥
অগ্নি জৈছে নিজধামঃ দেখাইঞা অভিরামঃ
পতঙ্গেরে আকর্ষিঞা মারেঃ।
ঐ হে তব নিজগুণঃ দেখাইঞা হরো মনঃ
পাছে দুখ ভবকুপে ভারে ॥ ইতি ॥

এ সব তোমার লিলা জানে মহেশ্বর।
জোগেতে জানিঞা গলে করে' নিল হার॥
কখন অধরে ধরি করে রস পান।
কখন মস্তকে করি করে জপ ধ্যান॥
কখন গলায় দেয় আনন্দিত হঞা।
লোমাঞ্চ পুলক কম্প সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিঞা॥
তদপরে রাখে বুকে সেই পঞ্চানন।
উষ্টে ধরি করে জুড়ায় রস আস্বাদন॥
সেই সদা সিব তোমার বিষ পান করি।
নিত্য মধ্যে বৈসে এবে লিঙ্গরূপ ধরি॥
নিত্যের ঐসানে স্থিতি জোনি পদ্মের মধ্য স্থানে॥
হুয়ার উপরে স্থিতি কটিকা আক্যাণে॥
সেই সম রস অমৃত ফেলি নাম।
চুসিতে চুসিতে সেই পায় নিত্য ধাম॥
বিকসিকা পদ্মে জৈছে ভ্রমর পসি রয়।
সেই মত মুর জুহ্বা স্থিত গতি তায়॥
এত কহি বন্ধু বাস করিল খদন।
স্তব স্তুতি করে স্নার করে দরসন॥
তবে সক্তি দেখি ভক্তি নির্ত্ত অভিলাস।
অনুগত দেখি পদ্ম করিলা প্রকাস॥
সর্ব্ব জ্যোতি ধরে পদ্ম রত্ন ক্রোটি জিনি।
অমৃত পুরিঞা জৈছে রসের ছাহনি॥
তাহা দেখি পুর্ন ব্রহ্ম লিলা সুখ রসে।
পুর্ন দিষ্টি রস দুরে জায়ঃ আর য়াইসে॥
কৃতাঞ্জলি করি কহে যুন রসকারি।
দয়া করি নিজ দাসে কর সহচারি॥
তোমার বিলাস সখি এই তিন জন।
রূপ রস রতি মোরে করুক আকর্ষণ॥
জেরূপে ত্রৈলক্ষ ভুলাইঞা কৈলে ক্ষেপা।
সেইরূপ ধরি এবে য়ামারে দেখাইবা॥

গোলক পর ব্যোমে জেহি নাহি দেখি যুনি।
কৃপা করি এবে তাহা দেখাইবা আপনি ॥
কাম গাত্রি কাম বিজ বিধি নাহি জানে।
রতি রসে প্রকাশিলা নিত্য বৃন্দাবনে ॥
রতিতে বিজের জন্ম রসে গাত্রি বলি।
মুর উপাসনা তাহা দেখাইলা সকলি ॥
দস ইন্দ্র ছয় রিপু আর পঞ্চ জন।
তাহা দেখি স্তব্ধ থকিত হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
এত কহি নিত্য স্বর আর দলে জায়।
কারণ্য দলেতে জাঞা দাণ্ডাইঞা কয় ॥
তুমি ব্রহ্ম সনাতনিঃ　　　সকল পুরাণে কুনিঃ
তুমি সর্ব্ব বেদ বিধি সার।
তুমার অংসের রংসে　　　ব্রহ্মা বিষ্ণু অবতংসে
তিতিয়ে সিবের জন্ম যার ॥
সেই তিন পদ্ম এবে আমারে দেখাইবা।
তবে সেত বর্ণ নিল রক্তজে উৎপল।
জোনি উদ্দ নাভি য়ধ করে ঝলমল ॥

ক্রমশঃ।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ।

কেহ কেহ মনে করেন, জীব ঈশ্বরের অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অপর কেহ কেহ বলেন, জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ। প্রথমোক্ত মতে সূর্য্যকিরণের সহিত সূর্য্যের যে প্রকার অংশাংশিভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশিভাব। সুতরাং জীবও ঈশ্বরের মত নিত্য বস্তু। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয় এবং জীব তন্নিঃসৃত অংশুস্থানীয়। দ্বিতীয় মতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবও ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। অন্তে বলেন, প্রলয় ও মোক্ষকাল উপস্থিত হইলে জীব ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না। এইরূপ মুক্তিকেই

নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এ মুক্তির আদৌ সম্ভাবনা নাই। প্রথমোক্ত মতে ঈশ্বরের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ ব্যবস্থাপিত আছে। এই মতে জীব ঈশ্বরে বিলীন হয় না, অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি পায় না। মার্ত্তণ্ডময়ূখ যেমন মার্ত্তণ্ডে পুনর্গমন করে না, সেইরূপ জীবও ঈশ্বরে লীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে না। সুতরাং এ মতে জীব কেবল ঈশ্বরের পার্ষদ হয় মাত্র। এই মত দুইটি সাংখ্যসম্মত নহে। সাংখ্য যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তখন সাংখ্যমতে জীব ঈশ্বরের অংশও নহে এবং ঈশ্বর হইতে উৎপন্নও নহে। সাংখ্যাধ্যায়ীরা বলেন, জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, তবে ঈশ্বরে যে শক্তি আছে, জীবে তাহা নাই কেন? অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেমন কিছু না কিছু শক্তি আছে, জীব ঈশ্বরের অংশ হইলে অবশ্যই তাহাতে একটুও ঐশীশক্তি থাকিত। তাহা যখন নাই, তখন জীবকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া তর্ক-বিতর্ক করা বৃথা। যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, সে মতও রক্ষা করা অসম্ভব; কারণ উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ধ্বস্ত হইয়া যায়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন—এ মত সত্য হইলে জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ইহাও সত্য হইবে। সুতরাং নাস্তিক ব্যতীত অন্য কেহ এ মতের পোষকতা করিতে সাহস করিবেন না। আস্তিকগণ কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া আত্মার উৎপত্তি বিনাশ মতের মূল শিথিল করিয়া দেন।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে, রাজার সহিত প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ। ঈশ্বরের সহিত জীবেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। রাজার উপাসনা করিলে যেমন প্রজা অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়, সেইরূপ জীবও ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা পরমা গতি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ মোক্ষ পায়। অন্য দার্শনিক পণ্ডিত বলেন, "জীবই ঈশ্বর," জীবে ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই, যেমন—"তত্ত্বমসি"। ইহার অর্থ এই—"তুমিই সেই," "অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম"। এস্থলে, জীব কি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। "বেদান্তসার" বলেন, "ইয়ম্ বুদ্ধিঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী জীব উচ্যতে।" ইহার অর্থ—বুদ্ধি ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টির নাম জীব। জীবেরই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আছে—আর কাহারও নাই এবং এই জীবই সুখ দুঃখের ভাগী। পুনশ্চ এই জীবই ইহলোকে পরলোক সঞ্চরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

জীবেরই কর্ত্তৃত্ব, আর কাহারও নহে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জীব স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না, কারণ উহা জড় স্বভাব বিশিষ্ট। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি জীব জড়ই হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে? ইহার প্রত্যুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব কেবল চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য বশতঃই। জীব যতদিন চিচ্ছক্তিরে উপাসনা না করিবে, ততদিন উহাকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতেই হইবে। কিন্তু উপাসনা করিলে মোক্ষপদ লাভ করিবে।

এক্ষণ "তত্ত্বমসি" সূত্রটির অর্থ কি দেখা যাউক। এই সূত্রটির দুইটি অর্থ আছে—একটি অর্থ তুমিই সেই; আর একটি অর্থ তস্য ত্বম্ অসি অর্থাৎ তাহার তুমি। শেষোক্ত অর্থটি ষষ্ঠী সমাস দ্বারা পাওয়া যায়। আমি অদ্য যাহা লিখিলাম, তাহা স্বকল্পিত নহে। শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে জীব কি এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি, তাহা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। তবে আমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই প্রকারে ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ রায় বি, এ।
লাভপুর যাদব লাল হাই স্কুলের
দ্বিতীয় শিক্ষক।

...ক চিত্র।

যযাতি।

ধর্ম্মের পথ বড়ই সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছিল। এই পথে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়। সামান্য মাত্র অসাবধানতায়, সামান্য মাত্র অমনোযোগে স্খলিতপদ হইয়া, মানব অধর্ম্মের অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত হয়; অসাধারণ ধৈর্য্য, প্রভূত শক্তি না থাকিলে সহজে কেহ সেই অন্ধকার হইতে আত্মোদ্ধারে সমর্থ হয় না। এই সংসারে ধর্ম্মের উন্নত, সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছিল পথের পার্শ্বে পার্শ্বে অধর্ম্মের নিম্ন প্রশস্ত আপাতমোহন বর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। কাম-ক্রোধাদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দস্যুগণ সর্ব্বদাই পথিককে আকর্ষণ করিয়া অধঃপাতিত করিবার চেষ্টা করে। পথিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ও অবহিত না হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। পতনের পর তাহার আর ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, অধর্ম্মে ঘৃণা থাকে না; অধর্ম্মাচরণ করিয়া তৃপ্তি হয় না—ধর্ম্মের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না। সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। তবে কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়াও অলৌকিক আত্ম-বলে স্বকীয় উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। তাই মহর্ষি বেদব্যাস যযাতি রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে আমাদিগকে উপরিউক্ত মহোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সঙ্গে আরও কত অমৃতোপম ধর্ম্মকথা দ্বারা সংসারী জীবের হৃদয় ব্যথা জুড়াইয়াছেন। সেই জন্য আমরা আজ যযাতি-প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

বন মধ্যে মৃগয়াবিহারী যযাতি রাজাকে যখন আমরা প্রথম সন্দর্শন করি, তখন উত্তরকালে তিনি যে ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবেন, তাহার কোন লক্ষণই তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই। শুক্রদুহিতা দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক কূপে নিঃক্ষিপ্তা হইয়াছেন, মৃগয়া পরিশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত যযাতি জলান্বেষণে কূপের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। বনমধ্যে অসহায়া সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া পূর্ব্বকালের অনেক রাজার ন্যায় তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র চিত্তবিকার ঘটিল না। "তিনি সুশ্রোণী দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বনগরে গমন করিলেন।" আবার যখন ইহার বহুকাল পরে, যযাতি পুনর্ব্বার মৃগয়ার্থ এই বনে আসিয়া সখিপরিবৃতা দেবযানীকে দর্শন করেন, তখন তিনি দেবযানীকে চিনিতেই পারেন নাই। পরস্পরের নিকট পরিচিত হইলে যযাতি কোন রূপ চিত্তচাঞ্চল্য না দেখাইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। দেবযানী বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; যযাতি অসম্মত হইলেন। যযাতি কহিলেন :—

বিদ্ধ্যৌশনসি ভদ্রন্তে ণত্বামহেঽহস্মি ভাবিনি।
অবিবাহ্যা হি রাজানো দেবযানি পিতুস্তব॥

"হে শুক্রনন্দিনি, ভাবিনি, দেবযানি, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার যোগ্যপাত্র নহি। তোমার পিতা যেরূপ, তাহাতে রাজগণ তোমার বিবাহযোগ্য হইতে পারেন না।" ইহা শুনিয়া দেবযানী নানা যুক্তি তর্ক-দ্বারা রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, যযাতি ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার ভর্ত্তা হইতে পারেন না। কেন না তিনিই প্রথমে দেবযানির পাণিগ্রহণ

পূর্ব্বক তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যযাতি ঘোর আপত্তি করিতে লাগিলেন; তিনি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা হইতে পারে না। তবে শুক্রাচার্য্য যদি অনুমতি করেন, তবে তাঁহার আপত্তি থাকিবে না। শুক্রাচার্য্য অনুমতি দিলেন, তথাপি যযাতি বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন, "হে ব্রহ্মণ ভার্গব, এ বিষয়ে বর্ণসঙ্কর জন্য মহান্ অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি।" এই সকল হইতে স্পষ্টই অনুমান হয়, যে যযাতি সাতিশয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়লালসা যে প্রবল ছিল, এই সকল ঘটনা হইতে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি "সদ্বংশজ সাতিশয় শান্ত বীর্য্যবান ও যশস্বী।" "তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" এহেন যযাতিও উত্তর কালে এত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিলেন যে, স্বকীয় জরা পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া নিজে বিষয় সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এত গুণ সত্ত্বেও যযাতির এক মহান্ দোষ ছিল। সেই দোষের জন্যই তাঁহার অবনতি ঘটিয়াছিল। মানুষ যতই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হওয়া চাই, ও সেই বুদ্ধি বৃত্তি-প্রদর্শিত পথে গমন করিবার মনের বল (Will power) থাকা চাই। কর্ত্তব্যাবধারণে ভুল হইলে আমরা যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস ও শাস্ত্রপাঠ জন্য যযাতির ইন্দ্রিয় সংযম ও সৎশিক্ষা হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যাবধারিণী বুদ্ধি যে তাদৃশ তীক্ষ্ণ ছিল, একথা বলিতে পারা যায় না। আর বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য যতটুকু দার্ঢ্য চাই, তাহাও যে তাঁহার ছিল, এমন বোধ হয় না। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, যে দেবযানীকে বিবাহ করা তাঁহার অন্যায়। অথচ শুক্রাচার্য্যের ভয়ে বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। আবার যখন শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে শয়নে আহ্বান করেন, তখনও যযাতি কর্ত্তব্যাবধারণে ভ্রম করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা যখন তাঁহার নিকট প্রথমে প্রস্তাব করেন, তখন তিনি শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া প্রথমে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করেন।

এই মহাভ্রান্তিতে তাঁহার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই শুক্রাচার্য্যের কথা অবহেলা করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জানা উচিত ছিল, দেবযানী কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক। দারুণ অভিমান ও ক্রোধ বশতঃ যিনি রাজনন্দিনী দৈত্যরাজ দুহিতাকে নিজদাসীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না, যযাতির ইহা বুঝা উচিত ছিল। ফলে ঘটিলও তাহাই, শুক্রাচার্য্যের ভীষণ শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন!

এইবার আমরা বুঝিতে পারি, যযাতি কি ছিলেন, কি হইয়াছেন! শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে জরা পরিগ্রহ করিয়া যযাতি অতি নির্লজ্জের ন্যায় বলিলেন,—

"অতৃপ্তো যৌবনস্যাহং দেবযান্যাং ভৃগূদ্বহ।
প্রসাদং কুরুমে ব্রহ্মন্ জরেয়ং ন বিশেচ্ছমাম্।"

"হে ভৃগুদ্বহ, আমি যৌবনাবস্থায় দেবযানীতে পরিতৃপ্ত হই নাই। হে ব্রহ্মন্ আপনি প্রসন্ন হউন, যে এই জরা যেন আমাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।" শুক্রাচার্য্য দয়া করিয়া বলিলেন, যে তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। তবে যযাতি ইচ্ছা করিলে এই জরা অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ করিতে পারিবেন। যযাতি পুত্রকে জরা অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন।

ধর্ম্ম কর্ম্মভ্রমে শর্ম্মিষ্ঠার উপরত হইয়া যযাতি ঘোরতর অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন। এই পাপের ফলে তিনি ধীরে ধীরে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইতেছিলেন। ইহা কিন্তু তিনি নিজে বুঝিতে পারেন নাই। পাপের গতি এমনই নিঃশব্দ। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করাই তাঁহার ইন্দ্রিয় পরায়ণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিষয় ধ্যান করিতে করিতে মানুষের ক্রমে আসক্তি আসিয়া পড়ে। ভগবান বলিয়াছেন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" গীতা।

যযাতিরও তাহাই হইয়াছিল। যাহা হউক, যযাতি পুত্রে জরা সংক্রমণ করিয়া পুনরায় বিষয় ভোগে লিপ্ত হইলেন। ভাবিলেন, আর কিছুদিন

সুখাস্বাদন করিলেই তাঁহার তৃপ্তি জন্মিবে। কিন্তু হায়! তিনি যে তৃপ্তির আশায় নিতান্ত নীচের ন্যায় পুত্রের যৌবন অপহরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সুখসাগরে অবগাহন করিলেন, কিছুতেই তাহার তলদেশ প্রাপ্ত হইলেন না। কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। নৈরাশ্য কাতরকণ্ঠে, অনুতাপ স্রাবিনী জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"যথা কামং যথোৎসাহং যথাকাল মরিন্দম।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেনময়া তব॥
ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যৎপৃথিব্যাং ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাতৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
যাদুস্তজা দুর্ম্মতিভির্যান জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগ স্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥
পূর্ণং বর্ষ সহস্রং মে বিষয়াসক্ত চেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষভিজায়তে॥
তস্মাদেনামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বোনির্ম্মমো ভূত্বাচরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥"

"হে অরিন্দম পুত্র, আমি তোমার যৌবন দ্বারা অভিলাষ ও উৎসাহ অনুসারে যথাকালে বিষয় ভোগ করিয়াছি; পরন্তু যেমন হুতাশনে ঘৃত প্রদান করিলে নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কখন কাম নিবৃত্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, সুবর্ণ পশু ও স্ত্রী এ সকল একজনের উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না। অতএব ভোগ-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই বিহিত। যে তৃষ্ণা দুর্ম্মতি ব্যক্তিদিগের দুস্তজা, বার্দ্ধক্য হইলেও যাহার ক্ষয় হয় না, এবং যাহা প্রাণ বিনাশক রোগ স্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই। আমি বিষয়াসক্ত ছিলাম, তাহাতে আমার সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি আমার বিষয় তৃষ্ণা দিন দিন প্রবল হইতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও মমতা রহিত হইয়া অরণ্য মধ্যে মৃগের সহিত একত্র বাস করিব।"

যযাতির এই বাক্যগুলি যেন সহস্র জিহ্বায় সাংসারিক জীবগণকে সাবধান করিয়া দিতেছে। ভোগ দ্বারা লালসার তৃপ্তি হয় না। সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন ভিন্ন সুখের প্রকৃষ্ট উপায় নাই।

যযাতির এই পরিণাম দেখিয়া আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হই। যযাতি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদপাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্ত সংযম ঘটিয়াছিল; বাল্য জীবনের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ইন্দ্রিয়গণের হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর আমাদের এখন কি আছে? আমাদের ব্রহ্মচর্য্য আছে, না ইন্দ্রিয় সংযম আছে? নানা প্রলোভন সঙ্কুল সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করিবার উপযোগিনী কি শিক্ষা আমরা বাল্যে প্রাপ্ত হই? আমরা প্রথম হইতেই বালকগণকে বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল ও অসহিষ্ণু করিয়া তুলি। ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, আমরা তাহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সংসারে প্রবেশ করিয়া আমাদের বালকগণ যে বায়ুতাড়িত অর্ণবপোতের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা যে ইংরাজ জাতির অনুকরণ করি, তাহারাও শিক্ষার সময় কথঞ্চিৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। শিক্ষার সময় তাঁহারা ছাত্রের ন্যায় থাকে। আমরা শিক্ষার সময়ও গৃহী দারা পুত্র পরিবৃত। এই ভয়ঙ্কর দোষে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছে না। আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে না। চরিত্র গঠন না করিয়া মিল, স্পেন্সার পড়াইলে কোন ফল হইবে না।

যাহা হউক, যযাতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; যেমন পাপ তদুপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অন্তিমে তিনি স্বর্গে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন। দেখাইলেন, অধঃপতিত ব্যক্তির নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। যদিও তুমি কোনরূপে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হও, তাহা হইলেও স্বকীয় কর্ম্মদ্বারায় আবার দিব্যগতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আর্য্যশাস্ত্র কখনও পাপীর চির নরকের ব্যবস্থা করেন নাই।

যযাতি স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও যে পাপ করিলে দণ্ড হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। মানব স্বর্গেই থাকুক; আর মর্ত্ত্যেই থাকুক, পাপের প্রলোভন হইতে তাহাকে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে। জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাকে পাপ পুণ্যের অধীন থাকিতেই হইবে। মানবজীবন কি কঠিন পরীক্ষার স্থল!

মানুষকে কত সাবধানে যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা বলা যায় না। স্বর্গে যযাতি কথা-প্রসঙ্গে এক দিন আত্মপ্রশংসা করিলেন। অমনি এই পাপেই তাঁহার স্বর্গবিচ্যুতি ঘটিল। ইন্দ্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ অল্পীয়সশ্চাবিদিত প্রভাবঃ।
তস্মাল্লোকাস্ত্বন্তবন্তস্তবোন, ক্ষীণেপুণ্যে পতিতাস্যদ্য রাজন্॥"

"হে রাজন্! তুমি অন্যের প্রভাব না জানিয়াই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুল্য ও অধম সকলকেই অবমাননা করিলে—এই কারণে তোমার পুণ্যক্ষয় হইল, সুতরাং এই স্বর্গভোগেরও শেষ হইল। অতএব তুমি অদ্য দেবলোক হইতে পতিত হইবে।" এই হিসাবে দেখিতে গেলে আমাদের দিন দিন দণ্ডে দণ্ডে কত যে পুণ্যক্ষয় হইতেছে, তাহার আর সীমা নাই। আমরা কি আর স্বর্গ দেখিতে পাইব? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আমরা শাস্ত্র পড়ি না, বুঝি না, শাস্ত্রের সম্মান করি না, আমাদের নরক হইবে না ত কি হইবে? যাহা হউক, যযাতি পুনরায় স্বীয় কর্ম্মবলে সদগতি প্রাপ্ত হন।

যযাতি উপাখ্যানে পুরুর চরিত্র অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদীপ্ত হইয়াছে। পিতার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, যৌবনে জরাগ্রস্ত হইয়া তিনি যে অদ্ভুত কীর্ত্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, এই ঘোরতর শোচনীয় সময়ে ভরসা করি,তাহা আমাদিগকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবে। কিন্তু হায়, বাল্যে ধর্ম্মহীন শিক্ষা (?) লাভ করিয়া আমাদের বুদ্ধি এমনই বিকৃত হইয়া যায় যে, যৌবনে আমরা আর ধর্ম্মকথায় কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

প্রসঙ্গ ক্রমে যযাতির মুখ হইতে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই একটি পাঠকদিগকে উপহার দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যযাতি পুরুকে বলিয়াছিলেন:—

"অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিষ্ট স্তথাতিতিক্ষুরতি তিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষেভ্যো মানুষাশ্চ প্রধানা বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ॥
আক্রুশ্যমানোনাক্রোশেন্মন্যুরেবতিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দ্দহতি সুকৃতঞ্চাস্যবিন্দতি॥

নারুন্তুদোঽস্যান্ননৃশংসবাদীনহীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াস্যবাচাপর উদ্বিজেত নতাংবদেদ্রুষ্কাং পাপলোক্যাম্॥
অরুন্তুদং পরুষং তীক্ষ্ণবাচং বাক্কণ্টকৈর্ব্বিতুদন্তং মনুষ্যং।
বিদ্যাদলক্ষ্মী কতমং জনানাং মুখেনিবদ্ধাংনির্ঋতিংবহন্তম্॥
সদ্ভিঃ পুরস্তাদভিপূজিতঃ স্যাৎ সদ্ভিস্তথা পৃষ্ঠতোরক্ষিতঃস্যাৎ।
সদা সতামতিবাদান্‌তিতিক্ষেৎ সতাং বৃত্তং চাদদীতার্য্যবৃত্তম্॥
নহীদৃশং সমবননং ত্রিষুলোকেষু বিদ্যতে।
দয়ামৈত্রীচ ভূতেষু দানঞ্চমধুরাচবাক্॥"

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা অক্রোধ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অসহিষ্ণু ব্যক্তি অপেক্ষা সহিষ্ণু ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানব জাতি শ্রেষ্ঠ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তি অপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। কোন ব্যক্তি আক্রোশ করিলে তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ আক্রোশ করিবে না। কেন না সহিষ্ণু ব্যক্তির মনই আক্রোশকারীকে দগ্ধ করে, এবং ঐ ক্ষমাশীল ব্যক্তির সুকৃতও লাভ করিয়া দেয়। পরপীড়ক বা নৃশংসবাদী হইবে না। অভিচার প্রভৃতি নীচ উপায় দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিবে না। এবং যে বাক্যে পরের মনোদুঃখ হইবার সম্ভাবনা, এ মত দগ্ধকারী পাপসূচক বাক্যও কহিবে না। যে ব্যক্তি বচনরূপ কণ্টক দ্বারা মানবগণকে বিদ্ধ করে, যাহার মুখে পরপীড়ন বাক্যরূপ রাক্ষস নিবদ্ধ আছে, এমত তীক্ষ্ণবাদী নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে দেখিলেও লক্ষ্মী-ত্যাগ হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসাধুগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও সর্ব্বদা সাধুগণ কর্ত্তৃক অগ্রে প্রপূজিত ও পশ্চাৎ রক্ষিত হইয়া থাকেন। তিনি সাধু চরিত আশ্রয় করিয়া অসাধুদিগের নিন্দা বাক্যে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। * * * * সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া, মৈত্রী দান, ও মধুর বাক্য এই চতুষ্টয়ের তুল্য সম্বল ত্রিভুবনে আর নাই।"

পোলোনিয়সের পুত্রের প্রতি উপদেশ সাংসারিকের পক্ষে হিতকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বড়ই ঘৃণিত বোধ হয়।

যযাতি সাধুগণকে বলিয়াছিলেন ;—

"তপশ্চ দানঞ্চ সমোদমশ্চ হ্রীরার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পাঃ।
স্বর্গস্তু লোকস্য বদন্তি সন্তো দ্বারানি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাং॥
নশ্যন্তি মানেন তমোভিভূতা পুংসঃ সদৈবেতি বদন্তি সন্তঃ।

অধীয়মানঃ পণ্ডিতং মন্যমানো যো বিদ্যয়া হন্তি যশঃ পরেষাম্।
তস্যান্ত বন্তশ্চ ভবন্তি লোকা ন চাস্য তদ্ব্রহ্ম ফলং দদাতি॥"

*　　*　　*　　*

"ইতি দদাম্যিতি যজ ইত্যধীয় ইতি ব্রতং।
ইত্যেতানি ভয়ান্যাস্থন্তানি বর্জ্জ্যানি সবশঃ॥"

"সাধুগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, যে তপস্যা, দান, শম, লজ্জা, ঋজুতা ও সর্ব্বপ্রাণীতে অনুকম্পা, এই সাতটি মানবগণের স্বর্গলোক গমনের প্রধান দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। পরন্তু যে সকল পুরুষ তমোভিভূত হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহারা শ্রেয়োভাজন হইতে পারে না, ইহাই সাধুরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়া 'আমিই পণ্ডিত' এইরূপ অভিমানী হইয়া বিদ্যা দ্বারা অন্যের যশঃ বিলুপ্ত করে, তাহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। * * * দান করিলাম, যজ্ঞ করিলাম, অধ্যয়ন করিলাম, ব্রত করিলাম, এইরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে তাহার সদ্গতি হয় না, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। অতএব সর্ব্বতোভাবে দম্ভ পরিত্যাগ করাই উচিত।"

আজকাল আমাদের বাঙ্গালা দেশে এই উপদেশটির বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে।

পাগল।

দুখ সুখ নাই,　　বৈভব বিভব—
　কান্দিবার নাই মরিয়া গেলে,
নাহিক বিষয়,　　মান, অপমান
　বালকেও ডাকে 'পাগল' ব'লে।
কারো নাই ভয়,　　কারো নাই ভয়,
　নহিক অধীন, স্বাধীন নই।
আপনিই হাসি,　　আপনিই কান্দি,
　আপনারি প্রাণে সকলি সই।
চাঁদের কিরণ,　　কাননের ফুল,
　যখন যে ভাবে যেখানে দেখি;
ভুলে যাই দুখ,　　ভুলে যাই জ্বালা,
　আপনা ভুলিয়ে চাহিয়ে থাকি।
পুরাতন রবি,　　পুরাতন শশী,
　আমার দেশেতে যে ভাবে হাসে
আমাদের জল,　　যত নিরমল,
　নহেক এমন কোনও দেশে।

আমাদের বাঁশী,　　আমাদের গান
　আমাদের সুখ কোথাও নাই;
আমাদের ফুল　　ফোটে না কোথাও,
　গড়ে নাই বিধি এমন ঠাঁই।
আমাদের দেশে　　শীতে বরষায়
　পাখীগুলি ব'সে গায় যে গান,
বসন্ত যেথানে　　চির বিরাজিত,
　সেথানেও নাই সে মধু তান।
প্রাচীনেরমুখে　　যে হাসি এখানে,
　সে হাসির ভাবে যে সুধা ঢালে;
আর কারো দেশে　আসে না সে হাসি,
　যুবক যুবতী নবীন গানে।
আমাদের দেশে　　যুবক যুবতী
　যখন যে ভাবে কথাটি কয়
পবিত্রতা ভাব,　　সরল পরাণ
　কথায় কথায় প্রকাশ পায়।

রবি, শশী, তারা সকলি সরল,
মৃদুল পবন সরল বয় ;
তারাও সরল, আমিও সরল
দেশটি আমার সরলময়।
সকলি সরল, সব নিরমল,
কঠিন এখানে কিছুই নয়
সুধীর পবন সেটিও সরল
মধু মাসে কিছু কঠিন্ বয়।
সরল (ও)আমার, কঠিন (ও)আমার,
আমির আমার কাহারো নই,
যার পানে চাই, সেই মধুময়,
সরলতা গুণে ডুবিয়ে রই।
যত দিন আছি, যত দিন বাঁচি,
প্রাণটি(ও) আমার ছাড়া ত নয়,
প্রাণ বলে আমি ধরি না সে প্রাণ,
সকলে সে প্রাণ পাগল কয়।

রবিও আমার, শশীও আমার,
সরল পবন, বনের ফুল ;
জল নিরমল, যা কিছু সরল,
সকলি আমার সুখের মূল।
একটি বকুল ফুটে থাকে ফুল,
বনের একটি কোকিল বসে,
একটি ভ্রমর বান্ধিয়াছে ঘর,
সদাই বেড়ায় ফুলের পাশে ;
সেই তরুমূলে একাকী বসিয়ে,
ভ্রমরার সনে বাঁশরী গাই,
বনের কোকিল, ভ্রমর বাঁশরী,
এ ছাড়া আমার কিছুই নাই।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।

মুগ্ধা বালিকা।

মাঝে মাঝে মনে হয় যেয়ে বলে আসি ;
প্রাণের সহিত তারে কত ভালবাসি !
সেইত সর্ব্বস্ব মোর,
অলক্ষ্যে বেঁধেছে ডোর
তার বিনা স্বর্গসুখে নহি অভিলাষী ;
সে যে এ হৃদয়াকাশে,
ফাল্গুন পূর্ণিমা রাসে,
বসন্তের সুবিমল সুধাময় শশী !
(অথবা) শুভ্রিম মাধুরীভরা,
শরতের শুকতারা,
নির্জ্জন প্রভাত কুঞ্জে কুসুমবিলাসী ;
ভকতি কুসুম তুলে,
ভাবেতে আপনা ভুলে,
প্রেমাঞ্জলি তার পদে দেই দিবানিশি ;
গোপনে গোপনে তারে বড় ভালবাসি।

মাঝে মাঝে মনে হয় ধরি তার পায়,
বলিগে প্রাণের কথা পাশরি লজ্জায়!
বহু দিন হতে গাঁথা,
নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথা,
আঘাতিছে যেন শত লৌহ শলাকায়।
বলি তায় অনিবার,
নাহি সহে এত আর,
শুধু আশা, ফিরে যাওয়া, চা (ও) য়া উত্তরায়;
অজ্ঞাতে এ প্রেম-ভার,
বিনামূলে কেনা তার,
অলক্ষ্যে শৃঙ্খল পরা আপনার পায়;
জীবন-তপস্যা শেষে,
অব্যক্ত স্বপ্নের দেশে,
আমিত পেয়েছি মোর আদি দেবতায়;
মাঝে মাঝে মনে হয় চলি গিয়া তায়।
কিন্তু হায়! সরমের কঠিন বাঁধন,
বলাত হ'লনা তায় মনের বেদন
ফুরায় না দিনরাত,
অবিরাম অশ্রুপাত,
ঘোচে না প্রাণের ব্যথা, স্মৃতির দংশন;
তোরা কি আমার হবি,
বারেক তাহারে কবি,
বালিকার মর্ম্মব্যথা নীরব রোদন!
অযাচিত উপহার,
ঢেলে দিবি পদে তার,
ফিরে কি আনিয়া দিবি, স্নেহ-সম্ভাষণ,
বলিবি আমি যে তার, আমারি সে জন।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

জমীদারবংশাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রাচীন ভূম্যধিকারিগণের পূর্ব্বাবধি গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও উন্নতি অবনতির হেতু অন্বেষণ, তাহাদিগের পারিবারিক কিম্বদন্তী, কুলগত প্রথা ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিতে পারিলে যে স্থানীয় ইতিবৃত্তের একটি প্রধান উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাঁহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আমরা বীরভূমি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানের প্রাচীন জমীদার বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

বীরভূমির বর্ত্তমান সীমানার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহির হইয়া, ইহার পূর্ব্বতন সীমানার পরিসর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। এই পূর্ব্বায়তন সম্বন্ধে, 'বীরভূমির' ১ম খণ্ডে ১৩০ পৃষ্ঠায় 'সীমানা' প্রবন্ধে বিশদ রূপে আলোচনা করা গিয়াছে।

পাড়রা বা পোদ্দার ডিহি রাজবংশাবলী।

পাড়রা বা পোদ্দার ডিহি—এক্ষণ মানভূম জিলার অন্তর্গত ১৭৭০ খৃঃ হইতে ১৮০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মানভূমের কতকাংশ বীরভূম ও কতকাংশ মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল; তন্মধ্যে পাঁড়রা পরগণা বীর-ভূমের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু ১৮০৫ খৃঃ Regulation xviii দ্বারা, বর্ত্তমান মানভূমের অধীনস্থ ও অন্যান্য কয়েকটি পরগণা একত্র করিয়া, 'জঙ্গল মহাল' বলিয়া স্বতন্ত্র একটি জিলা সৃষ্ট হয়। পরে, ১৮৩৩ খৃঃ 'জঙ্গল মহাল' লুপ্ত করিয়া সেন পাহাড়ী, সেরগড়,ও বিষ্ণুপুর ব্যতীত সমগ্র মানভূম, এবং দানভূম পরগণা লইয়া, বর্ত্তমান মানভূম জিলার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সামান্য পরিবর্ত্তনের পর, ১৮৭১ খৃঃ ১লা জুলাই তারিখে ইহা স্বতন্ত্র একটি জিলা বলিয়া ঘোষিত হয়।

ফলকথা, পাঁড়রা বা পোদ্দার ডিহি বীরভূমের অন্তর্গত একটি পর-গণা ছিল,—কাল ক্রমে বীরভূমি হইতে পৃথক হইয়াছে মাত্র।

পারিবারিক কিম্বদন্তীঃ—পাঁড়রা রাজ বংশীয়গণ আপনাদিগকে 'সূর্য্যবংশ সম্ভূত ছত্রি' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।* তাঁহারা অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া তুড়ী বা তুণ্ডী পরগণার জঙ্গলভূমি শাসন করিয়া লন এবং স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর, লছমন সিংহের পুত্র সাহেব সিংহ, তুণ্ডী পরগণা পরিত্যাগ করিয়া, ২৪ মাইল পূর্ব্ব পাঁড়রায় আগমন করতঃ মালিক বা মল্লিক নামক নীচ জাতীয় জমীদারগণকে নিহত করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তিনি নগরে রাজার নিকট জমী-দারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

* Colonel Dalton কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'Ethnology of Bengal.' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। লেখক।

বংশাবলী

(অপরার্দ্ধ শাবলী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
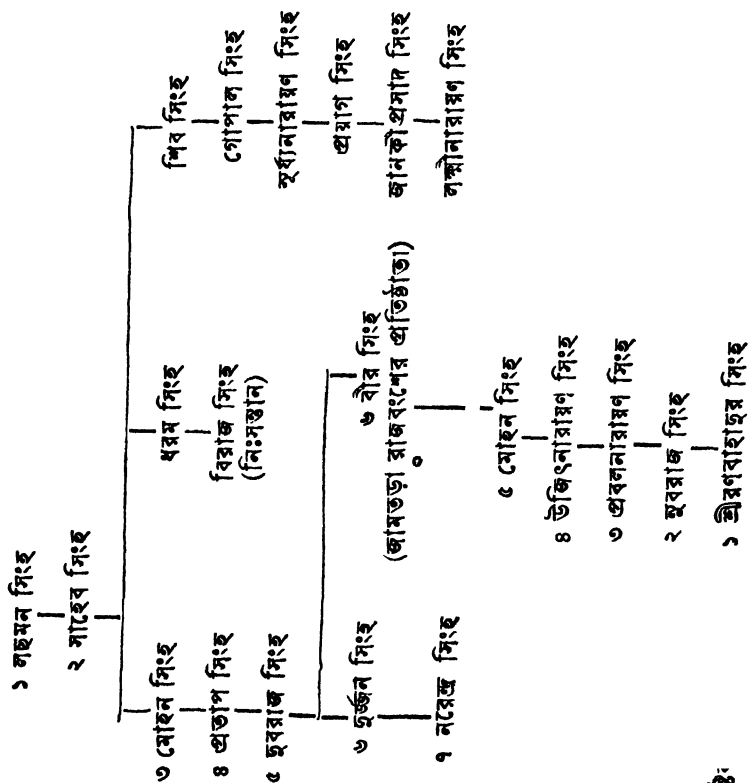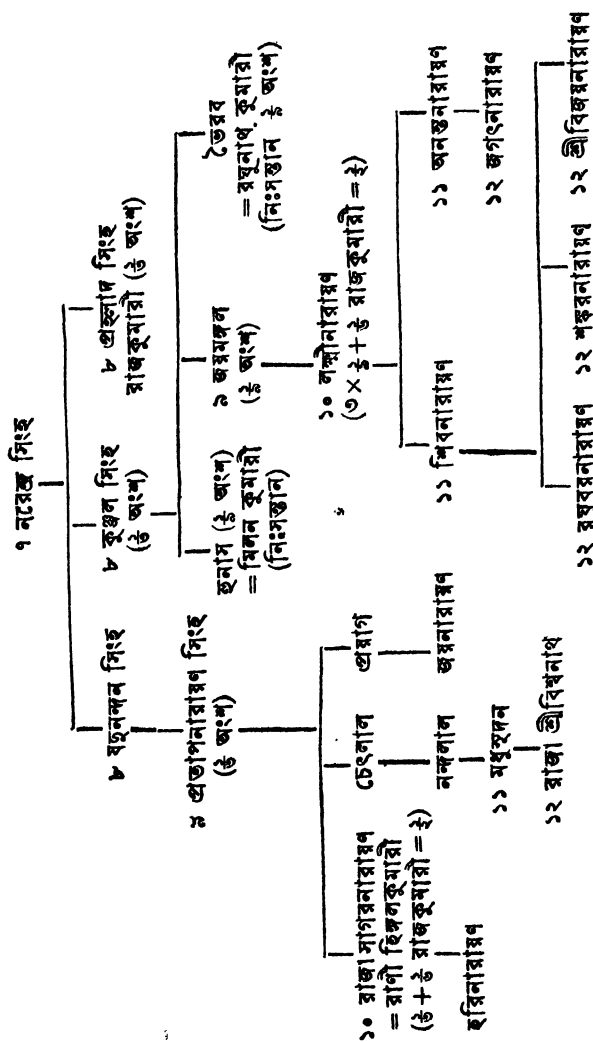
পরিচয় ঃ—পাঁড়রা রাজবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যভার প্রাপ্ত হইতেন, অপর ভ্রাতৃগণ গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেন মাত্র। এই নিমিত্ত াহেব সিংহের পর যথাক্রমে মোহন, প্রতাপ, ভুবরাজ ও দুর্জ্জন সিংহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু দুর্জ্জন সিংহের পুত্র নরেন্দ্র সিংহ াজ্যভার প্রাপ্ত হইলে, খুল্লতাত বীর সিংহ সম্পত্তি বিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়া নগরের তদানীন্তন রাজা বাদির জ্জমা খাঁর

নিকট ১১৩৬ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখে, উভয়ে একত্র ৩৬০৲ টকা রাজস্বে ৬টি তালুক বন্দোবস্তের একটি সনন্দ বাহির করিয়া লইলেন। সনন্দটির প্রতিলিপি যথা,:—

(সনন্দ *)

হুকুম দেওয়ান সাহেব।

মোহর সেখ বাদিয়ৎ জমা খাঁ।

ইজতাসার রাজা নরেন্দ্র সিংহ ও কোউর বীরসিংহ বাকিয়ৎ বাসন্দ বাং সন ১১৩৬ সাল অবধি তালুকা পাড়রা ও উব্‌চিড়া প্রভৃতি তোমাকে হুকুম হইল ও তুমি এই একবার সন মজকুর হইতে মোকরির জমা ৩০০৲ টাকা সন সন আদায় করিব বলিয়া কবুলতি লিখিয়া দিয়াছ তাহা দপ্তর দাখিল হইল। মৌজা মজকুর তপশীল অনুসারে আমল দখল করিয়া সন সন মাল গুজারী করিবে।

তপশীল
পাড়রা
উবচুড়া ০
জামতাড়া
ভিট্‌রা দুই তরফ
আবড়া

তালুক হইয়া পরওয়ানা অনুসারে ছয় মৌজা আমল করিয়া আবাদ মতে মালগুজারী কর তাঃ ৩রা ভাদ্র ১১৩৬ সাল বাঙ্গালা।

৩০০৲ টাকা
সদর জমা
মালগুজারী
মঞ্জুর
প্রতাপ দাস
নন্দরাম দাস
জীবণ দাস।

১১৫২ সালে কোনরূপ বিবাদসূত্রে তাঁহারা সম্পত্তি বিভাগ করিয়া

* পাড়রা রাজবংশের প্রাচীন কর্ম্মচারী শ্রীকাঙ্গালী চন্দ্র রায় মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমায় এই সনন্দের একটি প্রতিলিপি প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। অর্দ্ধোক্ত বিবরণও তিনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম। লেখক।

লইলেন। রাজদপ্তরে স্ব স্ব নাম খারিজ করিয়া লইলে পর, জামতড়া, ভিৎড়া, পেবা বা পাবিয়া ইত্যাদি মহাল লইয়া ৬০্ টাকা মাত্র জমায়, বীরসিংহ পাড়য়া হইতে আপন নামে পৃথক তৌজী করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত গ্রাসাচ্ছাদনের উপসত্ত্ব ভোগাধিকারী, বিরাজ সিংহের কতক সম্পত্তি অধিকৃত করিয়া ১১৫২ সালে বীরসিংহ জামতড়ার পৃথকভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের তিন পুত্র। যদুনন্দন কুঞ্জল ওপ্রহ্লাদ। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনন্দনের নামে দশসালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। বাহাদুর জমা খা যদুনন্দনকেও ১১৯২ সালে সনন্দ প্রদান করেন। ১২০০ সালে যদুনন্দনের মৃত্যুর পর,কুঞ্জলের তিন পুত্র——হুনাস, জয়মঙ্গল ও ভৈরব, যদুনন্দনের পুত্র প্রতাপ নারায়ণের নামে সমগ্র সম্পত্তি বিভাগ করিবার নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৯৫ খৃঃ ২৯ এপ্রেল তারিখে ৫২২৫ নম্বর মোকদ্দমায় তদানীন্তন বীরভূমের জজ, সম্পত্তি বিভাগ করিতে আদেশ প্রদান করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯৮ নম্বর মোকদ্দমায় প্রভিন্সিয়াল কোর্টও, গৃহস্থ সম্পত্তি রাজ্য নয়, এই বলিয়া নরেন্দ্রের বংশ মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করাই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া জজের মতের অনুমোদন করিলেন। অতএব নরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনন্দন বা পৌত্র প্রতাপ নারায়ণ $\frac{১}{৩}$ অংশ, মধ্যম পুত্র কুঞ্জল $\frac{১}{৩}$ অংশ (বা কুঞ্জনের তিন পুত্র $\frac{১}{৯}$ অংশ করিয়া) এবং কনিষ্ঠ বা তৃতীয় পুত্র প্রহ্লাদ সিংহ বা তাঁহার পত্নী রাজকুমারী $\frac{১}{৩}$ অংশ সমভাবে প্রাপ্ত হইলেন। প্রহ্লাদ বা রাজকুমারী নিঃসন্তান। এই নিমিত্ত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারীর মৃত্যু হইলে তাহার অভিপ্রায়ানুসারে অধিকৃত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ $\frac{১}{৬}$ প্রতাপের পুত্র সাগর নারায়ণ, এবং অপরার্দ্ধ $\frac{১}{৬}$ কুঞ্জনের দুই পুত্র ভৈরব ও জয়মঙ্গল প্রাপ্ত হন।

ভৈরবের মৃত্যুর পর, তাহার পত্নী রঘুনাথ কুমারী, স্বামীর পৈত্রিক $\frac{১}{৯}$ অংশ রাজকুমারী হইতে প্রাপ্ত অংশ জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিলে জয়মঙ্গলের পুত্র লছমীনারায়ণ তাহা প্রাপ্ত হন। হুনাশের পত্নী মিলন কুমারীর মৃত্যু হইলেও ঐ সম্পত্তি তাহার হস্তগত হয়। ফলে, মূল সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লছমীনারায়ণ এবং অপরার্দ্ধ সাগরনারায়ণ প্রাপ্ত হইলেন।

সাগরনারায়ণ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিক্রি বা মীমাংসা সত্ত্বেও বংশগত প্রথা বলিয়া 'অবিভাজ্য' প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিলেন। বিশেষতঃ অপরাপর

ভ্রাতারা এ বিষয়ে তত সচেষ্ট ছিলেন না। ১২৮৮ সালে সাগরনারায়ণের পত্নী রাণী হিঙ্গলকুমারীর * মৃত্যু হইলে, প্রয়াগ ও মধুসূদন বিলাত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা করেন; কিন্তু রাজ্য 'অবিভাজ্য' বলিয়াই অবশেষে স্থিরীকৃত হয়।

লছমীনারায়ণের বংশ মধ্যে কিন্তু, সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে।

সাগরনারায়ণ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি সাগরনারায়ণের বংশধরগণ আপনাদিগকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। লছমীনারায়ণের বংশধরগণ 'বাবু' বলিয়া আখ্যাত হন।

রাজবংশের জমিদারী অন্যূন চল্লিশ সহস্র টাকা। সদর মালগুজারী ১৬১৲ টাকা মাত্র; এতদ্ব্যতীত কয়লাখনি প্রভৃতির আয় আছে।

কুলপ্রথা ঃ—মৃত্যুর পর দশম দিবসে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া আচরিত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, কুটুম্ব স্বজনগণের অবস্থিতি কালেই নূতন রাজার শুভ অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া 'রাজা' বলিয়া খ্যাত হন। মধ্যম 'কুমার' তৃতীয় 'ঠাকুর', চতুর্থ 'মুন্নু' এবং পঞ্চম অবধি 'বাবু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অভিষেককালে রাজা মস্তকে উষ্ণীষ বা 'পাগ্‌ড়ী' ব্যবহার করেন,—'কুমার' ছত্রধারণ ও 'ঠাকুর' চামরব্যাজন করেন। অভীষ্ট দেবতা সর্ব্বাগ্রে রাজাভিষেক করিয়া মস্তকে 'পাগ্‌ড়ী' বন্ধন করিয়া দিবেন এবং রাজাকে মুদ্রা বস্ত্র ইত্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিবেন। তদনন্তর পুরোহিত অভিষেক করিলে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে খুল্লতাত, ভ্রাতা, স্বজাতীয় কুটুম্ববর্গ সকলেই পাগ্‌ড়ী বন্ধন করিয়া দেন। দরবার গৃহে এই সকল কার্য্য সমাধা হইলে অন্দরে সস্ত্রীক 'গোষ্ঠী বন্ধনের' পর রাজপাঠে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর রাত্রে অন্দরমহলে অভিষেক হইয়া থাকে। তৎকালে কেবলমাত্র পুরোহিত, খুল্লতাত, ও ভ্রাতৃগণ উপস্থিত থাকেন।

রাজসংসারের কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই বংশপরম্পরা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

জামতড়া, ঝরিয়া, কাতরাস, নওয়াগড়, শ্রীরামপুর, হাজারীবাগ, কররহ-

* ১২৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে ইনি মহারাণী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বালী, টীকাইৎ প্রভৃতি জমিদারগণ পাড়রা রাজবংশের কুটুম্ব। এতদ্ব্যতীত ভূমকা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদিগের জ্ঞাতিবর্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজাদিগের বাসস্থান পোদ্দার ডিহি বা পাড়রা। বাবুদিগের বাসস্থান কিঞ্চিৎ অন্তরে সমন্দপুর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ঐতিহাসিক ছড়া সংগ্রহ।

(৩)

'বানভাসীর কবিতা'

[সন ১২৩০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত।]

রচয়িতা—লক্ষর দাস।

নদী সে দামোদরে, বড়াকরে, করহে আনাগোনা
দু'ধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা।
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়
ছড়্ ছড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর।
মিশায়ে নালা খোলা, বানের খেলা নদীর হলো বল
দামোদরে জড় হল চৌদ্দ তাল জল।
নদীতে আঁট্বে, কত শত শত, নৌকা ভাসে জলে
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে।
ভাঙ্গিলো আদগাঁভাড়া, গোপের পাড়া, ভাঙ্গিল বাবুই শোন
তার পর ভাঙ্গিল লয়ে নপুর বল্লভপুর। ১০
বাক্সা, ডুবলো, গোলা,হাতে খোলা, নিলেক মহাজন
দামোদরের বলদেখে উঠলো সিঙ্গেরণ।
চল্লো বান যোজ জুড়ে, ত্বরায় করে, যেমন টাওন ঘোড়া
আদগাঁ ডুলুই ভঙ্গে, মেজে যয় সাড়া।
করিল চিপেপুরি, আহা মরি, করিলে কি ঠাকুর
নিশি সরোবরে যেন ফুটিল সালুক।
বলে, কি করলে হরি, আহা মরি, কি করলে ঠাকুর
তার পর ভাঙ্গিল যেয়ে পুব্ড়া মদনপুর।

বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

৩য় ভাগ] মাঘ, ১৩০৮। [৪র্থ সংখ্যা

কলিকাল।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেই সংক্ষেপে বা বাহুল্যরূপে কলিযুগের লক্ষণ অর্থাৎ এই যুগে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্ম আমরা তন্মধ্য হইতে কতকগুলি প্রমাণ-বচন এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিত স্তপো বিচলিতং সত্যঞ্চ দূরেগতং,
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ।
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽপি চপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ।
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ॥"

অর্থাৎ কলি প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, তপস্যা বিচলিত, সত্য দূরগত, পৃথিবী স্বল্পশস্যপ্রসবিনী, রাজা সকল কপটভাবাপন্ন, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রবিবর্জ্জিত, লোক সকল স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রীলোক সকল চঞ্চলপ্রকৃতিবিশিষ্টা, সাধুজনের অবসন্নতা ও দুর্জ্জনের প্রভাব বৃদ্ধি এই সমস্ত দুর্লক্ষণযুক্ত ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥
যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥

ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া।
মিথঃ সম্প্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি শিবে শাস্ত্রে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥
ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী।
ভবিষ্যতি মহাপ্রজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥
যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ।
অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, যে সময়ে বেদমার্গানুসারি সাধুগণের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি দৃষ্ট হইবে; যখন ধনলুব্ধ ম্লেচ্ছজাতি ভারতের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; স্ত্রীলোক সকল সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও লজ্জাশীলতারূপ গুণ হারাইয়া অতীব দুর্দ্দান্তা, কর্কশা ও কলহে রতা হইয়া, যখন নিজ পতির নিন্দাবাদ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিতা হইবে না; যখন ভ্রাতৃগণ ও স্বজনামাত্য সকল তুচ্ছ ধনের জন্য পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ করিবে; সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা যখন ছিন্ন ভিন্ন দশায় অবস্থিতি করিবেন; যখন মানবগণ স্ত্রীর বশীভূত ও কামকিঙ্কর হইয়া গুরুমিত্রাদির দ্রোহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং পৃথিবী স্বল্পফলপ্রসবা, মেঘ সকল স্বল্প বারিবর্ষী ও বৃক্ষ সকল সম্যক্‌ফলদানে অসমর্থ হইবে, তখন কলি প্রবল হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ঐ তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে,—

"ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বহির্মুখাঃ ॥
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্মুখাঃ শঠাঃ ॥
স্বল্পায়ুর্ন্দমতয়ো রোগ-শোক সমাকুলাঃ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বালা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥

নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দা-পরদ্রোহ-পরিবাদপরাঃ খলাঃ॥
পরস্ত্রীহরণে পাপাঃ শঙ্কাভয় বিবর্জ্জিতাঃ।
নির্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ॥"

অর্থাৎ কলি প্রবল হইলে সনাতন বেদশাস্ত্র এবং নানা ইতিহাস সমন্বিত ও সাধানাপক্ষে নানা প্রথপ্রদর্শক স্মৃতি শাস্ত্রের আর প্রভাব থাকিবে না। বহুল পরিমাণে পুরাণ শাস্ত্রেরও বিলোপ হইবে। তখন লোক সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মবহির্মুখ, উচ্ছৃঙ্খল, মদোন্মত্ত, কামুক, লোভী, ক্রূর, নিষ্ঠুর, শঠ, স্বল্পায়ু, রোগ-শোক-সমাকুল, দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হইবে। এই কালে সাধারণতঃ সকলে নীচাচারপরায়ণ, নীচসংসর্গনিরত, পরবিত্তাপহারক, পরনিন্দা-পরো-দ্রোহতৎপর, পরস্ত্রীহরণে শঙ্কাবিবর্জ্জিত, নির্ধন, মলিন ও চিররোগী হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিবে।

যে ব্রাহ্মণজাতি ব্রহ্মার আদি সৃষ্টি; যাঁহারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় মানবের অগ্রজন্মা, নেতা ও গুরু; যাঁহাদের প্রীতিসাধন কামনায় এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ স্ব স্ব ধন, মান, বিষয়, বিভব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত চরণতলে সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; যাঁহাদের অসীম তপোবলে এবং অনন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মবিধানে আর্যসমাজে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, বিবাদ, বিস-ম্বাদ স্থান পায় নাই; যাঁহাদের তপোদ্ভাবিত মস্তিষ্ক হইতে অনন্তজ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ শাস্ত্র সকল প্রকটিত হইয়াছে; এবং যাঁহারা সত্য, সরলতা, শম, দম ও তিতিক্ষাদি সত্ত্বগুণের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন; সেই ভূদেব ব্রাহ্মণজাতির অবস্থা ও আচার ব্যবহার কলিতে কিরূপ হইবে, তাহাও উক্ত তন্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা,—

"বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দন-বর্জ্জিতাঃ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ॥
অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যা তপোব্রত পরাঙ্মুখাঃ॥
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ।
পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ॥
কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলী-রতি-কামুকাঃ॥

দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্॥
নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্॥"

কলিকালে ব্রাহ্মণ সকল শূদ্রবৎ আচারবিশিষ্ট, সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিত, অযাজ্য-যাজক, লুব্ধ, দুর্বৃত্ত, পাপকারী, মিথ্যাবাদী, মূর্খ, দাম্ভিক, প্রতারক, কন্যা-বিক্রয়ী, দশসংস্কারবর্জ্জিত, তপোব্রতপরাঙ্মুখ ও পাষণ্ড হইবে। ইহারা কেবল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে লোক ভুলাইবার জন্যই বাহিরে জপপূজাপরায়ণ হইবে; পরন্তু প্রকৃত ভক্তি বা শ্রদ্ধার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। এই কালে ব্রাহ্মণেরা অখাদ্য খাদক, আচারভ্রষ্ট, ক্রূরস্বভাব ও শূদ্র সেবক হইয়া শূদ্রের অন্নভোজন করিবে। ইহারা অনূঢ়া কন্যারও সম্ভোগ-কামনায় সঙ্কুচিত হইবে না। কলিতে ব্রাহ্মণগণের অর্থলালসা এতই বলবতী হইবে যে, তাহারা ধনলোভে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী পত্নীকেও অনায়াসে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে নীচহস্তে সমর্পণ করিবে। ইহাদের পানাদি নিয়ম ও খাদ্যাখাদ্যবিচার কিছুমাত্র থাকিবে না। কেবল মাত্র সূত্রধারণই (যজ্ঞো-পবীত) ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক হইবে। ইহারা ধর্ম্মশাস্ত্রেরও নিন্দা করিবে ও নিরন্তর সাধুদ্রোহে রত হইবে।

উপরে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, কলির অবস্থা পরিজ্ঞান পক্ষে বোধ হয়, তাহাই যথেষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য যে, এতদ্-ব্যতীত কলিশেষে গোবংশের ধ্বংস হইয়া ছাগদুগ্ধের প্রচলন হইবে; ধরিত্রী লৌহনিগড়ে (রেল্ রোডাদিরূপ) আবদ্ধা হইবেন; ইত্যাদি নানা কথা কলির লক্ষণরূপে নানা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণের বিরক্তি ও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার আশঙ্কায় সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। ফলকথা কলি-শেষে প্রায় সমগ্র আর্য্যসমাজ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। তাহার পর ভগবান্ কল্কিরূপে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্মস্থাপন ও সত্য-যুগের প্রবর্ত্তন করিবেন। যাঁহারা ভগবদ্গীতার উক্তি গুলিকে ভগবদুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।”

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, “যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অতি বৃদ্ধি হইয়া উঠে, সেই সেই সময়ে আমাকে অবতারত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সাধুগণের পরিত্রাণ ও পাপীগণের বিনাশের জন্য প্রতি যুগেই আমি অবতার হইয়া থাকি।”

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিশেষে সমগ্র আর্য্যসমাজ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। এই ম্লেচ্ছ জাতি কাহাকে বলে ও তাহাদের আচার ব্যবহার বা কি প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি যে সমস্ত বিধর্ম্মী করদ ও মিত্র রাজগণ উভয় পক্ষে যোগদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, মদ্রাধিপতি শল্য তাহাদের মধ্যে এক জন। মদ্রদেশবাসিগণ ম্লেচ্ছ জাতি বিধায় ও তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করায়, শল্যেরও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই শল্যের সহিত মহারথী কর্ণের যখন বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তৎকালে কর্ণ শল্যের বাক্যবাণে অতিমাত্র উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া শল্যকে “ম্লেচ্ছ সম্বোধনে যে সমস্ত গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন, পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত বচনগুলিতে ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি ও তাহাদের আচারব্যবহারাদির কথা এবং ধর্ম্মপরায়ণ, সদাচারপূত আর্য্যজাতি তৎকালে ম্লেচ্ছ জাতিকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। যথা,—

“বহিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ ॥
তে কথং বিহিতান্ ধর্ম্মান্ জ্ঞাস্যন্তি হীনযোনয়ঃ ॥
মিত্রধ্রুক্ মদ্রকো নিত্যং যো নো দ্বেষ্টি ন মদ্রক।
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি ক্ষুদ্রবাক্যে নরাধমে ॥
বয়স্যাভ্যাগতশ্চান্যে দাসীদাসঞ্চ সঙ্গতম্।
পুংভির্ব্বিমিশ্রা নার্য্যশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ স্বয়েচ্ছয়া ॥
যেষাং গৃহেষশিষ্টাণাং সক্তুমৎস্যাশিনাস্তথা।
পীত্বা শীধুং সগোমাংসং ক্রন্দন্তি চ হসন্তি চ ॥

পায়ন্তি চাপ্যবদ্ধানি প্রবর্ত্তন্তে চ কামতঃ।
কামপ্রলাপিনোঽন্যাঽন্যং তেষু ধর্ম্মং কথং ভবেৎ ॥
বাসাং স্থ্যৎস্থক্য নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো বা মত্তমোহিতাঃ।
মৈথুনেঽসংযতাশ্চাপি যথাকামবরাশ্চ তাঃ ॥
তাসাং বিভ্রষ্টধর্ম্মাণাং নির্লজ্জানাং ততস্ততঃ।
তাসাং পুত্রঃ কথং ধর্ম্মং বাহীকো বক্তুমর্হতি ॥
নগরাগারবপ্রেষু বহির্মাল্যানুলেপনাঃ।
আহ্বন্তেঽন্নসূক্তানি প্রব্রুবাণা মদোৎকটাঃ ॥
"বারাহং কৌক্কুটং মাংসং গব্যং গার্দ্দভমৌষ্ট্রকম্।
ঐড়ঞ্চ যে ন খাদন্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকম্ ॥"
ইতি গায়ন্তি যে মত্তাঃ শীধুনাং বিহ্বলীকৃতাঃ।
সবালবৃদ্ধাঃ কুর্দ্দন্তি তেষু ধর্ম্মঃ কথং ভবেৎ ॥
কাষ্ঠকুন্তেষু বাহীকা মৃণ্ময়েষু চ ভুঞ্জতে।
শক্তুবাট্যাবলিপ্তেষু শাবলীঢ়েষু নির্ঘৃণাঃ ॥
আবিকাঞ্চাষ্ট্রকঞ্চৈব ক্ষারং গার্দ্দভমেব চ।
তদ্বিকারাংশ্চ বাহীকাঃ খাদন্তি চ পিবন্তি চ ॥
ষাস্তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রমেহন্তি যথৈবোষ্ট্রদশেরকাঃ ॥
যত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা পুনর্ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বাহীকস্ততো ভবতি নাপিতঃ।
নাপিতশ্চ পুনর্ভূত্বা পুনর্ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥
ভবন্ত্যেককুলে জাতাঃ সর্ব্বে তে কামচারিণঃ।
এতন্ময়া শ্রুতং তত্র ধর্ম্মসঙ্করকারকম্ ॥

কৃতঘ্নতা পরবৃত্তাপহারো,
মদ্যপানাং গুরুদারাবমর্দ্দঃ।
বাক্‌পারুষ্যং গোবধং রাত্রিচর্য্যা,
বহির্গেহং পরবস্ত্রোপভোগঃ ॥
যেষাং ধর্ম্মস্তান্ প্রতি নাস্ত্যধর্ম্ম,
আরট্টকান্ পাঞ্চনদান্ ধিগস্তু ॥

মনুষ্যানাং মলং ম্লেচ্ছা ম্লেচ্ছানামৌষ্ট্রিকং মলম্।
ঔষ্ট্রিকানাং মলং ষণ্ডাং ষণ্ডানাং রাজযাজকাঃ ॥

বহিষ্কৃতা হিমবতা গঙ্গয়া চ বহিষ্কৃতাঃ।
সরস্বত্যা যমুনয়া কুরুক্ষেত্রেণ চাপি বা॥
পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরস্থিতাঃ।
তান্ ধর্ম্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হতশল্য বিজানীহি হন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে।
আবট্টা নাম তে দেশানষ্টধর্ম্মান্ ন তান্ ব্রজেৎ॥"

এই সমস্ত বচনের মর্ম্মার্থ এই যে, "বিপাসা নদীতীরবাসী পিশাচ পিশাচী বহি ও ইকের * বংশসম্ভূত বাহীক বা ম্লেচ্ছগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বহির্ভূত জীব। সুতরাং তাহারা কি প্রকারে বিহিত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবে? যে নরাধম ম্লেচ্ছগণ কামাচারে উন্মত্ত হইয়া পরম মিত্র পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনীরও অপ্রিয়াচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; পরস্পর বিদ্বেষ ভাবই যে ম্লেচ্ছের সমুদায় কর্ম্মকাণ্ড ও উন্নতির মূল কারণ; যে ম্লেচ্ছ জাতির ভাষা অতীব সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ন্যায় গম্ভীর ও মহান্ ভাবে মনকে উন্নত করিতে পারে না; যে মদ্রক ম্লেচ্ছগণের কার্য্যসমূহের মধ্যে সঙ্গতি বা ধারাবাহিক যোগ নাই এবং স্বেচ্ছাই যাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের নিয়ামক; তাহারা কোন্ সাহসে আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া পরিচিত ও সাধুসমাজে উপদেশ প্রদান করিতে প্রয়াস পায়? যাহারা মিত্র বা অভ্যাগত অতিথি ও দাসদাসী প্রভৃতি সকলের সহিত একত্রে পানভোজন করে; যাহাদের নারীগণ স্ব স্ব ইচ্ছামত পরিচিত বা বা অপরিচিত সকল প্রকার পুরুষের সঙ্গে বিশ্রান্ত উপবেশন ও আলাপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; পরপুরুষসংসর্গ যে জাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে পাতিত্যের কারণ বলিয়া গণ্য নহে; তাহারা আবার কি প্রকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে? পবিত্র গৃহস্থমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়াও যে অশিষ্ট ম্লেচ্ছগণ শুষ্ক মৎস্যচূর্ণ ও সমদ্য গোমাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া গুরুজন ও স্নেহাস্পদের সমক্ষে হাস্য, ক্রন্দন, অসম্বন্ধ প্রলাপ বা সঙ্গীত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না ও মত্তাবস্থায় যথাকাম কার্য্যসকল সম্পন্ন করে, তাহাদের মধ্যে আবার ধর্ম্ম থাকিবে কি করিয়া? যে জাতির স্ত্রীলোকেরাও মদ্যপানে মোহিত হইয়া অবশেষে গাত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পরপুরুষের সহিত একত্রে নৃত্য করিতে থাকে; যাহাদের বিবাহবন্ধন কেবল মাত্র মৈথুনধর্ম্মে আবদ্ধ; যথায় পতির মৃত্যুর বা অপর কোন কারণে মৈথুন-

* কেহ কেহ এই বহি ও ইককে আদম্ ও ইভ্ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিলে, পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে; যাহাদের মধ্যে প্রকৃত পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই; এবং যথায় স্ত্রীলোকেরা কামচারিণী ও নির্লজ্জা হইয়া পরপুরুষের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়; এবম্ভূতা নারীগণের কামোৎপন্ন সন্তানসন্ততিগণ আবার কি প্রকারে ধর্ম্ম্য আচার ব্যবহার অবগত হইবে? যাহারা নিজে গন্ধমাল্য সহ্য করিতে পারে, পরন্তু পর্ব্বদিনে দীন, দুঃখী, অনাথগণের এবং ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলের তৃপ্তিসাধন করা দূরে থাক্, কেবলমাত্র নগরে, প্রাকারে ও বাসগৃহে গন্ধমাল্যানুলেপন করিয়া দেয়; যাহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে; যাহারা মত্ত হইলে গর্দ্দভাদির ন্যায় উৎকট শব্দ করে; এই প্রকার লোকের উপদেশ কি প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে? "শূকর মাংস, কুক্কুট মাংস, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের মাংস যাহারা না খায়, তাহাদের জন্মই বৃথা" এইরূপই যাহাদের সংস্কার; যাহারা বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে একসঙ্গে ক্রীড়া করিতে লজ্জাবোধ করে না; যাহারা পরস্পরকে একই ভাবে সম্ভাষণ করিয়া থাকে, সেই অস্থিরমতি ম্লেচ্ছগণের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান কি প্রকারে উদয় হইবে? যাহারা সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্যাদি ধাতুপাত্রে ভোজন না করিয়া কাষ্ঠ ও মৃণ্ময় পাত্রে ভোজন করিয়া থাকে; যাহারা শক্তুবাটী (নীরস পিষ্টকাদি) ভোজন, অজ, মেষ ও গর্দ্দভাদির দুগ্ধপান এবং তদ্বিকার (পনীরাদি) আহার করে, অর্থাৎ দুগ্ধময় ও রসহীন দ্রব্য যাহাদের ভোজন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না; যাহারা নির্ঘৃণ হইয়া কুকুরের সহিত একপাত্রে ভোজন এবং উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুগণের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব ত্যাগ করে, তাহাদের আচার আদি শিষ্টাচার বলিয়া অনুকরণীয় হয়, তবে জগতে ইতর, ভদ্র, উচ্চ, নীচ, ভাল, মন্দ ও শিষ্টাশিষ্টের আর প্রভেদ থাকিল কৈ? যে দেশে প্রকৃতিগত গুণানুসারে বর্ণ বিচার নাই; কর্ম্মানুসারে যেখানে জাতিত্ব প্রাপ্তি ঘটে; যথায় পিতৃবীর্য্য নগণ্যরূপেই ব্যবহৃত হয়; যথায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া সকলেই সকল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে যায়; জাতিতে নাপিত হইয়াও যে দেশের লোক উদরান্নের জন্য ধর্ম্মোপদেশ করিতে সমুদ্যত হয়; তথায় যে ধর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যাহারা কৃতঘ্ন; পরবিত্তাপহরণে যাহাদের গর্ব্ব; বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীতে যাহারা বিহারশীল; যাহারা রাত্রি অবধি দিবসের গণনা করিয়া থাকে; নগরের বহির্ভাগে

যাহারা বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করে; যাহারা মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখে; তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মই বা কি, অধর্ম্মই বা কি? এবং ঐ সকল ব্যক্তির উপদেশকে কোন্ শিষ্টজন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন? অতএব হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিও, ম্লেচ্ছেরা মানবজাতির মলস্বরূপ ধর্ম্মহীন মানব স্বভাব কর্ত্তৃকই হত হয়। ধর্ম্মহীন জাতি জগতে চিরকাল অবস্থান করিতে পারে না; স্বভাবের নিয়মই এই।"*

পাঠক! শাস্ত্রোক্ত ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি-বিবরণ ও তাহাদের আচার ব্যবহারাদির কথা শুনিলেন? ইহা দ্বাপর যুগের কথা। যে পাশ্চাত্য জাতি আজি ভূমণ্ডলে সভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত; যাহাদের সভ্যতা দিন দিন অলক্ষিতরূপে আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতেছে; যাঁহাদের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার ও আহার বিহারাদির অনুকরণ করিয়া আমরা আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি, সেই পাশ্চাত্য জাতির আচার ব্যবহারাদির সহিত এখন একবার শাস্ত্রোক্ত মদ্রক ম্লেচ্ছগণের আচার ব্যবহারাদির তুলনা করিয়া দেখুন এবং দেখিয়া স্থিরচিত্তে একবার মনে মনে ভাবুন যে, কলি-কালের অদম্য শক্তি প্রভাবে আমরা ক্রমে ক্রমে কিরূপে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি ও শাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী কিরূপে সফল করিতেছি।

বস্তুতঃ ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ ম্লেচ্ছসংসর্গকে এতই অনিষ্টকর ও পবিত্রতার হানিজনক বলিয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা তাহাদের ভাষাশিক্ষাকেও একবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"ন সাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি বৈ ফলেন তু।
ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্॥

কূর্ম্মপুরাণ।

অর্থাৎ "ইষ্টক বা ফলনিক্ষেপ দ্বারা কোন গাছের ফল পাড়িবে না, ম্লেচ্ছভাষা শিখিবে না ও পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না।" কেননা তাঁহারা জানিতেন যে,—

"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

"যেমন সংসর্গ দোষগুণ তদনুরূপই হইয়া থাকে।" আর্য্য-বিজ্ঞান আরও বলেন যে,—

* এই প্রবন্ধোক্ত ম্লেচ্ছ জাতির বিবরণটী "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

"সংলাপাৎ স্পর্শনাদ্‌বাসাদেকশয্যাসনাশনাৎ।
সৌহার্দ্দাদ্‌বীক্ষণাদ্দানাত্তেনৈব সমতাং ব্রজেৎ॥"

সংলাপ, সংস্পর্শ, একত্র বাস, এক শয্যায় শয়ন উপবেশন ও একত্র ভোজন, পরস্পর সৌহৃদ্য ও বীক্ষণ এবং আদান প্রদান, এই সকল কারণে দোষগুণের সমতা-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ যেরূপ প্রকৃতির লোকের সহিত সংঘর্ষ ঘটিবে, আমাদের প্রকৃতিও তদাকারে গঠিত হইবে। বাস্তবিক মানব অনেক সময়ে যে, সাধুসহবাসে সাধু ও অসাধু সহবাসে অসাধু হইয়া যায়, তাহার প্রধানতম কারণই হইল, পরস্পরের সংঘর্ষজনিত দোষগুণের সমতা প্রাপ্তি।

শাস্ত্রোক্ত ম্লেচ্ছজাতির আচারব্যবহারাদির কথা বলিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে দুই একটা অবান্তর কথারও আলোচনা করিতে হইল। যাউক্ সে কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কলিযুগের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। ইহার মধ্যে ৫০০২ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। এখনও ৪২৬৯৯৮ বৎসর বাকী। সুতরাং সবে মাত্র এখন কলির সন্ধ্যা বলিলেই হয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা স্থিরচিত্তে একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে, দূরদর্শী ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষুতে জল আইসে। বস্তুতঃ আমরা বাল্যজীবনে যেরূপ সংসার দেখিয়াছি, তাহা আর নাই। বাল্যজীবনের কথা মনে হইলে, আমরা এখন যেন, অন্য নূতন একটা সংসারে বাস করিতেছি, এইরূপই ধারণা হয়। সে কালের সেই সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, দীনে দয়া, পিতামাতৃভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী কোন্ দিকে অন্তর্ধান করিয়াছে। এখন পিতা-পুত্রে, পতি-পত্নীতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্প্রীতির পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। কুলস্ত্রীগণের মধ্যে তাঁহাদের সেই প্রকৃতিসিদ্ধ সহিষ্ণুতা, কোমলতা, ও লজ্জাশীলতাদিরূপ গুণ আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কালধর্ম্মে তাঁহারা এখন বিলাসিনী ও স্বাধীনতা-প্রয়াসিনী। স্বামী বা অন্য গুরুজনের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা, ঘোর অসভ্যতা ও বর্ব্বরতামূলক বলিয়াই ক্রমে তাঁহাদের ধারণা জন্মিতেছে। পাশ্চাত্য জাতির আদর্শে শিক্ষিতা হইয়া স্ত্রীলোক সকল এখন গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন, অতিথি সৎকার, দেবদ্বিজে ভক্তি ও গুরুজন সুশ্রূষাদিরূপ পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ক্রমেই পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বিদুষী সাজিয়া মাসিকপত্রাদিতে প্রবন্ধ ও গ্রন্থকারের উচ্চাসন গ্রহণে সমুদ্যতা হইয়াছে। "বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ

পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥" এই মনুবচন এখন পক্ষপাতদুষ্ট ও উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া—ক্রমেই তাহাদের ধারণা হইতেছে। ফল কথা, এখন ভারতের প্রায় সকল সংসারই অশান্তি-ময়। পূর্ব্বকালের সেই সরলতা মাখা আনন্দময় ভাব আর কোন সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রতিবেশীদের মধ্যেও পরস্পর আর পূর্ব্বের মত সৌহৃদ্য ভাব নাই। স্বার্থপরতা, কপটতা, ঈর্ষা ও অসূয়া প্রভৃতি অসদ্‌গুণ সকল মানব হৃদয়কে এরূপ ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, এখন আর মন খুলিয়া কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এই বৈষম্যময় জগতে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এক "সাম্য" কথা উঠিয়া সমাজকে অধিকতররূপে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না; সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, সকলেই প্রধান। কাল মাহাত্ম্যে আর্য্যজাতির চিরপ্রসিদ্ধ ক্ষমাগুণ এখন দেশ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে লোক সকল এরূপ আত্মাভিমানী হইয়া পড়িয়াছে যে, কথায় কথায় তাহারা আদালতের আশ্রয় লইতেছে ও কথায় কথায় মান-হানির মোকদ্দমা উপস্থিত করিতেছে। ইংরেজীশিক্ষিত নব্য সমাজে যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী ও সুসভ্য বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, যাঁহারা দেশের প্রতিনিধি সাজিয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার করণে সমুদ্যত হয়েন, মানহানির মোকর্দ্দমা করা রোগটা আজ কালি তাঁহাদেরই মধ্য কিছু বেশী বেশী সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই নশ্বর জীবনে মান যে কিসের ও কয়দিনের এবং অপর ব্যক্তির একটা কথায় এবং কার্য্যে যে মানের হানি হয়, আদালতে মোকদ্দমায় জয়ী হইলেই সেই লুপ্ত মানের পুনরুদ্ধার হইতে পারে কিনা, সে কথাটা কেহ একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না।

কলি প্রবল হইলে যেরূপ যেরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী, ক্রমে ক্রমে তাহাই ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। লোক সকল দিন দিন শাস্ত্রবিব-র্জ্জিত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সমাজে যথেচ্ছাচারিতার মাত্রা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় আপনা-দিগকে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিয়া যে ভাবে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা

করিতেছেন, তাহাকে দেশের সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের সূচক বলিব, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক হিন্দুধর্ম্মটার সমূল পরিবর্ত্তন ও বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগীরূপে গঠন করিয়া লইতে সমুৎসুক। কথকগুলি লোক হিন্দুর জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটাকে একবারে উঠাইয়া দিয়া, একাকারকরণে বদ্ধপরিকর। বলা বহুল্য যে, সমগ্র শাস্ত্রবাক্যে ইঁহাদের বিশ্বাস নাই। ইঁহারা বাছিয়া গুছিয়া, নেজামুড়া বাদ দিয়া আপনাদের যুক্তির অনুকূল মত যাহাতে দেখিতে পান, কেবল সেই সকল শাস্ত্রই মানিয়া থাকেন। পরন্তু তদ্‌ভিন্ন শাস্ত্র সকল পূর্ব্বকালের স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতার ফলস্বরূপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী শাস্ত্র সকলের মধ্যে যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন ও সামঞ্জস্য আছে, এবং মানবগণের প্রকৃতি ও রুচি ভেদেই যে শাস্ত্রভেদ ও অধিকারীভেদ হইয়াছে, এ কথাটা তাঁহাদের ভ্রান্তবুদ্ধিতে আদৌ প্রতিভাত হয় না। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন যে,—

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব॥"

মহিম্ন স্তব।

শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ এই যে, বেদ মত, সাঙ্খ্যমত যোগ শাস্ত্র, পাশুপত মত বৈষ্ণব মত প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী নানামত, কেবল মানবগণের রুচি বৈচিত্র্য প্রযুক্তই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঋজুপথ বা কুটিল পথ, যিনি যে পথেই গমন করুন্, সকলেরই শেষ গম্যস্থান এক মাত্র "তুমি" (ঈশ্বর)। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্নরুচিবিশিষ্ট মানবগণ আপন আপন প্রকৃতির ও রুচির অনুকূল শাস্ত্রাবলম্বনে সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ফলিতার্থে শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

আবার নব্যদলের আর এক সম্প্রদায় বিলাতি ধরণের "ব্রহ্মচারী আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের লোকগুলাকে একেবারে ঋষিকল্পরূপে প্রস্তুত করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহাদের এই ব্রহ্মচারী আশ্রমেও আর্য্যজনোচিত বর্ণভেদ বা অধিকারী ভেদের সম্বন্ধমাত্রও নাই। বোধ হয়, হাড়ি, মুচি, মুর্দ্দাফরাস, মেথর প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি এবং যবন,

ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিধর্ম্মী লোকেরাও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারী আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে পারিবে। কেননা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতারা যে, সাম্যবাদী ও শিক্ষিত লোক। স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতমূলক বৈষম্যভাবকে তাঁহারা যে অতি ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ধন্য কলিকাল !! ধন্য তোমার প্রভাব !!! তোমার প্রভাবে না হইতে পারে, এমন ঘটনাই নাই। আজি তোমারই প্রসাদে ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণ স্বার্থপর ও বর্ব্বররূপে পরিগণিত।

নব্যদলের অন্য কথকগুলি লোক আজিকালি বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও অবকাশ সময়ে ঘরে বসিয়া পুঁথি দেখিয়া যোগ সাধনায় মন দিয়াছেন। ইঁহাদের মতেও যোগসাধনায় অধিকার বিচার, বর্ণভেদ ও গুরুকরণ ব্যবস্থার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি, যোগের এই যে আটটী অঙ্গ আছে, সেই সমস্ত অঙ্গগুলি ক্রমপরম্পরায় সাধনা না করিলে, ঈশ্বর-সমাধি হইতে পারে না, এই শাস্ত্রবাক্যেও ইঁহাদের বিশ্বাস নাই। ফলকথা নব্যদলের অনুষ্ঠিত এই যোগসাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ও ইহার চরম ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা ক্ষুদ্র মানব, ইহার রহস্যোদ্ভেদ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত যোগ কাহাকে বলে, যোগসাধনের প্রকৃত অধিকারী কে ও কি প্রণালীতে যোগ সাধনা করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় আমরা বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

পাঠক ! ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সমাজের কথা শুনিলেন ? এইবার প্রাচীন সমাজ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। সদাচারপরায়ণ, অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী, পঞ্চ মহাযজ্ঞের-অনুষ্ঠাননিরত এবং শম, দম, তিতিক্ষাদি গুণসম্পন্ন সাধু ব্রাহ্মণ এই সমাজে আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কপটতা, স্বার্থপরতা, ঘোরতর আত্মাভিমান ও জিগীষা প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি সকল ক্রমেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্তে ইঁহারাও এখন বিলাসী ও সম্মানাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন।

"সম্মানদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্‌বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ সম্মানলাভেচ্ছাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া, লোক-সমাজ হইতে অমৃতের ন্যায় অবমাননারই আকাঙ্ক্ষা করিবেন।" এই মনু-বচনে আর তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অর্থ-লোভ এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, অর্থ পাইলে তাঁহারা না করিতে পারেন, এমন অকার্য্যই নাই। ফলকথা, কোন শাস্ত্রবাক্যে সংশয় উপস্থিত হইলে, ইঁহাদের দ্বারা আর তাহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে সুমীমাংসিত হইবার আশা করা যায় না। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিনা যে, সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ-দুষ্ট হইয়াছেন। এই সমাজে এখনও এমন লোক আছেন, যাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা এতই অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদিগকে তুলনায় সমুদ্রে শিশিরবিন্দু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাঠক! আবার দেখুন। কলিতে মানবগণের আধ্যাত্মিকী শক্তির হ্রাস হওয়া প্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ হইলেও আজি কালি কপটবেশধারী, পেসাদার সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভৈরব ভৈরবীতে এক-বারে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহারা দেহি দেহি রবে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া, লোক সকলকে অনবরতঃ জ্বালাতন করিয়া তুলিতেছে। তন্ত্র বলিয়াছেন,—

> "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপিন প্রিয়ে।
> গৃহস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥"

অর্থাৎ কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম থাকিবে না। কেবল গৃহস্থাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রম এই দুইটী মাত্র আশ্রমই মানবগণের অবলম্বনীয় হইবে। আবার বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

> "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
> দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
> দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
> মাংসদানং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
> দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
> দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, (সন্ন্যাস গ্রহণ) অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজগণের বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, মধুপর্কের নিমিত্ত পশুবধ, শ্রাদ্ধে গোমাংসদান, বানপ্রস্থাশ্রম, অক্ষতযোনিদত্তা কন্যার অন্যপাত্রে পুনর্দ্দান (বিধবা-বিবাহ) দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ এবং মহাপ্রস্থানগমন, এই ধর্ম্মগুলি কলিযুগে একবারেই বর্জ্জনীয়।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত পেসাদার সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে এবং যাহারা কেবল ব্যবসায়ের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগকে ভিক্ষাদান করিতে নাই। যথা,—

"নালস্যজীবিনে দেয়ং সামর্থ্যশালিনে ক্বচিৎ।
ন ভিক্ষাব্যবসায়িভ্যো ন বাতিরিচ্য বর্ত্তনম্॥"

সক্ষম অথচ অলস এবং ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগকে ভিক্ষাদান করিবে না। আবার নিজের অবস্থার অতিরিক্ত দানও কাহাকেও করিতে নাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই শাস্ত্রসঙ্গত ভিক্ষুক। যথা,—

"ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ।
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ॥"

স্মার্ত্তধৃত বচন।

প্রকৃত ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, (যিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন) গুরুপোষক, সম্বলবিহীন পথিক ও ক্ষীণবৃত্তি (যাহার নিজবৃত্তিতে আহার্য্য আহরণের শক্তি নাই, যথা—অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি) এই ছয়প্রকারের লোকই ভিক্ষাদানের প্রকৃত পাত্র।

পাঠক! শাস্ত্রের কথা শুনিলেন? এখন দেখুন, কিরূপ শ্রেণীর লোক ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছে। ফলতঃ কেবল ভিক্ষুক বলিয়া নহে, আজি কালি সংসারে সকল বিষয়েই ব্যবসাদারি চলিতেছে। গুরুগিরিতে ব্যবসাদারি, তীর্থস্থানে ব্যবসাদারি, আপন আলয়ে দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসাদারি, শুভবিবাহে ব্যবসাদারি; আর কত দেখাইব? ব্যবসাদারি নয় কিসে? এখন সমগ্র ভারতের, কেবল ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর লোকই বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ, সভ্যতার ভাণ ও পরোপকারিতার ভাণ করিয়া, কেবল স্বার্থের

জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মুখ্যতম স্বার্থই হইল, এখনকার ধনসম্পত্তি লাভ ও সম্মান লাভ, বস্তুতঃ এখন সমস্ত সংসারই কপটতাময়।

পাঠক! একবার আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেখিতে পাইবেন যে, দুই জন ধনী লোক ব্যতীত আর সকল সংসারেই ঘোর অর্থাকৃচ্ছ্র উপস্থিত। খাদ্য খরচের ব্যয়, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয়, বিলাস দ্রব্যের ব্যয়, চিকিৎসার ব্যয়, কন্যাদায়ের ব্যয়, পুত্রদায়ের ব্যয় ও তদ্‌ভিন্ন সাংসারিক আরও নানা ভাবে নানা ব্যয়ে লোক সকল অস্থির হইয়া পড়িতেছে। এদিকে রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে ভারত সংসার ছারখার যাইতে বসিয়াছে। আমাদের ইংরেজরাজ সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমাদের কষ্টনিবারণ ও উন্নতির জন্য নানা উপায়াবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু করিলে কি হইবে? আমাদের এ অবনতি, এ কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। যত দিন কলিকালের প্রভাব থাকিবে, ভগবানের ইচ্ছায় ও কালমাহাত্ম্যে আমাদের দুঃখদারিদ্র্যের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। ঐশীশক্তির নিকট ক্ষুদ্রতমা মানবশক্তি অতীব তুচ্ছ পদার্থ।

প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্রাবয়ব বীরভূমিতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া, এইখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য সকল কথা এখনও বলা হইল না। পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি ও এই স্থানেই মানব শক্তির সম্পূর্ণতা কেন হয়? পাশ্চত্য জড়বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা যে মানবাত্মা প্রকৃত উন্নত, পরিতৃপ্ত ও ও চিরসুখী হইতে পারে না; যে বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবোন্নতি চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়; মানব কৃতার্থ হয়; সেই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানই যে প্রকৃত বিজ্ঞান; কালশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা কিরূপে জগতের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইতে বাকী থাকিল। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। সময়ক্রমে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা থাকিল।

এই পাঠকগণের নিকট কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়া ও একটী নিবেদন জানাইয়া, বিদায়গ্রহণ করিব। আমি একজন বিদ্যাবুদ্ধিহীন অতীব ক্ষুদ্র ব্যক্তি। ইতঃপূর্ব্বে আমি কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব-শক্তিসম্পন্ন পুলিস কর্ম্মচারী ছিলাম। সে কাজ হইতে এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছি। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার যেরূপ চরিত্র ছিল, তাহা শুনিলে, আপনারা আমায় ঘৃণা না

করিয়া থাকিতে পারিবে না। মদ্যপান, পরদারগমন, ও অখাদ্যভোজন প্রভৃতি অনেকগুলি দোষই আমাতে বিদ্যমান ছিল। তদ্ভিন্ন আমি হিন্দু-ধর্ম্মে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলাম। তাহার পর জগদম্বার কৃপায় ও অদৃষ্টবশতঃ আমার দুর্ম্মতির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তদবধি আমি হিন্দুধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু বিশাল হিন্দুধর্ম্মের কণামাত্রের মর্ম্মও অদ্যাপি আমার পরিজ্ঞাত হয় নাই। এখনও আমি অনেক বিষয়ের রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারি নাই। সুতরাং আর এই প্রবন্ধোক্ত সকল কথাই যে অভ্রান্ত হইবে, এরূপ কথা বলিবার সাহস বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে আমি যে ভাবে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতেছি, ও তদালোচনায় আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, এবং জগৎসংসারটা আমার চক্ষে যেরূপ দেখাইতেছে, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিরপেক্ষ বিচার জন্য সরলভাবে তাহাই এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম। কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষপাত করা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নহে। যদি আমার লেখার দোষে প্রবন্ধের কোন স্থানে ঐরূপ দোষ লক্ষিত হয়, তবে সকলে নিজগুণে আমায় ক্ষমা করিলেই কৃতার্থ হইব।

দীনহীন
শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সীতাহাটী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধৃতরাষ্ট্র—হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রণস্থলে।
কি করিছে বীরগণ—পাণ্ডব কৌরব দলে॥ ১

সঞ্জয়— নিরখি পাণ্ডব-সৈন্য ভীত মন দুর্য্যোধন।
দ্রোণাচার্য্য পাশে গিয়া, করিছেন নিবেদন॥ ২
"আচার্য্য! দেখহ চাহি পাণ্ডবের সৈন্যবল।
তব শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন—কিবা ব্যূহ, কি কৌশল॥ ৩
সুসজ্জিত সেই দলে মহারথ, বীর্য্যবান।
সাত্যকি, বিরাট, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান॥

কাশিরাজ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ নৃপতি আর।
কুন্তিভোজ, যুধামন্যু সবে রণে দুর্নিবার॥
উত্তমৌজা, অভিমন্যু, দ্রৌপদী নন্দনগণ।
মহাধনুর্দ্ধর সবে রণে ভীমার্জ্জুন সম॥ ৪—৬
প্রধান মোদের যাঁরা নেতৃপদে অধিষ্টিত
দ্বিজবর! তব পাশে হইতেছি নিবেদিত॥ ৭
ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য আপনি বিকর্ণ আর।
ভূরিশ্রবা আদি আরো বহুবীর দুর্নিবার॥
মহারণে, মোর তরে অকাতরে দিতে প্রাণ,
উল্লাসে সমর সাজে হইয়াছে আগুয়ান। ৮-৯
কিন্তু রহি সৈন্য মম ভীষ্ম বীর্য্যে সুরক্ষিত।
দুর্ব্বল; ভীমের সৈন্য বীর্য্য মদে গরবিত॥১০
রহিয়া ব্যূহের দ্বারে ভীমবীর্য্যে প্রাণপণে।
সশস্ত্রে করুন রক্ষা ভীষ্মদেব মহারণে॥ ১১
করিতে সন্তোষ চিত্ত ভয়ান্বিত দুর্য্যোধনে।
শঙ্খধ্বনি করিলেন ভীষ্ম আনন্দিত মনে॥ ১২
সে রবে ধ্বনিল শঙ্খ, ভেরী, ঢক্কা, ঘনরব।
মর্দ্দল, গোমুখ নাদে হ'ল মহাকলরব। ১৩
বসিয়া উত্তম রথে শ্বেত অশ্ব সংযোজিত।
করিলেন শঙ্খধ্বনি কৃষ্ণার্জ্জুন হরষিত॥ ১৪
পাঞ্চজন্য হৃষিকেশ, দেবদত্ত পার্থবীর।
মহাবীর বৃকোদর পৌণ্ড্র শঙ্খ সুগভীর॥ ১৫
অনন্ত বিজয় রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময়।
সুঘোষ মণিপুষ্পক শঙ্খ মাদ্রিপুত্রদ্বয়॥ ১৬
মহাবীর কাশিরাজ, শিখণ্ডী বিরাট আর।
বিজয়ী সাত্যকি আদি ধৃষ্টদ্যুম্নো দুর্নিবার॥
মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ
করিলা সকলে ক্রমে আপন শঙ্খ নিস্বন॥ ১৭-১৮
তুমুল সে শঙ্খধ্বনি, আকাশ ও ভূমণ্ডল
করিল প্রতিধ্বনিত, কাঁপিল কৌরবদল॥ ১৯

সাজি যুদ্ধসাজে, কৃষ্ণ অর্জ্জুন পুরুষোত্তম
কহিলা "অচ্যুত! রাখ, মধ্যস্থলে রথ মম॥
দেখিব এ যোদ্ধৃদল উপস্থিত মহারণে,
দেখিব, করিব আমি সমর কাদের সনে। ২০-২২
দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের করিতে প্রিয় সাধন
দেখিব কাহারা যুদ্ধে করিয়াছে আগমন॥ ২৩
হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ! তুষিতে পার্থের চিত
সেনাদল মধ্যে কৃষ্ণ করিলা রথ স্থাপিত। ২৪
সম্মুখেতে ভীষ্ম, দ্রোণ, ভারত নৃপতিগণ—
কহিলেন, "পার্থ! কর কুরুপক্ষ দরশন॥ ২৫
নেহারিলা পার্থ তথা, পিতৃব্য ও পিতামহ,
আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র সখা সহ
শ্বশুর, সুহৃদ্ সবে সৈন্য মধ্যে অবস্থিত,
নেহারিয়া বন্ধুবর্গ পার্থ-চিত্ত বিষাদিত॥ ২৬-২৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

অঞ্জলি।

কত দিন দীন সুতে মা হ'য়ে রহিবে ভুলে,
অকৃতী অধম ব'লে লবে নাকি কোলে তুলে?
গেছে সাথী, সখি, সখা,　　সংসার-শ্মশানে একা,
কাঁদিতে দাঁড়ায়ে আছি স্মৃতির জাহ্নবী কূলে;
মরম পাথার হ'তে,　　কল্পনার দূর পথে,
ঝরেছে কামনা--কলি বাসনা-বিটপী-মূলে!
অন্তরে সঞ্চিত শক্তি,　　মায়া, মোহ, আসুরক্তি,
বিস্মৃতি-সলিলে দিছি প্রাণের কপাট খুলে,
পাপ-কর্ম্ম-নাশা-জল,　　অনুতাপ দাবানলে,
ব্যথিত সতত হৃদি, সংশয়-হিল্লোলে দুলে;
সকাতরে তাই তোমা,　　'মা' বলে ডাকিমা উমা!
এনেছি তোমার তরে "অঞ্জলি" প্রীতির ফুলে!

শেফালি আকুলি কত, জবা ত শোভেনা তত,
পদ-কোকনদে মজে মুনি-মন-অলি কুলে!
কি ছার নীলিমা-ভালে, প্রকৃতি চাদিমা জ্বালে,
কত কোটি শশী তব নখর-মৃণাল মূলে!
জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী, অগতির গতিদাত্রী,
স্বগুণে নির্গুণে তারা! তারিবে না কি অকূলে;
ভাসাবে সন্তানে কত ভবসিন্ধু এ বিপুলে?

শ্রীতারকনাথ সরকার।
শ্রীরামপুর।

প্রবাদ-প্রসঙ্গ।

(২)

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

এই বাক্যটিতে আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে শিক্ষা দিতেছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে সংসারে কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন করা যায় না। কার্য্য সাধন উদ্দেশে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে, তৎপর প্রাণপণ যত্নে তাহা নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে যদি শরীরের পতন ঘটে, তাহাও শ্রেয়, তত্রাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। "করিব" এই সংকল্প করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা নিশ্চয়ই সম্পাদিত হয়। সুতরাং কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে,—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

ভাটমুখে বিদ্যার রূপ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া সুন্দরের প্রেম-পারাবার উথলিয়া উঠিল। সে বিদ্যাকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সদা সর্ব্বদা বিদ্যার কথা ভাবিতে লাগিল,—

"হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা বিদ্যা কবে পাব,
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব।
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট,
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।

প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খোয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে ॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"
একা যাব বর্দ্ধমানে করিয়া যতন,
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।"

সুন্দরের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল বলিয়াই তিনি বিদ্যালাভে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

এক ব্রাহ্মণ কাক-চরিত্র-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবিত ব্যক্তির ললাট এবং মৃত ব্যক্তির ললাট-অস্থির উপর লিখিত লিপি পড়িতে পারিতেন। একদা ব্রাহ্মণ এক শ্মশানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে পথি-পার্শ্বে এক মৃত ব্যক্তির একটি মস্তক দেখিতে পাইলেন। মস্তক দেখিয়া ব্রাহ্মণের ললাট-লিপি পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি মরার মাথার নিকট যাইয়া পড়িলেন, কাক-চরিত্র-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অবোধ্য অক্ষরে লিখিত আছে,—

"ভোজনং যত্র তত্রৈব
　　　শয়নং হট্ট-মন্দিরে,
মরণং গোমতী তীরে
　　　অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।"

লিপি পাঠ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—এ লোকটার ভারি অদৃষ্টের জোর দেখিতেছি। ভোজনটি যেখানে সেখানে হইত, হাটের মধ্যে গৃহেতে শয়ন হইত, তাহার পর গোমতী তীরে মরণ। এখন "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি," ইহার পরে কি হইবে? মৃত্যুর পরে আবার কি হইবে, তাহাত ছাই আমার মাথায় আসে না। যাহা হউক, এই মুণ্ডটি বাড়ীতে লইয়া যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ স্বীয় উত্তরীয় বসনে মুণ্ডটি আবৃত করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন, পরে একটি মৃণ্ময় পাত্রে ঢাকিয়া গৃহের এক নিভৃত কোণে লুকায়িত রাখিয়া ভবিষ্যৎ ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রত্যহ মুণ্ডটি বাহির করিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন।

এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। একদা কোন এক দেশ হইতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইল। যাত্রাকালে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন,—"ঐ যে হাঁড়িটি দেখিতেছ, খবরদার ওটি নাড়িও না। আমি উহার ভিতর এক প্রকাণ্ড অজগর পূরিয়া রাখিয়াছি।" ব্রাহ্মণী শুনিয়া ভীতা হইলেন এবং স্পর্শ করিবেন না বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে, কিছু দিবস পর কোন সূত্রে ব্রাহ্মণীর সহিত তদীয় শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর কলহ উপস্থিত হয়। কথায় কথায় কলহ সপ্তমে উত্থিত হইলে, স্বামী-সোহাগিনী ব্রাহ্মণী অভিমানভরে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া চিরশান্তি বিরাজিত অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কি করিয়া সে বাসনা চরিতার্থ হয়? এখনকার মত সে কালে আফিং, আরসেনিক, মরফিয়া প্রভৃতি সদ্যপ্রাণঘাতী বিষের আবি-ষ্কার হইয়াছিল না; তাই ব্রাহ্মণী স্বামী-কথিত সেই অজগর সর্পের হাঁড়ীর ভিতরে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ভবজ্বালা নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিয়া, হাঁড়ীর মুখাবরণ উদ্‌ঘাটিত করিলেন। উদ্‌ঘাটিত করিয়া কি দেখিলেন, ও হরি! সাপ কই? এ যে মড়ার মাথা! ব্রাহ্মণীর ক্রোধ গিয়া ভয়ানক বিস্ময়ের উদয় হইল। তথায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ মড়ার মাথা দিয়া কি করে? পৃথিবীতে এত জিনিষ থাকিতে, ব্রাহ্মণের মড়ার মাথা এত ভাল লাগিল কেন? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় কারণ আছে।" শেষে কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রভাবে ব্রাহ্মণী অচিরেই কারণ উদ্ভাবন করিলেন। কারণ উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণীর শাশুড়ীর উপরের ক্রোধ প্রশমিত হইয়া, সেই রাগ ও প্রচণ্ড ঈর্ষা স্বামীর উপর হইল। ব্রাহ্মণী স্বগত বলিতে লাগিলেন,—"বটে, এতদূর। আসুক আগে বাড়ী, দেখ্‌তে পাবে আমি কেমন মাগী। ঝাঁটা দিয়ে পীঠ ঝেড়ে ভাঙ্গা কুলোর বাতাস দিয়ে যদি বাড়ী হইতে না তাড়াই, তবে আমি রাম ঠাকুরের মেয়েই নয়! গোপনে একটা মাগী রাখিয়াছিল,—এখন সে মরে গেছে, অলপ্পেয়ে মিন্সে তার মায়া কাটাতে না পারে মুণ্ডুটা এনে ঘরের ভিতর রেখেছে, আর নিত্যি নিত্যি তাই দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করেন। বাড়ী আসুক, এবার এম্‌নি ঠাণ্ডাই কোর্‌ব, তা আমার মনেই জান্‌ছে।" ব্রাহ্মণী এইরূপে গর্জ্জিয়া মুণ্ডুটি লইয়া গিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা দুর্গন্ধময় নর্দ্দমায় ফেলিয়া আসিয়া শয়নকক্ষে উপবেশন করিল। তাহার গা যেন কিঞ্চিৎ পাতলা হইল।

বিধির নির্ব্বন্ধ। ঠিক সেই সময়েই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিয়াই মুণ্ড দেখিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীর মনোভাব অবগত হইয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন,—

"সেগুড়ে বালি! তোমার বড় সাধের পিরীতের আমি কি দশা করিয়াছি, দেখ্‌গে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সেই পুতিগন্ধময় নর্দ্দমার নিকট উপনীত হইয়া নরকপালের ভবিতব্য প্রত্যক্ষ করাইলেন। ব্রাহ্মণ এত দিনের পরে "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" দেখিয়া সুস্থ হইলেন।

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

চুরির সমান বিদ্যা নাই, এক রাত্রেই বড়লোক হওয়া যায়। একদা রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্নের সভায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, চৌষট্টি বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। মহাকবি কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,— "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।" চুরিতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যদি না থাকিত, তবে ইহার তুল্য বিদ্যা সংসারে আর নাই। চোর যত দিন ধরা না পড়ে। তত দিন তাহার পসার প্রতিপত্তি অটুট থাকে, ধরা পড়িলেই তাহার 'ভারিভুরি' সব "মাত্" হইয়া যায়।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।

অর্থোপার্জ্জনের যত উপায় আছে, তন্মধ্যে বাণিজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতে সমস্ত জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাণিজ্য দ্বারাই তাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিয়াছেন। যে বৃটীশ সিংহ আজ ছত্রিশ কোটী বাঙ্গালীর দণ্ড মুণ্ডের বিধাতারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা প্রথমে বণিকবেশেই ভারতে পদার্পণ করেন।

পুরাকালের সংস্কৃত ভাবাভিজ্ঞ কবি বলিয়া গিয়াছেন,—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবনৈবচ॥"

কবিরায় গুণাকর 'অন্নদা মঙ্গলে' 'শিবের ভিক্ষায়' ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। গৌরী কহিতেছেন,—

"শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
কি করিব একা ঘরে রয়ে।

বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই,
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিণী কেন,
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীগণে, ধন ধন ঝন ঝনে,
আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই॥
"বাণিজ্য লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ,
রাজ.সেবা কত খচ মচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈব নৈবচ॥"

কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।

কাকও কৃষ্ণবর্ণ, কোকিলও কৃষ্ণ বর্ণ, কিন্তু তাহাদের পার্থক্য কেবল স্বরের দ্বারাই অনুভব করা যায়। বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে কোকিলের কূজনে বিরহিদিগের বিরহ বেদনা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, আর কাকের কর্কশ শব্দে প্রাণমন উত্যক্ত হইয়া উঠে। কোন কবি বলিয়াছেন,—

"কাকঃ কৃষ্ণ পিকঃ কৃষ্ণ স্তভেদ.পিককাকয়োঃ
আয়াতা মধুযামিন্যঃ কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥"

কাক ও কোকিল উভয়েই কৃষ্ণ বর্ণ, উহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বসন্তকাল আসিলে তাহাদের বিভিন্নতা উপলব্ধ করা যায়। বাসন্তী রজনীতে যে কাক সে কাকই থাকে, এবং যে কোকিল সে কোকিলই থাকে।

আদরে ভোজন কি করে ব্যঞ্জন।

নিমন্ত্রণ প্রথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে বা আমোদ বাসরে অনেকেই বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আগমন করিলে যে, তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিতে হয়, তাহা না বলিলেও চলে। যথা রীতি অভ্যর্থনা না করিলে সুমিষ্ট ভোজ্যও বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। অল্প লোকেই 'পেট পুরিয়া চিনি সন্দেস খাইতে পাইব' ভাবিয়া নিমন্ত্রণে যান। সকলেরই মুখ্য

উদ্দেশ্য দশ জনের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়িত করা। এই আদর অভ্যর্থনায় খাদ্যের দরিদ্রতা ঢাকিয়া যায়। আদর করিয়া শাকান্ন প্রদান করিলেও অমৃত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই ইহা মনে রাখেন না। নিজাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি ফিরিয়াও চান না। এই সম্বন্ধে একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

বিদুরের খুদ।

ব্যাস-সন্তান মহাত্মা বিদুর প্রাক্তন অভিসম্পাতে শূদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, বিদুর কৃষ্ণৈকপ্রাণ; ভ্রমেও কোন দিন অধর্ম্মাচারণ করেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আপোষে মিটাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আগমন করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে হতাদর করেন। পরে আহারের নিমিত্ত রাজ-ভোগ উপস্থিত করিলে, ভগবান অশ্রদ্ধায় দত্ত বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া, বিদুরের আবাসে যাইয়া সভক্তিপ্রদত্ত তাঁহার খুদের 'জাউ' খাইয়া পরিতৃপ্ত হন।

গতস্য শোচনা নাস্তি।

অদ্যাবধি কেহই বিধিলিপি খণ্ডন করিতে পারে নাই। সুখ দুঃখ সততই কালচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালই প্রাণী প্রসব করিয়া থাকে এবং কালই তাহাকে গ্রাস করে। কাল সমস্ত জীবের পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং কালই তাহা উপশম করে। সংসারের মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই কালের অধীন। এই কালবশে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে, পরে তজ্জন্য শোক প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত ভাবিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিলুপ্তচেতন হন। সঞ্জয় তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অন্যান্য কথার সহিত বলেন,—"অনেক শাস্ত্রবিৎ কবিরা পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত বর্ণনাকালীন বৃহৎবল, ধৃষ্টকেতু, চপল, ধূর্ত্ত, মহাপুরাণ সম্ভাব্য প্রভৃতি ব্রজেশ্বরগণের অসাধারণ বল, খ্যাতি, ঔদার্য্য, অকাপট্য, সত্য, পবিত্রতা, দয়া প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিবিধ সদ্‌গুণযুক্ত হইয়াও যখন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তখন আপনার অসদাশয়, লোভশীল, ক্রোধপরায়ণ পুত্রগণ সমরক্ষেত্রে

চিরনিদ্রাভিভূত হইয়াছে বলিয়া এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? বিশেষতঃ আপনি সুবোধ এবং সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির শোক করা উচিত নয়। আপনি দৈবের প্রসাদ ও বৈমুখ্যের অস্থিরতা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পূর্ব্বে বিশেষ প্রতিবিধান চেষ্টা করিলেও যাহা ঘটিবার তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব "পশ্চাত্তাপ অনুচিত।" তথাহি,—

"কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাম্মতং॥"

মৃত ব্যক্তির যেমন আর মৃত্যু নাই, কৃত কর্ম্মের সেইরূপ আর করণ নাই। অথচ গত বিষয়েরও শোচনা নাই, ইহা বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মত।

মান্ধাতার আমল।

কোন কার্য্য বিলম্বে নিষ্পন্ন হইতে দেখিলে বা কোন কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইলে লোক বলিয়া, "মান্ধাতার আমলে গিয়াছিলে, আর এই কলিকালে ইংরেজ আমলে ফিরিলে", কিন্তু অনেকেই এই মান্ধাতা কে তাহা জানেন না। মান্ধাতার আমল বলিলে যেমন অতি প্রাচীন কাল বুঝায়, মান্ধাতার পরিচয় জানিতে পারিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মান্ধাতা প্রকৃতই অতি প্রাচীনকালে রাজ্য শাসন করিতেন।

ইক্ষ্বাকুবংশ সম্ভূত রাজা যুবনাশ্ব অপুত্রত্ব নিবন্ধন অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে বাস করিতেন। কিয়দ্দিবস পর মুনিগণ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাজার পুত্রোৎপাদনার্থ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইলে মুনিগণ বেদীমধ্যে মন্ত্রপূত সলিল রাখিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। অনন্তর রাজা যুবনাশ্ব অত্যন্ত তৃষিত হইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া বেদীমধ্যে জল দেখিতে পাইলেন। তিনি মুনিগণকে নিদ্রাভিভূত অবলোকনে তাঁহাদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া সেই মন্ত্রপূত জল পান করিলেন। পরে মুনিগণ জাগ্রত হইয়া জল না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মন্ত্রপূত উদক কে পান করিয়াছে? "উহা রাজা যুবনাশ্বের পত্নীর জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। উহা পান করিলে রাণীর এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইবে।" মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন,—"প্রভো! আমি না জানিয়া জলপান করিয়াছি। "মুনিগণের

কথা অব্যর্থ হয় না। তখনি যুবনাশ্বের গর্ভ সম্ভব হইল এবং দশমাস পর রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া পুত্র বহির্গত হইল কিন্তু রাজা মরিলেন না।

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে মুনিগণ বলিলেন,—"এ শিশু কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া প্রাণধারণ করিবে?"

অনন্তর ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, এই বালক আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে। এই কারণে বালকের নাম মান্ধাতা হইল। দেবরাজ ঐ বালকের মুখে স্বীয় অঙ্গুলি ধরিলেন, বালক ঐ অঙ্গুলি চুষিতে লাগিল। ঐ অমৃত নিস্যন্দিনী অঙ্গুলির রসপান করিয়া বালক বর্দ্ধিত হন এবং পরে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে,—"সূর্য্য যে স্থান হইতে উদিত ও যে স্থানে অস্ত যান তৎ অন্তর্গত সমুদয় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ব বংশীয় রাজা মান্ধাতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইত।" (১)

আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

আত্মাকে সতত রক্ষা করিবে। আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধনের একমাত্র উপায়। আত্মঘাতীর আর কোন কালে উদ্ধার নাই।

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন ভূমিষ্ট হইয়াই গর্দ্দভের ন্যায় রোদন ও শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়স সকল প্রতিশব্দ করিয়া উঠিল। ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত বহিতে আরম্ভ করিল। দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ হইতে লাগিল।

এই সকল অদ্ভুত ভীষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইলেন এবং ভীষ্ম ও বিদুর প্রভৃতি সমস্ত কৌরবদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। সকলে একত্রিত হইলে বিদুর বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজন্! আপনার এই পুত্র ভূমিষ্ট হইবামাত্রই অমঙ্গল সূচক নিমিত্ত উপস্থিত হইল দেখিয়া

---

(১) অথাগম্য দেবরাজত্রবীৎ মাময়ংধাস্যতীতি। ততো মান্ধাতা নামতো হভবৎ। বক্তে চাস্য প্রদেশিনী দেবরাজেন ন্যস্তাতাংপপৌ। তাঞ্চামৃতস্রাবিণীমাসাদ্য পীত্বা চাহ্নৈব ব্যবর্দ্ধত। সতু মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপাং মহীং বুভুজে। ভবিত চাত্র শ্লোকঃ।

"যাবৎ সূর্য্য উদিতেস্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণঃ, ৪র্থ অংশ।

বোধ হইতেছে, ইহা হইতেই আপনার বংশ নাশ হইবে। যদি কুলের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে ইহাকে পরিত্যাগ করেন। প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই মহৎ বিপদ ঘটিবে। যদি এই একটিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি বংশ ও জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে একশত হইতে আপনার একোনশত সন্তানই ভাল। কথিত আছে,—

"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদং স্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥"

বংশের মঙ্গলের নিমিত্ত পরিবারের একজন, গ্রামের উপকারের নিমিত্ত কুল, রাজ্যের হিতসাধনের নিমিত্ত গ্রাম এবং আপনার শুভ সম্পাদনের জন্য পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হয়। (১)

নিম্নলিখিত প্রবাদটিতেও আত্মরক্ষার নিমিত্ত উপদেশ দিতেছে।

আত্মানাং সততং রক্ষেৎ।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্য মধ্যে ভদ্রসেন নামক এক বণিক বাস করিত। ভদ্রসেনের সম্পদের অবধি না থাকিলেও সে বড় কৃপণ ছিল। কিয়দ্দিবস পরে তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র পুরন্দর পিতার বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যদৃচ্ছা দান করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর একদা তাহার প্রিয় সুহৃদ্ ধনদ বলিল যে, বণিক হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অর্থ ব্যয় করা তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে না। বণিকেরা কোন প্রকারে উপার্জ্জন করিবে, কিন্তু এক কড়াও খরচ করিবে না। বিপদকালে অর্থ দ্বারা উদ্ধার পাওয়া যায়। কথিত আছে,—

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানাং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥"

আপদের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা দারগণকে রক্ষা করিবে এবং দার ও ধন দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ।

আশ্রমস্তাগতা বেশ্যা ঋষ্য শৃঙ্গ ঋষেঃ সুতঃ।
তপস্বিন স্তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগৎ॥ (২)

নরপতি লোমপাদ বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশলে স্বরাজ্যে

(১) মহাভারত, আদিপর্ব্ব—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় প্রকাশিত। (২) বাশিষ্ঠ রামায়ণং।

আনয়ন করিবার মানসে তাহার নিকট বিচিত্র হাবভাব ও অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন কতিপয় বেশ্যা প্রেরণ করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অরণ্যবাসী, পিতা ব্যতীত সে পর্য্যন্ত কখনও দ্বিতীয় মনুষ্য দেখেন নাই। গতিকেই স্ত্রীত্ব পুংস্ত জ্ঞান তাঁহার ছিল না। তিনি আশ্রম সন্নিকটে লোমপাদ প্রেরিত নটীদিগকে অবলোকন করিয়া অতি তেজস্বী তপস্বী বলিয়া মনে করিলেন। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন, আশ্রমে আগতা সেই বেশ্যাদিগকে দর্শন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তাহাদিগকে তপস্বী জ্ঞান করিলেন। অতএব যে যেমন ব্যক্তি, তাহার চক্ষে পৃথিবীর সকলেই সেইরূপ প্রতীত হয়।

বিনা যুদ্ধেন কেশব।

যৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবপক্ষের হইয়া ভূমি প্রার্থনা করিলে, মদদর্পিত দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন,—

"সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাচমেদিনী।
তদৰ্দ্ধং নৈব দদ্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥" (১)

হে কেশব! সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমিভেদ হয়, তৎপরিমাণ ভূমিও আমি বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না।

নিরাখালের খোদা রাখাল।

এই প্রবাদটি যে দীন দুঃখী ব্যাধিগ্রস্ত উপায়হীন ব্যক্তিদিগের নিকট কত মূল্যবান, কত আদরের তাহা বলা যায় না। জগতে যদি কিছুতে সুখ থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মে। লোকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত ভীষণ ভীষণ পাপকার্য্য করিতেছে, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আবরণ আছে বলিয়া কেহ কিছু বলিতে পারে না। ধর্ম্মের আবরণ বড় কঠিন আবরণ; সে আবরণ ভেদ করা সহজ নয়। জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইলে, আদিব্যাধি নিবারণের সমস্ত উপায় নিষ্ফল হইলে, লোকে শান্তির জন্য কেবল একমাত্র শান্তিদাতা ভগবানের উপর নির্ভর করে। বিপদ্‌কালে স্বতই প্রাণ ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়, তাই বিপদ উপস্থিত হইলেই লোকে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকে। যখন জীবন-সংগ্রামে পরাভবের পর পরাভবে লোকের আশা অন্তর্হিত হয়, উৎসাহ ভগ্ন হয়, তখন লোকে 'নিরাখালের খোদা রাখাল' ভাবিয়া কত

(১) ভারত সাবিত্রী।

আনন্দ উপভোগ করে, দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি নিক্ষেপ করে। উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল ভবসাগরের কামকলুষময় ঝঞ্ঝাবাতে এ ক্ষীণ জীবন-তরণী নিমজ্জিত হইতে বসিলে, সংযত চিত্তে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের পবিত্র পাদপদ্ম ধ্যান করিলে মন কতই না সুস্থির হয়। তখন সত্যই মনে হয়—

'নিরাখালের খোদা রাখাল।'

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

স্বপনে।

কেন এলে হৃদি-কাননে!
কুড়াও না আর স্মৃতির মালায়
ঝরা ফুল বৃথা যতনে!
আজি আঁখিজল ঝরে অবিরল,
তোমারি লাগিয়া পরাণ বিকল,
সবি ফুরায়েছে, রেখেছি কেবল
তোমারি কাহিনী জীবনে!
অতীতের কথা জাগাও না আর,
চেওনা তৃষিত নয়নে!

তুমি পরাণ সঁপেছ তাহারে,—
তবে কেন বল আসিলে আবার,
আবার কাঁদাতে আমারে?
যে দিন গিয়াছে ফিরিবে না আর,
সে জোছনা নিশি আসিবে না আর,
খেলিবে না ছবি নয়নে তোমার,
বৃথা ডাকিও না আমারে!
কি হ'বে গো আর এ পোড়া হৃদয়
ভাসা'য়ে নয়ন-আসারে!

চলে যেতে দেরে অতীতে,—
শ্রান্ত হৃদের ত্যক্ত বাসনা
জাগাস্‌নে আজি নিশীথে!

ফুরায়েছে যাহা যাক্‌লো ফুরায়ে,
ঝরা ফুলগুলি এন না কুড়া'য়ে,
মিটে নাই যাহা সে সাধ পুরায়ে
পারিবে কি ভালবাসিতে ?
তুমিত দিয়াছ পরাণ অপরে
বৃথা আসিও না নিশীথে !

ত্যজিয়াছি সব বাসনা।—
তোর মালা গাছি ছিঁড়ে ফেলে দি'ছি,
শুকা'য়েছে যত সুখনা !
ভুলেছিনু তোরে, আবার কেনরে
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে বাঁধনের ডোরে,
বসিলি আসিয়া হৃদয়ের'পরে,
আবার কিসের কামনা ?
হতাশ সাগরে ভাসায়েছ মোরে,
পারি না সহিতে যাতনা !

শুধু অকারণ জীবনে,
বারেক আসিয়ে মিছে দেখা দিয়ে
ব্যথা দিওনাক মরমে !
নিরজনে বসি' কাটা'ব জীবন,
ছিঁড়িবরে তোর প্রেমের বাঁধন,
তুমি আজি হায় পরের জীবন,
বুক ফেটে যায় স্মরণে !
অকারণ আর কাঁদাতে আমারে
দেখা দিওনাক স্বপনে !

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যায় শাস্ত্র ভাষা পরিচ্ছেদ।

ন্যায় দুই—গৌতম কৃত ও কণাদ কৃত। কণাদ যে ন্যায় প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "বৈশেষিক দর্শন।" পূর্ব্বকালে নাস্তিকগণকে দমন করিবার

নিমিত্ত এই শাস্ত্রের অবতারণা। ন্যায় দর্শন অতিশয় দুরূহ। ইহা অধ্যয়ন করিলে আমাদের বিচার ও তর্ক বিতর্ক করিবার শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই জটিল শাস্ত্রের অভ্যন্তরে কি অমূল্যনিধি নিহিত আছে, অদ্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণকে প্রদান করিতেছি—

১। মঙ্গলাচরণঃ— "তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ
সংসার মহীরুহস্য বীজায়॥"

মঙ্গলাচরণ সম্বন্ধে মহর্ষি কপিল বলেন,—

"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি।"

ইহার অর্থ—শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি, এই তিন দ্বারা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির আছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ—সংসার রূপ বৃক্ষের বীজ স্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার। বিশদার্থ—যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, তদ্রূপ এই সংসারের বীজ অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ "কৃষ্ণ"। সেই কৃষ্ণকে নমস্কার। এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ দর্শিত হইতেছে। যেমন "ঘট" বলিলে তাহার একজন কর্ত্তা আছে বলিয়া অনুমান হয়, সেইরূপ ক্ষিতি অঙ্কুরাদিরও একজন কর্ত্তা আছে তাহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু সে কর্ত্তৃত্ব মানবে সম্ভবে না। অতএব এবম্বিধ কর্ত্তৃত্ব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

২। পদার্থঃ—ন্যায়মতে পদার্থ সাতটী, যথাঃ—(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) সবিশেষক, (৬) সমবায়, (৭) অভাব। নৈয়ায়িকগণ ইহার অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন না। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "পদার্থ ও দ্রব্য এই দুইটীর মধ্যে প্রভেদ কি?" সহৃদয় পাঠকগণের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইলে পরমাহ্লাদিত হইব।

৩। দ্রব্যঃ—দ্রব্য নয়টী, যথাঃ—(১) পৃথিবী, (২) জল, (৩) তেজ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল, (৭) আশা, (৮) আত্মা, (৯) মন।

৪। গুণঃ—সর্ব্বশুদ্ধ গুণ ১৯টী, যথাঃ—(১) স্পর্শ, (২) সংখ্যা, (৩) পরিমিতি, (৪) সংযোগ, (৫) বিভাগ, (৬) পরত্ব, (৭) অপরত্ব, (৮) বুদ্ধি, (৯) সুখ, (১০) দুঃখ, (১১) ইচ্ছা, (১২) দ্বেষ, (১৩) যত্ন, (১৪) গুরুত্বক, (১৫) দ্রবত্ব, (১৬) স্নেহ, (১৭) সংস্কার, (১৮) অদৃষ্ট, (১৯) শব্দ।

৫। কর্ম্মঃ—কর্ম্ম পঞ্চবিধ, যথাঃ—(১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমন।

৬। কারণ :—কারণ তিন প্রকার, যথা :—(১) সমবায়, (২) উপাদান, (৩) নিমিত্ত। দৃষ্টান্ত,—"কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করিতেছে।" এ স্থলে কুম্ভকার=সমবায়। মৃত্তিকা=উপাদান। আর যে উদ্দেশ্যে ঘট নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার নাম নিমিত্ত কারণ। জগৎসৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণও বটে, উপাদান কারণও বটে। আর লূতা নিজ জাল নির্ম্মাণ বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃত উপাদান কারণ কি?" উত্তর—মায়া।

৭। ভূত :—ভূত পাঁচ প্রকার, যথাঃ—(১) পৃথিবী, (২) অপ্, (৩) তেজ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী স্পর্শ দ্বারা অনভূত হয়। প্রথম তিনটীর রূপবত্ব, দ্রবত্ব ও প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব এই তিনটী গুণ আছে। আর প্রথম দুইটীর গুরুত্ববত্ব ও রসবত্ব এই দুইটী গুণ দৃষ্ট হয়।

৮। রস :—মধুরাদি ভেদে রস ছয় প্রকার।

৯। গন্ধ :—সৌরভাসৌরভ ভেদে গন্ধ দুই প্রকার।

১০। পৃথিবী :—পৃথিবী নিত্যাও বটে, অনিত্যাও বটে। পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্যা, আর পৃথিবী যখন অবয়ব যোগিনী, তখন তাহাকে অনিত্যা বলা যায়।

১১। দেহ :—যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দেহ দুই প্রকার। যোনিজ দেহ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(১) জরায়ুজ, (২) অণ্ডজ। মনুষ্যাদির দেহ জরায়ুজ, আর সর্পাদির দেহ অণ্ডজ। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার দেহ আছে, তাহারা অযোনিজ—যেমন স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। কৃমিদংশাদির দেহ স্বেদজ আর তরু-গুল্মাদির দেহ উদ্ভিজ্জ। নারকীদিগের দেহও অযোনিজ।

১২। জল :—জলের মধুর রস, স্পর্শ শীতল ও বর্ণ শুক্ল। তেজের স্পর্শ উষ্ণ। বায়ুর দুইটী গুণ—স্পর্শ ও তির্য্যগগমন। আকাশের গুণ কেবল শব্দ।

১৩। কাল :—কাল জগতের আশ্রয় ও সমুদায় জন্য বস্তুর জনক।

১৪। আত্মা :—আত্মা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। চৈতন্য অভাবে শরীরের কর্ত্তৃত্ব নাই। শরীরের চৈতন্য যদি থাকিত, তাহা হইলে মৃত শরীরেও থাকিত। তাহা যখন থাকে না, তখন শরীরের চৈতন্য কল্পনা করা ন্যায়-সঙ্গত নহে। শরীর কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়।

যেমন রথকর্ম্ম দ্বারা সারথির অনুমান হয়, তদ্রূপ আত্মকর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মার অনুমান হয়। আত্মা হইতেই অহঙ্কার জন্মে, কিন্তু শরীর হইতে নহে।

১৫। বুদ্ধিঃ—অনুভূতি ও স্মৃতি ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। অনুভূতি চারি প্রকার, যথা :—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমিতি, (৩) উপমিতি, (৪) শব্দজ।

১৬। মন :—সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, মতি (জ্ঞান) ও কৃতি (যত্ন) এই কয়েকটী মনের ধর্ম্ম।

১৭। সুখ :—সুখ জগতের একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইহা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৮। দুঃখ :—অধর্ম্ম হইতে ইহার উৎপত্তি।

১৯। ইচ্ছাঃ—ইচ্ছা দ্বিবিধা, যথা :—(১) ফলবিষয়িণী,(২)উপায় বিষয়ণী।

২০। প্রযত্নঃ—ইহা তিন প্রকার, যথা :—(১) প্রবৃত্তি, (২) নিবৃত্তি, (৩) জীবনযোনি। নিবৃত্তি দ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয়।

২১। গুরুত্বঃ—ইহা অতীন্দ্রিয়। ইহার কার্য্য পতন।

২২। প্রবত্বঃ—দুই প্রকার, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলের প্রবত্ব সাংসিদ্ধিক এবং ক্ষিতি ও তেজের প্রবত্ব নৈমিত্তিক।

২৩। স্নেহঃ—দুই প্রকার, উৎকৃষ্ণ ও অপকৃষ্ণ। যাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার নাম উৎকৃষ্ণ স্নেহ, যেমন তৈল। আর যাহা দ্বরা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহার নাম অপকৃষ্ট স্নেহ, যেমন জল।

২৪। সংস্কারঃ—তিন প্রকার, যথা :—(১) বেগ, (২) ভাবনা, (৩) স্থিতিস্থাপক।

২৫। ধর্ম্মঃ—গঙ্গাস্নাদি যাগাদির নাম ধর্ম্ম। ইহা স্বর্গাদির কারণ।

২৬। অধর্ম্ম—নিন্দিত কর্ম্মজ। ইহা নরকাদির হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনা হইতে জন্মে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়।

২৭। শব্দঃ—দুই প্রকার, যথা :—(১) ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনি মৃদঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন হয় আর বর্ণ কণ্ঠ সংযোগাদি জন্য। শব্দ কেবল আকাশের গুণ।

শ্রীশশিভূষণ রায়, বি, এ।

জাল প্রতাপ চাঁদ।

বর্দ্ধমানের জাল রাজা অনেক দিন মরিয়াছেন, কিন্তু লোকে আজিও তাঁহাকে ভুলে নাই। যাঁহারা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত জাল রাজার কথা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি লোকের মনে কিরূপ আধিপত্য স্থাপন

করিয়াছিলেন। তিনিই বর্দ্ধমানের প্রকৃত রাজা, অবিচারে রাজ্য পাইতেছেন না, শুদ্ধ ইহা ভাবিয়া লোকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, তাহা নহে; লোকে তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিত। অনেকে তাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গের অভেদাত্মা মনে করিত। সেই জন্যই জাল রাজা শেষ বয়সে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন—লোকের পূজা পাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের লীলা প্রকাশার্থে যেমন চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, প্রতাপ চাঁদের লীলা সম্বন্ধে তেমনই একখানি পুস্তক রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের নাম "প্রতাপচন্দ্র লীলা রস প্রসঙ্গ সঙ্গীত"।* গ্রন্থ রচয়িতার নাম অনুপচন্দ্র দত্ত। নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ বাবু দুর্গামঙ্গল দাসের আজ্ঞায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে, ১২৫০ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থের শেষে রচয়িতা লিখিতেছেন, "ইতি অনাগত প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত। বিরচিতং শ্রীঅনুপদত্ত উগ্রক্ষত্রিয়কুলজাত শ্যামসুন্দর দত্তাঙ্গজ মৃত্যুঞ্জয় জনক কনিষ্ঠ গোপাল, ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদাস ধনঞ্জয় বিশ্বজয় শ্রীখণ্ডবাম বসতিং। * * * শকাব্দা ১৭৬৫। আনন্দনামা বর্ষ ১২৫০। ১৩ মার্গশীর্ষেতু ত্রয়োদশ দিবসীয় সোমষষ্ঠী নক্ষত্র শ্রবণা দিবা দ্বিপ্রহর।"

জাল রাজা ১৮৫২ কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে প্রাণত্যাগ করেন † গ্রন্থ রচনা হয় ১২৫০ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়, গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্রের একজন চেলা ছিলেন। শ্রীখণ্ডে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল, গতিবিধিও খুব ছিল। সুতরাং অনুপচন্দ্রের কথায় অনেকটা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। তবে তিনি প্রতাপ চাঁদের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবার যত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার রাজনৈতিক লীলা বর্ণনার ততটা চেষ্টা করেন নাই। তথাপি এই গ্রন্থে রাজনৈতিক কথা যাহা আছে, সজীব

* বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে এই গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ, নচেৎ তিনিই এই প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি লিখিলে প্রবন্ধ কিরূপ উপাদেয় হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, তাঁহার দয়ার জন্য তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিতেছি। বীঃ সঃ।

† জাল প্রতাপ চাঁদ, ৩য় সংস্করণ—১৮২ পৃষ্ঠা।

বাবু 'জাল প্রতাপচাঁদ লিখিবার সময় যদি তাহা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ আরও উপাদেয় হইত। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ভগবান ম্লেচ্ছ বিনাশের জন্য ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রতাপচন্দ্র নামে বর্দ্ধমানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই জন্য গ্রন্থের অনেক স্থানে ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে সেই সকল কথা উল্লেখ করিব।

জন্ম ও শৈশব।

প্রতাপের জন্মদিনেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

রাণী অঙ্গে হস্ত দিয়া ধাত্রী কয় কথা।
নেহার আপন পুত্র অগো রাজমাতা॥
একবার দ্বিতীয় বার ডাকি তিন বার।
উত্তর না পাই মনে করিল বিচার॥
যোড়হাত ভূপতিরে জানাই সংবাদ।
শ্রুত মাত্র রাজপুরে হরিষে বিষাদ॥
শুভতে অশুভ হবে জানেন রাজন।
মনে মনে মনোদুঃখ করি নিবারণ॥
সুতিকাগারের মধ্যে বসি মহীপাল।
একদৃষ্টে রাণীমুখ করয়ে নেহাল॥
পূর্ব্ব উক্ত* স্মরিয়া বিলাপ অতিশয়।
বিধির বঞ্চনা বিনা বিপদ কোথা হয়॥
রাণীর অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া বিধিমতে করি।
সুতিকাগারেতে বাস শোক পরিহরি॥

রাজমাতা বিষ্ণুকুমারী প্রতাপকে লালন পালন করেন।

রাজমাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী।
দিব্য চক্ষু বিকশিত সন্তানে নেহারি॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিচারিল মনে।
দ্বিবাহু পসারি ক্রোড়ে তোলেন সন্তানে॥

* এক সন্ন্যাসী (গ্রন্থকার বলেন, স্বয়ং ভগবান) তেজচাঁদ বাহাদুরকে বলেন যে, তাঁহার প্রতাপবান এক পুত্র হইবে। মহারাণীও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেন।

আনন্দে পূর্ণিত অঙ্গ আঁখি ছল ছল।
স্নেহে পুলকিত চুম্বে বদনকমল ॥
রাণীর ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
পূর্ব্বেতে যশোদা রাণী ছিলেন নিশ্চয় ॥
অবিরত লালন পালনে দিয়া মন।
শুভক্ষণে করাইলেন শুভান্নপ্রাশন ॥

প্রতাপচন্দ্র শৈশবকাল কাল্‌নায় অতিবাহিত করেন।

বর্ষ এক পরে রাণী বিচারি মনে মন।
বালকে লইয়া যান অম্বিকা ভুবন ॥
ক্রমে পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত তথা বাস।
নগরবালক সঙ্গে ক্রীড়াতে উল্লাস ॥

তাহার পর তিনি কখন বর্দ্ধমানে, কখন কাল্‌নায় থাকিতেন।

কভুদিন বর্দ্ধমান কভু:অম্বিকায়।
দ্বাদশ বৎসর গত এই মত হয় ॥

বৃদ্ধা রাজমাতা নিজের যাহা স্ত্রীধন, তাহা প্রতাপচন্দ্রকে দান করেন।

যত ছিল মহারাণীর রাজত্ব বৈভব।
প্রবাল প্রস্তর হীরা আদি সব ॥
প্রতাপচন্দ্রে দিয়া দান দান পত্র লিখি।
ইংলণ্ডাধিপতির কর্ম্মকারকেরা সাক্ষী ॥

চতুর্দ্দশ বৎসরের পর প্রতাপের উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া বিবাহ হয়। কন্যার নাম প্যারীকুমারী, পঞ্চানন বাবুর দুহিতা। কিছুদিন পরে বাবু গোপালচন্দ্রের কন্যার সহিত তাঁহার আবার বিবাহ হয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন প্যারীকুমারী শ্রীমতী রাধা আর গোপালচন্দ্রের কন্যা চন্দ্রাবলী।

গ্রন্থকার প্রথম হইতে বলিতেছেন ম্লেচ্ছ বিনাশের জন্য ভগবান প্রতাপচন্দ্র নাম ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহণ করেন। ইংরাজ রাজত্বে অন্যায় বিচার নানারূপ হইতেছে; সেই সকল নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার আর্য্যধর্ম্ম প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। এই চতুর্দ্দশ বৎসরে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে নানা কার্য্য করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতাপের এই সকল কথা জানিতে পারেন। বোধ হয়, সেইজন্য ফিরিয়া আসিলে তাঁহার এত লাঞ্ছনা

হয়। মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, প্রতাপচন্দ্র "তাম্ররাজ নিধন কারণ।" ভক্তগণ এক সময় ভগবানের নিকট কলির অত্যাচার প্রতিকার প্রার্থনা করিলে,

সদয় সচ্চিদানন্দ প্রবন্ধ বচনে।
প্রবোধ করেন ভক্ত বিচারিয়া মনে ॥
কলির কল্পের ভোগ স্বল্প দিন আর।
ইতিমধ্যে হইব আমি পুনঃ অবতার ॥
মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমানবাসী।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কত পুণ্যরাশি রাশি ॥
মনোবাঞ্ছা পূরাইব হইব অঙ্গজ।
শাসিব সকল পৃথ্বী সহিত বঙ্গজ ॥

* * * *

উগ্রাধিপতি শ্রীমান রণজিত রাজন।
বহুসৈন্য বেষ্টিত আছয়ে সেই জন ॥
বর্দ্ধমান রাজধানীর প্রাপ্তির বিলম্বে।
আসিবে সিংহের সৈন্য সেই অবলম্বে।
ম্লেচ্ছ দলন হেতু সেই মহাজন।
সখা প্রিয়তম সঙ্গে হইবে মিলন ॥

সঞ্জীব বাবুও "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

"লোকে বলে তিনি (প্রতাপ চাঁদ) ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। গল্প আছে কোন একজন ইংরাজকে বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সার্বেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে ধোপা নাপিতের ছেলেরাই সিবিলসার্বেণ্ট হইয়া এদেশে আসে, এবং তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টর সাহেব সেই সময়ে তাঁহার বগি এক পার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি এইরূপ একটা সামান্য ক্রটী করিয়াছিলেন। প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে তাঁহার নামে সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট

হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টদের উপর ছিল।"

যাহা হউক, ইংরাজের উপর যে প্রতাপচাঁদের বিদ্বেষ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য তিনি যে নানা চেষ্টা করিবেন, তাহা অসম্ভব নয়। মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার সহিত গোপনে একদিন দেখা করিয়া অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ করেন।*

যবন কুলেতে লোক নবাব খেয়াতি।
মুরশিদাবাদ মধ্যে যাহার বসতি॥
পূর্ব্ব পরিকর ভক্ত পরমাংশ জানি।
তার সঙ্গে ভেটিব মনেতে অনুমানি॥
রাজবেশ উপযুক্ত পাত্র করি সঙ্গে।
তরণী বাহনে উত্তরেন নানা রঙ্গে॥
ভাগীরথী কুলেতে মিলন দুইজনে।
করে কর দিয়া চলে বসি একাসনে॥
জগৎ শাসন হেতু করিয়া মন্ত্রণা।
প্রজাগণ শুনি যাথে ঘুচিবে যন্ত্রণা॥
ম্লেচ্ছ দলনে দোঁহার ইচ্ছা অতিশয়।
সাত পাঁচ বিচারিয়া হইল উদয়॥
শিশিরান্তে হেমন্ত ঋতুর আগমন।
শুভযোগ যেই দিন হবে শুভক্ষণ॥
উভয়েতে এক বাক্য স্থিরতা হইল।
উভয়ের মন কথা মনেতে রহিল।
উভয়েতে ভণ্ড মৃত্যু করিব প্রকাশ।
নূন্যাধিক্য দণ্ড পল নহিব নির্য্যাস॥
স্থির করি বর্দ্ধমান পুনঃ আগমন।
শুনিলেন মহারাজ সব বিবরণ॥

প্রতাপচাঁদ নিজের একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

* সঞ্জীব বাবুর পুস্তকে এ কথার উল্লেখ নাই।

প্রতাপচন্দ্র প্রতিনিধি চিত্রের প্রতিমা।
ফিরিঙ্গি নক্কাশ আনি নির্ম্মাইল সীমা॥

সঞ্জীব বাবু বলেন, চিনারি নামে একজন সাহেব এই চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

তাহার পর প্রতাপ একবার কলিকাতা গমন করেন।

পিতার প্রবোধ দিয়া কলিকাতা প্রবেশিয়া
করিলেন কালী দরশন।
মনের মানস যত পূরাইব মনোমত
করপুটে করিয়া স্তবন॥

* * * *

মুলুকের কর্ত্তা লাট তার সঙ্গে রঙ্গ নাট
কত ঘাটি করিয়া বন্ধন।
ম্লেচ্ছ তোষণ করি বাইশ শিরোপা হরি
শ্রীহস্তেতে করিলেন গ্রহণ॥

* * * *

রাখিতে রাজ্য শাসন, আইল অষ্টম কানুন
নিজ রাজ্যে করিলেন জারি।
ফিরিঙ্গির গোল ঘর দেখিবেন নরেশ্বর
এই ইচ্ছা হইল যে ভারি॥
সঙ্কেত করিয়া সাটে কহেন ম্লেচ্ছ লাটে,
যাব ঘর দেখিব কেমন।
কে আমার সঙ্গে যাবে কার ঘর কে দেখাবে
কে জানাবে সব বিবরণ॥
শুনিয়া ম্লেচ্ছ লাট আগুসরি বহিবাট
লয়ে যায় ঘরের ভিতর।
তার মাঝে সাহি তক্ত দেখিয়া করেন উক্ত
কে বসিবে এ তক্ত উপর॥
লাট বলে মহারাজ লক্ষ তঙ্কা অব্যাজ
যেবা দিবে বসিবে এক দণ্ড।

সত্য সগুণ করি ইংলণ্ড অধিকারী
রচিয়াছেন নিয়ম অখণ্ড ॥

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অজ্ঞাতবাসের কল্পনা করেন।

মগধ তৈলঙ্গ কাশী কামিখ্যা উৎকলবাসী
স্বপ্রদেশী যত বুধগণ।
ছল করি পত্র দিয়া আনিলেন আমন্ত্রিয়া
অজ্ঞাতের ব্যবস্থা কারণ ॥
অখাদ্য ভোজন আর অগম্য গমন যার
অপেয় পানাদি পাপ জন্য।
অতিশয় মনস্তাপ কিসে ধ্বংস হয় পাপ
এই পরিচয় নহে অন্য ॥
বিচারেণ বুধগণ তৎপাপ মোচন
হয় করে পরণানু কল্প।
যদি বর্ষ চতুর্দ্দশ করিয়া অজ্ঞাতবাস
ভণ্ড মৃত্যু প্রকাশয় স্বল্প।
এই বিধি জানি স্থির বিচার করেন ধীর,
মনে মনে শুধিব অন্তরে।
সময় নিকট জানি ভাবিলেন চক্রপাণি
রোগ ছলে যাব গঙ্গা তীরে ॥
সৃজন বিকার জ্বর বুঝি ভাব নৃপবর
চিকিৎসক কবিরাজে ডাকি।
নাড়ী ধরি নির্ব্বাচিল মৃত্যুরোগ উপজিল
জীবের অগোচর এই ফাঁকি ॥

পীড়া সঙ্কট দেখিয়া চিকিৎসকেরা গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন।

শিবিকার বার ধরি বহুত বিলাপ করি
রাণীগণ করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া মৃদুভাষে চলিলেন গঙ্গাবাসে
শোকাকুল পুরবাসিগণ ॥
উত্তরিলেন অম্বিকায় আবাল বৃদ্ধ যুবা ধায়,
রূপ করিবারে দরশন।

আকুল নগরবাসী পুরুষ প্রকৃতি আশি
সবে করে হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥
জাহ্নবীর তট জুরি তম্বু কানাতে ঘেরি
তার মধ্যে পাতিয়া আসন।
বসিলেন করি ছল হরি ভকত বৎসল
সবার মন করিয়া হরণ ॥
ঘেরা পরদা চতুর্ভিত গেলা জলে আচম্বিত
দণ্ডাইয়া করি নানা স্তব।
অন্তরীক্ষে গঙ্গাদেবী আসিয়া চরণ সেবি
তুলিলেন করিয়া গৌরব ॥
নিকটে পরাণ চন্দ্র গোসাঁই ব্রহ্মানন্দ
দোঁহাকারে কহেন বচন।
যে রাজ্যের আমি রাজা ত্রিলোকেতে করে পূজা
সেই রাজ্যে আমার গমন ॥
এরাজ্যের রাজ্য কাজ কিয়ৎকাল অব্যাজ
পিতা পুত্রে কর অধিকার।
পূর্ব্বের পুণ্যের বলে কিয়ৎকাল কুতূহলে
কর ভোগ বাঞ্ছা যত যার ॥
একথা স্মরণ রবে বিস্মরণ না হইবে
তবে পাবে সম্পদ বিস্তর।
কহিলাম সতন্তর সাক্ষী গঙ্গা দিবাকর
গোসাঁই ব্রহ্মানন্দের গোচর ॥
ধীরাজ মহারাজ নরেন্দ্র নরের মাঝ
থাকিবেন দীপ্ত যত কাল।
অনুগত হবে সবে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমভাবে
সন্তোষে রাখিবে মহীপাল ॥
অধর্ম্ম সঞ্চার যবে জাতি কুল সব যাবে
লোক মাঝে পাবে বহু লাজ।
প্রাণ লইয়া টানা টানি পাবে এই শাস্তি জানি
পদচ্যুত হবে এই রাজ ॥

যার রাজ্য সেই লবে নিকাশে আটক হবে
নাহি গতি বিনা সে শরণ ।
শুনি বাক্য সুকৌশল ভয়ে তরল বিরল
জোড় হাতে করিল স্তবন ॥
অন্তর্গঙ্গা জানি তায় করিলেন মহাকায়
ক্ষণেক হইয়া সচেতন ।
দিবা দণ্ড দশ হয় উঠি বসি হাসি পায়
ক্ষৌর কর্ম্ম করিবারে মন ॥
ঈষৎ ইঙ্গিত হয় নন্দসুন্দর আসি তায়
ক্ষৌর কর্ম্ম করি সমাপন ।
হরিদ্রা আমলকি মাখি স্নান করি কহেন ডাকি
উপহার করিব ভোজন ॥
ওলা মিছরী শর্কর সরবত স্বতন্তর
তরমুজ শ্রীফল দাড়িম্ব ।
হরীতকী ত্বক ছানি সুধা মকরন্দ আনি
তাহাতে মিশ্রিত অবলম্ব ।
সর ছানা রসে ছাঁকা মনক্কা মাথন মাখা
নানা জাতি মোরব্বা পকান্ন ।
সাজাইয়া থরে থর পরিকর জোড় কর
সম্মুখে দণ্ডায় পাতি কর্ণ ॥
যথা ইচ্ছা আহুতি করি পরি যঙ্গ উপরি
বসিলেন মন কুতূহলী ।
দেখি তায় চমৎকার হর্ষচিত্ত সবাকার
পরাণ চন্দ্র* করে কৃতাঞ্জলি ॥

* * * * * *

দ্বিবচন ভাবার্থ বিচার করি যথার্থ
প্রত্যুত্তর না করেন হরি ।
পুনঃ আগমন হবে দুষ্ট খল শাস্তি পাবে
মনেতে মন্ত্রণা এই করি ॥

* মহাতাপ চাঁদের পিতা ।

দিবা হয় অবসান দেখি মুখ ম্রিয়মাণ,
অনুমানি পরিকরগণ।
সবে করে কানা কানি কপালে আঘাত হানি
না জানি কি ঘটে বিড়ম্বন॥
পূর্ব্বের নিয়ম কাল উপস্থিত সেই কাল
উনিলেন (?) দ্রবময়ী জলে।
উত্তরাস্য দাঁড়াইয়া চকিত অচেন হৈয়া
ডুবিলেন মায়া করি ছলে॥
ঘেরা পরদা পার হইয়া ধনু শতান্তর গিয়া
উঠিলেন তরণী বিরলে।
কেহ না দেখিতে পারে হাহাকার শব্দ করে
ইতি উতি তপাশিয়া বুলে॥
না পাইয়া সন্ধান ভাবে বুঝি গেল প্রাণ
পরাণের পরাণ সংশয়।
ব্রহ্মানন্দ কহে বসি শিরে হাত দিয়া বসি
বলে বল কি হবে উপায়॥
একথা হইলে গোল ভূপতি শুনিবে বোল
সবংশে গাড়িবে একথাদে।
করিলে নানা সন্ধান তবু যদি বাঁচে প্রাণ
তবু অপমান অপবাদে॥
কিসে দায় রক্ষা হয় কর গোসাঁই সে উপায়
পড়িলাম বিষম সঙ্কটে।
দেখি শুনি ব্রহ্মানন্দ অন্তরেতে নিরানন্দ
সৃজিল উপায় নিজ ঘটে॥
কাষ্ঠের সিন্ধুক এক ত্বরা করি আনিলেক
আর এক বাজনিয়া শঙ্খ।
সে শঙ্খ সিন্ধুকে রাখি সিন্ধুক কম্বলে ঢাকি
লেপন করিল তায় পঙ্ক॥
অগ্নি দিয়া জ্বালাইল মৃতদাহ গন্ধ হইল
পরাণের প্রাণ হইল স্থির।

প্রবঞ্চক শবদাহ না জানিল অন্য কেহ
প্রাতঃকালে উদয় মিহির ॥
নিরঞ্জন সমাধান ঝিল করি নির্ব্বাণ
সজল নয়নে সবে চলি।
দিবানিশি শোকে ভাসি অম্বিকা নগরবাসী
আবাল বৃদ্ধ বিরহে ব্যাকুলী ॥

শবদাহ হইল, কিন্তু লোকে কানাকানি করিতে লাগিল, প্রতাপ জীবিত আছেন।

মৃত্যু হওয়া মিথ্যাবাণী প্রতাপচন্দ্র আছে জানি
পরস্পর কিংবদন্তী হয়।
বিচারিয়া বিজ্ঞ লোক তৎকাল পাসরে শোক
মধ্যে মধ্যে কানাকানি কয় ॥
পরাণচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কপট শোকে নিরানন্দ
মনোদুঃখে গিয়া রাজধানী।
মরণের বৃত্তান্ত . জানাইল আদ্য অন্ত
শোকে মগ্ন রাজার ভগিনী ॥
অনুগত লোক যত শোকেতে জীবন মৃত
বিরহেতে বধূ ঠাকুরাণী।
ঘটিল দশম দশা মুখে না নিঃসরে ভাষা
দোঁহাকার সংশয় পরাণী ॥
দীপক রাগিণী স্বরে কত না করুণা করে
ক্রন্দন করয়ে দিবানিশি।
প্রজ্জ্বলিত বৈশ্বানর দহিতেছে কলেবর
সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া পড়ে খসি ॥
ধৈর্য্য নাহি ধরে ধরা অধীরা না যায় ধরা
পাহাড় পাষাণ গলি যায়।
পশু পক্ষী ছিল যারা রোদন শুনিয়া তারা
ত্যজিল আহার পাণী তায় ॥
অঝরে নয়ন ঝরে সকলে স্বস্থান ছাড়ে
বনপথে সবার গমন।

মহারাজ রাজ্যেশ্বর ব্যাকুলিত নিরন্তর
বাকরোধ বিরহে বিমন ॥
প্রতাপচন্দ্রের বিচ্ছেদে জগৎ মজিল খেদে
পরাণচন্দ্রের মনাহ্লাদ তায়।
অন্তর্যামী নারায়ণ জানিয়া সবার মন
প্রবোধ করিতে ইচ্ছা যায়।

যাহা হউক, ক্রমে বর্দ্ধমানেও রাষ্ট্র হইল যে, প্রতাপ জীবিত আছেন। কবি বলিতেছেন,—

পবনে করি স্মরণ কহিলেন বিবরণ
জগতে জানাহ এই বাণী।
প্রতাপচন্দ্র জীবিতমান পুনঃ আসি বর্দ্ধমান
অধিষ্ঠান হইবেন জানি ॥
পবন আদেশ পাইয়া বর্দ্ধমান প্রবেশিয়া
প্রচার করেন এই বোল।
একজনের মুখ হইতে আর জন শুনি তাথে
নগরে নগরে হইল গোল ॥
শোকের সাচব্য হয় বিষাদে হরিষ বয়
প্রকারে প্রবোধ পায় সবে।
পরাণে তঞ্চক করি অম্বিকা ছাড়িয়া হরি
তরণী বাহিয়া যান তবে ॥
মধ্যমকাণ্ডের আদ্য লীলা প্রকাশিত চারুশীলা
সমাপ্ত হইল এতদূরে।
ভণ্ড মৃত্যু পরকাশ পরেতে অজ্ঞাতবাস
সে বৃত্তান্ত কহি অতঃপরে ॥
প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত যশঃ
ঘোষিতে ঘোষণা ভূমণ্ডলে।
অনূপচন্দ্র বিরচন তুষিতে জগত মন
সঁপি মন গুরুপদতলে ॥

অজ্ঞাতবাস।

প্রতাপ উত্তর মুখে গঙ্গা বাহিয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে গমন করেন। পথে মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনিও দেশে মৃত্যুর ভাণ করিয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন, নবাব সাহেব নিত্যানন্দের অবতার। যাহাই হউক, ইঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া উজ্জল নগরে শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর আলয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করেন।

আপনি কাণ্ডারী তরি ত্বরা চলি যায়।
কেহ পথে জিজ্ঞাসিলে দেন পরিচয়॥
হরিদাস কাণ্ডারী আমি হরি চরণ দায়।
হরিসঙ্গে হরি ব'লে যাই হরিদ্বার॥
শুনি পরিচয় সে প্রবোধ পায় তবে।
বিধির অগম্য ভাবের অন্ত কতো পাবে॥
নবদ্বীপ করিয়া পাছে নৌকা চলি যায়।
হেন কালে নিত্যানন্দ মিলিল তথায়॥
ত্যজিয়া নবাবী বেশ বেনয়া ফকির।
গৌর আগমনে মনে হইয়া অস্থির॥
নিজদেশে ভণ্ড মৃত্যু করিয়া প্রকাশ।
পূর্ব্বের নিয়ম যথা আছিল নির্য্যাস॥
উভয়ের এক কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে।
একত্রে মিলন পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে॥

* * * *

তরণী ত্যজিয়া হরি-তটে উপনীত।
হইল মিলন দোঁহে লোকে অবিদিত॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ হবে থাকিতে অজ্ঞাত।
কোথা কোন রূপে যাই এবে অচিরাৎ॥
শুনি স্বরূপাঙ্গে কন বিবরণ।
উজ্জল নগরে যাই আছে প্রয়োজন॥
শ্যামলাল ব্রহ্মচারী তথা করে বাস।
পূর্ব্বমত যোগী যোগে বড়ই বিশ্বাস॥

আমাতে বাৎসল্য ভাব সাধন তাহার।
এই অবসরে সাধ পূরাইব তার॥
কৃষ্ণলাল গৌরলাল বিশ্বরূপ নাম।
তিনটি সন্তান তার রূপ অনুপম॥
তথিমধ্যে বিশ্বরূপ হয় ঘটান্তর।
অবশেষ বর্ত্তমান দুই সহোদর॥
সেই দুই ঘটে দোঁহা করি আকর্ষণ।
বাল্যবসে কিছু কাল তুষি তার মন॥
উভয় বিচারে স্থির বাক্য হৈল ঐক্য।
তবে দোঁহা চলি জান কালিকা সাপক্ষ।
কালী কালী নাম মাত্র জপিতে জপিতে।
উপনীত ব্রহ্মচারীর মন্দির মধ্যেতে॥
কালীরূপা প্রতিমা ব্রহ্মচারীর সেবিত।
স্ত্রী পুত্র পরিবার পূজাতে নিশ্চিত॥
চক্ষু বুজি ধ্যানযোগে আছে সবে বসি।
সেই কালে বায়ুছলে ঘটেতে প্রবেশি॥
চিত কণাচিত মধ্যে মিশাইল যবে।
স্ত্রী পুরুষে ব্রহ্মচারীর ধ্যান ভঙ্গ তবে॥
দোঁহা.পুত্রে দোঁহে মুখ করি নিরীক্ষণ।
ঘোর মায়ায় মুগ্ধ চুম্বে দোঁহার বদন॥
পূর্ব্ব হইতে অধিকন্তু স্নেহেতে পুলক।
হয়তো প্রণয় আঁখি হইল পলক॥
আঁখি আড় করিতে বাসনা নাহি হয়।
নিরবধি লালন:পালন অতিশয়॥
কেতাবাদি বিদ্যায় প্রবর্ত্ত বালক।
স্বল্প দিন মধ্যে সিদ্ধ বিদ্যায় পারগ॥
কভু কভু চাকুরিয়া পোষাকে ভ্রমণ।
দেখিতে ম্লেচ্ছ বিচার করয়ে কেমন॥
কভু নাট পাঠশালে ছাওয়ালের সঙ্গে।
কভু কভু যুবতী যৌবন রস রঙ্গে॥

এইমত রস কেলি নগর সমাজ।
যথায় যেমন ভাব তথায় সেই সাজ॥
দ্বিবর্ষ হইল গত খেলা রঙ্গরসে।
সাধিতে স্বকাজ চিন্তা হইল বিশেষে॥
দণ্ডগ্রহণ করি ব্রহ্মচারী পাশ।
ভিন্ন ঘরে ভিন্নাসনে উভয়ের বাস॥
ত্যজিয়া আহার পানী জপেতে মগন।
যথা কালে কিছু গব্য করিল ভোজন।
গ্রামবাসী স্ত্রীপুরুষ কেহ নাহি দেখি।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম নহে তথা থাকি॥
বর্ষ এক সাদ ইচ্ছা করিতে ভ্রমণ।
কেবা কোন ভাবে দেখিব কেমন॥
এই অভিপ্রায় মন উভয়ের হয়।
তীর্থ পর্য্যটন ছলে গমন নিশ্চয়॥
হেনকালে দৈববাণী হয় উচ্চারণ।
ত্বরা করি কর হরি জগতশাসন॥
একছত্র তলে ত্রিভুবন থাটিবেক।
বাল্যরস কেন ভ্রম হইল এতেক॥
অকস্মাৎ সত্যবাণী স্বপ্নসম ভাব।
চৈতন্য চেতন পায় জীবের হয় লাভ॥
সাজিয়া সন্ন্যাসী বেশ যুগলাখ্যা ধরি।
পূর্ব্বের বিরত ভাবে মত্ত হ'য়ে ভারি।
প্রতিপদ প্রহরণে ধরণী কম্পিত।
পূর্ব্বদিক চলিলেন ভ্রমণে ত্বরিত॥
হলায়ুধ নিজ অস্ত্র ধরি হলধর।
পাসণ্ডদলনে ঈষৎ কুপিত অন্তর॥
রূপ সঙ্গ স্বরূপাঙ্গ এত রঙ্গ তায়।
কেহ না দেখিতে পারে অলক্ষ্য লীলায়॥
ম্লেচ্ছাসুর আগে নাশিতে অন্তর।
ভক্তগণে আদেশিতে প্রতি ঘরে ঘর॥

পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ।

প্রথমে আসাম রাজ্য ব্রহ্মার মুলুক।*
প্রতাপচন্দ্র পরিচয় জানান চুম্বক॥
কৃতনাম খ্যাতি কৃতব্রহ্মা নাম।
তেঁই সে ব্রহ্মার মুলুক চেহীত (?) আসাম॥
পূর্ব্বভক্ত সূত্র রাজার সানুকূল হয়ে।
ঐ দেশে কিয়ৎকাল থাকেন তিষ্ঠিয়ে॥

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে প্রতাপ যোগ দেন।

সে মুলুক শাসিতে ম্লেচ্ছ করে রণ॥
সৈন্য মাঝে প্রতাপচন্দ্র উদিত তখন॥
ব্রহ্মার তারিণ (?) সে মগধরাজ সেনা।
সেই প্রতাপচন্দ্র বলি দিলেক ঘোষণা॥
ইংরাজের জেনারেল শুনি সেই বোল।
কোন প্রতাপচন্দ্র বলি সৈন্য করে গোল॥
কেহ বলে ছোট রাজা বর্দ্ধমানবাসী।
মগধ সহিত রাজা মিলিলেন আসি॥
কেহ কয় রাজার মৃত্যু শুনিয়াছি কানে।
মৃতদেহে পুনঃ কোথা আসিবে এখানে॥
সত্য মিথ্যাদি বচন হয় জনরব।
জানরেল জানিল কথা অতি অসম্ভব॥
ম্লেচ্ছ মগের যুদ্ধ দেখে লাগে ভয়।
বিশেষ ম্লেচ্ছ দাগাবাজ অতিশয়॥
যুদ্ধেতে পরাস্ত মানি ব্রহ্মার সহিত। †
বিবাদ ভঞ্জন করি মিলিল ত্বরিত॥

প্রতাপচন্দ্র জীবিত আছেন, এই সন্দেহ হওয়ায় সে সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান হয়।

* আসাম তখন ব্রহ্মদেশের অধীন ছিল।

† কথাটা নিতান্ত মিথ্যা। এই যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় হয় নাই। যুদ্ধে ব্রহ্ম সেনাপতি নিহত হয়েন। ব্রহ্মরাজ এক কোটী টাকা, আসাম, আরাকান, ও তেনাসারিম কোম্পানীকে দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

শ্রুতকটুর কথায় সন্দেহ করিতে ভঞ্জন।
কলিকাতার কৌন্সিলে জানায় বিবরণ ॥
বর্দ্ধমানের জজকে বাচাই হয় ভার।
বড় মহারাজাকে জানায় সমাচার ॥
অম্বিকা বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে।
বালবৃদ্ধ যুবাকে জিজ্ঞাসে বারে বারে ॥
মৃত্যু হওয়া তথ্য কথা কেহ না কহিল।
জীবিতমান আছে কিংবদন্তী হয়েছিল ॥
সকল বিবরণ জজ কৌশলে জানায়।
গবর্ণর কৌন্সিলের তত্ত্ব জেনারেল পায় ॥
যুদ্ধ পরিহরি সে জানরেল যোদ্ধাপতি।
ছোট মহারাজ সঙ্গে মিলিবার মতি ॥
ইতস্ততঃ তপাশি জানাইয়া তত্ত্ব।
সহজে বিমর্ষ মন না করিল ব্যক্ত ॥
পরমের পরম খেলা পরে প্রকাশিবে।
সামান্য মানুষে ইহার অন্ত কেবা পাবে ॥
প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত প্রসঙ্গ।
শ্রবণ কীর্ত্তনে কাল ভয় হয় ভঙ্গ ॥
অনুপচন্দ্র বিরচিত ছন্দ বিছন্দে।
আস্বাদনে বাড়ে সুখ থাকয়ে আনন্দে ॥
অজ্ঞাতবাসের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
প্রিয়মুখ ভরি সবে কর হরি ধ্বনি ॥

ক্রমশঃ।

জ্যোতিষ্ক তত্ত্ব। (২)

সূর্য্যদেব সহস্রকরে বিশ্বব্যাপী—আলোক বিতরণ করেন, তজ্জন্য তিনি "সহস্রাংশু"। তিনি অন্ধ তমিস্রার চির-বৈরি, সৌরজগতের অন্ধকার বিনাশক, তজ্জন্য তিনি 'ধ্বান্তারি' 'লোকচক্ষু' বা 'লোক-প্রকাশক'। তাঁহার প্রচণ্ড তেজে নিখিল বিশ্ব পরিতাপিত, তাই তিনি মার্ত্তণ্ড। সূর্য্য—রশ্মি ও

সূর্য্যাতপরূপ যাদুশক্তি বলে জীবকুল-মুখরিতা ধরিত্রী দেবী শস্য-শালিনী ও নয়নমনোহর ফল-পুষ্প শোভিনী। আকাশে সুমধুর বিহঙ্গ-রব, গভীর নির্জ্জন কাননে মধুর মল্লিকা-হাসি, পৃথিবী-প্রান্তে অগাধ অনন্ত জলধির শ্রবণ-মধুর অনন্ত কল্লোল প্রভৃতি যাহা কিছু মনোরম তৎসমুদয়ই সূর্য্য-সাপেক্ষ। মেঘ, বৃষ্টি, বন্যা, নিদাঘের সুশীতল সান্ধ্য-সমীরণ, বৈশাখের কাল ঝটিকা, বাণিজ্য বায়ু, ভূ-বায়ু, সাগর-বায়ু প্রভৃতি সমস্তই সূর্য্যাতপ সমুৎপন্ন। অনন্ত আকাশব্যাপী অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ তপন দেবের চিরপারিষদ, তাঁহার তেজে তেজোবান হইয়া তাঁহার চতুঃপার্শ্বে অনন্ত মার্গে অনন্ত-কাল পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই হিন্দুর-চক্ষে এই সর্ব্ব মঙ্গলাধার সূর্য্য সেই সর্ব্বমঙ্গলময় অনন্তরূপী ভগবানের অংশ, সূর্য্যে সেই অচিন্ত্য-শক্তির অনন্ত শক্তির বিকাশ, সেই মহান্ জ্যোতিষ্মানের অনন্ত জ্যোতির অভিব্যক্তি, তজ্জন্য আর্য্য ঋষির চক্ষে সূর্য্য দেবতা। বিশ্বরূপী ভগবান বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজিত। বিশ্বস্থ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থেও বিশ্বস্রষ্টার অপার মহিমা প্রকটিত, সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বর প্রেমিক আর্য্য ঋষিগণ যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া দেবভাবে তাঁহার পূজা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময় বা নিন্দার বিষয় কিছুই নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ কৃষ্ণ চিহ্নগুলিকে সূর্য্যতলস্থ গভীর গহ্বরাবলি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল গহ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সূর্য্য প্রকাণ্ড জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড মাত্র। অনেকে অনুমান করেন, সূর্য্যস্থ উত্তপ্ত বাষ্প-রাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া "সূর্য্যাবহের" অপেক্ষাকৃত শীতল প্রদেশে আসিলে শৈত্য প্রভাবে ঘনীভূত হয় ও প্রচণ্ড বেগে পুনরায় বাষ্পময় সূর্য্য-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া ঐ সকল গহ্বর উৎপাদন করে। বস্তুতঃ এই বিষয়ের সর্ব্ববাদী সম্মত সুমীমাংসা নানা কারণে এক প্রকার অসম্ভব।

সূর্য্যকিরণ সম্ভবতঃই অত্যন্ত প্রখর। আমরা চর্ম্মচক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অসমর্থ, সুতরাং আমরা চর্ম্মচক্ষে সূর্য্যপৃষ্ঠের প্রকৃতি নিরূপণে অপারগ। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে দৃষ্টিযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে সূর্য্যতলস্থ যাবতীয় বিষয়ই চিরদিনের জন্য আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। সূর্য্যগ্রহণ কালে সূর্য্যতেজ মন্দীভূত হইয়া যায়, পূর্ণগ্রাস কালে সূর্য্যমণ্ডল একবারে অদৃশ্য হয়, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, উহার

চতুঃপার্শ্বে একটী 'ছটা' মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়ে সূর্য্যমণ্ডলের প্রান্ত সীমায় কতকগুলি নয়ন-মনোহর উন্নত প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অন্য সময়ে যে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না, এরূপ নহে, তবে সূর্য্যের প্রখর কিরণজালে বেষ্টিত থাকায় উহারা মানবচক্ষুর অগোচরে থাকে। বর্ণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই সমুদয় উন্নত প্রদেশ উদ্‌জান ও অন্যান্য বাষ্পাকার ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহারাও সূর্য্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল, ও পৃথিবীস্থ অগ্নিশিখার ন্যায় ইহাদিগেরও বিকম্পন অনুভূত হইয়া থাকে। ইহারা একস্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে না, পরন্তু সময়ে সময়ে স্থানচ্যুত হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ মাইলেরও অধিক বেগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ইহাদের আকৃতি সকল সময়ে একরূপ থাকে না, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল। মহামতি বল সাহেবের গ্রন্থে এইরূপ একটী উন্নত প্রদেশের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে সূর্য্যমণ্ডলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমায় একটী উন্নত প্রদেশ দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রকাশ কালে উহার উচ্ছ্রায় সহস্র মাইল ছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে উহা অত্যুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, ও উহার আয়তনও প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অপরার্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উহার উচ্চতা ৩৫০,০০০ মাইল হইয়া গেল এবং তৎপরে বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রথম দর্শনের দুই ঘণ্টার মধ্যেই উহা একবারে মলিন হইয়া অদৃশ্য হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সূর্য্যপৃষ্ঠ সমতল নহে, পরন্তু অসম। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ন্যায় ইহাতেও গহ্বর ও উন্নত প্রদেশ আছে, তবে প্রভেদ এই যে, অপরিমেয় তাপ নিবন্ধন কোন পদার্থই সূর্য্যপৃষ্ঠে কঠিন বা তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারেনা—সমস্তই বায়বীয় অবস্থাপন্ন। পৃথিবী যেরূপ চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী বায়ুরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্য্যও সেইরূপ বায়বীয় পদার্থ বিশেষ দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহারই নাম "সূর্য্যাবহ।" সূর্য্য অমেয় আলোকাধার। আমরা নির্ম্মল পূর্ণিমা রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের জগৎবিমোহন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার ৫ লক্ষ পূর্ণচন্দ্র একত্র করিলেও তাহার আলোক সূর্য্যালোকের সমকক্ষ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সূর্য্যের তাপ পরিমাণ তাহার আকৃতি ও আলোকের অনুরূপ। সমুদ্রে গণ্ডূষবৎ সূর্য্যাতপের কণামাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সূর্য্য অবিশ্রান্ত ভাবে চতুর্দ্দিকে তাপ

ও আলোক বিতরণ করিতেছেন। সূর্য্যাতপ বিকীরণ কোন রূপে প্রতিরুদ্ধ হইলে জগৎ সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে, বায়ু রাশি কঠিন বা তরল পদার্থে পরিণত হইবে, জীবকুল মুখরিত সর্ব্বজীবের আবাসভূমি পৃথিবী মৃত্যুর কালছায়ায় একবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা আজন্ম সূর্য্যদেবকে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিম গগনে অস্তগত হইতে দেখিতেছি এবং মাষ্টার মহাশয়ের শনৈঃ সঞ্চালিত বেত্র-যষ্ঠির প্রভাবে বা পরীক্ষা রূপ মহাসমুদ্রের একমাত্র তরণী স্বরূপ পরীক্ষক মহাশয়ের প্রসাদ লাভ প্রত্যাশায় বাল্যকাল হইতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছি যে, সূর্য্য নিশ্চল, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরি-ভ্রমণ করে। জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সূর্য্যের গতি নাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতিই তাহার উদয়াস্তের কারণ। যেমন কোন দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া গমন করিলে বোধ হয়, উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি বস্তু সমূহ বেগে বিপরীত দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে এবং আমরা শকট মধ্যে নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট আছি, সেইরূপ পৃথিবী আপন মেরু-দণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া আমরা নিশ্চল সূর্য্যকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গতি বিশিষ্ট বলিয়া মনে করি। অধুনা বিজ্ঞান চর্চ্চার আধিক্য বশতঃ এই বিষয়টী প্রায় অনেকেই সম্যক অবগত আছেন, কিন্তু মানবের আদিম অবস্থায় সূর্য্যের উদয়াস্ত একটী অতি দুরূহ সমস্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল, এবং জাতি বিশেষের মধ্যে অনেক প্রকার কিম্বদন্তীও প্রচলিত ছিল। আমরা অরুণ সারথি পরি-চালিত অষ্টাশ্বযোজিত স্যন্দনে সূর্য্যদেবের গগনপটে পরিভ্রমণের কথা অবগত আছি। কোন কোন জাতির বিশ্বাস ছিল যে, দিবাভাগে গগন পর্য্যটন করিয়া সূর্য্যদেব সন্ধ্যার সময় সুদূর পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইতেন, এমন কি, তাহারা সূর্য্যে জলপতন-কালে বারিমধ্যে অগ্নি নিক্ষেপবৎ "সোঁ। সোঁ।" শব্দ শুনিতে পাইত। তৎপরে সূর্য্য 'ভল্‌কান্‌' দেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া একটী ক্ষুদ্র স্বর্ণময় যানে স্থাপিত হইতেন এবং ঐ সমারোহণে উত্তর সমুদ্র বাহিয়া ঠিক প্রভাতকালে পূর্ব্বগগনে আসিয়া বিকাশ পাইতেন। জাতিভেদে এই সকল অমূলক বিশ্বাস বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অদ্যাপিও অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এরূপ নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত

সূর্য্যদেবের পরেই সুধাধার চন্দ্রদেবই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তপন দেবের ন্যায় সুধাংশুও অশেষ মঙ্গল-নিদান। বাহ্যদৃষ্টিতে বোধ হয়, নব পরিনীত যুবক-যুবতীর নব প্রেমোদ্ভাসিত অন্তঃকরণে সুধা সিঞ্চনের জন্য বা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা বিরহ-বিধুরা অভাগিনী রমণী-হৃদয় বিষসিক্ত করিবার জন্যই শশাঙ্কের সৃষ্টি। চন্দ্রালোক ও কোকিল-কূজন প্রেম-গাথার ও বিরহ বর্ণনার চির-সহচর। কাব্যে সন্ধ্যা বর্ণনের সহিত চন্দ্রোদয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। চন্দ্র কবিকুলের এতই প্রিয় সামগ্রী যে, কোন কবি পঞ্জিকা কথিত অমানিশায় চন্দ্রের বিকাশ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত সুধাংশুর সুধাময় রশ্মি মানবমাত্রেরই আদরের সামগ্রী। প্রকৃত পক্ষে চন্দ্র হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। চন্দ্র পৃথিবীর স্থায়ী নিকট প্রতিবেশী, পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব আড়াই লক্ষ মাইলের অধিক নহে। এই নৈকট্য নিবন্ধন চন্দ্রকে আমরা অপর নক্ষত্রাবলী অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর দর্শন করিয়া থাকি; বস্তুতঃ যে সমস্ত নক্ষত্রকে আমরা পৃথিবী হইতে অতি ক্ষুদ্রাকার দেখি, তাহাদের অধিকাংশই চন্দ্র অপেক্ষা বহুলক্ষ গুণ বৃহত্তর। পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের আয়তন প্রায় তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে সূর্য্যের অসীম দূরত্ব ও চন্দ্রের নৈকট্যই ইহার কারণ। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র, পৃথিবীকে পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশকে বর্ত্তুলাকার করিলে উহার আয়তন চন্দ্রের সমান হইবে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ, অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাবলী যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, চন্দ্র সেইরূপ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীকে একবার পরিভ্রমণ করিতে চন্দ্রের প্রায় প্রায় ২৭ দিন লাগে; ইহাই এক একটী চান্দ্র মাসের পরিমাণ। আমরা সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রেরও যে উদয়াস্ত দেখিতে পাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতি তাহারও কারণ। কিন্তু চন্দ্র যে গতিশীল, অতি সহজ উপায়ে তাহাও প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। কোন একটী "নিশ্চল" নক্ষত্র লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, চন্দ্র হইতে ইহার দূরত্ব সকল সময়ে সমান থাকে না, এক রাত্রির মধ্যেই দূরত্বের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। চন্দ্রের গতিই ইহার কারণ।

চন্দ্র বহুরূপী। তিনি কখন অদৃশ্য কখন বা ক্ষুদ্র রেখাকৃতি, পরে কলায় কলায় বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে পূর্ণচন্দ্র রূপে প্রকাশমান হয়েন

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রের নিজের জ্যোতিঃ নাই, সূর্য্যের কিরণ লইয়াই তাঁহার জ্যোতিঃ। চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী পরস্পর এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, সকল সময়েই চন্দ্রের অর্দ্ধাংশের উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া উহাকে উজ্জ্বল করে। অনেক সময়ে দিবাভাগে চন্দ্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন উহাকে ম্লান ও হীনপ্রভ দেখায়, সে সময়ে চন্দ্রের জ্যোতিঃ ও আকাশপথে সঞ্চরমান একখণ্ড শ্বেত মেঘের জ্যোতিঃ প্রায়ই তুল্য ; উভয়েই সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বলীকৃত বলিয়া একরূপ দেখায়। যেরূপ কোন জ্বলন্ত বর্ত্তিকার সম্মুখে একটী গোলক রাখিলে গোলকের যে অংশ বর্ত্তিকাভিমুখে থাকে, সেই অংশ বর্ত্তিকা-কিরণে আলোকিত হয়, অপরাংশ অন্ধকারময় থাকে, সেইরূপ চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, সেই অংশ সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল-ভাব ধারণ করে, অপরাংশ অন্ধকারময় থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য, ও পৃথিবীর অবস্থানের ক্রমিক পরিবর্ত্তন নিবন্ধন আমরা সকল সময়ে চন্দ্রের উজ্জ্বল অর্দ্ধাংশ পূর্ণভাবে দেখিতে পাই না। কখন বা আমরা ঐ অর্দ্ধাংশের অংশমাত্র দেখিতে পাই, কখন বা উহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নয়নগোচর হয়, ইহাই আমাদের "পূর্ণচন্দ্র"। সুতরাং আমরা যাহাকে "পূর্ণচন্দ্র" বলি, তাহা "অর্দ্ধচন্দ্র" মাত্র, অপরার্দ্ধ অন্ধকারময় থাকিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। পূর্ণিমার দিন পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া আমরা চন্দ্রের উজ্জ্বল অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ দেখিতে পাই ; ও অমাবস্যায় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে স্থানে অবস্থিতি করে বলিয়া উহার উজ্জ্বলাংশ সূর্য্যাভিমুখে থাকে ও অন্ধকারময় অপরার্দ্ধ পৃথিবীর দিকে থাকায় আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। চন্দ্রের এইরূপ আকৃতি পরিবর্ত্তন চন্দ্রের গতির অপর একটী প্রমাণ।

আমরা সকলেই জোয়ার ভাটার বিষয় অবগত আছি। এই জোয়ার ভাটা বাণিজ্যের বিশেষ সহায়। ইহা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সংঘটিত হয়। সকলেই জ্ঞাত আছেন, চন্দ্রের আকর্ষণই এই জোয়ার ভাটার কারণ। চন্দ্রের অস্তিত্ব লোপ হইলে জোয়ার ভাটাও লোপ পাইবে, নাবিকগণের সমুদ্রবক্ষে জাহাজ পরিচালন কার্য্যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। সাগরপৃষ্ঠে পোতপরিচালন জন্য চন্দ্র অন্যরূপেও নাবিকগণের অপরিহার্য্য অবলম্বন। পোতবাহীদিগকে অকূল জলধি অতিক্রম করতঃ দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে হয়। পথ নির্ণয়ের জন্য জাহাজ কোন্ সময়ে পৃথিবীর কোন্ অংশে, কোন্ দিকে

চলিয়াছে, ইহা স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক। যে কোন সময়ে পৃথিবীর কোন্ অংশে জাহাজ চলিতেছে, জানিতে হইলে সেই স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূগোল-পাঠকেরা অবগত আছেন, স্থানীয় ও গ্রীনউইচ সময়ের পার্থক্য দেখিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ স্থান সমূহের দ্রাঘিমাংশ নির্ণীত হয়। সূর্য্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন স্থানের স্থানীয় সময় ও অক্ষাংশ নির্ণয় করা কঠিন নহে। দ্রাঘিমাংশ জানিতে হইলে প্রকৃত গ্রীনউইচেব সময় জানা অপরিহার্য্য। এই উদ্দেশ্যে নাবিকেরা জাহাজে একটী গ্রীনউইচ 'ক্রনোমিটার' লইয়া থাকেন। কিন্তু এই ক্রনোমিটার গ্রীনউইচের প্রকৃত সময় প্রদর্শন না করিলে নাবিকগণের মহা বিপদ, এক মিনিটের ভুলে তাহারা প্রকৃত পথ ছাড়িয়া ১৫ মাইল বিপথে চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহাদের ক্রনোমিটার মিলাইবার জন্য সাগর-পৃষ্ঠস্থ সর্ব্ব-স্থান হইতে পরিদৃশ্যমান প্রকৃত গ্রীনউইচ সময়প্রদর্শক এক বিপুল ঘটিকা-যন্ত্রের আবশ্যক। পরম কারুণিক বিশ্বস্রষ্টা গগনতলে এই ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিস্তৃত অনন্ত আকাশ এই ঘটিকার 'শঙ্কপট্ট!' নক্ষত্রা-বলী উহার সময়জ্ঞাপক সংখ্যা বিশেষ ও চন্দ্রদেব উহার 'শঙ্কুদণ্ড'। গ্রীন-উইচের প্রত্যেক সময়ে চন্দ্র হইতে নক্ষত্র বিশেষের দূরত্ব নাবিকদিগের নিকট লিপিবদ্ধ থাকে। সুতরাং গ্রীনউইচের প্রকৃত সময় জানিতে হইলে উহারা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উক্ত নক্ষত্র হইতে চন্দ্রের দূরত্ব স্থির করিয়া লয়। পরে পূর্ব্বোক্ত লিপিদৃষ্টে অনায়াসেই গ্রীনউইচ সময় অবগত হইতে পারে।

জ্যোতির্ব্বিদেরা দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের সম্পূর্ণ মানচিত্র প্রস্তুত ও তত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্যের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা চর্ম্মচক্ষে চন্দ্রে নানা প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাই, উহারাই আমাদের বাল্যকালের 'কদম্ব বৃক্ষ' 'শশক' ও সূত্র নির্ম্মাণ-তৎপরা অশীতিপরা 'বৃদ্ধা'। চন্দ্রপৃষ্ঠে শশক বিরাজিত বলিয়া উহার অপর নাম 'শশধর'। প্রাচীন পাশ্চাত্য জ্যোতি-র্ব্বিদগণের মতে ঐ সমস্ত কৃষ্ণচিহ্ন চন্দ্রস্থ জলরাশি মাত্র। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রে জল বা বায়ুর অস্তিত্ব নাই। পরন্তু এই সমস্ত অঙ্গুরীয়াকৃতি কৃষ্ণচিহ্ন সমূহ চন্দ্রতলস্থ গহ্বরা-বালী ও তন্মধ্যস্থ পর্ব্বতমালা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্রমশঃ

শ্রীআদ্যনাথ রায়।

ত্রেতা ও দ্বাপরের গ্রন্থালোচন।

রামায়ণ ও মহাভারত।

(যুগদ্বয়ের মহাফল, জীবমুক্তি, 'অকাল বোধন' ও 'গীতা'। *)

ত্রিপাদ পুণ্য এবং পাদৈক পাতক সংকীর্ণ ত্রেতাযুগের নাম করিলে যেমন রাজৈশ্বর্য্য সমন্বিত সরযুতটস্থিত অযোধ্যা, বিরাট বক্ষে সেতুবন্ধধারী অকুল সাগর মধ্যবর্ত্তিনী স্বর্ণকিরিটিনী লঙ্কা, অগণন রাক্ষস-বানর পরিবৃত আহবস্থান মধ্যবর্ত্তী পরম প্রতিদ্বন্দীদ্বয় শ্রীরাম রাবণ, আর অশোক কাননে রাক্ষসী পরিবৃতা ক্ষোভ-মুহ্যমানা ক্রন্দমানা সীতা দেবীর বিষাদময় মুখ-কমল মনে পড়ে; অর্দ্ধাঙ্গপাতকপুণ্য সমাকুল দ্বাপরের কথা তুলিলেও তেমনি বিপুল আর্য্যাবর্ত্তে প্রলয় স্বরূপ বিপুল আহবের প্রচণ্ড ধ্বনি উদ্বেলিত যমুনাতটস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ ও সহস্তিনা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডব, দুর্য্যোধ কৌরব এবং ঘোরাপমানমুহ্যমানা কৃষ্ণার কথা হৃদয়ে উদিত হয়। অতুল প্রতিভা সম্পন্ন মহর্ষিদ্বয় ঠিক একই ভাবে তাঁহাদের অমর লেখনী-মুখে ধর্ম্মের জয় এবং পাপের পরাজয়ের অপূর্ব্ব চিত্রদ্বয় জগৎ সমক্ষে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আদ্য কবি প্রতিভায় এবং ঋষি প্রতিভায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনাযোগ্য কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায়। তাহাদিগকে পার্থক্য না বলিয়া বাস্তবপক্ষে প্রতিভা সমাবেশে হ্রাস পর্য্যায়ের ইতরবিশেষ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কবি বাল্মীকি দিব্য পবিত্রতা, অটল সতীত্ব, অতুলনীয় পাতি-ব্রত্য প্রভৃতি লইয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সুকরুণ অথচ সর্ব্বংসহা ত্রিজগতে অদ্বিতীয় যে দেবীমূর্ত্তি সীতাদেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, মহর্ষি ব্যাসের কৃষ্ণায় যেন ততটা প্রতিভা ফুটিতে গিয়াও স্ফুরিত হয় নাই! আবার আহবক্ষেত্রে সহায়-সম্পদ-বল-ভরসা-স্বরূপ মন্ত্রির চিত্রে বাল্মীকি,—সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুমান, হনুমান প্রভৃতিতে যে প্রতিভা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন, ব্যাসদেব সেই সমগ্র প্রতিভা লইয়া, তাহাতে দীপ্ত সনাতন ধর্ম্মতেজ, দেবত্ব ও আদর্শ

* যদিও "অকাল বোধন" মূল রামায়ণে নাই, তথাপি ইহা ও "গীতা" হিন্দুর মুক্তির প্রধান উপায় স্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ত্রেতা ও দ্বাপরের এই দুই কীর্ত্তিকে আমরা মহাফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। "অকাল বোধন" বাল্মীকির রামায়ণে নাই, তবে ইহা ত্রেতার ঘটনা বটে ও অপর পুরাণে আছে। লেখক।

মনুষ্যত্ব সংযোজিত করিয়া অপূর্ব্ব সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণরূপ অপূর্ব্ব তেজোময় মূর্ত্তি জগৎ সমক্ষে দাঁড় করাইয়াছেন। ব্যাসের অদ্ভুত প্রতিভা এ ক্ষেত্রে বাল্মীকিকেও পরাহত করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাই, আমরা একদিন বলিতেছিলাম,—বাল্মীকির সীতা জগতে অদ্বিতীয়া এবং সীতাই সীতার উপমা, আর ব্যাসের শ্রীকৃষ্ণ জগতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং 'কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণ অতুল ভূতলে।"

ত্রেতায় পুণ্য ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, সুতরাং উভয় যুগের অবস্থা সমন্বয় সম্ভবপর নহে; দ্বাপরে জীবের মতি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন জন্য যে ভ্রাতার হস্তে রাজ্যার্পণ করিয়া পত্নী ভ্রাতানুবর্ত্তিত হইয়া অম্লানচিত্তে বনবাসী হইলেন; চিত্রকূটে ভরতের সাধ্যসাধনাতেও পুনরায় রাজ্যগ্রহণে ব্রতভঙ্গ করিলেন না; ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের অক্ষসত্য পালনে স্ত্রীভ্রাতৃসহ বনবাস অবসানে, যখন 'সূচ্যগ্রভূমি' দানেও দুর্য্যোধন অস্বীকৃত হইল, তাঁহাকে সেই ভ্রাতার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইল। অবশ্য ব্রতভঙ্গ ইঁহাকেও করিতে হয় নাই, তথাপি ত্রেতা দ্বাপরে মানবের মতিপার্থক্য অনেকটা ঘটিয়া গিয়াছে।

বাল্মীকির রাম সৌম্যাবতার, সর্ব্বগুণাধার, আদর্শ চরিত।* সীতার বনবাসকে অনেকে রামচরিত্রে কালিমা নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ কূট-রাজনীতিবাদে এরূপ প্রজারঞ্জন অবশ্য বিধেয়।† ব্যাসের যুধিষ্ঠিরও শান্ত দান্ত গুণের অধিশ্বর, ধর্ম্মাবতার এবং সর্ব্বগুণান্বিত; উভয়েই ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু দ্রোণ পর্ব্বের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" যুধিষ্ঠিরের বিমল চরিত্রে চিরপ্রসিদ্ধ কলঙ্কারোপ করিয়াছে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। 'নরকদর্শন' তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত।

---

* 'ভারতী'তে শ্রদ্ধাস্পদ সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "রামায়ণের দুইটি চিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরাম রাবণে যে সুন্দর তুলনা দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে রাম চরিত্রের বিশুদ্ধতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

† 'নবপ্রভা'য় প্রতিভাবান কবি দ্বিজেন বাবুর (Drama) "সীতা'য় রামের চিত্র যদিও শক্তিহীন করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, তথাপি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় 'পরিপাণ্ডু বিকম্পিতদেহ ভূমিবিলুণ্ঠিত রামের সম্মুখে সহসা সীতাকে যেরূপ সুকৌশলে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। স্বামীর আশ্বাস ও সান্ত্বনা স্বরূপ যে কয়েকটি বাক্য এখানে সীতার মুখ হইতে বাহির করা হইয়াছে, সীতার ন্যায় সীতার পক্ষে তাহা বড়ই স্বাভাবিক, বড়ই হৃদয়স্পর্শী। এই কয়েকটি কথা যেমন কবির প্রতিভার পরিচায়ক, তেমনি সীতার বনবাস সম্বন্ধে অভিনবমতি উদ্ভাবক অত্যুৎকৃষ্ট বিধান। এখানে প্রজারঞ্জন ও গুরুসত্য পালনে সীতা অনেকের আদর্শ স্বরূপা।

রাবণ দুর্য্যোধনে সাম্যও এমনি অদ্ভুত। তবে,—"অতি দর্পে হতালঙ্কা অতি মানেচ কৌরবাঃ—" রাবণ দর্পের আর দুর্য্যোধন অভিমানের (অহং-মিকা) চিত্র; উভয়েই পাপের প্রতিমূর্ত্তি। অনন্ত বিলাসিতার খরস্রোতে ভাসমান অসংখ্য অসৎ পরিষদ্ পরিবেষ্টিত; উভয়েই ভীমদর্পী, জগতের সাক্ষাৎ অমঙ্গল। অশোকবনে সীতাকে প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, ও মহা সভা মধ্যে পাঞ্চালীকে উরুপ্রদর্শন বস্ত্রাকর্ষণ প্রভৃতি ইহাদেরই কীর্ত্তি। বাল্মীকির মধ্যস্থ মূর্ত্তি মাতা নিকষা সুমন্ত্রণা দিতে যাইয়া ভর্ৎসিত এবং ভ্রাতা বিভীষণ লাঞ্ছিত; পদাঘাতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; আর খুল্লতাত বিদুর উপদেশ দিতে গিয়া অবজ্ঞাত এবং দূতরূপী শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষ হইতে সন্ধিবাদ লইয়া গিয়া জীবনসংশয়ে পড়িয়াছিলেন,—দুর্য্যোধন তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল!

দুর্য্যোধন যে লক্ষ্যভেদে এবং রাবণ ধনুকভঙ্গে অপারগ হইয়াছিল, অর্জ্জুন সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া, পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদী লাভ করেন; শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ পণ জিনিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি এবং ব্যাস এইখান হইতে স্বস্ব প্রতিভার প্রদীপ উস্কাইয়া দিলেন।

বনপর্ব্ব উভয় গ্রন্থের শ্রেষ্ঠবস্তু। সীতা ও লক্ষ্মণ লইয়া শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যেই যেমন সুখের কুটির পাতিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ সহ পাঞ্চালী লইয়া তেমনি নৈমিষারণ্যে শান্তি আশ্রম গড়িয়াছিলেন। এমন ভার্য্যা, এমন ভ্রাতা লইয়া অরণ্যও স্বর্গ হয়।

কিন্তু সর্গ বেশীদিন টিকিল না, কবিও ঋষি ঘটনা বিন্যাস জন্য ত্রিদিবের নন্দনে বিষম ঝড় বহাইয়া দিলেন।—রাবণ সীতা হরণ করিল, এদিকে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস আরব্ধ হইল। অশোকবনে সীতায় চেড়ীর দৌরাত্ম্য, বিরাটে পাঞ্চালীতে কীচকের অত্যাচার কবিদ্বয়ের ঝড়ের আর এক এক প্রচণ্ড প্রবাহ। বিরাটের কৌরবের গোধন হরণোপলক্ষে অর্জ্জুনের কৃতিত্ব প্রকাশ, তৎপর উত্তরাঅভিমন্যুপরিণয় ঘটিত বিরাটের সহিত পাণ্ডবের সম্বন্ধ স্থাপন এবং সপ্ততালভেদী কৃতী রামচন্দ্রের ভ্রাতৃবিত্তহারী বালীবধ দ্বারা সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী সংঘটন,—দুই যুগের দুই বিরাট যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ও সহায়। সুগ্রীব সহায়ে রামচন্দ্রের লঙ্কাজয় এবং বিরাট পাঞ্চালের সাহায্যে পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়। *

যুদ্ধস্থলের ঘটনা গুলির অসামান্য সামঞ্জস্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শ্রীরামের অবধ্য ইন্দ্রজিৎ বিভীষণ সাহায্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক এবং পাণ্ডব চতুষ্টয়ের অবধ্য জয়দ্রথ শ্রীকৃষ্ণ সহায়তায় ধনঞ্জয় কর্তৃক নিহত হয়েন।

রাক্ষসপক্ষে কুম্ভকর্ণ কালানুযায়ী জাগরিত হইলে একদিনেই ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে পারিত, তাহাকে কৌশল করিয়া অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া নিধন করা হইল; এদিকে শিখণ্ডীকে উপলক্ষ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া ভীষ্মদেবকে শরশয্যায় শায়িত করান হইল; কাবণ ভীষ্মদেব আর কয়েক দিন টিঁকিয়া যাইলে, পাণ্ডবের জয় সম্বন্ধে বড়ই সন্দেহ ছিল।—দেবগণ সমরকালে শ্রীরাম চন্দ্রকে অস্ত্র ও রথাদি দ্বারা সাহায্য, "আদিত্যহৃদয়" স্তব শিক্ষা দ্বারা শক্তিশালী এবং মাতলি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্য্যো-ধনের উরুভঙ্গকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বউরুতে তৃণাঘাত দ্বারা ভীমকে শত্রুর নিধন সন্ধান নির্দ্দেশ করিলেন। ইত্যাদি

লঙ্কাজয়ের পর সীতার উদ্ধার। কুরুযুদ্ধাবসানে এখানে স্ত্রীপর্ব্ব সংযোগ করিয়া মহাভারত রামায়ণের অপেক্ষাও এক স্বাভাবিক করুণ দৃশ্য দেখাইয়া-ছেন। কিন্তু অশোককুঞ্জের,—সরমাপার্শ্ববর্ত্তিনী স্বামীসন্দর্শনে গমনোদ্-যুক্তা সীতা,—অগণন বানর-রাক্ষসের আনন্দ-কোলাহল—কি সুন্দর দৃশ্য!—এস্থলে রামায়ণ সংযোগান্ত (comedy) এবং মহাভারত বিয়োগান্তের (Trgidy) দৃশ্য অভিনয় করিয়াছেন।—লঙ্কাজয়ে রামায়ণে যেমন আনন্দ, মহাভারতে কুরুজয়ে তেমনি বিষাদ। মন্দোদরীর করুণ ক্রন্দনে রামচন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হইলেও, অগণন বিধবা পুরনারীগণের (এবং বিশেষতঃ শত পুত্রশোকাতুরা গান্ধারীর) আকুল আর্ত্তনাদে যুধিষ্ঠির একেবারে উতলা ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন,—স্ত্রীপর্ব্বের সেই দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক! লঙ্কার আনন্দোচ্ছ্বাস, হস্তিনায় তেমনি করুণ ধ্বনি। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কবির ও ঋষির গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।—উল্লিখিত হইয়াছে, ত্রেতার পর দ্বাপরের মানব এক স্তর নিম্নে নামিয়াছে, তাই নিস্পৃহ রাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন কেবল সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত। যুদ্ধজয়ে তিনি

এদিকে জয়দ্রথ পাণ্ডব পক্ষের ভয়ানক ক্ষতি করিতেছিল অথচ অর্জ্জনের যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে-ছিল না, সুতরাং অভিমন্যুকে বধ করিয়া অর্জ্জুনের কোপ উদ্দীপিত করাইয়া নানা কৌশলে জয়দ্রথকে বধ করা হইল; এদিকে পুত্রের নিধনজনিত কোপে বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের বধোপায় প্রকাশ করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রধান বৈরী ধ্বংস করিলেন।

আনন্দলাভ করিলেন; আর পাণ্ডব রাজ্যকামী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য নশ্বর, তাহার পরিণাম দুঃখদায়ক, ইহা দেখাইবার জন্যই মহাভারতকার যুদ্ধজয়ের পরেও এরূপ ভীষণ বিষাদের ও বিশৃঙ্খলার চিত্র আঁকিয়াছেন।

যুদ্ধাবসানে সীতার অগ্নিপরীক্ষাছলে রামায়ণ পূর্ব্বপুরুষগণকে শ্রীরাম সকাশে উপস্থিত করাইয়াছিলেন; মহাভারতাকারও যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব্বপুরুষগণকে অবতীর্ণ করাইতে ছাড়েন নাই। রাম যুদ্ধজয় করিয়া অযোধ্যায় আসিলেন, রাজ্যগ্রহণ করিলেন, কিন্তু সুখোপভোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। পাণ্ডবের ভাগ্যেও রাজ্যলাভ করিয়া সুখভোগ করা হয় নাই। এখানে সীতার বনবাসের ন্যায় একটি অপূর্ব্ব ঘটনা সমাবেশ কিন্তু আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই না। সীতার বনবাসে বাল্মীক শেষবার তাঁহার অতুল প্রতিভা প্রোজ্জ্বলরূপে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর স্বর্গারোহণাদি নানাবিধ ঘটনার পর মহাগ্রন্থদ্বয় সমাপ্ত হইল। * আমরা পাইলাম কি ?—

রামায়ণে দেখিলাম,—দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতই জীবন, নিরবচ্ছিন্ন সুখাশা কেবল মরিচীকা মাত্র; তবে পাপের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় নিত্যসনাতন। হনুমানের মত ভক্ত, সেবক—লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতা জগতে অতুল। অন্যান্য সহস্র শিক্ষনীয় বিষয় পশ্চাতে রাখিয়া সর্ব্বোপরি 'শ্রীরাম-চন্দ্র ও সীতা' আমাদের জীবনে প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে পঠনীয়। রাজর্ষি জনকের প্রতিবিম্ব এই সঙ্গে বরণীয়। মহাভারতে,—'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়' শীর্ষবাক; পঞ্চভ্রাতা আদর্শ এবং সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ আদর্শ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের অমূল্য ধন। ভীষ্মদেবের প্রতিবিম্ব গ্রহণীয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে রামায়ণ ভক্তপ্রবর গরুড়ের আগমনে শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছিলেন, আর মহাভারতে মহর্ষি কি করিয়াছেন ?—এক, ভীষ্মদেবের পবিত্র মুখনিসৃত শান্তি পর্ব্ব, অর দিব্যজ্ঞানী পার্থের সম্মুখে সেই অনন্ত গুণসিন্ধু গীতোক্ত বিশ্বরূপ প্রকাশ! লঙ্কাযুদ্ধে মুক্তি সোপান স্বরূপ আমরা যেমন 'অকাল বোধন' পাইয়াছি, কুরুযুদ্ধে 'গীতা' এই অকুল সংসার মহার্ণবের প্রচণ্ড সন্দেহ-তরঙ্গে তেমনি আমাদের জীবনের কর্ণধার।

* প্রস্তাভাবে লইয়া আমরা উভয় শাস্ত্রের বিশ্লেষণও আলোচনা করিয়াছি বলিয়াই কেহ যেন লেখককে শাস্ত্রদ্বয়ের সত্য সম্বন্ধে সন্দেহাকুল মনে না করেন।

'গীত'ার জন্য দ্বাপরের নিকট জগৎ সম্পূর্ণ ঋণী। নীরস্থিত নির্লিপ্ত ননীর ন্যায় সংসারাশ্রমে থাকিয়া পূর্ণব্রহ্মে লীন হইতে গেলে গীতোক্ত ধর্ম্মই মানবের একমাত্র প্রশস্ত উপায়। বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি লোমকূপে যেমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তেমনই তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ বিনিসৃত অমৃতময়ী গীতার প্রতি অক্ষরে জগতের সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্বধর্ম্মের সার সঙ্কলিত।

ভাই হিন্দু! তুমি কাহার সন্তান, তাহা একটিবারও ভাবিয়া কি তুমি তোমার জীবনপথে অগ্রসর হও? তোমার ধর্ম্মবল যে জগতে শীর্ষস্থানীয়, তাহা ভাবিয়া কি তুমি মুহূর্ত্ততরেও হৃদয়ে বিমলানন্দ ও গৌরবাভাস উপলব্ধি কর না? পশ্চাতের দিকে শুধু চাহিলেই চলিবে না, তোমার জাতি কি ছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান আশীষ সমূহ লইয়া এস দেখি, আমরা জগতে জীবন-সংগ্রামে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াই! তোমারই পূর্ব্বপুরুষ-গণের রামায়ণ মহাভারতরূপ অপার কীর্ত্তি সমুদ্র থাকিতে, সেই সমুদ্র মথিত সুধা-স্বরূপ অকালবোধন ও গীতা থাকিতে নদী-নালায় জীবনতরী বাহিয়া কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া আয়ুকাল কর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে চাও? রামা-য়ণের মহাফল অকালবোধন ও মহাভারতের মহাফল শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা হিন্দুর গৃহে গৃহে সাত্ত্বিক ভাবে আচরিত ও আদৃত হইলে দুঃখের দিন আর রহিবে না। লোকে বলে, ভারতের ইতিহাস নাই, বিজ্ঞান নাই,—আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান তাহাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান করুন। মানব জাতিতে হিন্দুর স্থান কোথায় পার্থিব নশ্বর ঐশ্বর্য্যমুক্ত ক্ষুদ্রপ্রাণ মানব তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, তাই হিন্দু অসভ্য! ভাই সভ্য! জগতে কি চাও তুমি? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ?—হিন্দুরক্তের দাওয়ার জোরে নগণ্য দুর্ব্বল হিন্দু সন্তান স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে, চতুর্ব্বর্গের তুমি যাহা চাও,—দুর্গতি হারিণীর সাত্ত্বিক পূজায় তুমি তাহা নিশ্চিত লাভ করিবে, গীতা তোমাকে সেই ধনের চরমধনে ধনী করিয়া চরম পথে উপনীত করিয়া দিবে;—তখন তুমি আপনা হইতেই ভক্তিনম্রপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে বলিবে,—

"নমঃ সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলে দেবি সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

এবং পুলককম্পমান গদ্গদ কণ্ঠে—

"কস্মাচ্চ তেন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ॥
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে ॥"

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সমালোচনা।

চৌকিদারী টেক্‌সের আইন। (পঞ্চায়তের কার্য্যবিধি) রামপুর হাটের সব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশপ্রসন্ন রায় বি, এ, কর্তৃক প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তকে অতি সরলভাষায় গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ও চৌকিদারগণের কর্ত্তব্যের কথা এবং চৌকিদারী আইনের বিষয় বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। পঞ্চায়ত ও গৃহস্থগণ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই পুস্তক পাঠে আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের অনুরোধ, যাঁহারা সামান্য বাঙ্গালা জানেন, তাঁহারা এই পুস্তক এক এক খানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। দাম সুলভ, ছাপাও উৎকৃষ্ট।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সভা কার্য্য-বিবরণী। শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থগণের যে সভা হয়, সেই সভার কোন কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদের জন্য শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের আর একটি সভা হয়। সকল কাজেরই একটা প্রতিবাদ হওয়া ভাল। দোষদর্শী থাকিলে সাবধানে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার ইহাতে দুঃখ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। রাজা বিনয়কৃষ্ণও কায়স্থ সমাজের হিতকাঙ্ক্ষী। উভয় সভাই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই কার্য্য করিতেছেন। তবে মতভেদ অনিবার্য্য, চিরকালই হইয়া আসিতেছে। ভরসা করি, উভয় সভা মতভেদ ত্যাগ করিয়া একত্রে কার্য্য করিয়া কায়স্থ জাতির মঙ্গল সাধন করিবেন।

বীরভূমি

৩য় ভাগ]　　চৈত্র, ১৩০৮।　　[৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাধুর লক্ষণ।

ইত্যগ্রে আমরা 'কলিকাল' নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সহকারে দেখাইয়াছি যে, কর্ম্মভূমি ভারতে এখন কলি প্রবল হওয়াতেই দেশে কপট বেশধারী পেসাদার সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি ভণ্ডগণের এতাধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এই সকল ব্যক্তিকে ভিক্ষাদান করিলে, প্রকৃত দানের ফল পাওয়া যায় না। কেন না শাস্ত্রমতে তাহারা একবারেই ভিক্ষাদানের অপাত্র। বস্তুতঃ এই সকল ভণ্ডসাধুর দ্বারাই ধর্ম্মপ্রমাণ সরলহৃদয় লোক সকল অহরহঃ প্রতারিত ও উত্যক্ত হইতেছেন। তাঁহারা সাধুভ্রমে অসাধুর সৎকার করায়, আলস্যজীবী প্রতারকদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেশেরও সমূহ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। তবে কি বর্ত্তমান কালে ভারতে প্রকৃত সাধুর এককালীন অভাব হইয়াছে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ কলিতে যে, "পুণ্যমেক পাদম্''—এক পাদ পুণ্য থাকিবে। এখনও তপোবলে অদ্ভুত শক্তিশালী ২।৪ জন প্রকৃত সাধু প্রচ্ছন্নভাবে সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও তাঁহারা আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বসঞ্চিত বহু সুকৃতি না থাকিলে, প্রকৃত সাধুর সন্দর্শন লাভ ঘটে না। সুতরাং তাঁহারা প্রয়োজনানুরোধে কোন সময়ে লোকালয়ে আসিলেও দুরদৃষ্টবশে আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না। সাধুসমাগমের ফলও অনন্ত।

"গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বং সাধুসমাগমঃ॥"

পূতসলিলা ভাগীরথী জীবকৃত পাপ নষ্ট করেন; সুধাংশু চন্দ্রমা দ্বারা তাপের নাশ হয় এবং কামপ্রদ কল্পবৃক্ষ হইতে দারিদ্র্যদুঃখ নিবারিত হয় বটে, কিন্তু একবার সাধুসমাগম হইলে পাপ, তাপ ও দৈন্য কোন্ দিকে পলাইয়া যায়।

"জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং,
মানোন্নতিং দিশশতি পাপমপা করোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং,
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্ ॥"

সজ্জনের সহবাসে বুদ্ধির জড়তা দূর হয়; বাক্য সত্য হয়; মানোন্নতির উপদেশ লাভ হয়; পাপ দূর হয়; চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং সর্ব্বত্র যশ বিস্তারিত হইয়া থাকে। অতএব বল দেখি, সৎসঙ্গ পুরুষের কি না উপকার করিয়া থাকে?

সাধু সন্দর্শন ও সাধুসমাগমের ফল অনন্ত হইলেও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। অতএব সাধু চিনিবার শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ কি, অদ্য আমরা তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"প্রজহাতি সদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষুনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

ভগবদ্‌গীতা।

যিনি চিত্ত-নিহিত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং আত্মাতেই তুষ্ট থাকেন, যাঁহার চিত্ত দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, বিষয়-সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ বিদূরিত হইয়াছে; যাঁহার দেহাদি পদার্থে আদৌ স্নেহ-মমতা নাই; প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর লাভে যিনি প্রশংসা বা নিন্দা করেন না; যিনি সর্ব্বত্র নির্লিপ্তভাবে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; যিনি ইন্দ্রিয়গণকে কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় (কূর্ম্ম যেমন শিরঃপদাদি অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া লয়, তদ্রূপ) শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করণে সমর্থ, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায়।

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোহনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

যিনি কৃপালু (পরদুঃখ অসহিষ্ণু) অকৃতদ্রোহ (জীবমাত্রেরই উপর হিংসারহিত) তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল) সত্যসার (সত্যই যাঁহার বল) অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি দোষশূন্য) সম (সমদর্শী বা সুখদুঃখ হর্ষবিষাদ বর্জ্জিত) সর্ব্বোপকারক (যথাশক্তি সকলের উপকারী) কামে অহতধী (বিষয় সমূহ দ্বারা অক্ষোভিত চিত্ত) দান্ত (বাহ্যেন্দ্রিয় যাঁহারা সংযত) মৃদু (কোমলচিত্ত) শুচি (সদাচার পরায়ণ) অকিঞ্চন (অপ্রতিগ্রাহী) অনীহ (নিরীহ) মিতভুক্ (পরিমিত-ভোজী) শান্ত (সংযতান্তঃকরণ) স্থির (স্বধর্ম্ম নিরত) মচ্ছরণ (মদেকাশ্রয়; অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানেই নির্ভর করিয়া থাকেন) মুনি (মননশীল) অপ্রমত্ত (সাবধান) গম্ভীরাত্মা (নির্ব্বিকার) ধৃতিমান্ (বিপদেও যিনি ধৈর্য্যশীল) জিতষড়্‌গুণ (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, দেহের এই ষড়্‌বিধ ধর্ম্মকে যিনি জয় করিয়াছেন) অমানী (মানাকাঙ্ক্ষা শূন্য) মানদ (যিনি অন্যকে মান করিয়া থাকেন) কল্য (পরকে বুঝাইতে যিনি দক্ষ) মৈত্র (অবঞ্চক) কারুণিক (যিনি লোভ বা স্বার্থশূন্য হইয়া কেবল করুণাবশতঃই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন) এবং কবি (সম্যগ্‌জ্ঞানী) তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি দোষগুণ সমস্ত জ্ঞাত হইয়া বেদরূপ ভগবদাদিষ্ট কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ ঈশ্বরকেই ঐকান্তিকভাবে ভাবনা করেন, তিনিও ঐরূপ সাধুশ্রেষ্ঠ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ।

বঙ্গভাষায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের আসন অতি গৌরব-মণ্ডিত ও উন্নত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবে * যুগপৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বঙ্গ সাহিত্যের নব জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, তৎকালপ্রচলিত বিবিধ সম্প্রদায়িক কলহ, নিমাই চাঁদের সতাণ্ডব হরিগুণগানের মধুর আরাবে, বিলীন হইয়া গিয়াছিল। মনোহর সঙ্কীর্ত্তন-লহরীর মধুর ঝঙ্কারে এই ভগবৎ-প্রেমের কিরূপ সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রে বহু স্থান ব্যাপিয়া তাহার নিদর্শন ও প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের ন্যায় জগতের আর কোন ভাষার সাহিত্যে প্রেম এমন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হয় নাই। এই অপূর্ব্ব প্রেম-মদিরা পানে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বঙ্গীয় কাব্য-কাননের কলকণ্ঠ পিককুল একদিন যে মধুর তান ধরিয়াছিলেন, তাহার ঝঙ্কার,—যাহা অদ্যাপি দূরাগত নৈশানিল সঞ্চালিত বীণাধ্বণিবৎ।

'কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিয়া গো,
আকুল করয়ে মোর প্রাণ।'

বাঙ্গালীর কর্ণে চিরদিন মধুবর্ষণ করিবে। এ অফুরন্ত মধু চিরদিন অফুরন্তই থাকিবে। আর শ্যামের যে মধুর বাঁশীর রবে একদিন যমুনা উজান ছুটিয়াছিল, সে বাঁশীর কি যে অপূর্ব্ব শক্তি ছিল, আজ কে বুঝিবে? শচীনন্দন এক দিন যে প্রেমের বন্যা আনিয়া বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, যে বন্যার খরস্রোতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব ভাসিবা গিয়া এক অগাধ প্রেম-সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছিল, সে বন্যার পুনরাবির্ভাব কল্পনা করা যায় না সত্য, কিন্তু তাহার জের মিটিতে এখনো অসংখ্য যুগ বাকী, একথা বেশ বলা যাইতে পারে।

কথিত আছে, এই বন্যার স্রোতে, কিনা, চৈতন্য দেবের বিশ্বজনীন প্রেম ও

---

* বর্ত্তমান বর্ষের ৩য় সংখ্যক "বীরভূমির" ফুটনোটে ভ্রম ক্রমে 'গাভুরাণী'র পরিবর্ত্তে 'ঠাকুরাণী' লেখা হইয়া গিয়াছিল। প্রযুক্ত কথাগুলি 'গাভুরাণী' সম্বন্ধেই, 'ঠাকুরাণী' সম্বন্ধে নহে। ঐ মন্তব্যটির আদৌ প্রয়োজন ছিল না। দীনেশ বাবু স্বীয় উদারতা গুণে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন, আশা করিতে পারি।

ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হইয়া কয়েক জন একেশ্বরবাদী মুসলমান পর্য্যন্ত, স্বীয় ধর্ম্মাভিমান পরিত্যাগ করতঃ চৈতন্যের ধর্ম্ম-বৈজয়ন্তী তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ সাধু হরিদাস নাকি একজন মুসলমান। বৈষ্ণবগণের মধ্যে তাঁহাদের আরাধ্যের লীলাত্মক গাথা রচনার প্রথাটি সমধিক প্রচলিত। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াও কয়েকজন মুসলমান কবি চিরতরে বৈষ্ণব-জগতে স্মরণীয় (১) হইয়া রহিয়াছেন। সেরূপ কবির ৯ জনের নাম মাত্র এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত কি ছিল, জানা না গেলেও বৈষ্ণব-লীলাত্মক শব্দ রচনা করায় বঙ্গসাহিতে তাঁহারা 'বৈষ্ণব কবি' এই সম্মানিত আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস কি ছিল, অধুনা তাহার বিচারে কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব মহাজনগণের সুচিন্তিত পন্থানুসরণই উচিত বোধে, আমরাও বিনা বিচারে বৈষ্ণব পদাবলী-লেখক মুসলমান কবিগণকে এই প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত নামে অভিহিত করিলাম।

বঙ্গদেশে এমন গ্রাম নাই, যেখানে একজন না একজন কবি না জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশে যত কবির আবির্ভাব হইয়াছে, বোধ হয় সমগ্র ভারতেও তত কবির আবির্ভাব হয় নাই। আজও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গৃহস্থের প্রাচীন, কীটদংশনবিব্রত কাগজ রাশির অন্তরালে কত অসংখ্য কবির কঙ্কালসার নাম অজ্ঞাতে পড়িয়া আছে, কে বলিবে? একা আমি, নিভৃত স্থানে বসিয়া, ঈশ্বরের নাম মাত্র সহায় করিয়া অল্পদিন মধ্যে ৩০০ জন বাঙ্গালী কবির নাম আবিষ্কার করিয়াছি। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে এখন প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছে। আশা করা যায়, কয়েক বৎসর মধ্যেই বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের অনেক বিলুপ্তপ্রায় সম্পত্তির উদ্ধার হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইবে। চট্টগ্রামে প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিতে করিতে কয়েক জন পদাবলী-লেখক মুসলমান কবির সহিত আমার সাক্ষাতকার ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের রচিত পদগুলি ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে একথা বলা যাইতে পারে, যে শতাব্দীতে পদাবলীগায়ক

(১) ইহাদের নাম ও পদসংখ্যা এই :—(১) সৈয়দ মর্ত্তুজা ৪, (২) নসির মামুদ ২ (৩) আকবর সাহা ১, (৪) ফকির হবিব ১, (৫) সালবেগ ১, (৬) কবীর ১, (৭) সেখলাল, ১, (৮) ফতন ১, (৯) সেখ ভিখন ১। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি' দ্রষ্টব্য।

কোকিল-কুলের কুহুতানে বঙ্গীয় কাব্য-কানন মুখরিত হইয়াছিল, আমাদের আলোচ্যমান কবিগণও সেই শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পদাবলী সাহিত্যের শেষ সময়ের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহারা ধরাধামে মর্ত্তালীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব কবিতার সমালোচনা অনাবশ্যক। বৈষ্ণব সাহিত্যামোদীর চক্ষে এ সকল কবিতার সৌন্দর্য্য অসামান্য। আমাদের অলোচ্যমান কবিগণ তেমন উচ্চশ্রেণীর কবি না হইলেও, তাঁহাদের পদনিচয়ের ভাষা ললিত, ভাব কোমল ও মর্ম্মস্পর্শী, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াও তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

নিম্নে আমরা কয়জন কবির পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পদগুলির স্থানে স্থানে অশুদ্ধিশোধন করা গিয়াছে। একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, যুগে যুগে রূপান্তরিত সংস্কৃত হইতে পদগুলির মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব বিলুপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সহজ ও মার্জ্জিত আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক মাত্রই আমাদের এ মতের সমীচীনতা স্বীকার করিবেন, আশা করা যায়।

আমাদের আবিষ্কৃত কবিগণের সংখ্যা বেশী। তন্মধ্যে এই কয়েক জনই প্রধানঃ—সৈয়দ আইনদ্দিন, মীর্জা ফয়েজুল্লা, আফঝল আলি, সৈয়দ মর্ত্তুজা, নাছির মাহাম্মদ, সৈয়দ নাছিরদ্দিন, হাসিম, গয়াজ, আলাওল, সেরচাঁন্দ, আলি রাজা, মহম্মদ আলি, মোছন আলি, কমর আলি এবং সৈয়দ সুলতান। ইঁহারা ভিন্ন অনেক হিন্দু কবির পদাবলী আমরা পাইয়াছি। এই সকল পদাবলীর কয়েকটি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমা' ও 'সাহিত্য'সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও অনেক পদ প্রকাশের বাকী আছে। এ সকল পদ প্রকাশে 'পূর্ণিমার' অনিচ্ছা দেখিয়া আমরা 'সাহিত্য-সংহিতার' আশ্রয় লইয়াছিলাম। কিন্তু কি কারণে জানি না, প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার যে সভার একতম মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই সভার মুখপত্র 'সংহিতা'ও অবশেষে পদগুলির প্রকাশে বিরত হইয়াছেন।

১। মীর্জা ফয়তুল্লা (মীর্জা কাঙ্গালী) পদ সংখ্যা—৫

ধানশী।

সজনি সই, কানু সে প্রাণধন মোর। ধুয়া।

যে বলে বলুক মোরে   যে করে করিব নিজপতি

সকলি ছাড়িয়া মুই,   কানুর শরণ লই,

তোমরা যথেক সখী, ঘরে যাও কুল রাখি,
কানুর ভাবে হৈয়াছি বিভোর।
শুনিতে বাঁশীর গান, দ্রবীভূত হএ পাষাণ,
রমণীর প্রাণ কথ দড়।
চিত্ত উতরোল দেখি চৌদিকে পলকে আঁখি,
সকলি দেখি এশ্যামরায়।
মনে হেন সাধ করে, নিত্য দেখি বন্ধুয়ারে
ভজিতে না পারি রাঙ্গা পায়॥
মীর্জা ফয়জুল্লা বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী,
মনে ভাব মন্দিরে বসিয়া।
জীবন জোয়ারের পানি, তরল তরঙ্গ জানি,
ঐ রাঙ্গা চরণ ভজিয়া॥ ১।

তুড়ী।

দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়া।
এরূপ যৌবন, করিএ নিছন,
শ্যামপদে ভজ গিয়া॥ ধুয়া।
মোহনিয়া কালা মোহনিয়া মালা,
মোহনিয়া বাঁশী বাজায়।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, দিতে নারি সীমা,
* * *
কপালে চন্দন, মদনমোহন
মজাইল গোকুল ধাম।
মকর কুণ্ডল অরুণ মণ্ডল,
মূরছিত কোটি কাম॥
বচন শোভা মুনি মনলোভা
আনন্দ রসেরি দান। (?)
* * *
বাঁশের বাঁশী, গরলরাশি
যুবতী বধিতে পাশী।

শুনি বাঁশীর ধ্বনি, গোকুল রমণী,
বিনি মূলে হয় দাসী ॥
মীর ফয়জুল্লা ভণে, লাগিল নয়ানে,
কেমতে ধৈরজ ধরি, শ্যাম সোণা হেরি ॥*

রামকেলী (সুহই)।

কিরে শ্যাম এমন উচিত নহে তোমার। ধুয়া।
অঘোর সাঁজুয়া বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা,
সাঁচা যদি না আছিল মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এথ:দুঃখ না সহে পরাণে ॥
যখনে পিরীতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্ন ভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে ॥ (২)
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, আনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া।
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া ॥৩।

রামক্রিয়া।

চল দেখি গিয়া, রূপ বন্ধু চল দেখি গিয়া।
কিরূপে ধরাইমু হিয়া শ্যামে না দেখিয়া ॥ ধু।
মালতীর মালা গলে শোভি আছে ভালা।
মুখখানি পূর্ণিমা শশী বরণ চিকণ কালা ॥
সাক্ষী হৈও সাক্ষী রৈও এ পাড়া পড়শী।
শাশুড়ী ননদীর বাদে হৈলাম দেশান্তরী ॥
কদম্বের ডালে বসি বাজায় মুরলী।
আবরিছে কদম্বের পত্র সারি সারি ॥

* "তোমার কঠিন মন, মোরে হও বিস্মরণ,
দুখেমে পিরীতি তোর সনে।" পাঠান্তর।

মীর ফয়জুল্লা কহে মনেতে ভাবিয়া।
দেখ দেখি শ্যামরূপ জলে চল গিয়া ॥ ৪।

আর একটী পদের পাঠ বড়ই ভ্রান্তিপূর্ণ বোধ হওয়ায় এখন দিলাম না। *

২। সৈয়দ নাছিরদ্দিন। পদসংখ্যা—২।

গান্ধার।

আলোরে পরাণের পোতলী বন্ধু,
তুলি মোর ললাটের ফোটা।
দৈবে সে বন্ধের লাগি, হৈয়াছম বৈরাগী,
তাতে কিবা লাজ খোঁটা ॥ ধুয়া।
পিরীতি অবশেষ, না রহিমু এই দেশ,
আনল দিয়া যাইমু ঘরে।
নিতি রাধার মন, করে উচাটন,
বাহির হইমু হইমু প্রাণে করে ॥
করেতে কঙ্কণ, নয়ানে আঞ্জন,
পিন্ধনে পাটের শাড়ী।
করেতে মন্দির, চরণে নেপুর,
কেনে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
অন্তরে আগুনি বাহিরে আগুনি
আগুনি এ দশ দিশ।
নাছিরদ্দিন এ মিনতি ভণএ
দয়া না ছাড়িও শেষ ॥ ১।

দীপক।

রূপের নিছনি মানি রাই।
ঐ রূপ রসিয়ার সঙ্গে কে দিব মিলাই ॥ ধু।
যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর।
অবিরত তনু ক্ষীণ হিয়া জর জর ॥

* এই প্রবন্ধান্তর্গত দুই একটী পদ পূর্ব্বে 'পূর্ণিমায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন কোন কোন পদের স্থানে স্থানে অশুদ্ধি বা অপূর্ণতা ছিল। এবার যথাসাধ্য বিশুদ্ধরূপে প্রচার করা গেল।

তরুয়া কদম্বতলে অই রূপ রঙ্গিমা।
নানা রস বাঁশীর স্বনে দিতে নারি সীমা॥
কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পূরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লা পদে করিয়া ভকতি॥ ২।

৩। সের চান্দ। পদসংখ্যা—১।

ললিত।

পন্থ ছাড় ঘরে যাইরে নিলাজ কানাই। ধু।

মাথায় পাসরা করি,
চলিছ গোপালের নারী,
কোথায় তোর ঘর বাড়ী।
মথুরাতে যাইতে চাহ,
কিছু দান দিয়া যাহ,
অনাদানে ছাড়িতে না পারি॥
হওম মুই গোপালের নারী,
গোকুলেতে ঘর করি,
মথুরাতে করি হাট ঘাট।
চিরকাল এই পন্থে,
না দেখেছি দান লৈতে,
আজু কেনে নিরোধিছ বাট॥
তুমি ত নন্দের সুত,
কর্ম্ম কর অদভুত,
পন্থ মধ্যে কর বাটোয়ারি।
রাজা আছে কংসাসুর,
বড়াই করিব চুর,
পাছে দোষ না দিও আমারে॥
হীন সের চান্দের বাণী,
শুন রাধে ঠাকুরাণী,

তরিতে পাতকী লোক,
না ভাবিও মনে দুখ,
কানু বিনে গতি নাহি আর ॥ ১।

৪। মহম্মদ আলী। পদসংখ্যা—১।

গুর্জ্জরী।

নাগর কানাইরে,
কি দেখিলুম যমুনার ঘাটে ॥ ধু।
জঙ্গম মেঘের আড়ে, যুগল খঞ্জন নাচেরে,
তা দেখিয়া মোর হিয়া ফাটে ॥
যমুনার জলে যাইতে, বৃষ্টি পাইল রাজপন্থে,
ধোলাইল শিরের সিন্দূর রে।
বেহানে পড়িল বাধা, কেনে গেলুম কলঙ্কী রাধা,
শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ মোর পড়ি গেল ঢেশা রে ॥
পদ পরে পদ থুইয়া, কদম্ব হেলান দিয়া,
বাজাএ বাঁশী প্রিয়া নাম লৈয়া রে।
দংশিল অনঙ্গ নাগে, বেদমন্ত্র নহি লাগে,
বিষে ছাইল সর্ব্ব অঙ্গরে ॥
মহম্মদ আলীএ ভণে, না ভাবিও দুঃখ মনে,
ভাব প্রভু এক সার রে ॥ ১।

৫। সৈয়দ মর্ত্তুজা। *

ইনি অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটা ইতিপূর্ব্বে 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পদগুলি এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে। †

* বিগত মাঘ মাসের 'সুধা' নাম্নী পত্রিকার শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মুরশিদাবাদবাসী এক সৈয়দ মর্ত্তুজার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বীঃ সঃ।

† ইনি রমণী বাবুর প্রকাশিত কবি 'মর্ত্তুজা' হইতে ভিন্ন ব্যক্তি কি না, জানি না। রমণী বাবুর গ্রন্থে প্রকাশিত কোন পদ এখানে পাওয়া যায় নাই। দুইজন অভিন্ন হইলে ইনি যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নচেৎ ইঁহার এতগুলি পদ এখানে পাওয়া সম্ভব হইত না।

ভাটীয়াল।

হেলায় হারাইলাম বনমালী
পাইয়া স্বপনে রে নাথ। ধু।
শিঙ্গা বাজে বেণু বাজে আর বাজে করতালি।
মথুরা নগরে বাজে আনন্দ ধামালী॥
যমুনার ঘাটে গেলুম হাতে স্বর্ণ-ঝাড়ি।
ভরমে হারাই আইলাম হাতের কুম্ভবারি॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে ওহে বনমালী!
পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ডালি॥ ১।

ধানশী।

ও কুলের বধূরে!
মজালি মজালি মজালিরে জাতি কুল॥ ধু।
একেত কুলের বধূ আর ত অবলা।
কতেক সহিমু নাথ কলঙ্কের জ্বালা॥
ঘরে গঞ্জে গুরুজন, বাহিরে রবির তাপ।
পরের পিরীতি নাথ আন্ধার ঘরে সাপ॥
ঐ কুলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী।
উড়ি যাইতাম সাধ করে পাখা না দেএ বিধি॥*
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে মনেত ভাবিয়া।
তন জ্বলে মন পোড়ে ঐ বন্ধের লাগিয়া॥ ২।

গড়া (বিহাগড়া ?)।

সোণা বন্ধের কি হৈল বেয়াধি।
তাহার ঔষধ তোমরা কেহ জান যদি॥ ধু।
আমি ত অবলা নারী কিছু ত নাহি জানি।
হৃদের অন্তরে আছে প্রেমের আগুনি॥
ধন্বন্তরর পাশে যাই চাহ জিজ্ঞাসিয়া।
তারা নি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া॥

(৬) "ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।

ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুনরে কামিনী ।
তোমারে দংশিয়া আছে প্রেমের আগুনি ॥ ৩ ।

শুহিনী ভাটিয়াল ।

পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই ।
কানাই মোরে পার কররে ॥ ধুয়া ।
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার ।
নয়ালি যৌবন দিমু কানাই খেবার পাই পার ॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকাকিনি ।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে রাধে গোপালিনী ।
কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যথ গোপালিনী ॥ ৪ । (?)

বিভাস ।

ঝামরু কেন রে দেখি হরি নন্দলাল । ধু ।
নন্দের নাগর গুণের সাগর
ঝামরু কেনরে দেখি ।
রাধার ব্রজহরি, সখী সবে বেড়ি
রাধার কাননে করে কেলি ॥
চূড়ার উপরে মালতীর মালারে
* * *
আমি একেলা নারী বন্ধের ভাবে মরি
চিন্তা না করিএ * মন্দা ।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কয় পর কি আপনা হয়,
প্রেমে মজি সবে করে ধান্ধা ॥ ৫ ।

ক্রমশঃ ।

শ্রীআবদুল করিম ।*

* এই মহাত্মার সম্পাদিত "রাধিকার মান ভঞ্জন" নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"শ্রীআবদুল করিম চট্টগ্রামে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত । তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে । তথাপি তিনি সাহিত্য সেবায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন । বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না । তিনি মুসলমান হইয়াও হিন্দুর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত । * * * তিনি

জাল প্রতাপ চাঁদ।

ব্রহ্মযুদ্ধের পর ইংরাজ জানিতে পারিল যে, প্রতাপ চাঁদ জীবিত আছেন।

ব্রহ্মার মুলুকে খেলা যেই হইল প্রকাশ।
জানিল জানরেল তাহা করিয়া নির্য্যাস ॥
প্রতাপ চন্দ্র জীবিতমান থাকা হইল সত্য।
কভু মিথ্যা নয় কথা সবে জানি তথ্য ॥
পশ্চাৎ প্রমাণ হেতু ধরা সুরতহাল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ বান্ধা মিটাইতে জঞ্জাল।

ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন।

তথা হইতে চলিলেন কামরূপ কামাক্ষ্যা।
যোগ যাগে তন্ত্রমন্ত্র আদি করি শিক্ষা ॥
তদন্তরে দেব রাজা নেপাল ভুপাল।
হেরিয়া নাথ বদরিনাথ সহিত হেমতাল ॥
চন্দ্রশেখর চিত্রকুট হরিদ্বার।
কাশী কাঞ্চি প্রয়াগ অযোধ্যা সরযূপার ॥
ব্রজধাম বৃন্দাবন গোকুল মথুরা।
মিথিলা জনকপুর দ্বারকা শিঙ্গারা ॥
গোকরণ নাথ জালামুখী বৈদ্যনাথ।
নানা তীর্থ নানা দেশ ভ্রমিয়া পশ্চাৎ ॥
বন উপবন আর পর্ব্বত পাহাড়।
নানা বেশে পরবাসে করিয়া বিহার ॥

এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় কোন জর্ম্মান এডিটর এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমরাও বলি, আবদুল করিমের স্থায় লোক ভারতে দুর্লভ। ভগবান ইঁহাকে সুখী করুন। বীঃ সঃ।

লাহোর গঞ্জার সে মুলুক পেশোয়ার।
সিংহকুল রণজিৎ নাম, তার অধিকার॥
কাশ্মীর কাবুল চীন কনুজ কান্দাহার।
গৌতগঞ্জ কুটী আওমিলও (?)সহর॥
কান্দপুর বাস বিতালি ভগবন্ত নগর।
হিমাদ্রি পর্ব্বত হিমালয়ের উত্তর॥
মণিপুর সেতুবন্ধ তৈলঙ্গ কর্ণাট।
কাঞ্চীপুর নগর কান্তি দ্রাবিড় গুজরাট॥
মুলতান দিল্লী লক্ষ্ণৌ বোম্বাই ইবান।
তুর্কিস্থান মক্কা মদিনা মাধাই।*

হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিয়া প্রতাপ চাঁদ দিল্লীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং সাহা আলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রণজিৎ সিংহের নিকট সুপারিশ পত্র গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎ ব্যাপার কিছু বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ; তজ্জন্য গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা পাঠককে জানাইব।

শ্যাম সাহি অতিক্রম করিয়া তখন।
অবশেষ রূপ মধ্যে দিয়া দরশন॥
নির্জ্জন নিবাসী দোঁহে বিচারিয়া মনে।
দিল্লীর ঈশ্বর আসি মিলিল সেখানে॥

---

* বোধ হইতেছে, যতগুলি স্থানের নাম গ্রন্থকরের জানা ছিল, সমস্ত গুলিতেই তিনি প্রতাপ চাঁদকে ভ্রমণ করাইয়াছেন। জাল রাজা আদালতে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া যে দরখাস্ত দেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ ও আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে অদ্দি নাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় একবৎসর থাকি। তাহার পর জৈন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বাণেশ নাথ মহাদেবের নিকট একবৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চল যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গলাজ, জ্বালামুখী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি। শেষে কাশ্মীরে যাই। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর হিন্দুস্থানে আসি। জাল প্রতাপ চাঁদ, ৩য় সংস্করণ, ১২৮ পৃষ্ঠা।

পাঠক দেখিবেন, উভয় বর্ণনা অনেকটা মিলিতেছে। তবে অনূপ চন্দ্র অনেক বেশী কথা বলিয়াছেন।

একত্রে মিলন তিনে থাকি মৌন ভাবে।
আপন আপন পরিচয় পত্র লিখি তবে॥
ম্লেচ্ছে নাশিল ধর্ম্ম অধর্ম্মে ধরণী।
শস্যহীন প্রজা, কষ্টে ধ্বংস হয় প্রাণী॥
তুমি ধর্ম্ম অবতার এ মহীমণ্ডলে।
কর সূক্ষ্ম সুবিচার দণ্ড করি খলে॥
সর্ব্বশুভা অনুমতি লইয়া প্রার্থনা।
প্রভাব লাঘব কর করিয়া মন্ত্রণা॥
পূর্ব্বদ্বারে আরজ বেগীর হস্তে পত্র দিয়া।
ছল করি পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া॥
সাহি তক্তে সাহা বসি প্রতাপে প্রচণ্ড।
পলকে করিতে পারি ক্ষিতি লণ্ডভণ্ড॥
একরূপে সেই ঘটে থাকি অধিষ্ঠান।
আর রূপে প্রতাপ চন্দ্র ভূপতি নিশান॥
এইরূপে বর্ষ এক করি গতায়াত।
নিত্য নিত্য দেখি রঙ্গ কহিলা পুছে বাত॥
একদিবস চিন্তামণি চিন্তেন তখন।
সাহা ঘটে সরস্বতী করেন আকর্ষণ॥
বলে বিভাবরী গতে যদি কোন নর।
হরিণ শীকার করি ধরয়ে নজর॥
আগে তার মনোবাঞ্ছা পূরাব্ সেখানে।
অলঙ্ঘন এই বাক্য শুন সর্ব্বজনে॥
ইতি মধ্যে শুন কিছু পরমের তরঙ্গ।
প্রতাপ চন্দ্র রূপ ধরি চড়িয়া তুরঙ্গ॥
নিশাভাগ রাত্রি যোগে প্রবেশি কানন।
কুরঙ্গ শীকার করি আনন্দিত মন॥
নিশি অবশানে মন যাইতে হুজুর।
লইয়া শীকার অগ্রে গমন সাহাপুর॥
প্রত্যূষ বিহানে সাহা ত্যজি অন্তঃপুর।

আগে আসি দৃষ্টি করি পরে জিজ্ঞাসয়।
কে তুমি কি জন্য আসা দেহ পরিচয়॥
দৃষ্ট মাত্র নয়ন নিমিষহারা হয়।
মন প্রাণ ঐক্য মহাভাব উপজয়॥
ত্রিদশের নাথ মনে হয় ক্ষণে ক্ষণ।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি বিবরণ॥
পূর্ব্ব করমের ফলে বুঝি হে উদয়।
না কর তঞ্চক সত্য যদি হে সদয়॥
কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত স্তবে তুষ্ট নারায়ণ।
অস্থ পরিচয় দেন শুন দিয়া মন॥

পদং।

ভকত ভাণ্ডারে, ভিক্ষা করি ধন, করি বিতরণ
তুমি দুঃখী জন। ধুয়া।
আমি সহজে কাঙ্গাল হলে সে বেহাল,
তবু হে দয়াল বলে সর্ব্বজন। পরঞ্চ।
গুণহীন নিগুণ নির্ব্বিবাগী মন।
তুমি তার মন মাঝার ভাবে আপন॥
আমি নাশি তার যাতনা মনের এই মন্ত্রণা
কর বিবেচনা, উচিত যেমন। চিতান।
এইত আশ্বাস করহে বিশ্বাস
কহি তব পাশ মম বিবরণ॥
হও যদি সপক্ষ বিনাশি বিপক্ষ
তোমা বিনে সখ্য কে আছে এমন।
বর্দ্ধমান ধামে তেজশ্চন্দ্র নামে
বাজাধীরাজের আমি হে নন্দন॥
আমার সঙ্গে স্বরূপাঙ্গ আর তাহে সঙ্গ
দিল্লীর ঈশ্বর ধর্ম্মের নন্দন।
বর্ষ এক হয় লিখি পরিচয়
মনের বাসনা যত।

আসি পূর্ব্বদ্বারে আরজ বাগী করে
সে পত্র দিয়া তুরিত ॥
দেখিয়া শৈথিল্য বুঝি হে তাচ্ছিল্য
মনে মনে অনুমানি।
প্রতিজ্ঞা বচন শুনিয়া তখন
হরিণ শীকার আনি।
কর অবগতি এইত ভারতী
আরতি তব গোচর।
মনের মানস করহে সন্তোষ
ত্যজিয়া কপট অন্তর ॥
শুনি সাহা আলি সুরস পাঁচালি
মন কুতূহলী কত।
বলে সুপ্রভাত জগতের নাথ
ক্ষম অপরাধ যত।
অতি ক্রোধ ভরে চলিয়া সত্বরে
বার দিল সিংহাসনে।
পাত্র মিত্র যত সবে সশঙ্কিত
উপনীত সেই ক্ষণে ॥
করে কানা কানি কি দোষ না জানি
ঘটিল কপাল গুণে।
করি কৃতাঞ্জলি কম্পে কত অলি
কপালে আঘাত হানে ॥
দ্বারপাল যত হইল বিরত
সঘনে ফুৎকার করে।
চতুরঙ্গদল সবে সচঞ্চল
টলে মহী পদভরে।
বিহন্দ বিহন্দ পহরা প্রবন্দ
উদ্ধ ধুদ্ধ জেদবার। (?)
ভয়ে ভয়ঙ্কর শুনে লাগে ডর
জরাসিন্ধু কারাগার ॥

কে করে উদ্দেশ করয়ে কুর্ণিশ
বাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে।
ফুকারে নকিব পশু পক্ষী জীব
সবে ভিত চিত রাখে॥
আগে জোড় হাত করে প্রণিপাত
সভাসদ পাত্র ভবে।
কহে মৃদুভাবে কি আজ্ঞা এ দাসে
প্রকাশ বুঝিব ভাবে॥
হইল ইঙ্গিত আহ তুরিত
পূর্ব্ব দ্বারে আরজ বেগী।
পেয়ে কার যুক্তি বিবাদীর পত্রী
ছাপিয়া রাখে কি লাগি।
বর্ষ এক হয় কি সাহসে রয়
করিয়া হুকুম রশুল।
বিবাদীর স্থানে পাইয়া সন্ধানে
তেঁহ করি এত ভুল॥
দুষ্ট হারামজাদে গাড়িব এক খাদে
তার যত পরিবার।
প্রাণ রক্ষা পায় সত্য যদি কয়
এই বাক্য সারোদ্ধারে॥
ভয়ে মন বিবাগী কহে আরজবেগী
ক্ষমা কর অপরাধ।
ফিরিঙ্গির ফাঁকি না বুঝে এত কি
পাছে হবে বিসম্বাদ।
বিবাদীর পাঁতি সম্মুখে সম্প্রতি
হেহুরে বাখিন। (?)
যেবা ইচ্ছা হয় কর মহোদয়
আমী দোষী দীন হীন॥

* সাহা আলি কে তাহা বুঝিলাম না।

অগ্রেতে জানিতাম তবে কি করিতাম
এমত দুর্নীত কর্ম্ম।
ফিরিঙ্গির বোলে নিষ্কলঙ্ক কুলে
দৈব যোগে হত ধর্ম্ম॥
দিন দুনিয়ার কর্ত্তা ভারতবর্ষ ভর্ত্তা
বিনা ছায়া নাই গতি।
ধরি তব পায় রক্ষা কর দায়
বারেক রাখ মিনতি॥
দেখিয়া কাকুতি আরজবেগী প্রতি
ঈষৎ ইঙ্গিত হয়।
প্রাণ রক্ষা পায় প্রভুর কৃপায়
পলাইল দুরাশয়॥
শ্রীহস্তের পাতি করি কত স্তুতি
শিরে বাঁধি বারে বার।
যে ভার আমার প্রতি কুলার আরতি
সত্য এই অঙ্গীকার॥
আমি কে তুমি কে কোথা বা আছে কে
কেহ ত্যজি প্রবঞ্চক।
শ্রীমুখের সুবাণী জুড়াক হৃদি শুনি
ঘুচাও হে মন তঞ্চক।
কহেন তখন শুন দিয়া মন
ঈশ্বরস্থ বচ সত্য।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভার করিতে বিচার
বিদুর অবতার বর্ত্ত॥
তব সেনাপতি ভীম মহামতি
মুলুক পেশোয়ারে বাস।
রমণী বল্লভ সিংহ কুলোদ্ভব
রণজিত নাম প্রকাশ॥
কর অনুভব তৃতীয় পাণ্ডব
অবতীর্ণ সেই কুলে।

আজানুলম্বিত   বাহু সুললিত
  নওলে হাল নাম বলে ॥
পিতা খড়্গ সিংহ   মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ
  অভিশাপে জন্ম তার।
সে সব বিস্তার   অতি চমৎকার
  উপপুরাণোক্ত সার ॥
পাণ্ডব কুরু কুল   উভয় সমতুল
  যদু রঘুকুল তায়।
শ্রীরাম লক্ষণ   ভরত শত্রুঘ্ন
  চতুর্থাংশে যে উদয় ॥
শুনহে বৃত্তান্ত   সুগ্রীব হনুমন্ত
  বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল।
জাম্বুবান কাছে   বিভীষণ আছে
  সকলে হয়ে বিভোল ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী   সত্যভামা খ্যাতি
  রুক্মিণী জনকসুতা।
ব্রজের ব্রজেশ্বরী   সহ সহচরী
  বৃকভানুর দুহিতা ॥
শ্রীদাম সুদাম   দাম বসুদাম
  স্তোক কৃষ্ণাদি নাম।
আর যে সুবল   দ্বাদশ গোপাল
  সঙ্গী তাহে বলরাম ॥
সনক সনাতন   ব্যাস তপোধন
  নারদ বশিষ্ঠ আদি।
হরজে (?) ঘরণী   সহিত আপনি
  করিতে নিরাশ বাদী ॥
যথা যার উদয়   তার পরিচয়
  পশ্চাৎ জানিবা তুমি। *

* গ্রন্থকারের মতে দেবগণ ম্লেচ্ছ বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আদেশি ভ্রমণ এ চৌদ্দ ভুবন
চৈতন্ত চেতন আমি।
শুনি পরিচয় সরস হৃদয়
সাহা আলি আলম পনা।
নিজ সেনাপতি রণজিত ভূপতি
লিখি তারে পরোয়ানা॥
বর্দ্ধমানবাসী প্রতাপচন্দ্র আসি
উদিত আমার পুরে।
ম্লেচ্ছ নাশিতে সহায় করিতে
এ ভার তোমার উপরে॥
না পারিবে যবে আমারে লিখিবে
স্বয়ং সহকারী হব।
সর্ব্ব সৈন্ত লইয়া পাছু গোড়াইয়া
সেক্ষণে আমি যাব॥
এই অনুমতি দিল তব প্রতি
ইথে না করিহ হেলা।
বাক্য বারম্বার হইবে হুসার
পরমের পরম খেলা॥

প্রতাপচন্দ্র এই পরোয়না প্রেরণের পর সন্ন্যাসীর বেশে রণজিৎ সিংহের ·ট পূর্ব্বেই উ .স্থিত হয়েন।

করিল রওনা সত্য পরোয়না
ইচ্ছারূপ হয়ে হরি।
তথা অপ্রকট রণজিৎ নিকট
উপনীত আগে সারী॥

রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ।

আচম্বিত দেখি রূপ আনন্দে রণজিত ভূপ,
আগে সরি করি নতি স্তুতি।
বসিতে দিব্যাসন যোগাইল তত্ক্ষণ
পাদ্যার্ঘ সুগন্ধি আরতি॥

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ]   বৈশাখ, ১৩০৯।   [৭ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	নাগোর সমাধি।	(শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী)	১৭৫
২।	মায়া ফাঁস।	(শ্রীরামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়)	১৮০
৩।	জাল প্রতাপচাঁদ।	(সম্পাদক)	১৮২
৪।	গ্রন্থ সমালোচনা।	(ঐ)	১৯৫
৫।	শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।	(শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী) ...	২০৫

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা   এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা

৩য় ভাগ]　　বৈশাখ, ১৩০৯।　　[৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

নাগোর-সমাধি।

মহম্মদীয় শাস্ত্র সমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, আরব্যান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ মক্কা ও মদিনা নগরী ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন স্থানে মুসলমানের তীর্থক্ষেত্র নাই; কিন্তু এই সুবিশাল জগতের দিগ্‌দিগন্তর পরিব্রজন করিতে করিতে ইশলামীয়গণ যে সকল স্থানে ভগবৎপরায়ণ সাধুদিগের আশ্রম ও সমাধি অথবা স্বদেশ-হিতৈষী কিম্বা প্রকৃত স্বধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা-দিগের পবিত্র লীলা-ক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা "স্থানীয় তীর্থ" বলিয়া পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন; এই জন্য কার্ব্বোলার সুপ্রশস্ত ময়দান, সিংহলের "দাদা" পাহাড়ের অদ্ভুত পদাঙ্ক, আফ্রিকার পীরশ্‌ অরণ্যানীর চিরযৌবন সমাযুক্ত কোমল শষ্পাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ড প্রভৃতি তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত। বস্তুতঃ মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত বলবতী ও বেগবতী হইয়া উঠে এবং ভগবৎজ্ঞান যখন সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার পূর্ব্বক অতি প্রকীর্ণ ভাবে সর্ব্বতোমুখী হইয়া প্রসারিত হয়, তখন মানবজাতি প্রত্যেক পবিত্র জীবে, প্রত্যেক পবিত্র পদার্থে এবং প্রত্যেক পবিত্র স্থানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রতিভাষিক সত্বাকে সুন্দররূপে প্রতিফলিত দেখিতে পান। এই জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে মুসলমানের তীর্থক্ষেত্র বিরাজিত। যে জাতি তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানের পরে অশীতি বৎসর গত না হইতে হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অমিত অধ্যবসায় সহ-কারে স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল এবং যাঁহাদের মোল্লা মৌলবী, হাফেজ, হাজী প্রভৃতি প্রচারকগণ নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অধিবাস বা উপনিবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি কখনও একটি কিম্বা দুইটি তীর্থ স্থানের মহাত্ম্য লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন? হিন্দু-স্থানে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের তীর্থক্ষেত্রের সংখ্যা কম নহে; রাজপুত-নান্তর্গত আজমীরের সুপ্রসিদ্ধ খাজে সাহেবের দরগা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলান্ত-

ভুক্ত এটা (Etah) জেলার অন্তঃপাতী জলেশ্বরের সুবিখ্যাত সমাধি, দক্ষিণ ভারত রাজ্যের সীমাভুক্ত সালেমের (Salem) দর্‌গা, পেশোয়ারের ফকির—নেওয়াজ প্রভৃতি মুসলমানের অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; কিন্তু নাগোর-সমাধি ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুসলমান এইস্থানে গমনাগমন করেন; আজমীরের কিম্বা সালেমের তীর্থ নাগোর সমাধি হইতে প্রাচীনতর হইতে পারে, কিন্তু শোভা, সম্ভ্রম, প্রখ্যাতি এবং পবিত্রতায় নাগোর সমাধি বৃহত্তম। ভারতবর্ষে এতদপেক্ষা মুসলমানের আর বড় তীর্থ নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

নাগোর-সমাধি দর্শন করিতে হইলে নাগোর নামক গ্রামে উপস্থিত হইতে হয়। নাগোর কোথায়, তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে গিয়া তাঞ্জোর (Tanjore) ষ্টেশনের টিকিট লইতে হয়; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তাঞ্জোর বা তাঞ্জোয়াবার একটি প্রসিদ্ধ নগর। সেই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বাষ্পীয় শকট বদ্‌লাইতে হয়, তদনন্তর তাঞ্জোর হইতে একটি ক্ষুদ্র শাখা (রেলওয়ে) লাইন দিয়া নেগাপটম্ (Negapatam) পর্য্যন্ত যাওয়া আবশ্যক। মাদ্রাজ হইতে নেগাপটম বা নাগপত্তন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হইলে দশ ঘণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং সামান্য মাত্র চারিটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয়ে টিকিট ও আহারের বন্দোবস্ত হইতে পারে। নাগপত্তন একটি ভুবনবিখ্যাত বন্দর, ইহা সমুদ্র কূলে অবস্থিত এবং দেখিতে অতীব নয়নানন্দদায়ক। তাঞ্জোর জেলার অধীনে ইহা একটি বিখ্যাত মহকুমা। যাহাহউক, তদ্দেশীয় "জট্‌কা" নামক এক প্রকার অদ্ভুত অশ্বযানে নেগাপটমে আরোহণ পূর্ব্বক ন্যূনাধিক সার্দ্ধেক পঞ্চ মাইল দূরে গেলে নাগোরে উপস্থিত হওয়া যায়। রাস্তাটী আপদ্ শূন্য এবং প্রশস্ত ও পরিষ্কার। এক সময়ে ফরাসীরা নাগোরের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে ইহা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত। নাগোর হইতে একটু দূরে যাইলে ফরাসিদিগের কারিকোল এবং দিনেমারদিগের ট্রাণ্‌কুইভার (Tranquevar) রাজ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাগোরকে একটি বৃহৎ গ্রাম বলিলেই হয়। ইহার প্রায় বার আনা মুসলমান এবং বাকি চারি আনা হিন্দু ও অপরাপর জাতি। গ্রামে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ আফিস, ডাকখানা, থানা, ছোট স্কুল, বাজার এবং আবকারী বিভাগ ভিন্ন কোন কাছারী বা আদালত নাই। এই গ্রাম

নেগাপটন মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। যেথানে গাড়ী হইতে নামিতে হয়, তাহা সমাধি-মন্দিরের প্রথম দ্বার (ফটক) হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে অবস্থিত। এই সীমানার পরে কোন প্রকারের যান লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে অম্বরাল (ছাতা), পদরক্ষী (জুতা) এবং যষ্টি পরিত্যাগ করা আবশ্যক; সময়ে সময়ে মাথার টুপি ও পাগ্‌ড়ী খুলিয়া যাইতে হয়।

সমাধি-মন্দিরের শোভা ও সভ্রমের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তির বিবরণ দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। শুনা যায় প্রায় এক শত ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে এক জন গৈরিকবসনধারী মহাপুরুষ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নাগোরে উপস্থিত হয়েন। একটি বৃক্ষতলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করিয়া তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদ আছে, তিনি মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত ঐ তরুতলেই অবস্থান করিয়াছিলেন, কখনও অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্যও তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। বর্ষার পর বর্ষা, শীতের পর শীত, গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম, এইরূপে ক্রমান্বয়ে অনেক বৎসর কাল ব্যাপিয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত বার ষড়ঋতু চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ এক দিনের জন্যও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্য-সাধারণ বহুদর্শন, দেবোপম সুন্দর স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং তৎসঙ্গে মৃদু হাস্য, মিষ্টভাষণ ও প্রিয় ব্যবহার সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ও ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, লোকে তাহা বুঝে নাই এবং তিনিও কাহাকে বুঝান নাই। সন্তোষ সহকারে যে যাহা দিত, তাহাই খাইয়া তিনি ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেন। মুসলমান শাস্ত্রে এবং মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও ভক্তি দেখিয়া মুসলমান তাঁহাকে মুসলমান ভাবিত, এ দিকে হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং হিন্দুধর্ম্মে অচলা ভক্তি দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই স্থির করিয়াছিল; কিন্তু তিনি যে প্রকৃত পক্ষে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মভাব তাঁহার জীবনের অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। পরমহংসের যাহা আশ্রম, তিনি সেই আশ্রমাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম তাঁহাকে কোনও নিয়মবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। কোরাণ পড়িলে তাঁহাকে মুসলমান এবং পুরাণ পড়িলে তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম হইত।

আহারে, বিচারে এবং বেশভূষায় হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী উভয়ই মিশ্রিত ছিল। ক্রমে ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি প্রখ্যাত হইয়া পড়িলেন, বহু দূর দেশ হইতে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। এইরূপ পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিয়া, বহুসংখ্যক অনাথ ও রুগ্নের পরমোপকার সাধন করিয়া এবং অসংখ্যাসংখ্য মায়াময় সংসারী মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিয়া, ভগবানের পদারবিন্দ চিন্তা করিতে করিতে সহাস্যবদনে এই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। সেই পবিত্র তরুতলে তাঁহার নশ্বর মৃতদেহ পড়িয়া রহিল; হিন্দুরা শবদেহ দাহন করিবার জন্ত সচেষ্ট হইলে মুসলমানেরা বলিল, "ইনি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং দফণ্ ভিন্ন দাহন হইতে পারে না।" এই কথা লইয়া হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয় মধ্যে ঘোরতর বিবাদ এবং ক্রমে ঘোরতর লড়াই বাধিয়া উঠিল। প্রবাদ বাক্যে শুনা যায়, যখন হিন্দু ও মুসলমানে লড়াই চলিতেছিল, তখন এই মহাপুরুষের মৃতদেহ অদৃশ্য হইয়া যায়। শবদেহের সন্ধান না হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মূকভাব অবলম্বন করেন।

কিছুদিন পরে মুসলমানেরা প্রচার করিল যে, একটা ক্ষুদ্র বনের ভিতর মৃত মহাত্মার শবদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা ইহাও প্রচার করিল যে, "আমরা প্রত্যাদেশে (by inspiration) জানিয়াছি, ইনি সৈয়দবংশ সম্ভূত মুসলমান ছিলেন। আমরা এক্ষণে তাঁহার সমাধি প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম।" অল্পসংখ্যক এবং হীনবল হিন্দুরা সে কথা মানিয়া লইল, সুতরাং সেই তরুতলে মহাত্মার কবর-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। মহাত্মার প্রকৃত নাম কেহ জানিত না, সেই দিন হইতে তিনি মীর সাহেব নামে প্রখ্যাত হইলেন, কিন্তু হিন্দুর আজিও বিশ্বাস, তিনি হিন্দু ছিলেন। অনেক বৎসরের চেষ্টায়, পরিশ্রমে, যত্নে এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে এই সমাধি-মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বাস্তবিক নাগোরের সমাধি জগতে এক অদ্ভুত পদার্থ! ইহা দেখিবার উপযুক্ত এবং ইহার বিবরণ শুনিবার ও পড়িবার যোগ্য।

আমরা এইবারে এই বিখ্যাত সমাধি-মন্দিরের শোভা ও সম্ভ্রমের কথা বলিব। সমাধি মন্দিরের প্রথম দ্বারে (কটকে) উপস্থিত হইলে একটি দীর্ঘ কিন্তু অনতিউচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীর ও দ্বারের চারিদিকে কোরাণের বহুসংখ্যক শ্লোক সুন্দররূপে খোদিত আছে। এই

প্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রথম দ্বার পার হইবার পরে বড় বড় ইষ্টকে গাঁথা একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ড দেখিতে পাইবেন। ইহার চারিদিকে নানা প্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্তম্ভ বর্ত্তমান। এই সকল স্তম্ভ দেখিতে অতীব মনোহর; স্তম্ভখণ্ড পার হইয়া গেলে আর একটি এবম্প্রকার খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকগুলি সুরম্য কুটীর বর্ত্তমান। এই সকল কুটীরে ফকিরেরা ও অনাথ যাত্রিবৃন্দ বাস করিয়া থাকে, ইহার চারিদিকে লৌহ, পিত্তল ও প্রস্তরের খুব বড় বড় স্তম্ভ সুশোভিত আছে, এই সকল স্তম্ভের এক একটার বর্ণনায় এক একটা প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম স্তম্ভের উপরে স্বর্ণের কলস বসান আছে, তাহা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র (অর্থাৎ মহরমের সময়ে) নামাইয়া আনা হয়, উহাতে ফুল ভরা থাকে। এই খণ্ডের বাম পার্শ্বে মনোহর ফলফুলের উদ্যান, তাহার শোভা চিত্তহারিণী। তদনন্তর একটী সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে মুসলমানদিগের নেমাজের জন্য আয়োজন সমূহ সংগৃহীত থাকে, তাহার পরেই নাগোর-সমাধি দেখিতে পাইবেন। দূর হইতে দেখিতে ইহা তাজমহলের ন্যায়। এই সমাধি অতি আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে কাষ্ঠ, ইষ্টক, লৌহ এবং প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাঁর গাঁথনি সুদক্ষ মিস্ত্রীদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচায়ক। সমাধি-মন্দিরের ভিতরে বাবামীর সাহেবের সমাধি আছে; তাহার সম্মুখে ও পার্শ্বে অহোরাত্র মম বাতি জ্বলিয়া থাকে। এই সমাধিতে বহুমূল্য ও বহু সৌন্দর্য্যযুক্ত ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফানস, লণ্ঠন প্রভৃতি ঝোলান আছে। উপরে স্বর্ণখচিত মকমলের চন্দ্রাতপ এবং তাহার চারি দিকে বিশুদ্ধ রজত নির্ম্মিত ফুলমালা দেখিতে পাওয়া যায়। আতর, গোলাপ, চন্দন, অগুরু মৃগনাভি বিমিশ্রিত ধূপ, গোলাপ মিশ্রিত ধুনা প্রভৃতির সুগন্ধিতে সমাধি মন্দির চব্বিশ ঘণ্টাই "মেহক্" হইয়া থাকে। মন্দিরে প্রতিদিন দিবা বেলা একাদশ ঘটিকার সময় এবং সায়াহ্নে পঞ্চম ঘটিকা হইতে সপ্তম ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা, ভোগ, পূজা প্রভৃতি হইয়া থাকে। দিবসে তিন বার, রাত্রে দুই বার এবং ভোরে এক বার নহবৎ বাজে। মীর সাহেবের কবরটী অতি মূল্যবান এবং অতি সুন্দর লৌহ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, আকার খুব বড় নহে, ইহার চারি দিক বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিয়া মোড়া এবং মধ্যভাগে হীরকখচিত সুবর্ণ কুসুমগুচ্ছ বর্ত্তমান। প্রতিদিন এখানে দশ মণ চাউলের "ভোগ" হইয়া থাকে; অনেক দীন-হীন তাহাতে প্রতি-

পালিত হয়। ময়দা ২২সের পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকে। বাউরচির সংখ্যা ১৫ জন, ভৃত্যের সংখ্যা ২৭, দাসীর সংখ্যা ১৯, মোল্লার সংখ্যা ১৩, মৌলবীর সংখ্যা ১৫, হাজীর সংখ্যা ২৭, এবং বিত্থার্থী বালকদিগের সংখ্যা ১৬৪; এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন বেতনভোগী লোক এখানে কার্য্য করে। সমাধি মন্দির পার হইয়া গেলে আর একটী খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার শোভা অত্যন্ত মনোমোহিনী। এই স্থানে বহুবিধ সুন্দর পদার্থ দেখিবার আছে। ইহার পার্শ্বে অনেক ছোট বড় মস্‌জিদ এবং দরগা প্রতিষ্ঠিত। তাহার পরে একটী বৃহৎ এবং সুন্দর সরোবর, তদন্তর একটী অদ্ভুত "সুড়ঙ্গ" এবং তাহার অব্যবহিত পরে আবার ফল ফুলের বাগান। এই সকল স্থানে কত যে মশজিদ, কামরা, স্তম্ভ, দর্‌গা প্রভৃতি আছে তাহার ইয়ত্বা করা যায় না। প্রতি শুক্রবারে "বড় নেমাজ" হইবার সময় প্রায় দ্বাদশসহস্র মুসলমান একত্র হয়। বড় বড় ধনবান মুসলমানেরা মধ্যে মধ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এখানে স্বজাতিদিগকে খাওয়াইয়া থাকে, এই ভোজের নাম "নেওয়াজ।" নাগোর সমাধির সম্পত্তি এবং আয় এত অধিক যে ইহার তত্বাবধান জন্য একজন স্পেশাল তহশীলদার নিযুক্ত আছেন, তাঁহার কাছারী মন্দিরের প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত। শান্তি রক্ষার জন্য পুলীশ এবং "আজান্" দিবার জন্য বার জন বলবান মুসলমান দিবা রাত্র তথায় উপস্থিত থাকে। অসংখ্য হিন্দু এই মস্‌জিদে নিত্য উপস্থিত হয় এবং অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ মীর সাহেবের নামে বহুমূল্য দ্রব্যাদি এবং বস্ত্র, চাউল, ঘৃত, শর্করা প্রভৃতি উৎসর্গ করেন। এই দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব! এই দৃশ্য অতি সুখকর! হিন্দু ও মুসলমানের ইহা অতি আনন্দজনক সম্মিলন স্থল। নাগোর-সমাধি স্থলে দণ্ডায়মান হইলে চিত্ত মধ্যে পবিত্র ভাবের মহাপুরুষদিগের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। ইহা ভক্তের পক্ষে প্রাণশীতলকর স্থান; ইহা মহা-পুরুষদিগের মাহাত্ম্য প্রকাশক পবিত্র ক্ষেত্র।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মায়া ফাঁস।

দিন যায় রাতি আসে, জগৎ কালের বশে
ভেসে যায় অনন্তের কোলে।
বারণ না মানে কার, দুর্নিবার, অনিবার
চলিয়াছে কুলু কুলু রোলে॥

ষড়ঋতু পর পর,　　উদয় অবনী' পর
ধরি অঙ্গে কালের নিশান।
জানায় জগৎজনে,　　ভুলনাকো রেখো মনে
এ সংসার মায়ার বিমান ॥
জলশূন্য মরু মাঝে,　　মার্ত্তণ্ড ময়ুখ রাজে
রজ যেন কৃশানু সমান।
নব কিশলয় দলে,　　ছায়া পাতি তরুতলে
মায়ার মহিমা করে গান ॥
কেহ জন্মে, কেহ মরে,　　ব্যাধিগ্রস্ত কলেবরে
কেহ করে কর্ম্ম অবসান।
কেহ ভুঞ্জে রাজসুখ,　　কেহ বা বিষম দুখ
অদৃষ্টের প্রকৃষ্ট নিশান ॥
নগর হতেছে বন,　　বনে হর্ম্ম্য মনোরম
গিরি কলেবরে জল, জলধি পাষাণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিয়ম্বক,　　সৃষ্টি স্থিতি বিনাশক
প্রলয়ের কালে লয় কে কোথায় যান ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে ফুল,　　গুঞ্জরিছে অলিকুল
পরিমল লয়ে ফিরে দক্ষিণ পবন।
নিদাঘে রবির তাপ,　　প্রাবৃটের ঘন-ডাক
শরতে শারদ-শশী শান্তি নিকেতন।
হেমন্তের হাসিভরা,　　শস্যে পূর্ণা বসুন্ধরা
শীতে আর্ত্ত মর্ত্ত্যবাসী এ কার বিধান।
জগতের মেধি যেই,　　জগৎ রচিল সেই
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ সবার নিদান ॥
কেহ আসে কেহ যায়,　　কেহ ফিরে ফিরে চায়,
মায়ার নিগড়ে বদ্ধ পাশরি আপন।
দারা পুত্র কোলে করি,　　ভাসায়ে জীবনতরী
ভব পারাবারে পার পাবে আকিঞ্চন ॥
আশার কুহকে ভুলি,　　কারো হাতে মালা ঝুলি
গৈরিক বসনে অঙ্গ করি আচ্ছাদন।

ভালে ত্রিপুণ্ড্রক ফোঁটা, মস্তকে পিঙ্গল জটা
ত্রিশূল লইয়া করে করিছে ভ্রমণ॥
বাহিরের মালা ঝোলা, কাটে কি মনের মলা
ত্রিশূলে কি কাটে পাশ মায়ার মতন।
কেন ভ্রান্ত ঘুরে মর, গুরু মন্ত্র হৃদে ধর
সদা সাধু সঙ্গ কর অঙ্গের ভূষণ॥
ষড়রিপু কর জয়, ঘুচিবে কালের ভয়
বাসনায় জ্বেলে দাও জ্বলন্ত অনল।
পুড়িয়া হউক ছাই, আমার আমিত্ব নাই
জিয়স্তে মরিয়া যাই পাশরি সকল॥
এই ত জীবন্মুক্তি, বেদাগমে শিব উক্তি,
মুক্তির মূরতি বল কে দেখেছে কবে।
পূত জাহ্নবীর জলে, স্নান কর কুতূহলে
কর্ম্মভূমে কর্ম্ম কর পার পাবে ভবে॥

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়।

জাল প্রতাপ চাঁদ (৩)।

তৃতীয় বিবাহ।

পঞ্জাবে অবস্থান কালে প্রতাপ চাঁদ, রণজিত সিংহের দেওয়ান সুদয়াল সিংহের কন্যা রজন কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সঞ্জীব বাবুর পুস্তকে একথার উল্লেখ নাই। দয়াল সিংহ প্রতাপ চাঁদের রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

দৈবখেলা অনুপম সুদয়াল সিংহ নাম
জনকাংশে ক্ষত্রি কুলোদ্ভব।
রঞ্জিতের প্রিয়পাত্র শ্রীরূপের নেত্রে নেত্র
হেরি মাত্র কি নেত্র উৎসব॥
হইল পূর্ব্ব স্মরণ স্নেহে পুলকিত মন
করি রূপ দরশন তার।

শরীর রোমাঞ্চ হয় প্রাণে তুল্য ভাবোদয়
ভাবে পরিচয় কর কার ॥
ধরণী ধরের কর্ত্তা তারে জানাইতে বার্ত্তা
চলিল দেওয়ান দ্রুতগতি।
প্রবেশিয়া অন্তঃপুর জায়ারে কহেন চতুর
শুন শুন রসবতী সতী ॥
আজি রাজ দরবার দেখিলাম চমৎকার
দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম রূপ।
দক্ষিণে অনুজ তার গৌরবর অবতার
সুমিত্রা কুমার রসকূপ ॥
মনে হয় পুনঃ যাই নিকটে থাকি সদাই
রামরূপে ভুলিয়াছে মন।
কহিলাম সমাচার কেমন মন তোমার
কহ প্রিয়া স্বরূপ বচন ॥
স্বামি মুখে মৃদুভাষ প্রেয়সী প্রেমে উল্লাস
গদ গদ স্বরে কহে ভাষ।
পুন এ সৌভাগ্য কবে তনয়া কি জানকী হবে
নাম রঞ্জনকুমারী প্রকাশ ॥
তব মুখে রাম বোল শুনি মন উতরোল
কত সাধ মনেতে সাধন।
চল চল সঙ্গে যাই হেরিয়া হিয়া জুড়াই
মন সাধ মিটাই আপন ॥
তনয়া রঞ্জন কুমারী রামে সমর্পণ করি
জগজনে জানাই ভজন।
বিলম্বের কার্য্য নাই অবিলম্বে চল যাই
তার ঠাঁই হইগো ভাজন ॥
লইয়া কুমারী সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ নানা রঙ্গে
নানা উপহার ভারে ভার।
শুভ যাত্রা শুভক্ষণ গত মাত্র দরশন
ঘুচিল মনের অন্ধকার ॥

কুমারীরে করে ধরি রামে সমর্পণ করি
দেওয়ানের প্রেয়সী চতুরা।
বলেন লক্ষ্মী সঁপিলাম মনঃ প্রাণ সাধিলাম
ধনুর্ভঙ্গ মিথিলায় ধারা॥
হরি হইলেন হরষিত বাম ভাগে আচম্বিত
বসিলেন রঞ্জন কুমারী।
নিতাই লক্ষ্মণ হয়ে শিরে ছত্র ধরিয়ে
শোভা নব নীরদ বিজরি॥
গৌরাঙ্গ রাম রূপ প্রকাশিত অপরূপ
জানাইলেন জানকী মিলন।
দিব্য আঁখি আছে যার সে দেখুক অনিবার
চর্ম্ম চক্ষের অগোচর ধন॥
দেওয়ানের নিকেতন চলিলেন নারায়ণ
জানকী চাপিয়া চতুর্দ্দোলে।
দশ দিক উজ্জ্বল রূপে দীপ্ত ভূমণ্ডল
শরৎ শশী শোভে নীরদ কোলে॥

* * *

ইংরাজের ভীষণ চাতুরী।

এইবার গ্রন্থকার একটা ভয়ানক কথা বলিয়াছেন। কথাটাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। গ্রন্থকারের ইংরাজ বিদ্বেষ বড় বেশী; সেই জন্ত বোধ হয় ইহা কল্পনা করিয়াছেন। তবে সংসারে দেখিতেছি, যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, অনেক স্থলে তাহা সত্য হয়। সেই জন্ত ঘটনাটি গ্রন্থকারের ভাষাতেই পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিব। গ্রন্থকার বলিতেছেন, ইংরাজ অতি সাবধানে এই ঘটনা গোপন রাখিয়াছে।

দৈবখেলা দেখ তায় সে দেশে ম্লেচ্ছ যায়
দাগা করি করিতে শাসন।
রজত পরিষদ্ধ এক দাগা কলে গঠিলেক
চারি মেক চারি কোণে ধারণ।
তার সঙ্গে গাঁথা কল গোলা গুলি পিত্তল
আসোয়ার করিতে যাতন॥

এহেন দাগার খাট ধরে নজর সাহা নাট
রাজপুরে ঘটিল বাতনা॥
জানিলেন অন্তর্য্যামী রাজা সে বিপদগামী
সেক্ষণে সভাতে উদয়।
জানিল রণজিত রায় অস্ত না দেখিতে পায়
সভাসদ ব্যস্ত অতিশয়॥
ধরিয়া সন্ন্যাসীবেশ বসিলেন হৃষীকেশ
জানাইলেন শ্লেষে বচন।
পরিযঙ্কে যে বসিব কায়া প্রাণে ধ্বংস হব
ফাঁকি কল ফিরিঙ্গি গঠন॥
বুঝিয়া বিশেষ তায় সর্ব্ব লোকে চমৎকার
আজ্ঞা এক চড়াইতে তায়।
ছুটিল পিত্তল কল ধ্বংস হইল ছাগল
দেব হইতে রাজা রক্ষা পায়॥
স্পষ্ট হইল গুপ্ত ঘাট আন চিত্ত হইয়া লাট
স্তুতি করি কহে সত্যভাষ।
ইংলণ্ড অধিকারী করিয়াছেন এ চাতুরি
হই আমি পরিকর দাস॥
ইঙ্গিতে কহেন হরি দূত ধ্বংস নাহি করি
পরম্পর বাণী পুরাতন।
বুঝিয়া রঞ্জিত ইঙ্গিত জল্লাদে ডাকি ত্বরিত
কারাগারে করিতে বন্ধন॥
লাট সঙ্গে ছিল যারা প্রাণভয়ে পালায় তারা
এক লাট ফাটকে আটক।
সাতাইশ লক্ষ সেনা যার খাড়া আছে দোকাতার
দিবানিশি সুসজ্জ কটক॥

এক বৎসর পরে প্রতাপ চাঁদের অনুরোধে রণজিত সিংহ ইংরাজ দূতকে সসম্মানে বিদায় দেন।

দেখি লাট চমৎকার বলে প্রাণে বাঁচা ভার
রক্ষ মাম্ বারেক হৃষীকেশ।

লইলাম চরণছায়া নিজ গুণে করি দয়া
দাও বিদায় যাই নিজ দেশ॥
বর্ষ এক হয় গত ক্লেশ কহিব কত
ওষ্ঠাগত উড়ে যায় প্রাণ।
দীন হীনে দীননাথ কর কৃপা দৃষ্টিপাত
ক্ষম দোষ আমি হে অজ্ঞান॥
এত স্তব করি যবে মনঃ প্রাণ ঐক্য ভাবে
তারে তবে সদয় হন হরি।
লাট দেখে অপরূপ বর্দ্ধমানবাসী ভূপ
ছোট মহারাজ প্রতাপ চন্দ্র।
আসি অতি ত্বরা করি দক্ষিণ হস্তেতে ধরি
বলে প্রাণ বাঁচাও হে নরেন্দ্র॥
আমিত ফকির রাজ দেখনা ফকির সাজ
কন হরি চাপল্য বচন।
আকুল হইয়া লাট দণ্ডাইয়া যেন ঠাট
তাজি কপট প্রাণ বড় ধন॥
দূরে রাখি মান লাজ বলে রাখ মহারাজ
তব রাজ্য ছাড়িলাম আমি।
সত্য সগুণ ভাব ইথে নাহি অবিশ্বাস
নিষ্করে শাসন হবে তুমি॥
যতদূর অধিকার নিকটে না যাব তার
করি সত্য এই অঙ্গীকার।
এ ধর্ম্মে অন্যথা হবে নিস্তার নাহিক তবে
হবে রাজ্যভ্রষ্ট ছাড়ে খার॥
হেন জ্ঞান হয় আমার তুমি সত্য অবতার
নাশিতে ভূভারন্তের ভার।
লইলাম তব ছায়া ভবাশ্রিতে কর দয়া
জানি পাপ না করিব আর॥
কেমনে প্রতীত হবে আজ্ঞা হউক করি তবে
সাক্ষী ধর্ম্ম শাদাতে লিখিত।

তায় যদি রতি স্মরি (?) ছুস্তর নরকে পড়ি
অনুতার জানি যে নিশ্চিত ॥
সত্য প্রতিজ্ঞা জানি কহিছেন চক্রপাণি
মনে মনে করিয়া বিচার।
খল দুষ্ট দুরাচার ভয়ে মিত্র ব্যবহার
পদাশ্রিত হইল আমার ॥
পশ্চাৎ বিচার হবে স্বকর্ম্মের ভোগ পাবে
শরণাগতে রাখিতে উচিত।
করেন হরি আশ্বাস মাসেক করহ বাস
কহি আমি রাজাকে ত্বরিত ॥
যাতে প্রাণ রক্ষা পায় করিহে সে উপায়
এই মোর সত্য অঙ্গীকার।
ম্লেচ্ছে প্রবোধ করি যান হরি ধীরি ধীরি
রঞ্জিত নিকটে এক বার ॥
প্রতাপ চাঁদের উপরোধ রাজারে হইল বোধ
ঘটে উপজিল এই জ্ঞান।
ম্লেচ্ছ করিতে নাশ এত সহি উপহাস
দয়ার নিদান ভগবান ॥
আগেসরি জুড়ি কর স্তব করেন নৃপবর
শুভাশুভ ঘটনা ঘটন।
তব ইচ্ছা যেই হবে ত্রিজগতে মান্য হবে
হও হে পুরুষ পুরাতন ॥
শুনি প্রভু সুবচন ম্লেচ্ছের বিবরণ
কহিলেন করিয়া ইঙ্গিত।
বুঝিয়া রঞ্জিত রাজ লক্ষ মুদ্রা অব্যাজ
ম্লেচ্ছে দান দিলেন ত্বরিত ॥
মুখে কহি সুবচন ম্লেচ্ছের তুষি মন
বন্দী হইতে করিয়া খালাস।
কৃতার্থে মধুর ভাবে কহিছেন অবশেষে
দৃঢ় বাক্য মানিয়া নির্য্যাস ॥

প্রতাপচন্দ্র মহারাজে সন্তোষ রাখিবা কাজে
তবে সে করিবে সুখে রাজ ॥
স্বীকৃত অন্যথা হবে সে পাপে সম্পদ যাবে
জগমাঝে পাবে বহুলাজ ॥
পশ্চাৎ তৈনাত (?) আমি শাসিব সম্পদ ভূমি
নাহি শক্তি করি নিবারণ।
একথা অন্যথা নয় জানিবে হে এনিশ্চয়
সেই ক্ষণে আমার গমন ॥
যে করিলাম অঙ্গীকার কুলাব আরতি তার
ইহা কহি হইল বিদায়।
সতরঞ্চ নদী ঘাট * উত্তারে ম্লেচ্ছ লাট
নিজ সেনা মিলিল তথায় ॥
আপন শাসনে যায় কৌন্সিলে চিঠি পাঠায়
লিখিয়া বিশেষ সমাচার।
কৌন্সলি কোমেট † করি যথার্থ সুবিস্তারি
লিপি উত্তর লিখিল তাহার ॥
বুঝিয়া ম্লেচ্ছ লাট ধরি বিলাতে র বাট
লাজে হেট করিয়া বদন।
যে পাইল মনে ব্যথা মনমাল্য মন গাথা
রাখি কথা করিয়া গোপন ॥
প্রভু ইচ্ছা হবে যবে অনা'সে উদয় হবে
জগজনে জানিবে তখন ॥

পুত্রোৎপত্তি।

তুষ্ট নারায়ণ মন বরেন্দ্র স্তবনে।
পদব্রজে চলি দেওয়ানের নিকেতনে ॥
নারায়ণ লক্ষ্মী বামে স্বধামে বিরাজ ॥
আনন্দ কানন তথি ভুবন সমাজ।

---

* শতদ্রু। † কমিটি।

চতুর্ভিতে মুনি ঋষি তপস্বীর বাস।
রুদ্ররূপী হনুমন্ত বৈসে বারমাস ॥
বাহু নাম রাম.বকস বিপ্রকুলোদ্ভব।
সর্ব্বাঙ্গে সীতারাম লিখিত বৈভব ॥
যথা রাম তথা হনু সঙ্গে ছায়া রূপ।
সময়ে প্রকাশ পাবে কহিল স্বরূপ ॥
আর এক রহস্য কর আস্বাদন।
প্রসবেন রঞ্জন কুমারী একটি নন্দন ॥
সীতার উদরে জন্ম সুপাত্র কুমার।
পূর্ব্বে লব এবে মুলুকচন্দ্র নাম তার ॥
আশী লক্ষ তঙ্কার জমিদারী ভূম।
অবিচার করিলে সাজা পায় যম ॥
সে ভূমির ভূপতি মুলুকচন্দ্র বাহাদুর।
সর্ব্বসুখ সম্পদ সানন্দ রাজ পুর ॥
পূর্ব্বে বাল্মীকি তপোবনেতে জানকী।
প্রসবি সন্তান শ্রীরামমিলনে হন সুখী।
এবার সে ভাব নহে ম্লেচ্ছ কারণ।
দৈবযোগে রাম সীতা বিদেশে মিলন ॥
পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে বর্দ্ধমান।
মিলিব জানকী তথা সহিত সন্তান ॥

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন।

কিছু দিন পরে প্রতাপচাঁদ স্বদেশ যাইবার জন্য রণজিত সিংহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রণজিত অনিচ্ছা সত্বে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। প্রতাপচাঁদ রণজিত সিংহকে বলিলেন, ম্লেচ্ছগণ ধর্ম্মের বড়ই অবমাননা করিতেছে। ম্লেচ্ছ শাসনের জন্য তাঁহার যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার শ্বশুরের সহোদর কৃপানন্দও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। মুরশিদাবাদের নবাবও পূর্ব্ব হইতে ছিলেনই।

কর্ণাট্।

ক্রপানন্দ পাত্র শ্বশুরের সহোদর।
বাহ্য বৃত্তান্ত করি তাহারে গোচর॥
তিন জনে তিন অশ্বে হইয়া আসোয়ার।
অবিলম্বে সতরঞ্চ নদী হইয়া পার॥
ম্লেচ্ছ শাসন মাঝে সন্ন্যাসীর বেশ।
পদব্রজে ভ্রমিতে ভ্রমিতে নানা দেশ॥
দিল্লীর ঈশ্বর হরি করিয়া বিদায়।*
নগর কিস্কিন্ধা মাঝে আসি দয়াময়।
বালীরাজ ভক্ত যথা নরের পূজিত।
করণাট্ সহর সেই লোকেতে বিদিত॥
সেহাল কুল পোম্পাপতি আদি চারি জন।
রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া করয়ে শাসন॥
সে ভূমির পূজ্য রাজ অঙ্গদ হইব।
পুরাতন ভক্তবাক্য আছে কে খণ্ডিব॥

দিল্লী।

কর্ণাট্ হইতে দিল্লী চলিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে কর্ণাট্ কোথায় আছে, জানি না।

এত শুনি কর্ণাট্ ত্যজিয়া চলি যান।
নগর হস্তিনাতে হইলেন অধিষ্ঠান॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং অবতার।
জানাইতে তাহারে নির্য্যাস সমাচার॥
দিল্লীর ঈশ্বর হয়ে পেয়ে অপমান।
রূপ মধ্যে মিলি দুখ করিল বাখান॥
ম্লেচ্ছে শাসিল তার সকল শাসন।
মনে হয় মনোদুঃখ করিব ভঞ্জন॥

* বুঝিলাম না। "দিল্লীর ঈশ্বর" আবার প্রতাপের সঙ্গে গেলেন কখন?

সে জনে আশ্বাস বিশ্বাস জানাইতে।
মনোহর রূপ সাজ সাজিয়া সভাতে॥
নিরখি বঙ্কবিহারী জলদ বরণ।
সঙ্গে সখা বলরাম বিভূতি ভূষণ॥
পূর্ব্বভাব উপজয় জুড়ি দুই কর।
পাদ্যার্ঘ আসন যোগায় স্বতন্তর॥
রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপুত্র বসিয়া বিরলে।
তিন জনে তিঁতিলেন নয়নের জলে॥
বহুত বিলাপ করি জীবের লাগিয়া।
ধর্ম্মরাজে তুষিলেন অনেক কহিয়া॥
যেক্ষণে জীবের প্রতি হবে অত্যাচার।
সেক্ষণে পুনঃপুনঃ হয় শাস্তি তার॥
দুষ্টের দলন করি শিষ্টের পালন।
দৃঢ় বাক্য আছে ঐক্য পূর্ব্ব পুরাতন॥

* * *

ত্রিভুবন আকর্ষণ করি ক্রমে ক্রমে।
অশেষ বিশেষ শাস্তি দিব নরাধমে। *
সাত্যকি স্বকুল আর দ্রুপদ রাজকুল।
নেপাল ভূপাল তারা ভাব সমতুল॥
বেহারে বিরাট নৃপ নৃপতি প্রধান।
স্বকুলে সাহায্য হেতু হইয়া দীপ্তিমান
মণিপুরে বভ্রুবাহনের পরিবার।
স্বস্থানে স্থাপন সেই অর্জ্জুনকুমার॥
কটাক্ষেতে ক্ষিতি অতি শাসিতে সমর্থ।
পূর্ব্বদিক রক্ষা ভার পাইয়া কৃতার্থ॥

দিল্লীর বাদসাহকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উপরিউক্ত নৃপতিগণ ম্লেচ্ছশাসনে তাঁহার সহায় হইবেন।

---

* ইংরাজকে।

গয়া।

প্রথমা স্ত্রী প্যারীকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ।

দিল্লী ত্যাগ করিয়া প্রতাপচাঁদ গয়ায় উপস্থিত হন।

ধর্ম্মের নন্দন মন করি উপশম।
তথা হইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে গয়াভূম॥
নবম বৎসর গত হইল অজ্ঞাত।
পরম আশ্চর্য্য খেলা হইল অকস্মাৎ॥
প্রতাপচন্দ্র বিরহে প্যারীকুমারী ব্যাকুল।
গয়াভূম যাব বলি করিলেন তুল॥
ঈশ্বরী ঈশ্বর লীলা মহিমা অপার।
ইচ্ছাতে ঘটনা ঘটে কে খণ্ডিবে আর॥
মনেতে বাসনা রূপ করি দরশন।
শিবিকা সোয়ারি হ'য়ে করিলেন গমন॥
সেই দিবস গয়াভূম করিলেন প্রবেশ।
ছদ্মবেশী আসি মিশিলেন হৃষীকেশ॥
উভয়ের মনোবাক্য হইল পরিচয়।
বিষাদে হরিষ চিত্ত হইল উদয়॥
* * * *
গোপন মিলন এই লোকে অপ্রকাশ।
অন্তলীলা সারকথা করিবে বিশ্বাস॥
লোক বুঝাইতে লীলা আর এক প্রকার।
বিস্তার করিয়া কহি নির্য্যাস তাহার।
প্যারী কুমারী পথে চলেন যখন।
স্বরূপাক্ত ছদ্মবেশী পথেতে মিলন॥
কেশ বেশ মাথা ভুষ রাকা চন্দ্রমুখ।
হেরি রূপ চমৎকার দূরে মনোদুখ॥
অট্টহাসি মৃদুভাষী ক্ষণেতে মগন।
প্রতাপে প্রতপ্ত (?) নাস্তিঃমুখে উচ্চারণ॥
বারম্বার বাক্য সার শুনি সিমন্তিনী।
কি.করি ব্যবস্থা মনেতে অনুমানি॥

বুধগণের বিধিবাক্য মনে ঐক্য করি।
ফল্‌গু নদী তীরে বসি প্যারীকুমারী ॥
প্রতাপচন্দ্র জীবিতমান পিণ্ড দিতে নাই।
গয়াভূমে এই কথা সবারে জানাই ॥
পিণ্ডদান না করিয়া রাণী ফিরে যান।
গয়াভূমে এ কথায় লোকে করে গান ॥
পুনঃ আসি প্রতাপচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশ।
কহিতেছেন বিবরণ বচন শেষ ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে স্বদেশে গমন।
হইলে দুষ্ট দলন হইবে মিলন ॥
কলঙ্ক ভঞ্জন আগে করিব জগতে।
পরাণ চন্দ্র প্রতিবন্ধ হইবে নানা মতে ॥
বিচারে পরাস্ত যবে হবে নরাধম।
মনে মনে জানে সে পশ্চাৎ আছে যম ॥
বিপদে অধৈর্য্য হওয়া ভাল কার্য্য নয়।
স্থির পাণি প্রস্তর ভেদ করে সত্য কয় ॥
কিয়ৎকাল ব্যজে কর্ম্ম হইবে সফল।
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা সকলি বিফল ॥
ইঙ্গিতে বিশ্বস্তা হয়েন প্যারী কুমারী।
কহিলেন ইচ্ছা যেবা কর বনচারী ॥
তব মনোবাঞ্ছা যে বা অন্যথা কি হয়।
এত কহি স্বপ্রদেশে গমন নিশ্চয় ॥
বর্দ্ধমান প্রবেশেন প্যারী কুমারী।
গয়ার বৃত্তান্ত কহেন করিয়া চাতুরী ॥
না করেন পিণ্ডদান অনেকে জানিল।
সুস্পষ্ট হইয়া কথা অস্পষ্ট রহিল।

কাশী।

আর একটি বিবাহের যোগাড়।

গয়াভূমি হইতে হরি কাশীতে গমন।
লক্ষ্মীর উদ্দেশে তথা করেন ভ্রমণ॥
অন্নপূর্ণার সুপকার সে ব্রাহ্মণ।
সে জনার তনয়া লক্ষ্মী আছয়ে গোপন॥
দৈবযোগে উভয়ের চক্ষুতে মিলন।
পঞ্চবাণে পঞ্চবাণ মিলিল তখন॥
বাণে বাণে নিবারণ কে জানিবে সন্ধি।
যথা লক্ষ্মী তথা নারায়ণ থাকেন বন্দী॥
পঞ্চম বর্ষীয় নব কুমারী কুন্তলে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ ছটা হেলিছে হিল্লোলে॥
সহজেতে হয় দৃষ্ট যেন স্বর্ণলতা
বিম্বোষ্ঠী চারুনেত্রা মৃদুস্বরে কথা॥
মধ্যদেশ শোভা অতি জিনিয়া কেশরী।
উরু গুরু নিতম্ব যুগ ভারি॥
মরাল বারণ জিনি চলন সুধীর।
ঘেরিয়াছে রোমাবলী নাভি সুগভীর॥
শোভিত ত্রিবলী তায় লহরী তরঙ্গ।
ঘাঘর ঘুঙ্গুর মায়ের কি কব প্রসঙ্গ॥
পদতল শতদল অতি সুকোমল।
প্রভাত অরুণ জিনি কিরণ উজ্জ্বল॥
কর পদাঙ্গুলি নখের কি উপমা দিব।
কোটী চন্দ্র কিরণ সমতা না হইব॥
হেরি হরি অপরূপ নয়নের কোণে।
উভয়ে বাধিয়া মন কটাক্ষ সন্ধানে॥
অলক্ষ্যের খেলা এই লোকে অবিদিত।
বর্দ্ধমান প্রাপ্ত কালে মিলিন ত্বরিত॥

এই স্থির উভয় মনে ইঙ্গিত।
কমলা কমলপদে মাগিব আশ্রিত ॥
*　　*　　*　　*
হরগৌরী দরশনে চলিলেন বিশ্বম্ভর।
ত্যজি শ্রীমন্দির অগ্রে মিলি বিশ্বেশ্বর ॥

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। লেখাবলী—বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর বিরচিত ; মূল্য ।/০।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত ছয় খানি পত্রিকা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১। রামচন্দ্রের প্রতি জানকী। ২। অর্জ্জুনের প্রতি সুভদ্রা। ৩। কচের প্রতি দেবযানী। ৪। পুণ্ডরীকের প্রতি মহাশ্বেতা। ৫। মদনের প্রতি মায়াবতী। ৬। অমরনাথের প্রতি কমল কামিনী।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ কাব্যের প্রথম প্রচার করেন। যে অলোকসামান্য প্রতিভা বঙ্গীয় সাহিত্যে এই সুধার স্রোতঃ প্রথম প্রবাহিত করে, তাহার উত্তরাধিকারী বঙ্গে কেহ জন্মিল না। যে বীণার গম্ভীর মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গ-সাহিত্যকানন এক সময়, নিনাদিত ছিল, সেই বীণা নীরব হইলে, তাহার সুরে সুর দিয়া কোন বাঙ্গালী গাহিতে পারিল না। মধুসূদনের জন্মভূমি যাহা পারিল না, উৎকল তাহা দিয়াছে। তাই দূরাগত এই বীণা ধ্বনি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের কোলাহল ভেদ করিয়া "কাণের ভিতর দিয়া আমাদের মরমে" প্রবেশ করিয়াছে ও মধুসূদনের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য বড়ই আনন্দের সহিত আমরা এই ক্ষুদ্রকাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম পত্র, রামচন্দ্রের প্রতি জানকী।

সীতা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিনা দোষে পরিত্যক্তা হইয়াছেন। বহুবৎসর হইল রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নাই—রামও তাঁহার কোন সংবাদ লন নাই। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর রামচন্দ্রের মহিষী আজ দীনভাবে তপোবনে বাস করিতেছেন। যেন রামের সহিত তাঁহার কখন সম্বন্ধ

ছিল না। আজ সহসা রামচন্দ্র বাল্মীকির তপোবনে তুরঙ্গ রক্ষার জন্য আগমন করিয়াছেন। এই সুযোগ সীতা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি রামকে পত্র লিখিতেছেন। নানা আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় মথিত হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, রাম কি তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন? সীতা কর্ত্তৃক নিষ্কলঙ্ক রঘুবংশে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। সেই সীতার কথা রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়া রামের হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া কি উচিত? কিন্তু হৃদয়ের আবেগের স্রোতে সকল আশঙ্কা ভাসিয়া গেল। সীতা রামের নিকট হৃদয়ের দারুণ ব্যথা নিবেদন করিতে লাগিলেন। প্রথমে রামচন্দ্রকে 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, শেষে, 'প্রাণেশ' 'প্রভু' প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া অন্তঃকরণের ব্যথা জুড়াইয়াছেন। নিজের দুঃখের জন্য সীতা রামচন্দ্রকে একবারও দোষ দেন নাই। পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্ট দোষে সকলই ঘটিয়াছে। কেমন সুন্দর ভাবে কবি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন দেখুনঃ—

"নীরদ বরণ তুমি ; নীরদের রূপে
বর্ষিলে করুণা বারি অখিল সংসারে ;
চাতকী জানকী প্রভু ; অনন্যশরণা
লইল শরণ তেঁই নীরদ চরণে ;
পড়িল অশনি শেষে কুভাগ্যের ফলে
অনাথার মাথে, নাই দোষ ইথে তব ;
লভিল সভাই জল, মরিল চাতকী
নিজ ভাগ্য দোষে ; নহে মেঘ নিন্দাভাগী।"

কালিদাসের সীতাও রামচন্দ্রকে এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু এত মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় নহেঃ—

"কল্যাণবুদ্ধেরথবা স্তবায়ং
ন কামচারোময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জ্জথু রপ্রসহ্যঃ॥"

সীতা যখন রামের নিকট কুশীলবের পরিচয় দিতেছেন, তখন যেন সুখ দুঃখ, গর্ব্ব আশঙ্কা একত্র বিমিশ্রিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আবাক্ত করিতেছে। কুশীলবের ন্যায় তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছে, এই জন্য যেন সীতা

গর্ব্ব ও অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। আজ তাহাদের পিতার নিকট তাহাদের পরিচয় দিতে পারিতেছেন, এজন্য তাঁহার এত সুখ। দুঃখ এই জন্য যে, এমন দুইটি পুত্র কখন পিতার অঙ্কে আরোহণ করিতে পাইল না। বর্ণনাটি এতই সুন্দর যে, আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না"।

"অবোধ যুগল শিশু ধরিয়াছে বলে
অশ্ব তব, রাঘবেন্দ্র, না জানি আপনা,
ক্ষমিও এ অপরাধ দয়া অনুরোধে,
হইতে দায়াদ তব রাজসিংহাসনে
নাহি ধরে আশা, নাথ, স্বপনেও কভু
অভাগিনী জানকীর দুঃখী শিশু দুটী;
আজন্ম অনাথ তারা তবঅঙ্কাসন,
পিতা তুমি, মলিনিতে শিখে নাই কভু।
শিখে নাই নিজ ভাগ্য চিনিতে অভাগা॥
বাল আধবোল নাথ শুনিলে না তুমি;
অভাগা দুটীর কভু চুম্বিলে না মুখে।
নির্ব্বাসন পূর্ব্বে হায় প্রেমের কলহে
কহিতে সোহাগে মোরে, "জনমিলে শিশু
না দিব তোমারে, প্রিয়ে, লইব কাড়িয়ে,
এত কষ্ট রূপবতি, সও যার লাগি,
না মানিবে ঋণ তব সেই অবশেষে,
দিবে পরিচয় সদা রামের বলিয়া—"
হায়! সেই শিশু দুটী না জানিল আজ
নিজ জন্মদাতা জনে, কুভাগ্যের ফলে;
বাল্মীকির স্নেহ বলে বাড়িয়াছে বনে
শিশুদ্বয়, শিখিয়াছে তাঁহারি প্রসাদে
ধনুর্ব্বেদ, শিখিয়াছে গাইতে মধুরে
তবকথা, শিখিয়াছে হায়! জাগাইতে
দুঃখস্মৃতি দুঃখিনীর আহত হৃদয়ে;
হেমন্তে এ তপোবনে আসিলে রজনী

যে যার কুটীর হ'তে আইসেন হেথা
ঋষিবৃন্দ, বৃদ্ধ পিতা বাল্মীকিরে বেড়ি,
বসেন পাদপতলে ; ভাতে মনোহরে
ছায়ামিশ্র চন্দ্রাতপে চিত্রিত এ স্থলী,
পিতার আদেশে দোঁহে বীণা লয়ে করে
গায় তবগীত, প্রভু, কাঁদায় সকলে ;
শিশিরের ছলে কাঁদে তপোবন তরু
নীরবে; দুঃখের গীতে কাঁদে সৈকতিনী
তমসা, বিরসা মরি কল কল স্বরে ;
তপোবন মৃগকুল তুলি কুতূহলে
রোমন্থ মন্থর মুখ, শোনে নিদ্রালসে ;
ভারত কবিতা কম-কমলের রবি
কাঁদেন সে গীত স্বনে আপনি বাল্মীকি
(ঋষিকুল ধ্যেয় কবি, ঋষিকুলধন)
শান্তিময়, জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র সে আঁখি
ফেলে নাই অশ্রু যাহা নিজদুঃখে কভু
বরষে অন্যের দুঃখে দয়ার মুকুতা,
প্রাচেতস শ্বেত শ্মশ্রু তিতে অশ্রুনীরে ;
বিরলে সে গীতে হায় ! জানকী নয়নে
ঝরে অশ্রু, ঘোর বনে, হায়রে যেমতি
ব্যাধশরে বিদ্ধতনু স্রাবে মৃগবধূ
রুধির, ডাকয়ে যবে দুঃখে অভাগিনী
কৃতান্তে সে যন্ত্রণার অবসান আশে ;
ঝরিত এরূপে নাথ, অশোক কাননে
একদা নীরবে অশ্রু স্বর্ণলঙ্কা পুরে
সখীরূপে আশা কিন্তু দিতেন মুছায়ে
সে অশ্রু ; এখন আর নাহি দেন দেখা
দুঃখিনীরে সান্ত্বনিতে এ ঘোর বিষাদে।"

এই পত্র খানি বড়ই সুন্দর। একটা যেন উষ্ণশ্বাস প্রবাহ ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। গভীর সমবেদনা না থাকিলে এরূপ

লেখা হয় না। গ্রন্থবর্ণিত প্রত্যেক নায়িকার সহিত রাধানাথ বাবুর প্রভূত সমবেদনা আছে, সেই জন্যই পত্রগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের প্রতি মহাশ্বেতা—আর একখানি পত্র। এখানি প্রণয় পত্রিকা, সুতরাং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড়ই মধুর ভাবে প্রণয়ের নিবেদন বর্ণিত হইয়াছে। একটি স্থল উদ্ধার করিয়া দিলাম। পাঠক দেখিবেন, কবি কেমন কৌশলী। নায়িকা মহাশ্বেতা প্রণয়পাত্র পুণ্ডরীককে বলিতেছেন, "আজ শিব-চতুর্দ্দশী, সকলেই শিবপূজা করিতে কৈলাসে যাইবে, যাইবে না কেবল মদন, কেন না শিব তাহাকে একবার ভস্ম করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আজ আমাদের সহিত থাকিয়া তোমার সেবা করিবেন।"

শিবচতুর্দ্দশী আজি, রত মহোৎসবে
সুরলোক মর্ত্তলোক, কাতারে কাতারে
যাইছে কৈলাস চূড়ে গিরিবাসী যত,
সুর সীমন্তিনী সবে যান কুতূহলে
গগনে, বিমানে কেহ, কেহ হেম ঘনে;
মন্দারের উপহার সুরেন্দ্র লইয়া
ভেটিবেন ভবপদে রতনের-রাজি
ভেটিবেন ভক্তিভাবে অলকার পতি;
ঢুলাবেন সমীরণ মলয় চামরে;
বহাবেন জলনাথ দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে
কৈলাসের রজতাম্বু নির্ঝরিণী কূলে;
কৈলাসের কুঞ্জে কুঞ্জে আলোকের থালা
জ্বালিবেন তেজঃপুঞ্জ অনল আপনি;
ভেটিবেন মধু নব রসাল মঞ্জরী;
পড়িবেন বৃহস্পতি নূতন পঞ্জিকা
রাজ রাজেশ্বর পদে কৈলাশ শিখরে
চিত্ররথ সঙ্গে করি অপ্সরা-মণ্ডলে
হবেন তাণ্ডবে রত চণ্ডীপতি প্রীতে;
সবাই যাবেন আজি দেব দেবী যত
হরশৈলে ত্রিশূলীরে আনন্দে বন্দিতে
না যাবেন কিন্তু, কান্ত, মকর কেতন,

ভাঙ্গে নাই ভয় তাঁর আজু ত্রিশূলীরে,
থাকিবেন আজি তিনি আমাদের সাথে,
তব তপোবলে, দেব, সেবিবেন তিনি
ও পদে কিঙ্কর রূপে,——————.”

প্রকৃতির সহিত কবির সমপ্রাণতা আছে। তাঁহার নায়িকাগণও সেই জন্য প্রকৃতির সহিত প্রাণ মিশাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির স্পন্দনে তাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই জন্য সুযোগ পাইলেই কবি স্বভাব বর্ণনা না করিয়া ছাড়েন না। বর্ণনা গুলি কেমন সুন্দর, দেখাইবার জন্য দুই এক স্থান উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের প্রতি বলিতেছেন,

জননীর সঙ্গে আমি অচ্ছোদ সরসে
গেনু স্নান তরে আজি, হেরিনু সে সরে
বসন্তের নবশোভা; কুসুম যৌবনে
অপরূপ শোভা হেরি হইনু মোহিত,
কুসুম যুবতী, নাথ, দাসী এ সময়ে
কুসুম যৌবনে এবে অবতীর্ণ ভবে
ঋতুরাজ, কুসুমিত কানন সরসী;
হেরিনু কমলবনে কমলিনী শোভা,
শুনিনু শ্রবণে, নাথ, অলির ঝঙ্কার
সে কাননে, চারি পাশে কুসুমিত লতা
হেরিছে অঙ্গের শোভা সরসী-মুকুরে,
বিভোর আপন রূপে; শুনিনু বিপিনে
মলয়ে শ্বনিতে মৃদে কুলাঙ্গনা কানে;
মুকুলিত আম্রবনে সাধিতে কোকিলে
নিজ প্রিয়া কোকিলারে মদ কলস্বরে;
হেরিলাম মৃগীদেহ কণ্ডুয়নে রত *

* কালিদাস কুমারসম্ভবে ইহাই বলিয়াছেন:—
“শৃঙ্গেন স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসার।”

কৃষ্ণসারে, স্পর্শে মৃগী নিমীলিত আঁখি ;
সিন্দূরিত বনস্থলী শাল্মলী কিংশুকে
সুরভি সমীর চূত মুকুল সৌরভে
গিরি স্রোতস্বতী যত প্রসন্ন সলিলা
উপল শয়নে বহে মধুকলরবে
বিরলে বল্লরী কুঞ্জে বল্লরী দোলনে
হেরিলাম বনদেবে দোহাতে সোহাগে
বনদেবী, মধুমাস লক্ষ্মী স্বরূপিনী,
বকুল মেখলা রক্ত অশোককুন্তলা,
কুসুম পরাগ রাগে অরুণ বদনা,
লোহিত প্রবাল দোলে, লোহিত পতাকা
মন্মথরাজের যেন বনস্থলী মাঝে ;
কৌতুকে বিভোর আমি, কল্পনা কাননে
অন্বেষিনু মৃগীরূপে কৃষ্ণসার মম
বনদেবী রূপে, দেব, মম বনদেবে,
কোকিলে কোকিলারূপে, আকুল হইনু
না হেরি সে জনে, যারে নবরাজ রূপে
বসাইবো প্রেমাদরে নবসিংহাসনে
এ নব যৌবন রাজ্যে ;————”

এইরূপ অনেক স্থলে কবি স্বভাবের সহিত প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আদিরস বর্ণনাতেও কবি নিপুণহস্ত। দেবযানী কচকে লিখিতেছেন,—

অলংকার শাস্ত্র তুমি পড়িতেছ এবে,
যোগাইবে টীকা তার এ তব কিঙ্করী ;
প্রেমময়ী রমণীর মুখের সদৃশ
সে শাস্ত্রের টীকা আর নাই হে ভূতলে ;
যুবা কবি তুমি, নাথ, যুবতীর কাছে
প্রেমের নিগূঢ় তন্ত্র পড়িও বিরলে ;
জীবন্ত জলন্ত গাথা রচিতে বাসনা
থাকে হৃদে যদি, নাথ, চাও যদি কবি,

জ্বালিতে প্রেমের দীপ অন্যের হৃদয়ে,
নিজ প্রেমদীপ আগে লও হে জ্বালিয়া
নব যুবতীর নব প্রেমের প্রদীপে ;
চুম্বি কমলিনী মুখে, শাসে যবে ভবে
সমীর, স্বাগতে তারে ভ্রমর আদরে ;
ভাবুক ভ্রমরে যদি চাহ মোহিবারে
চুম্বিও সমীররূপে তব নলিনীরে ;
প্রেমের স্বপনে তোমা দিবে সে নলিনী
প্রেমের সৌরভ তার, শ্লোকরূপে তাই
বিতরিও সুখে তুমি ভাবুক ভ্রমরে।"

গম্ভীর ও মধুর ভাবের সমাবেশে, কল্পনার লালিত্যে, স্বভাব বর্ণনার চমৎকারিত্বে, শব্দ যোজনার পারিপাট্যে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে লেখাবলী বঙ্গ সাহিত্যে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস পাঠে বিকৃত মস্তিষ্ক বাঙ্গালী পাঠক এ গ্রন্থের আদর করিবে কিনা জানি না, তবে ইহা নিশঃঙ্ক চিত্তে বলিতে পারা যায় যে, রাধানাথ বাবু বঙ্গীয় ভাবুক সুধীমণ্ডলীর নিকটে চিরসমাদৃত হইবেন, এবং তাঁহার লেখাবলী বঙ্গীয় কাব্যকাননের সুরভি কুসুমরূপে কাব্যামোদীদিগের চিত্ত মোহিত করিতে থাকিবে।

এতক্ষণ আমরা গ্রন্থের গুণের কথাই বলিলাম ; দোষের কথা কিছু বলা হয় নাই। গ্রন্থে দোষ নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। মানবের কোন্ কার্য্যে দোষ না থাকে ? গ্রন্থে দোষ আছে, তবে গুণের তুলনায় অনেক কম। দোষের উল্লেখ না করিলে সমালোচনা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, বলিয়া আমরা দুই একটির উল্লেখ করিলাম। দেবযানী কচকে যে পত্র লিখিতেছেন, তাহা ইহাতে বুঝা যায় যে, দেবযানী যেমন কচের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কচও দেবযানীর প্রতি তদ্রূপ অনুরক্ত ছিলেন। মহাভারতের প্রেম-বিহ্বলা দেবযানীকে রাধানাথ বাবুর গ্রন্থে তদ্রূপ দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি ; কিন্তু রাধানাথ বাবুর কচকেত আমরা মহাভারতের কচ বলিয়া চিনিতে পারি নাই। মহাভারতের কচ দৃঢ়ব্রত কঠোর ব্রহ্মচারী। দেবযানী কচের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে কচ বিনা

চিন্তায় তাহা প্রত্যাখান করেন, * ইহাতে দেবযানী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিশাপপ্রদান করেন। তিনি নির্ভীক চিত্তে সে অভিশাপ শিরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু দেবযানীকে গুরুকন্যা বলিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। রাধানাথ বাবুর কচ যেন আজকালিকার টোলের ইয়ার ছাত্র। রাধানাথ বাবু কচ চরিত্র অন্যরূপে কেন চিত্রিত করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

রাধানাথ বাবুর নিকট আমাদের আর একটি বিনীত নিবেদন আছে। সেটি কমলকামিনী সম্বন্ধে। কমলকামিনী কে, তাহা না জানিলে পাঠক আমাদের কথা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া রাধানাথ বাবুর ভাষাতেই তাঁহার পরিচয় দিব।

"বালেশ্বরের সমীপবর্ত্তী রেমুণা নামক গ্রামে কমলকুমারীর জন্মস্থান। কুমারনাথ সম্বন্ধে তাহার ভ্রাতা ছিল। কমলকামিনীর বিবাহের পূর্ব্বে কুমারনাথ এবং কমলকামিনীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণী নদীর তীরে তালচের দুর্গে কমলকামিনীর বিবাহ হয়। কুমারনাথ বিরাগে যোগিবেশ ধারণ করিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। কিছুকালের পর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই তালচের গড়ে আসিয়া সিকতার মধ্যে একটি দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিল। যে দিন কুমারনাথ তালচেরে উপস্থিত হয়, সেই দিন সায়ংকালে কমলকামিনী নিম্নলিখিত পত্রিকা খানি তাহার নিকটে পাঠাইয়াছিল।"

কমলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কুমারনাথের প্রতি তাহার অনুরাগ পূর্ব্ববৎই আছে। এই পত্রখানি সেই অনুরাগের কথায় পরিপূর্ণ।

কমলকামিনী হিন্দু-স্ত্রী। হিন্দুরমণীর পক্ষে স্বামী ভিন্ন অপরের চিন্তা মহাপাপ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্য বটে বাল্যে কুমার নাথের প্রতি

---

* দেবযানী বিবাহ প্রস্তাব করিলে কচ বলিয়াছিলেন,—

পূজ্যোমাগুশ্চ ভগবান্ যথা তব পিতা মম।
তথা ত্বমন বদ্যাঙ্গি পূজনীয় তারা মম॥
প্রাণে জ্যেহপি প্রিয়বরা ভার্গবস্থ মহাত্মনঃ।
ত্বং ভদ্রে ধর্ম্মতঃ পূজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম॥
যথা মম গুরু নিত্যং মান্যঃ শুক্র পিতা তব।
দেবযানি তথৈব ত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব।

তাহার আসক্তি জন্মিয়াছিল, আর বাল্যের প্রণয় বিস্মৃত হওয়া কঠিন। কমল কামিনীর বড়ই দুরদৃষ্ট যে, সে বিবাহের পূর্ব্বে একজনকে ভালবাসিয়াছিল, তাহার আরও দুর্ভাগ্য এই যে, তাহার প্রণয় পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই। কুমারনাথকে বিস্মৃত হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন; কিন্তু কঠিন হইলেও তাহা তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা না পারিলে সতীধর্ম্ম হইতে তাহার পতন হইল। তাহার জন্ম শতবার আমরা চক্ষুর জল ফেলিতে পারি, কিন্তু তাহার কথা সুললিত ভাষায় গান করিয়া তাহার সম্মান করিতে পারি না। কমলকামিনী যদি কুমারনাথের নিকট কেবল মাত্র প্রণয় কথা জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিত, তবে কতকটা পদে থাকিত; কিন্তু সে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য করিতে প্রস্তুত। সে স্বামী ত্যাগ করিয়া কুমার নাথের সঙ্গে যোগিনী হইয়া চলিয়া যাইতে চায়!

"যাচি ভিক্ষা সঙ্গে তব হইতে সঙ্গিনী
যোগিব্রতে ব্রতী তুমি, বড় সাধ মনে
সেবিবে যোগিনীরূপে এ তব কিঙ্করী;
ত্যজি এ সংসার, সখে, গহন কাননে
পশিব তোমার সনে, বহিব আদরে
অজিন আসন তব দণ্ড কমণ্ডলু
হইব মৈথিলী মত কাননের সখী
কানন সোহাগী তুমি, কানন সোহাগী
এ দাসী; যেমতি যেই লভে সে তেমতি।"

হিন্দু আমরা, আমাদের এসব কথা ভাল লাগে না। সংসারে কমল কুমারীর ন্যায় স্ত্রী অনেক আছে, কিন্তু তাহারা কবির সঙ্গীতের বিষয়ীভূতা হইতে পারে না। ইহাদের পাপে সংসার পুড়িয়া যায়। শৈবলিনী এই পাপ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম বাবু তাহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। সে জীবিতাবস্থায় নরক ভোগ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, মন্দের আদর্শ সাহিত্যে না থাকাই ভাল। ইহাতে সমাজ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, কমলকুমারীকে হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইতে পারিতাম।

রাধানাথ বাবু সুবিদ্বান, প্রাজ্ঞ, বহুদর্শী ও সর্ব্বাংশে আমাদের শিক্ষক

স্থানীয়। হয়ত আমরা অল্প বুদ্ধিবশতঃ তাঁহার গ্রন্থের অন্যায় সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার যদি এরূপ বোধ হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহা সমাদরে পত্রস্থ করিব।

২। রাখাল রাজা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বেশ সরল বাঙ্গালায় লিখিত আছে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা নাই। এরূপ ভাবে ধর্ম্ম প্রচারের কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। যীশুর চরিত্র অতি মহান্। ইহার অনুশীলনে ফল নাই কেমন করিয়া বলিব? গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ! এ রণস্থলে, যুদ্ধ আশে অবস্থিত
আপনার জন,
নেহারি সম্মুখে মম, অবসন্ন কলেবর,
বিশুষ্ক বদন ॥ ২৮
কাঁপিতেছে দেহ মম, হইতেছে হে কেশব!
রোম হরষণ।
গাণ্ডীব পড়িছে খসি, হস্ত হ'তে, হইতেছে
শরীর দহন ॥ * ২৯
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে, না পারি রহিতে আর—
বিকল অন্তর,
বিপরীত চিত্র এবে, নয়ন উপরে ওই
ভাসে দামোদর ॥ ৩০

* মূলে "ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে" আছে। "ত্বক্" অর্থে গাত্রচর্ম্ম বুঝায়, কিন্তু আমি অনুবাদে ভাবার্থ "শরীর দহন" লিখিলাম। ইহাতে কোনও ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না।

দেখি না মঙ্গল কিছু, নাশিয়া সমরে কৃষ্ণ,
স্বজন সবার,
নাহি রণে জয়লাভ, সাম্রাজ্য কামনা, সুখ
আকাঙ্ক্ষা আমার ॥ ৩১
কি কাজ হে রাজ্যে কৃষ্ণ! কি কাজ ভোগে জীবনে
যাহাদের তরে,
রাজ্য-ভোগ-সুখ-আশা, আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম
মানব নিকরে,
সেই আত্ম বন্ধুগণ, আচার্য্য, শ্বশুর, পুত্র
পিতৃব্য মাতুল,
শ্যালক ও পিতামহ, পৌত্র আদি যত সব
আপনার কুল,
বিসর্জ্জি প্রাণের মায়া, তেয়াগিয়া ধন রত্ন
রণে অগ্রসর,
যদ্যপি ইহারা মোরে করে নাশ তবু আমি
হবনা কাতর ॥
সামান্য পৃথিবী রাজ্য,— নাহি চাহি ত্রিভুবন
হে মধুসূদন!
ধ্বংস করি ইহাদের, কি লাভ নাশিয়া বল
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ॥ ৩২-৩৫
এই আততায়ীগণে, নাশিলে মোদেরি হবে
পাপের আশ্রয়,
সেই হেতু সবান্ধব, বিনাশিতে ইহাদেরে
মন নাহি লয়।
মাধব! স্বজন নাশি, কেমনে হইব সুখী
হ'তেছে বিস্ময় ॥ ৩৬
এরা লোভে জ্ঞানহীন, না হেরিছে একবার
ওহে জনার্দ্দন!
মহা দোষ কুলক্ষয়, মহা পাপ মিত্র-দ্রোহ
হবে সংঘটন!
কিন্তু হেরি নয়নেতে, আপনার কুলক্ষয়,
দোষ আপনার,
নিবৃত্ত হইতে এই পাপ হ'তে, কেন জ্ঞান
না হবে আমার? ৩৭-৩৮ (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩০৮ সাল।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯　　[৮ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
সম্পাদিত।

সূচী।

১। ঈশ্বর-সমস্তালোচন। (শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) ... ২০৭
২। উদাস প্রাণ। (শ্রী—) ... ২১৫
৩। যোগী। . ২১৬
৪। গুরু ও শিষ্য। (শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়) ... ২১৭
৫। জাল প্রতাপচাঁদ। (সম্পাদক) ... ২৩৩

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা　　এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

স্বর্ণ মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।
মেওরেস

বীরভূমি।

৩য় ভাগ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।　　[৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

ঈশ্বর-সমস্যালোচন।

(সাকার-নিরাকার ও প্রত্যক্ষ।)

জগতের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই বিগত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতে জ্ঞানশালী জীবের মধ্যে একটা বিষয় লইয়া বিরাট যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে, সমস্যার কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই। আবার এই মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাদ, প্রতিবাদ, যুক্তি, তর্ক, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দ্বারা সে সমস্যার যে কোন কালে মীমাংসা হইবে, ইহা কেহ আশা করিতে পারেন না। সে সমস্যাটা,—ঈশ্বর আছেন কি না, থাকিলে সাকার কি নিরাকার?

প্রথমতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়াই যত গোল। ভক্ত, সাধক প্রভৃতি সরলপ্রাণ ব্যক্তি বলিতেছেন ঈশ্বর আছেন, শুধু আছেন নয়, তিনি সর্ব্ব-ঘটে বিরাজমান। চার্ব্বাকাদি দার্শনিকগণের দোহাই দিয়া তাঁহার মতানুবর্ত্তী সন্দিগ্ধচিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাস্তিকেরা (atheist) বলিতেছেন,—ঈশ্বর আবার কি?—এ মত লইয়া জগতে চিরদিন দ্বৈধভাব চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং উহার মীমাংসার আশা সু-বিদূর-পরাহত। তবে একথা সত্য, নাস্তিকগণ প্রকৃতির কার্য্যরূপ একটা শক্তির সত্ত্বা স্বীকার করিয়া থাকেন; বলিতে দোষ কি, ঐ শক্তিটাকেই আমরা আস্তিকের ঈশ্বর ধরিয়া লইনা কেন?

দ্বিতীয় কথা;—শুদ্ধ আস্তিক, যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেই ঈশ্বরের আকার লইয়া মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। আস্তিকের একদল বলেন,—ঈশ্বর সাকার; অন্যদল তাহাতে বাধা দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলেন,—ঈশ্বর নিরাকার। সত্য বটে,—

"কৃত্বা মূর্ত্তি পরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিং কুরু।
নির্ব্বেদ সমতা যুক্ত্যা যস্ত্যারয়তি সংসৃতে ॥"

বৈরাগ্য ও সমতাযোগে ভবসংসারে নিস্তারকারী চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কোনও কর্ম্ম করিও না। অপিচ,—

"সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।
এতৎ তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভাব সম্ভবঃ॥"

সাকার অলীক; নিরাকার ব্রহ্মই নিত্য, এবম্বিধ তত্ত্বের উপদেশে পুনর্জন্ম রহিত হয়।

কিন্তু এই নিরাকারের অর্থ কি? নিরাকারবাদী যাহাই বলুন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে নিরাকারের ধ্যান করা একেবারে অসম্ভব। বাহ্যিক মূর্ত্তি পূজা না করিতে পারি, কিন্তু ধ্যানমগ্ন হইতে গেলেই একটি কল্পিতমূর্ত্তি স্বতঃই হৃদয়পটে স্পষ্ট অথবা আভাসরূপে অঙ্কিত হইয়া উঠে। যাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা নিশ্চয় সত্যকে লাঞ্ছনা পূর্ব্বক নিতান্ত অনৃতের পথানুসরণ করিতেছেন বুঝিতে হইবে; কিন্তু প্রকৃত সত্য বিশ্বাসী ব্যক্তি ইহা বলিতে বাধ্য যে, যদিও ধাতব কিম্বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি পূজা না করি, তথাপি,—

"অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ং।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিন স্তাং বিমুক্তয়ে॥"

মোক্ষকামী যোগিগণ অভ্যাসযোগে চিত্ত সংযম করতঃ হৃদয়পদ্মে তাঁহার (ঈশ্বরের, পরব্রহ্মের) জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণা করিয়া থাকেন।

ফলতঃ ইহাই প্রকৃত কথা। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে নিরাকার উপাসনা একটা তামাসা বা ভাণ মাত্র। কোনও তত্ত্বজ্ঞানী কহিয়াছেন,—

"আঁখ্ নিমিলি শূন্যকো ভজে,
শূন্যপেথই, শূন্য বিরাজে।
কিঞ্চ করই মূরৎকো কল্প
মোক্ষ পাওয়ে অযুতকল্প॥"

অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার উপাসনা করিতে গেলে (সাধারণ মনুষ্য) কেবল অন্ধকারই দেখিয়া থাকে, এবং তাহার অবস্থিতিও (গতিমুক্তি) শূন্যে হইয়া থাকে অর্থাৎ গতিমুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ নিমিত্তাবস্থায় সে মূর্ত্তিরই কল্পনা করিয়া বসে এবং অযুত কল্পেও মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে গেলে দাঁড়ায় যে,—নিরাকার উপাসনায় রত (অসিদ্ধ) ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হয় অন্ধকার দেখিবেন, নচেৎ মূর্ত্তি

কল্পনা করিয়া অনর্থক নিরাকার উপাসনার ভাণ জনিত পাপে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন না।

আমার বোধ হয় কথাটা ঠিক। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বোধোদয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ"—সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত কয়জন সাধারণ মনুষ্য সেই চৈতন্য পুরুষের নিরাকারত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়? সুতরাং প্রথমে সাকারের উপাসনাই শ্রেয়ঃ। জগতের প্রত্যেক কার্য্যে ইহাই স্বাভাবিক; ইহার কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ প্রমাণ দিতেছি।—

(ক) "রাধানাথের মৃত্যু হইয়াছে" বলিবা মাত্র সর্ব্বপ্রথম রাধানাথের একটা কল্পিত মূর্ত্তি (অবশ্য রাধানাথ পাঠকের অপরিচিত, এরূপ স্থলে) আপনার মনোমধ্যে গঠিত হইয়াছে; সে মূর্ত্তিটি হয় খুব স্থূলকায়, অথবা কৃশ দীর্ঘ ইত্যাদি ইত্যাদি। ২য়তঃ যেন রাধানাথ মৃত অবস্থায় পতিত, কিম্বা তাহার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব ধরা হইতে অবলুপ্ত। এই দশাদ্বয় যুগপৎ আপনার হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়াই "রাধানাথের মৃত্যু হইয়াছে" কথাটার অর্থ আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছে; কল্পনা দ্বারা ঐ বিষয়গুলির মূর্ত্তি না গড়িলে এই কথাটার উপলব্ধি কিছুতেই হইতে পারে না। জীবনের প্রতি মূহূর্ত্ত এই ঘটনাময় সুতরাং বিজ্ঞ পাঠককে আশা করি এ বিষয়ে একাধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বাহুল্য। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কোন কিছুর ধারণা করিতে গেলেই পূর্ব্বে মূর্ত্তি কল্পনার আবশ্যক।

(খ) শিশু হাঁটিতে শিখে প্রথম কিছু অবলম্বন করিয়া; বালক সন্তরণ শিখিয়া থাকে প্রথম কাষ্ঠখণ্ড, কলসী অথবা কদলি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, ক্রমশঃ শিশুর গমন শক্তি ও বালকের সন্তরণ শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে স্ব স্ব আশ্রয় বা অবলম্বনকে ত্যাগ করিয়া থাকে;—তখন সেই বর্দ্ধিত শিশু অবলম্বন গ্রহণ দূরে থাকুক, অন্য শিশুকে স্কন্ধে করিয়া দৌড়ায় এবং বালক অপর বালককে পৃষ্ঠে বহন করতঃ উত্তাল তরঙ্গাকুল নদের বিস্তৃত জলরাশি ভেদ করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সাধনার প্রথম অবলম্বন স্বরূপ সাকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভবসাগরে সন্তরণ শিখিতে হইবে; শিক্ষা (সিদ্ধি) হইলে তখন আর অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে না, বরং অপর মুক্তি প্রয়াসীর গুরু স্বরূপ তাহাকে বহন করিয়াও মুক্তিতে পৌঁছাইয়া দিতে পারা যায়।

যে আশ্রয় ধরিয়া সাগর পার হইতে হইবে, তাহা কদলী (কালী) কাষ্ঠ (দুর্গা) কলসী (কৃষ্ণ) যাহা কিছু হইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ আশ্রয়ের সৃষ্টি করিয়াই ভগবান সাধকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥"

(গ) জগতের ইতিহাসের দিকে অবলোকন করিলে, প্রত্যেক প্রখ্যাত জাতির আদিম অবস্থা ঘোর পৌত্তলিক। আদিমনিবাসীর কথা ছাড়িয়া দাও, আর্য্যগণও বৈদিক সময়ে পর্ব্বত, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা করিতেন; রোমক গ্রীসীয়গণ রীতিমত মূর্ত্তিপূজা করিতেন। কালক্ষয়ের সহিত তাঁহাদেরও সাকার পূজার স্তর ক্রমশঃ নিরাকারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; বৈদিক আচারের সংস্কার হইয়া সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি তখন পৌরাণিকী কাল্পনিক মূর্ত্তিতে গঠিত হইল (ইঁহারাই অভিনেত্রী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী); ইহাই মুখ্য সাকার পূজা হইতে গৌণে সংস্কৃত হইল বলা যাইতে পারে। ইহার পর তামসিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাত্বিকভাবে মূর্ত্তিপূজার শেষ হইলে তৎপরে আর মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজন হয় না; তখন কেবল ধ্যান এবং চরমে নিরাকার উপাসনা আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য্য যে, প্রথমে সাকারের (অন্ততঃ কল্পিত সাকারেরও) উপাসনা করিতেই হইবে।

এক্ষণে সম্ভবতঃ আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, নিরাকার উপাসনা সত্য, তাহাই চরম, কিন্তু আদৌ সাকারের ভজনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এতাবৎ সাকার নিরাকারত্ব লইয়া আলোচনা করা হইল, এক্ষণে নাস্তিকেরও ঈশ্বর আছেন কি না, থাকিলে কে, তাঁহার সহিত সাত্বিকের ঈশ্বরেরই বা কি সম্বন্ধ এবং সমগ্র জগতের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

নাস্তিক যে বলিয়া রাখিয়াছেন, প্রকৃতির একটা শক্তিকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন (কারণ সে শক্তিটা না স্বীকার করিলে সৃষ্টিই হইতে পারে না, তাহা অস্বীকার করিলে সৃষ্টি অস্বীকার করিতে হয়।) সেই কার্য্যকারণ, যাহাকে পূর্ব্বে আমরা আস্তিকের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তিনি কি? প্রকৃতি। প্রকৃতি কে? আমি বলি 'ক্ষিত্যপ্তেজঃ মরুদ্ব্যোম' এই পঞ্চভূত শাসিত সৃষ্টিই প্রকৃতি, শুদ্ধ প্রকৃতি বলিলে ভুল হয়, প্রকৃতি ও পুরুষের

সমবায় শক্তি-সৃষ্টি। এখন এই প্রকৃতি পুরুষের সৃজন শক্তিটা কি তাহাই দেখিতে হইবে।

বিজ্ঞান বলেন,—আদিতে সমস্ত সৌরমণ্ডল একটা বিরাট বাষ্প-গোলক ছিল, উহা গগনের বিশাল কক্ষে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শে আসিয়া বিঘূর্ণিতাবস্থায় নানা অংশে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ বিচ্ছিন্ন বাষ্প-গোলক সমূহ ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়া কাল প্রভাবে জীবের আবাসস্থল এবং প্রকৃতির লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্য এই সৌরজগতের সবিতা। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াই এই সৌরজগৎ সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। সূর্য্যে কোনরূপ বিপদুৎপাৎ হইলে সৌরজগৎও তাহার ফলভোগী। গণিত এবং ফলিত উভয়বিধ জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সূর্য্য সৌরজগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং গ্রহগণের গতি ও পর্য্যায়ানুযায়ী জীবগণের জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে, সূর্য্য গ্রহাধিপ। অন্ধকারে জীব বাঁচিতে পারে না; এমন কি, কোনও গৃহের অভ্যন্তরে লতা উৎপন্ন হইলে উহা সর্ব্বদাই জানালা কিম্বা কোন ফাঁকা স্থান দ্বারা বাহিরে উঁকি দিতে প্রয়াস পায়, যাবৎ আলোকরশ্মি না নিরীক্ষণ করে, তাবৎ তাহার সোয়াস্তি নাই। জীব একটা স্বাভাবিক (বিজ্ঞান সম্মত) তাপের উপর জীবনী বিষয়ে নির্ভর করে; তাপ বিহীন হইলেই জীবের মৃত্যু হয়। এক মাতাল বলিয়াছিল,—"সূর্য্য হইতে চন্দ্র বড়, কেন না দিবসেত আলোক স্বভাবতঃই আছে, চন্দ্রমাকিরণে অন্ধকার রাত্রি আলো-কিত হয় সুতরাং চন্দ্রই শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু কোন দিবস যদি সূর্য্য উদিত না হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির অবস্থা কি হয়, একবার ভাবুন দেখি? সূর্য্যের সম্বন্ধে ধারণা যাঁহার ঐ মাতালের ন্যায়, আমার বিশ্বাস তিনিই ঐশীজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; পরে ইহার কারণ পরিষ্কাররূপে বুঝাইতেছি।

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, সূর্য্য আমাদের সব। সূর্য্য ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও সৃষ্টি তিষ্ঠিতে পারে না। সূর্য্য আদিতে যেমন বিশ্বের সবিতা, সর্ব্বকালেই সূর্য্য ইহার পালনকর্ত্তা এবং অন্তেও সূর্য্যই লয়কারী। আর্য্যগণ সৃষ্টি রক্ষার জন্য যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তাহাও এই সূর্য্যের পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে, অগ্নি সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। ভগবান বলিয়াছেন,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥”
গী—৩।১৪।১৫

ভূত সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়; কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সদাযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অন্যচ্চ,——

“তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥” ৯—১৯।

হে অর্জ্জুন, আমিই তাপ দিয়া থাকি, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং বৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমিই মৃত্যু, আমিই স্থূল এবং আমিই সূক্ষ্ম।

এই কয়েকটি ভগবদ্বাক্যাংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভগবদুক্ত যজ্ঞ সূর্য্য (কারণ সূর্য্যই ভূতখাদ্য অন্নের জনয়িতা, বৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা) এবং স্বয়ং ব্রহ্ম ঐ যজ্ঞে (সূর্য্য) অবস্থিত। তাপদান করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, বৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রভৃতি সূর্য্যের কার্য্য; ভগবান বলিতেছেন, “উহা আমিই করিয়া থাকি” সুতরাং সূর্য্যই ব্রহ্ম।

ভগবান পুনরায় বলিতেছেন,—

“যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
* * যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমামকম্॥” ১৫—১২

সূর্য্যস্থ যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, সেই তেজ আমার জানিও। জ্যোতিষ শাস্ত্রও স্পষ্ট বাক্যে ইহাই উপদেশ ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, নাস্তিকোক্ত প্রকৃতি-শক্তি এই সূর্য্য এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মও (এই সৌরজগতের পক্ষে) এই সূর্য্য। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর এই সূর্য্য এবং নাস্তিকেরও পঞ্চভূতশাসক স্বরূপ সবিত বা ঈশ্বর এই সূর্য্য। নাস্তিক বা আস্তিক যে দিক দিয়াই যাউন, চরম সিদ্ধান্তে উভয়ের ঈশ্বর স্বরূপ সূর্য্যকে না মানিলে উপায়ান্তর নাই। ভগবানের অপর নাম অনন্তদ্যুতি; ভগবান:জ্যোতির্ম্ময় এবং যে নাস্তিক প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তিনিও প্রকৃতির সৃজন-শক্তি স্বীকার করাতে পরোক্ষ ভাবে (গৌণভাবে) সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া

থাকেন এবং করিতেও' বাধ্য। মূলে নাস্তিক ও আস্তিকের মত দাঁড়ায় এক। মহামনা সম্রাট আকবর সমস্ত ধর্ম্মের সার সকলন করিয়া সর্ব্বশেষে সূর্য্যোপাসনাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করাতে আনুসঙ্গিক আর এক সমাস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঈশ্বর এবং পরমেশ্বরকে অনেকে পরস্পর প্রতিশব্দ মনে করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাই কি? অণু আর পরমাণু কি এক? আত্মা আর পরমাত্মা কি এক? তাহা হইতে পারে না; তাহা হইলে সৃষ্টির স্বতঃ সিদ্ধে ভুল হয়, অংশ সমষ্টি হইতে পারে না। সূর্য্যকে আমরা আত্মা (জীবন) বলিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে পরমাত্মার সন্ধানে প্রয়াস পাইয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—

এই সুবিরাট অসীম, জীবধারণার বহির্ভূত ভাবে বিস্তৃত অনন্ত শূন্যপথে জীব ও যন্ত্রচক্ষুর অগোচর যে অসংখ্যাসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিয়ত পরিঘুর্ণন করিয়া ছুটিতেছে, ইহার আদি কোথায়, শেষ কোথায়? কাহার উদ্দেশে ইহারা প্রতিনিয়ত ধাবমান? এ কথা জানি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ প্রদক্ষিণ করে; আরও শুনিয়াছি, আমাদের সূর্য্য এই সৌরজগৎ লইয়া আর এক বৃহত্তর ও অধিকতর ক্ষমতাশালী সূর্য্যের (কোনও বৃহৎ নক্ষত্রের) চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করেন, ঐ বৃহত্তর সূর্য্য আবার তদপেক্ষা বিশালতর অন্য সূর্য্যের উপগ্রহ; এইরূপ দ্বাদশ সূর্য্য পর্য্যায়ানুযায়ী করিয়া থাকেন। এ নিয়মমত দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর ঈশ্বর সূর্য্য, সূর্য্যের ঈশ্বর আর এক সূর্য্য, তাঁহার ঈশ্বর আবার অন্য এক সূর্য্য; এইরূপ এই অনন্ত অসীম গগনপথে কত নিরানব্বুই কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিরানব্বুই সহস্র নয়শত নিরানব্বুই সূর্য্য ঐ অসংখ্য সৌরজগৎ পরিবেষ্টিত হইয়া কোন অব্যক্ত শক্তিমান অনন্ত অব্যয় বিরাট মহাসূর্য্যের (অনন্তের) উদ্দেশে ছুটিয়াছে কে জানে? আমি বলি, সেই অনন্ত বিরাট মহাসূর্য্যেই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর; কারণ,—

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥" ১৩—১৭

তিনি (পরব্রহ্ম) সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসকলেরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক, অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ তাহা কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য অর্থাৎ সাধনা দ্বারা প্রাপ্য, এবং সমুদায় জীবের

হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত। তাঁহার অবস্থিতি বা সংজ্ঞা আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, দীনাতীতদীন। তুচ্ছাতীত তুচ্ছ হৃদয়ের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত ; তিনি সাধনা দ্বারা প্রাপ্য, নিরাকার অব্যয় অক্ষয় চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্ম তিনি, তাঁহার ধারণা করিতে পারিলেই অক্ষয়ানন্দ লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং সেই নিরাকার পরব্রহ্ম মহাসূর্য্যের ধারণা করা কি সহজ কথা! সেই জন্যই আদিতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সূর্য্যদেবের ধ্যানে মগ্ন হইয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে নিরাকার অনন্তদ্যুতির ধারণায় সক্ষম হওয়া যায়।

সেই অনন্ত দ্যুতির শক্তি (প্রতিবিম্ব) আমাদের প্রত্যক্ষ সূর্য্যে প্রতিফলিত, ইহার উপসনাই আমাদের আত্মোপাসনা। ইহা উদ্ভট বা নূতন সিদ্ধান্ত নহে, সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ মন্থন করিলে সুধা স্বরূপ যাহা উঠিবে, তাহা আস্বাদন করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য,—কেননা,—

"আদিত্যো ভুবনেশ্বর।
আদিত্যান্নাপরো দেবো হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ॥
নাস্ত্যাদিত্য সমোদেবো নাস্ত্যাদিত্যসমাগতিঃ।
প্রত্যক্ষো ভগবান্ বিষ্ণুর্যেন বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
আদিত্যশ্চার্চিতোদেব আদিত্যঃ পরমংপদম্।
আদিত্যো মাতৃকো ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্ময়ংজগৎ॥"

ভগবান্ আরও বলেন,—

"আদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবংনরঃ।
নাদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা ন স পশ্যতিমাং নরঃ॥"

সুতরাং হে নাস্তিক, হে আস্তিক, আমাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোদ্দেশে করপুটে সমস্বরে বলি,—

"ত্রিগুণং চ ত্রিতত্ত্বং চ ত্রয়োদেবা স্ত্রয়োগ্নয়ঃ।
ত্রয়াণাং চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্বং তুরীয়স্ত্বং নমোস্তুতে॥"

শান্তিঃ।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

উদাস প্রাণ।

উদাস পরাণ মোর ;
হৃদয়ে বিষাদ ঘোর
ছেয়ে থাকে দিবানিশি
যেন ঘোর তমসায়!
একাকী নির্জনে ব'সে
চাহি নীলিম-আকাশে,
নির্ম্মল পূর্ণিমা রাতে
অসংখ্য তারকা সাথে
বিকসিত যেন চারু
সাজান প্রসূনময়।
উজ্জ্বল তারকা হেরি
প্রাণ বিভাষিত হয়!
একাকী আকুল মনে
চাহিয়া অনন্ত পানে,
ক্ষণেকের তরে প্রাণে
কি যেন কি সুখ হয়!
অনিমেষ নিরধারে
হেরি স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে
প্রাণে যেন সুধা ঝরে
শান্তি সুখ ক্ষণে হয়।
অসীম আকাশ পানে
চাহিয়া আপন মনে
প্রাণ যেন চ'লে যায়
হায়! কি জানি কোথায়!
নিমিষে সকলি ভুলি
সকলি পশ্চাতে ফেলি
অনন্ত শান্তির আশে
পরাণ ছুটিয়া যায়!

(ক্রমশঃ)

শ্রী--

যোগী।

পূত তটিনীর কূলে, শ্রীফল তরুমূলে
যোগাসনে বসি যোগীবর।
অচল অটল কায়, রজত গিরির প্রায়
জটাজূট ছায় রবিকর॥
অরুণ কিরণ ছটা, ভালে সিন্দূরের ঘটা
জটায় জাহ্নবী কলরব।
উছলি উছলি ধায়, ফেনপুঞ্জ উঠে তায়
শিরে যেন তুষার বৈভব॥
বাল ইন্দু শোভে ভালে, বালার্ক কিরণজালে
গলে দোলে নর হাড়মাল।
স্ফটিকের শুভ্র আভা, মুনিজন মনোলোভা
বিকাশিছে উরস বিশাল॥
পিককুল কূজন, মধুকর গুঞ্জন
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
যেন শ্রান্তি দূর ছলে, বনদেবী কুতূহলে
যোগীবরে করিছে ব্যজন॥
কে তুমি হে যোগাসনে, নিমগন যোগধ্যানে
আজানুলম্বিত বাহু স্কন্দে।
কারে চিন্ত যোগীবর, ভস্মভূষা দিগম্বর
শবাসনে ত্রিনয়ন মুদে॥
রাতুল চরণে স্থান, দিও ওহে ভগবান
এ মিনতি যুগল চরণে।
জপতপ নাহি জানি, জানত হে শূলপাণি
কৃপানিধি অকৃতী সন্তানে॥

গুরু ও শিষ্য।

ঘোর কলিকাল-মাহাত্ম্যে গুরু ও শিষ্যের পবিত্র সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া, এখন গুরুগিরি অর্থোপার্জ্জনের একটা পন্থাস্বরূপ ব্যবসায়রূপে পরিণত হইয়াছে। কেবল মাত্র সেবাগ্রহণ ও শিষ্য-বিত্ত-হরণ-ব্যতীত গুরুকরণ-ব্যবস্থার আর কোন গূঢ়তম উদ্দেশ্য আছে কি না এবং দীক্ষা বিষয়ে গুরুগণের দায়িত্বই বা কতদূর, তাহা ব্যবসাদার গুরুগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজে অবগত নহেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন; যাঁহারা দীক্ষা সম্বন্ধে সকল রহস্যই অবগত আছেন, তাঁহারাও লোভপরতন্ত্র হইয়া স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ শিষ্যগণকে কথাটা জানিতে না দিয়া, প্রচ্ছন্নভাবেই রাখিয়াছেন। ফলতঃ ইঁহাদের কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া মনে হয়, ধর্ম্মভয় পরকালের ভয়, আদৌ ইঁহাদের লোভাক্রান্ত চিত্তে স্থান পায় না। যেন তেন প্রকারেণ শিষ্যকর্ণে যে সে একটা মন্ত্র দিয়া, স্বার্থসাধন করাকেই ইঁহারা পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গুরু নিজে দীক্ষাদানে অধিকারী কি না ও অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে দীক্ষিত করিলে, শাস্ত্রমতে সে দীক্ষা সিদ্ধ হইবে কি না এবং পরি-ণামে পরকালে তাঁহাদের নিজের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে ২।৪ জন ব্যতীত প্রায় লোকই দীক্ষা বিষয়ে এখন ঘোর অন্ধকারে অবস্থিত। প্রতারণা-পরায়ণ গুরুগণের প্রলুব্ধ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহারা মনে করে, যে কোন গুরুর নিকট যে কোন ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, কোন প্রকারে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিতে পারিলেই পরকালের কাজ হইয়া গেল। ফলকথা শাস্ত্রোক্ত সদাচারপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সাধনধর্ম্মতৎপর সদ্‌গুরুর যে, বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত অভাব হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ, কলিতে এইরূপই ঘটিবে, ইহা জানিতে পারিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ।
দুর্ল ভঃ সদ্‌গুরুর্দ্দেবি শিষ্য-হৃত্তাপহারকঃ॥"

গুরুগীতা।

অর্থাৎ শিষ্যের বিত্তাপহরণকারী গুরুই অধিকাংশ হইবে। কিন্তু শিষ্যের হৃদয়ের তাপ হরণে সমর্থ, এমন গুরু অতীব দুর্লভ। অতএব দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং গুরু ও শিষ্য কিরূপ লক্ষণান্বিত হওয়া উচিত, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে পাঠকগণকে জানাইবার চেষ্টা করিব।

সংসার-বিনাশক জ্ঞানলাভই গুরুকরণ ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মানবগণ অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া সংসারযাতনায় যে অহরহঃ জ্বালাতন হইতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়ই হইল, জ্ঞান লাভ। সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে, সেই জ্ঞানপ্রাপ্তি সহজসাধ্য হয় বলিয়াই, শিষ্যকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে হয়। গুরু শিষ্য সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধ শিষ্যের চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন। যথা,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরুগীতা।

জ্ঞানদাতা আদিনাথ মহাকাল সদাশিবই স্বয়ং জগদ্‌গুরু। কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি অপরাপর সকল প্রকার উপাসকগণের মধ্যেই মন্ত্রবক্তা এক মাত্র তিনি ভিন্ন, আর কেহ নাই। যথা,—

"আদিনাথো মহাদেবি মহাকালো হি সঃ স্মৃতঃ।
গুরুঃ স এব দেবেশি সর্ব্বমন্ত্রেষু নাপরঃ॥
শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবে চ গাণপত্যে তথৈন্দবে।
মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ।
মন্ত্রবক্তা স এবব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি॥"

যোগিনী তন্ত্র।

মানব-গুরু-দেহ পূর্ব্বোক্ত জগদ্‌গুরু ভগবান সদাশিবের যন্ত্র-স্বরূপ। শিষ্যকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার সময়, ঐ যন্ত্র-স্বরূপ মানব-গুরু-দেহে জগদ্‌-গুরুর আবাহন করিতে হয়। নতুবা দীক্ষাদানে মানব-গুরুর অধিকার হয় না। বলা বাহুল্য যে, যন্ত্র উপযুক্ত ও সুপবিত্র হইলেই তাহাতে শৈবী শক্তির আবির্ভাব হইয়া, দীক্ষাকে ফলবতী করিয়া থাকে। নতুবা সে দীক্ষা ব্যর্থ হয়। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয় বলিয়াই, মানবগুরুকে কদাচ মনুষ্য-বুদ্ধিতে দেখিতে নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"গুরৌ মানুষবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাম্।
প্রতিমায়াং শিলাবোধং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥
মুক্তির্ন জায়তে দেবি মানুষে গুরুভাবনাৎ।
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরু॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, যিনি গুরুতে মানুষবুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর বুদ্ধি ও প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহার মুক্তি কোন কালেই হইতে পারে না। পরন্তু ঐ পাপে তাঁহার নরকভোগও সুনিশ্চিত। শিষ্য সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন, যিনি আমার গুরু, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি আমার নাথ, তিনিই জগন্নাথ।

প্রকৃতি ও রুচিভেদেই সগুণব্রহ্মের উপাসকগণ প্রধানতঃ পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য। বহুরূপী ভগবানের যাঁহারা শক্তিরূপের উপাসক, তাঁহারা শাক্ত, যাঁহারা শিবরূপের, তাঁহারা শৈব, যাঁহারা বিষ্ণুরূপের, তাঁহারা বৈষ্ণব; যাঁহারা সূর্য্যরূপের, তাঁহারা সৌর; আর যাঁহারা গণেশরূপের উপাসক, তাঁহারাই গাণপত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য বুঝাইতে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়, বড়ই সুন্দর ও সুযুক্তি সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতি জন্য তাঁহার পঞ্চামৃত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"আত্মা যে পর্য্যন্ত স্ব স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত চুম্বকশৈলাভিমুখে লৌহের গমনোদ্যমের ন্যায় পরমাত্মাকে উপাসনা করিতে জীবের স্বতএব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহাদের প্রবৃত্তি কেবল মাত্র রুচি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা গম্য স্থানে পৌছিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের প্রবৃত্তি বৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা সংগঠিত ও সুপরিচালিত হয়, তাঁহারাই নির্ব্বিঘ্নে পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারেন। বিশেষ বিশেষ বিধি দ্বারা সগুণ ব্রহ্মে মনের যে বৃত্তিপ্রবাহ হয়, তাহাকে উপাসনা কহে। ("সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপারাণি উপাসনানি") ত্রিগুণময়ী মায়ায় অভিভূত জীব, কখন নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বেদমূলক সনাতন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র মানবের প্রকৃতিভেদে উপাসনা ভেদ করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ বিচার পূর্ব্বক ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতিভেদে এক এক রস ও এক এক বর্ণপ্রিয় হয়।

কেহ লবণ, কেহ মিষ্ট, কেহ বা তিক্ত রসপ্রিয়; কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ বা হরিদ্বর্ণ প্রিয়। মানবের জন্মকালে তাহার উপর যে গ্রহের আধিপত্য থাকে, সেই গ্রহের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রস ও বর্ণে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। চন্দ্রের অংশ যাহার শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে, লবণরস ও শুক্লবর্ণ তাহার স্বাভাবিকপ্রিয় হয়। আবার রব্যাদি সপ্তগ্রহ মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী জাতীয় ও কথকগুলি পুংজাতীয়। পুংজাতীয় গ্রহের ভাগ যাহার শরীরে অধিক, সে ব্যক্তি পুরুষ দেবতা ভালবাসে। এইরূপ জন্মনক্ষত্রগ্রহাদি বিচার পূর্ব্বক সুদক্ষ সদ্গুরু শিষ্যের প্রকৃতির অনুরূপ স্ত্রী বা পুরুষদেবতা, কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণের দেবতা, নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। মনঃপ্রকৃতিতে জন্মসূত্রনিহিত প্রীতি শক্তির সহিত নির্ব্বাচিত ইষ্টদেবতার জাতিগত বা ভাবগত সম্মিলন হইলেই সাধক ইষ্টফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নিজে ইচ্ছা করিয়া—পছন্দ করিয়া ইষ্টদেবতা নিরূপণ করিতে নাই। ব্রহ্মবিদ্গরিষ্ট গুরু, তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অজ্ঞাত—তোমার অন্তঃকরণের অভ্যন্তরগর্ভে নিহিত শক্তি সামর্থ্য ও অধিকার বিদিত হইয়া তোমার মঙ্গলার্থে তোমাকে যে উপাসনা পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইতে কহেন, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, তোমার হৃদয় বজ্রলেপময় পাষাণতুল্য হইলেও তাহা ভেদ করিয়া বিশাল জ্ঞানোর্ম্মিমালা ও রসোচ্ছ্বাস সহিত ভক্তির প্রস্রবণ ফুটিয়া বাহির হইবে। এবং পরমানন্দের প্রবাহ বহিতে থাকিবে।"

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় সাধারণতঃ যে ভাবে আপন আপন গুরুনির্ব্বাচন করিয়া লইবেন, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা,—

> "শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্ম্মতঃ।
> বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥
> গাণপে গাণপঃ খ্যাতঃ কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্গুরু।
> অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"
>
> মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

শাক্তে শাক্তগুরু, শৈবে শৈবগুরু, বৈষ্ণবে বৈষ্ণবগুরু, সৌরে সৌরগুরু ও গাণপত্যে গাণপত্যগুরুই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু যিনি কৌল, তিনিই শ্রেষ্ঠতম সদ্গুরু। এবং সকল প্রকার উপাসক সম্প্রদায়েরই তিনি গুরু

হইতে পারেন। অতএব ধীমান ব্যক্তি কৌলের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্যই বিশেষরূপে যত্ন করিবেন।

পাঠক! মনে রাখিবেন, এই কলিপ্রাবল্যের ঘোর দুর্দ্দিনে যে সকল কপটবেশধারী পেসাদার ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে 'কৌল' নামে পরিচিত ও কৌলোচিত বহিশ্চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া, স্বার্থের জন্য নিয়তঃই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যাহারা অনধিকারে উচ্চমত সাধকগণের অবলম্বনীয় মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব * স্পর্শ ও ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাদিগকে পতিত ও পরকালে নরকগমনের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছে, যাহারা মদ্যপানে মত্ত হইয়া সকল প্রকার অকার্য্যই করিয়া থাকে, এ কৌল, সে কৌল নহে। যিনি শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত কৌল সাধক, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং ঐশীশক্তিও অষ্টসিদ্ধি-সম্পন্না † হইবেন—তাঁহারা বাক্য অমোঘ হইবে। ফলকথা সাধনা দ্বারা মানব কৌলত্ব প্রাপ্ত হইলেই, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইল—তিনি কৃতার্থ হইলেন। শাস্ত্রকারগণ তান্ত্রিক কুলাচারের সাধককে সর্ব্বোচ্চতম আসন প্রদান করিয়াছেন যথা,—

"কৌলাচারবিধিং বক্ষে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা॥
দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ।
ন কোঽপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥
কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো ন হি॥
কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥

---

* মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, ইহারই নাম পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ মকার।

† অষ্টসিদ্ধি। যথা,—

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"

অণিমা (অণুত্ব, অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মত্ব) লঘিমা, (লঘুত্ব) প্রাপ্তি, (সর্ব্বজীবনের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অবগতি) প্রকাম্য, (শ্রুত ও দৃষ্ট সমস্ত বিষয়ের উপভোগ) মহিমা, (মহত্ত্ব) ঈশিত্ব, (শক্তি চালনা) বশিত্ব, (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, এই ত্রিগুণে নির্লিপ্ততা) ও কামাবসায়িতা (কাম্য সুখের চরম সীমা প্রাপ্তি।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ম্।
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ ॥"

কুলার্ণব তন্ত্র।

মর্ম্মার্থ এই যে, "এক্ষণে কৌলাকার-পদ্ধতি বলিতেছি। এই কৌলজ্ঞানই জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সৌভাগ্যক্রমে কৌলজ্ঞান জন্মিলে সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েন—আর তাঁহারা কর্ত্তব্যের অবশেষ থাকে না। কুলাচারী সাধকের সাধন বিষয়ে কোন দিক্ কালের নিয়ম নাই। কেন না, তিনি বিধি-নিষেধের অধীন নহেন। কুলাচারী সাধক ব্রহ্মাণ্ডের গুরু, সাক্ষাৎ সদাশিব-মূর্ত্তি—তিনি ত্রিলোকের পূজনীয়। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক আর নাই। সাধক যখন কুলাচারের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার পঙ্ক-চন্দন, পুত্র ও শত্রু, প্রিয় ও অপ্রিয়, শ্মশান ও অট্টালিকা এবং স্বর্ণ ও তৃণ, ইত্যাদি ভাল মন্দ বলিয়া, সংসারে কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না। বস্তুতঃ যিনি সর্ব্বভূতে অব্যয় বিভু আত্মাকে ও আত্মাতেই সকল ভূত দর্শন করেন, তিনিই কৌলিকোত্তম। দেহত্যাগের পর, তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন—আর তাঁহাকে সংসারে আসিতে হয় না।"

পাঠক। শাস্ত্রোক্ত কৌলসাধকের কথা শুনিলেন? এই প্রকার সদ্-গুরুর কৃপা লাভ হইলেই শিষ্য সাধনা বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এক্ষণে 'ইষ্টমন্ত্র' কাহাকে বলে, ও মন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা,—

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামন্ত্রান্মন্ত্র উচ্যতে।"

যাঁহার মনন হইতে বিশ্ববিজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসত্তা পৃথক্ নহে, এইপ্রকার অনুভব যখন প্রত্যক্ষ হয়) সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আমন্ত্রণ, এই তিনটী অলৌকিক দায়িত্ব যাহাতে নিত্য বিদ্যমান, তাহারই নাম 'মন্ত্র' বা 'ইষ্টমন্ত্র'। এইবার উপসনার যন্ত্রস্বরূপ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন সাকাররূপের প্রতিমা বা মূর্ত্তির কথা বলা যাইতেছে। প্রতিমা সর্ব্বরকমে আট প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ প্রস্তরনির্ম্মিতা, কাষ্ঠনির্ম্মিতা, লৌহনির্ম্মিতা, লৈপ্যা, (সিন্দূর-চন্দনাদিময়ী) লেখ্যা (চিত্রিতা) সৈকতা (বালুকাময়ী) মানসিকী ও মণিনির্ম্মিতা, এই আট প্রকার।

দীক্ষার কালনিয়ম।

"সম্প্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।

*　*　*　*　*

তস্মাৎ যত্নেন কর্ত্তব্যা দীক্ষা হি বর্ষষোড়শে।

হরিনাম বৃথা তস্য গতে তু বর্ষষোড়শে॥"

রাধাতন্ত্র।

শিষ্যের বয়স ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হইলেই আর তাহার দীক্ষা গ্রহণ হইতে পারে না। কেন না শাস্ত্রমতে ষোড়শবর্ষ বয়সের পর যে দীক্ষা, তাহা নিষ্ফলা হইয়া থাকে। অতএব ষোল বৎসর বয়সের মধ্যেই দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

জগদ্‌গুরু সদাশিবের যন্ত্রস্বরূপ মানবগুরুগণ কিরূপ লক্ষণান্বিত হইলে দীক্ষা ফলবতী হইবে,এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। যথা সারদাতিলকে,—

"মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধভাবো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্ব্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ॥

পরোপকারনিরতো জপপূজাদিতৎপরঃ।

অমোঘবচনঃ শান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥

যোগমার্গার্থসন্ধায়ী দেবতাহৃদয়ঙ্গমঃ।

ইত্যাদিগুণসম্পন্নো গুরুরাগমসম্মতঃ॥"

যিনি মাতাপিতা হইতে বিশুদ্ধ জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং নিজে বিশুদ্ধ-চরিত, জিতেন্দ্রিয়, সমগ্র আগম * শাস্ত্রের সারজ্ঞ, সর্ব্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা,

---

* আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ॥
নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

তন্ত্র নামে অভিহিত শাস্ত্র সকলের মধ্যে যাহাতে বক্তা ভগবান্ শিব ও শ্রোতা ভগবতী গিরিজা এবং যাহা ভগবান্ বাসুদেবের অভিমত, তাহার নাম আগম; আর যাহাতে বক্তা ভগবতী, শ্রোতা শিব ও যাহা বাসুদেবের সম্মত, তাহার নাম নিগম।

পরোপকারনিরত, জপপূজাদিপরায়ণ, অমোঘবচন, শান্ত (যাঁহার মনে সর্ব্বদাই শান্তি বিরাজমানা) বেদবেদাঙ্গপারগামী, যোগশাস্ত্রে ও যোগানুষ্ঠানে সুপণ্ডিত এবং ইষ্টদেবতাকে যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই আগমসম্মত গুরু। এবং এইরূপ গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত।

কুলার্ণব তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।"

সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা পুত্রবান্ গৃহস্থই গৃহস্থই শিষ্যের গুরু হইতে পারেন। যোগিনী-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য॥
যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িনী॥"

জন্মদাতা পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর, শত্রুপক্ষাশ্রিত ব্যক্তি, যতি, বনবাসী ও বিবিক্তাশ্রমী, (সন্ন্যাসী) ইঁহাদের নিকট হইতে গৃহস্থ শিষ্য কদাচ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না; করিলে সে দীক্ষা কল্যাণদায়িনী হয় না। রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং প্রদীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥
মন্ত্রার্থো দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিনী।
তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ॥"

পতি পত্নীকে, পিতা পুত্র কন্যাকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে কদাচ দীক্ষিত করিবেন না। পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র বিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে পত্নীকে নিজশক্তিরূপে দীক্ষিত করিতে পারেন। পরন্তু এরূপ স্থলে গুরুর মন্ত্রদান জন্য পিতৃত্ব ও শিষ্যের মন্ত্রগ্রহণ জন্য কন্যাত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে না। এইরূপ দীক্ষা কেবল বীরাচারে ও কৌলাচারেই বুঝিতে হইবে, পশ্বাচারে নাই। ইষ্টমন্ত্রের যাহা প্রকৃতার্থ, তাহাই দেবতার স্বরূপ; আর যিনি দেবতা, তিনিই গুরুস্বরূপিনী। সুতরাং যিনি আত্মহিত ইচ্ছা করেন, তিনি কদাচই মন্ত্র,

দেবতা ও গুরুতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। সিদ্ধমন্ত্রে কেবল নিম্নলিখিত দেবতা সকলই বুঝিতে হইবে। যথা,—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দীক্ষিতাস্তাসু যে নিত্যং সিদ্ধমন্ত্রাংস্তু তান্ বিদুঃ॥"

ক্রমচন্দ্রিকা।

পশ্চাল্লিখিত গুণসম্পন্না সধবা স্ত্রীগুরুও মন্ত্রদানে সমর্থা। কিন্তু বিধবার দীক্ষাদানে এককালীন অধিকারই নাই। যথা,—

"সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না জাপিকা পদ্মলোচনা।
রত্নালঙ্কার সংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা॥
শাক্তা কুলীনা কুলজা চন্দ্রাস্যা সর্ব্ববুদ্ধিগা।
অনন্তগুণসম্পন্না রুদ্রত্বদায়িনী প্রিয়া॥
গুরুরূপা শক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরূপিনী।
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা-পরিবর্জ্জিতা॥"

রুদ্রযামল।

সংস্কৃত অতি সরল বলিয়া, অনুবাদ দেওয়া হইল না।

ভগবৎ কৃপা ও শিষ্যের সৌভাগ্যের উদয় হইলে, কোন কোন সময়ে স্বপ্নাবস্থাতেও মন্ত্র পাওয়া যায়। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র বিষয়ে এক্ষণে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইতেছে। যথা,—

"স্বপ্নে তু নিয়মো নাস্তি দীক্ষায়াং গুরু শিষ্যয়োঃ।
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে সংস্কারেণৈব শুধ্যতি॥"

রুদ্রযামল।

"স্বপ্নলব্ধে তু কলসে গুরোঃ প্রাণান্নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

যোগিনী তন্ত্র।

গুরুকরণ ব্যতীত কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না। এজন্য স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র ও স্ত্রীগুরু প্রদত্ত মন্ত্র সংস্কার করিয়া লইতে হয়। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে ও ঘটে গুরুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ও কুঙ্কুম দ্বারা বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া গ্রহণ করিবে।

দীক্ষা বিষয়ে সাধারণ ব্যবস্থা।

"পৈত্রং গুরুকুলং যস্ত ত্যজেদ্ বৈ পাপমোহিতঃ।
স জাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্ক্ততারকম্॥"

পিচ্ছিলা তন্ত্র।

সাধারণতঃ গুরু যে যে গুণবিশিষ্ট লোক হইবেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি ঐ প্রকার গুণবিশিষ্ট লোক থাকা সত্তেও শিষ্য পাপমোহিত হইয়া পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ঘোর নরকে নিপতিত হইবে। কিন্তু যদি পৈতৃক গুরুকুলে গুরুযোগ্য লোক না পাওয়া যায়, তবে শিষ্য সে গুরুকুল ত্যাগ করিয়া অন্য জ্ঞানবান্ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যথা,—

"জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্জ্ঞানং পরাৎপরম্।
অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেদ্গুরুম্।
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সন্ত্যজতি প্রিয়ে॥
জ্ঞানত্রয়ং যদা ভাতি স গুরুঃ শিব এব হি।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ॥
জ্ঞানাদ্ধর্ম্মো ভবেন্নিত্যং জ্ঞানাদর্থোঽপি পার্ব্বতি।
জ্ঞানাৎ কামমবাপ্নোতি জ্ঞানান্মোক্ষো হি নির্ম্মলঃ॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥

*   *   *   *

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্ত সদ্গুরুঃ সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সিদ্ধোঽসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥

*   *   *   *

সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥

পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরক্ষার্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ ॥
ইত্যাদি গুণসম্পত্তিং দৃষ্টা দেবি গুরুং ব্রজেৎ।
ত্যক্ত্বাক্ষমং গুরুং শিষ্যো নাত্র কালবিচারণা ॥
কেবলং শিষ্যসম্পত্তি গ্রাহকো বহুমারকঃ।
ব্যঙ্গিতশ্চ সমক্ষে যো লোকৈর্নিন্দ্যো গুরুর্মতঃ ॥
*　　　*　　　*　　　*
কর্ম্মণা গর্হিতেনৈব হন্তি শিষ্যধনাদিকম্।
শিষ্যাহিতৈষিণং লোভাৎ বর্জ্জয়েত্তং নরাধমম্ ॥"

কামাখ্যা তন্ত্র।

একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব জ্ঞানের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম বস্তু আর নাই। অন্নাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন নিরন্নকে ত্যাগ করিয়া সান্ন জনের আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ জ্ঞান-পিপাসু শিষ্যও জ্ঞানদানে অক্ষম গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাতে জ্ঞানত্রয় * সদাই বিরাজমান, সেই সাক্ষাৎ শিবতুল্য সদ্‌গুরুর শরণ লইবেন। মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন মধু আহরণার্থ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরুর নিকট হইতে গুর্ব্বন্তরের আশ্রয় গ্রহণে অধিকারী। কেন না, কেবল মাত্র জ্ঞান দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

যিনি শান্ত, দান্ত, (তপঃক্লেশসহিষ্ণু) কুলীন ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ এবং পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার দ্বারা যিনি ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করণে অধিকারী, তিনিই সদ্‌গুরু পদবাচ্য। যিনি লোকসমাজে 'সিদ্ধপুরুষ' বলিয়া বিখ্যাত; দৈবশক্তি দ্বারা যিনি অদ্ভুত কার্য্যকরণে সমর্থ; তিনিও সদ্‌গুরু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যিনি শিষ্যগণের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্টিত এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, এই উভয় প্রকার সামর্থ্যই যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিও সদ্‌গুরু নামে কীর্ত্তিত হয়েন। আর পরমার্থ ব্যাপারে সদাই যাঁহার দৃষ্টি এবং স্বকীয় গুরুপাদাম্বুজে যাঁহার অচলা ভক্তি আছে. তিনিও সদ্‌গুরু। সুবুদ্ধি শিষ্য, ইত্যাদি গুণসম্পত্তি দেখিয়াই অক্ষম গুরুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক

---

* জ্ঞানত্রয়, যথা—বীর, দিব্য, কৌল; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও গুরু, মন্ত্র, দেবতা, ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান।

অন্ত সদ্‌গুরুর শরণ লইবেন এবং যিনি কেবল মাত্র শিষ্যবিত্তাপহারক, বহুমারক, (দীক্ষাচ্ছলে ধনাপহারক) ব্যঙ্গিত (অসার জ্ঞানে লোকসমাজ যাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে) শিষ্যের ধনহরণ জন্ত যিনি গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন ও যিনি লোভ প্রযুক্ত শিষ্যের অহিত কামনা করেন, সেই নরাধম গুরুকে অবিলম্বেই ত্যাগ করিবেন।

দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুবংশের নিম্নলিখিত দোষযুক্ত ব্যক্তিগণকেও শিষ্য ত্যাগ করিবেন। কেন না, শাস্ত্রমতে ইঁহারাও দীক্ষাদানে অধিকারী নহেন। যথা,—

"বর্জ্জয়েচ্চ পরানন্দ-রহিতং রূপবর্জ্জিতম্।
নিন্দিতং রোগিণং ক্রূরং মহাপাতকিনং গুরুম্॥
অষ্ট প্রকার কুষ্ঠে চ গলৎকুষ্ঠি নমেব চ।
শিত্রিনং জনহিংসার্থং সদার্থগ্রাহিনং তথা॥
স্বর্ণবিক্রয়িণং চৌরং বুদ্ধিহীনং সুখর্ব্বরম্।
শ্যাবদন্তং কুলাচার-রহিতং শান্তিবর্জ্জিতম্॥
সকলঙ্কং নেত্ররোগ-পীড়িতং পরদারগম্।
অসংস্কার-প্রবক্তারং স্ত্রীজিতং চাধিকাঙ্গকম্॥
কপটাত্মানমেবঞ্চ বিনষ্টং বহুজল্পকম্।
বহ্বাশিনং হি কৃপণং মিথ্যাবাদিনমেব চ॥
অশান্তং ভাবহীনঞ্চ পঞ্চাচার-বিবর্জ্জিতম্।
দোষজালৈঃ পূরিতাঙ্গং পূজয়েন্ন গুরুং বিনা॥"

রুদ্রযামল।

যিনি পরানন্দ-রহিত, রূপবর্জ্জিত, (কুরূপ) নিন্দিত, (লোকসমাজ যাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকে) রোগী, (চিররুগ্ন) ক্রূর, মহাপাতকী, অষ্ট প্রকার কুষ্ঠের মধ্যে গলৎকুষ্ঠরোগী, শিত্রী (যাঁহার গাত্রে ধবল হইয়াছে) জনহিংসার্থ সর্ব্বদা অর্থগ্রহণকারী, স্বর্ণবিক্রয়ী, চোর, বুদ্ধিহীন, সুখর্ব্বর, (খুব খর্ব্বাকৃতি) শ্যাবদন্ত, (যাঁহার প্রধান দন্তোপরি নূতন দন্ত বাহির হয়, যাহাকে কুকুর দাঁত বলে) কুলাচার-রহিত, শান্তিবর্জ্জিত, সকলঙ্ক, (যাঁহার অখ্যাতি ঘোষিত হইয়া থাকে) নেত্ররোগী, (যাঁহার চক্ষুরোগ জন্মিয়াছে) পরদারগামী, অসংস্কার প্রবক্তা (অশুদ্ধ ভাষী) স্ত্রীজিত, (স্ত্রৈণ) অধিকাঙ্গক,

(যাঁহার দেহমধ্যে অঙ্গুল্যাদি অঙ্গাধিক্য আছে) কপটাত্মা, বিনষ্ট, (ধর্ম্মভ্রষ্ট) বহু জল্পক, (বহু ভাষী, বৃথা বহু কথা যিনি কহিয়া থাকেন) বহ্বাশী (অমিতাহারী) কৃপণ, মিথ্যাবাদী, অশান্ত, ভবাহীন (ভক্তিহীন) পঞ্চাচার-বিবর্জ্জিত ও দোষ সমূহ দ্বারা পূরিতাঙ্গ, এই সকল দোষ বিশিষ্ট গুরু কখন দীক্ষাদানে অধিকারী নহেন।

গুরুকুলের মর্য্যাদা।

"পশু-মন্ত্র প্রদানে তু মর্য্যাদা দশপৌরুষী।
বীর-মন্ত্র প্রদানে তু পঞ্চবিংশতি পৌরুষী॥
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পঞ্চাশৎ পৌরুষী মতা।
ব্রহ্মযোগ প্রদানে তু মর্য্যাদা শত পৌরুষী॥"

যোগিনী তন্ত্র।

মর্ম্মার্থ এই যে, 'পশু-মন্ত্র-দাতা' গুরুবংশের দশপুরুষ, 'বীরমন্ত্রদাতা' বংশের পঞ্চবিংশতি পুরুষ, 'মহাবিদ্যা-মন্ত্রদাতা' বংশের পঞ্চাশৎ পুরুষ ও ব্রহ্মযোগ-মন্ত্রদাতা গুরুবংশের শত পুরুষ পর্য্যন্ত মর্যাদা থাকিবে। অর্থাৎ শিষ্যবংশীয় লোকেরা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত গুরুকুলে সম্মান দেখাইবেন। 'পশুমন্ত্র' ও 'বীরমন্ত্র' কাহাকে বলে, সে কথাটাও পাঠকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল। তন্ত্র বলিয়াছেন,—

জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদ-বিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোরভেদো হি দিব্যভাব উদাহৃতঃ॥
ভেদাভেদবিদো বীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং এমঃ প্রিয়ে।
পশুভাবঃ সোপরমো বীরভাবাববোধকঃ।
বিদ্যাববোধকো বীরভাবঃ সোপরমস্তথা॥
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে।
তথা ভাবত্রয়ং দেবি উত্তরারন্ত সাধনম্॥
অতএব মহেশানি বীরাণং কারণং পশুঃ।
দিব্যানাং বীরভাবশ্চ * * * ॥"

"ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান ভেদে, জ্ঞান দুই প্রকার। যে জ্ঞানে ঘট পটাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম ভেদজ্ঞান; আর যে জ্ঞানের উদয় হইলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একসত্তাময় উপলব্ধ হয়, তুমি, আমি, জগৎ, পৃথক্ বলিয়া ধারণা হয় না, তাহার নাম

অভেদজ্ঞান। ভেদ জ্ঞানকে 'পশুভাব,' ভেদাভেদ জ্ঞানকে 'বীরভাব' এবং একমাত্র অভেদজ্ঞানকে 'দিব্যভাব' বলে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের মনে ভেদজ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি পশুভাবাবলম্বী। যখন ভেদজ্ঞানের অল্পতা ও অভেদজ্ঞানের প্রবলতা হইবে, সেই সময়ে তিনি বীরভাবাবলম্বী; আর যখন সাধকের ভেদজ্ঞান একবারে নষ্ট হইয়া যায়, সেই অবস্থায় তিনি দিব্যভাবাবলম্বী হয়েন। যেমন জীবগণ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যবস্থা ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে, সেরূপ সাধক প্রথমে পশুভাব, পরে বীরভাব ও তদনন্তর দিব্যভাবে আরূঢ় হইয়া থাকেন। উক্ত ভাবত্রয়ের মধ্যে পশুভাব বীরভাবের ও বীরভাব দিব্যভাবের কারণরূপে পরিগণিত। সুতরাং একটীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, অপরটী ধরা যাইতে পারে না, অর্থাৎ পশুভাবে কার্য্য করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে, বীরভাবে অধিকার হয় না। আবার বীরভাবের কার্য্যে সফলতা না হইলে, সাধক দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারে না।" *

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেবল গুরুর কথাই বলিয়া আসিলাম। এইবার কিঞ্চিৎ শিষ্যের কথা বলিব। গুরু অপেক্ষা শিষ্যের কর্ত্তব্য অতীব কঠোরতর। "যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বস্ব গুরুপদে সমার্পণ করিতে না পারেন, তিনি শিষ্যযোগ্য হইতে পারেন না। সদ্‌গুরুর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার ও গুরু শুশ্রূষা, স্বয়ং গুরুপদে উন্নীত হইবার সোপানরূপে পরিগণিত। যিনি নিজে কখন শিষ্যগিরি করেন নাই, তিনি গুরুপদে বরিত হইবার যোগ্য হইতে পারেন না। ফলকথা বর্ত্তমান কালে যেমন সদ্‌গুরুর অভাব হইয়াছে, সৎশিষ্যও তদ্রূপ দুর্লভ। সদ্‌গুরুর অভাবের কথাটা লৌকিক মতে বলিলাম বটে, কিন্তু সদ্‌গুরুর এককালীন অভাব এখন হয় নাই। সৎশিষ্যেরই সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। আমরা শিষ্যযোগ্য নহি বলিয়াই, আমাদের অদৃষ্টে সদ্‌গুরু মিলে না। যদি আমরা প্রকৃত শিষ্যোপযোগিনী যোগ্যতা লাভ করিতে পারি; যদি গুরুভক্তি ও গুরুপাদপদ্ম পাইবার জন্য শিষ্যের মনে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গুরুর অভাব কখনই হয় না। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার গুরু মিলাইয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। মহাকবি ভক্ত জয়দেব এবং সাধকশ্রেষ্ঠ রাজা রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ ও ৺কমলাকান্তই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। শিষ্য প্রকৃত শিষ্যযোগ্য না হইলে, ও দীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কালগত

* ইহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ।

মুরশিদাবাদ।

এত কহি মুরশিদাবাদ মধ্যে আসি।
নবীন সন্ন্যাসী বেশ সুমধুর হাসি॥
বর্দ্ধমানবাসী মুদির তথায় কারবার।
নটকোণা দোকান পাতি করয়ে ব্যাপার॥
পূর্ব্ব পরিচিত চেনা যিনিলেক সেই।
গলে বস্ত্র জোড়হাত সম্মুখে দাঁড়াই॥
বলে কৃপা করি দাসে দেহ পরিচয়।
প্রতাপচন্দ্র মহারাজ হও মনে হয়॥
দেখি তব অঙ্গচিহ্ন আর কি ধরিব।
নিরবধি অঙ্গ ঘর্ম্মকার বা হইব।
ঈশ্বরের কৃত চিহ্ন এই অপরূপ।
পৃথিবী খুঁজিলে নাহি মিলব স্বরূপ॥ *
মুদি মুখে এই বাক্য হইল প্রকাশ।
ঈষৎ হাসিয়া তারে করেন আশ্বাস॥
প্রতাপচন্দ্র রাজা আমি হই যদি সত্য।
তোমার যতেক দুঃখ করিব নিষ্পত্য॥
এতেক কহিয়া তথি হয়ে অদর্শন।
স্বরূপাঙ্গ সঙ্গে করেন নগরে ভ্রমণ॥
সতের স্থান অসত অনেক আছে ঘেরি।
কেহ না চিনিল রূপ নয়নেতে হেরি॥
হাসি রূপ স্বরূপাঙ্গে কহেন তখন।
একা উত্তররাঢ় দেশে করহ ভ্রমণ॥
যাইব দক্ষিণে মধুমালতিপুর নাম: †
রাগাত্মিকা ভক্তগণ বৈসে সেই ধাম॥
রত্নানন্দ প্রিয়পাত্র ব্রহ্মকুলোদ্ভব।
জগমাঝে জানাইব তাহার গৌরব॥
বিলাস আসন এক তথায় হইব।
সেই স্থানে একবার উভয়ে মিলিব।

* জাল রাজার মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় ডাক্তার স্কট সাহেব (Robert Scott, 37th.) Madras Native Infautry) বলেন:—

"১৮১৭ সালে ইহাঁর গালের ভিতর এক খানি ঘা হইয়া শোষ হয়, আমি তখন ভাল করি। সে ঘার দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেই রূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীতকালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামেন।"   জাল প্রতাপচাঁদ, ৮৭ পৃষ্ঠা।

† বরাহনগর।

প্রতাপচাঁদের আদেশে স্বরূপাঙ্গ উত্তররাঢ় দেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে মুরশিদাবাদ হইতে জজান পাঁচথুপি গেলেন। পাঁচথুপি মুরশিদাবাদের ১৪।১৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম ময়ূরাক্ষী তীরে অবস্থিত। তাহার পার পাঁচথুপীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব সোণারুন্দিগ্রামে পরমানন্দ নামক ব্রাহ্মণের বাটী গমন করেন। তথা হইতে মসাগ্রাম নিবাসী জমিদার বদনানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সোণারুন্দি (বনয়ারি আবাদ) গ্রামের রামানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা মসাগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান গমন করেন ও তথায় এক মাস অবস্থান করেন। সেই স্থানে শ্রীখণ্ড-নিবাসী দীননাথ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। দীননাথ শ্রীখণ্ডের বাবু দুর্গামঙ্গলের কর্ম্মচারী। তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিয়া দুর্গামঙ্গল বাবুকে সন্ন্যাসীর কথা বলেন। দুর্গামঙ্গল বাবু সে কথায় তখন বড় মনোযোগ দেন নাই। যাহা হউক, সহসা একদিন অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে স্বরূপঙ্গ একাকী শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় গ্রামের মধ্যভাগস্থিত ব্রাহ্মণপাড়ায় যেখানে ভগবতী ব্রাহ্মণীর শিবালয় আছে, সেই স্থানে সন্ন্যাসী একাকী উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই দীননাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। দীননাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "রামসুন্দর তর্কবাগীশ* মহাশয়ের বাটী কোথায়?" দীননাথ পথ দেখাইয়া দিলে তিনি ক্রমশঃ উত্তর মুখে যাইয়া দুর্গামঙ্গল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দুর্গামঙ্গল বাবুকে সংবাদ দিবার জন্য ভৃত্যদের আদেশ করিলেন। তাহারা বলিল, তিনি পূজা আহ্নিক করিতেছেন। তাহাতে স্বরূপাঙ্গ বলিলেন, "বাবুকে বল, পূজা আহ্নিকে কোন প্রয়োজন নাই।" দুর্গামঙ্গল বাবু শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার বড় ভক্তি হইল। সন্ন্যাসী তথায় সাত মাস অবস্থান করিলেন। এইবার উভয়ে প্রতাপচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সঙ্গে পরাণ মুখুজ্যে, কানাই নাপিত, রামানন্দ ও নবানন্দ নামক চারিজন লোক থাকিল। ছয় জনে জলপথে বরাহনগরে প্রতাপচাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব (প্রতাপচাঁদ) তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন না। সকলে শ্রীখণ্ড ফিরিয়া আসিলেন। দুর্গামঙ্গল বাবু পুনরায় নবানন্দকে প্রতাপচাঁদকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এবার প্রতাপচাঁদ আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে বরাহনগরের সাগর বসু ও গোবিন্দ ঘোষ চলিলেন। কবি প্রতাপচাঁদের আগমন বর্ণনা করিতেছেন:—

* বীরভূমির পাঠকগণের নিকট রামসুন্দর তর্কবাগীশ অপরিচিত নহেন। বীরভূমিতে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ বয়সে তর্কবাগীশ মহাশয় একটু—একটু কেন, অনেকটা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এক সূত্রধর কন্যাকে ভৈরবী রূপে লইয়া তিনি তখন শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছিলেন।

সাগর গোবিন্দ. বুধানন্দ সহচর।
যাত্রা করি চলিলেন নৌকার উপর ॥
মৃগচর্ম্ম পাতি তায় বসিলেন রূপ।
কামিনীমোহন রূপ জিনি অপরূপ ॥
ভাগীরথী দ্বিকুল করিয়া দীপ্তিমান।
নিশি দিশি সম ভাব অভাব অজ্ঞান ॥
কূল ত্যজি: কুলবতী. কূলে আগমন।
কুল কুল কুল কুলাইবেন শ্রীমধুসূদন ॥
আবাল বৃদ্ধ যুবা কিবা প্রকৃতি পুরুষ।
ব্যগ্র চিত্তে সবে ধাই সহি কুশাঙ্কুশ ॥
পঞ্চম দিবস মধ্যে দাঁইহাটের ঘাট।
উত্তরে তরণী যথা, মুনির শ্রীপাঠ ॥
হাটে জনরব হইল আইল গৌরাঙ্গ।
নিরখি মোহিত মন রূপের তরঙ্গ ॥
শ্রীখণ্ডে সংবাদ রূপ পাঠান গোপনে।
স্বরূপাঙ্গ সাজিলেন বাবু সঙ্গোপনে ॥
শ্যামলাল হাজারা খ্যাতি ব্রাহ্মণ নন্দন।
সহকারী সহ সঙ্গে সদা মত্ত মন ॥
ভেটিলেন স্বরূপাঙ্গ লইয়া সঙ্গিগণে।
করে কর ধরি রূপ বসি একাসনে ॥
কাশীরায়ের চবুতরা নিকট গঙ্গার।
সেই স্থানে অবস্থিত হইল: সবার ॥
কবিরাজ কমলাকান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভব।
চতুর্মুখে লিখক পাত্র লীলার বৈভব ॥

*　　　*　　　*

*　　　* মনোভাব জানিয়া স্বরূপ।
বেড়ায় তরণী আনি করি আরোহণ।
কণ্টকনগর * পথে সবার গমন ॥
কণ্টকনগর ঘাটে উত্তরে তরণী।
সোণার মানুষ আইল হইল এই ধ্বনি ॥
পুরুষ প্রকৃতি ধায় দেখিবার মন।
কমলা বেওয়ার ঘরে হইল আসন ॥
কায়স্থকুলোদ্ভব নারী স্বভাব সরলা।
কৃষ্ণ অনুরাগী চিত্ত সহজে চঞ্চলা ॥

* কাটোয়া।

* * *

বাবু সঙ্গ স্বরূপাঙ্গ বাবুর আলয়।
নিজাসনে বসিলেন আসি দয়াময়॥
শিবিকা প্রেরিত হেতু হইল ইঙ্গিত।
তৈণাৎ তৎক্ষণাৎ বাবু পাঠান ত্বরিত।
অট্ট অট্ট হসন দশন দীপ্ত হয়।
জগজন চমকিত হেরি জগৎময়।
অবিলম্বে শিবিকায় করি আরোহণ।
শ্রীখণ্ডাসনে আসি দেন দরশন॥
আগে সরি বাবু বার ধরি শিবিকার।
নিজালয় আসিয়া মাগেন পরিহার॥
বসিলেন একাসনে রূপ স্বরূপাঙ্গ।
নগর শ্রীখণ্ড মাঝে বাড়ল তরঙ্গ।*

* প্রতাপচাঁদের শ্রীখণ্ড আগমন সম্বন্ধে যে গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সৌরেশ বাবুর গৃহচিকিৎসক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ কবিরাজ বলেন; যে দুর্গামঙ্গল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মাতুল। একদিন দুইজন সন্ন্যাসী দুর্গামঙ্গল বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। দুর্গামঙ্গল বাবু তখন আহ্নিক করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া একজন সন্ন্যাসী বলেন, "তাহার আহ্নিক ত বেশ হইয়াছে—সেত সোণার দর কত তাহাই ভাবিতেছে।" নিজের মনের ভাব বলিয়া দেওয়ায় দুর্গামঙ্গল বাবু আহ্নিক ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। ক্রমে তিনি তাঁহাদের খুব ভক্ত হইয়া পড়েন। দুর্গামঙ্গল বাবু সদা সর্ব্বদাই সন্ন্যাসীদের নিকটে থাকেন। অপর কোন কাজ দেখেন না। একদিন দুর্গামঙ্গল বাবুর ভগিনীপতি (আমাদের দুর্গানারায়ণ কবিরাজ মহাশয়ের শ্বশুর) অত্যন্ত পীড়িত হয়েন। দুর্গামঙ্গল বাবু কিন্তু সন্ন্যাসী-প্রেমে মত্ত। তিনি ভগিনীপতিকে দেখিতে যান না। ইহাতে তাঁহার মাতা অতীব দুঃখিত হইলেন। দুর্গামঙ্গল বাবু শুনিয়া সন্ন্যাসীদের নিকট কিছুক্ষণের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। প্রধান সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া দাও, পীড়া শান্ত হইবে।" বস্তুতঃ হইলও তাহাই। মিষ্টান্ন ভোজনে রোগী নিরাময় হইল। ইহাতে শ্রীখণ্ডের লোকের ভক্তি সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রবল হইল। এই স্থান হইতে জাল রাজা বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

হইলে, শাস্ত্রমতে আর তাহার দীক্ষা হইতে পারে না। চরিত্রগত দোষ জন্য যে সকল শিষ্য দীক্ষার অযোগ্য, এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে যথা—

"কামুকং কুটিলং লোক-নিন্দিতং সত্যবর্জ্জিতম্।
অবিনীতমসামর্থ্যং প্রজ্ঞাহীনং রিপুপ্রিয়ম্॥
সদা পাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকম্।
কলিদোষসমূহাঙ্গং বেদ-ক্রিয়া-বিবর্জ্জিতম্॥
আশ্রমাচারহীনঞ্চা শুদ্ধান্তঃকরণোদ্যতম্।
সদা শ্রদ্ধাবিরহিতং চঞ্চলং ক্রোধিনং * * *॥
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং সদা।
অসদ্বুদ্ধি সমূহোত্থমভক্তং দৈন্যচেতসম্॥
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জ্জয়েদ্ গুরুঃ।
যদি ন ত্যজ্যতে বীর ধনাদি-দান-হেতুনা।
নারকী শিষ্যবৎ পাপী তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥
ক্ষণাদসিদ্ধঃ স ভবেৎ শিষ্যাসাদিত পাতকৈঃ।
অকস্মান্নরকং প্রাপ্য কার্য্যনাশায় কেবলম্॥
বিচার্য্য যত্নাদ্ বিধিবৎ শিষসংগ্রহমাচরেৎ।
অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থো ভবেদ্গুরুঃ।"

কামুক, কুটিল, লোকনিন্দিত, সত্যবর্জ্জিত, অবিনীত, অক্ষম, রিপুপ্রিয়, (কাম-ক্রোধাদি রিপু চরিতার্থ করিতে পাইলেই যাহার আনন্দ হয়) সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত, বিদ্যাশূন্য, জড়স্বভাব, কলি-দোষযুক্ত, বৈদিক ক্রিয়া রহিত, আশ্রমাচারহীন (শিষ্য যে আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে, তদুচিত আচার বিহীন) অশুদ্ধ অন্তঃকরণ, শ্রদ্ধা বিরহিত, চঞ্চল, ক্রোধনস্বভাব, অসচ্চরিত্র, নির্গুণ, পরদারগামী, অসদ্বুদ্ধিযুক্ত, অভক্ত ও নানা নিন্দাযুক্ত, এই সকল দোষ বিশিষ্ট শিষ্যকে গুরু অবশ্যই ত্যাগ করিবেন; কদাচ দীক্ষিত করিবেন না। যদি ধনলোভাদি কারণে গুরু শিষ্য ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তিনি শিষ্যবৎ পাপী হইয়া নরকভোগ করিবেন ও তৎকৃত দীক্ষা অসিদ্ধ হইবে। অতএব বিচক্ষণ গুরু এই সমস্ত বিচার করিয়াই শিষ্যসংগ্রহ করিবেন। অন্যথা শিষ্যদোষে তাঁহার নরকভোগ সুনিশ্চিত।

দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু ও শিষ্য নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত একত্র অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর পরীক্ষিত হইবেন। যে যে বর্ণের শিষ্য যত দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থ গুরুসন্নিধানে অবস্থান করিবেন, তাহা কথিত হইতেছে। যথা,—

"বর্ষৈকেন ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রোহি গুরুভাবতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতাঃ শিষ্যযোগ্যতা॥"

রুদ্রযামল।

ব্রাহ্মণ শিষ্য এক বৎসর, ক্ষত্রিয় শিষ্য দুই বৎসর, বৈশ্য শিষ্য তিন বৎসর

ও শূদ্র শিষ্য চারি বৎসর কাল নিয়তঃ গুরুসন্নিধানে থাকিয়া শিষ্যযোগ্যতা লাভ করিবেন। গুরু, পরীক্ষান্তে দেখিবেন, শিষ্য মন্ত্রোপদেশ গ্রহণে সমর্থ কি না? আবার শিষ্যও দেখিবেন, গুরু, গুরুযোগ্য বটে কি না? এই-রূপে উভয়ে পরস্পর পরীক্ষিত হইলে পর, তখন মন্ত্রোপদেশ দান ও গ্রহণ হইবে। যদি বিনা পরীক্ষায় মন্ত্রোপদেশ প্রদত্ত ও গৃহীত হয়, তবে গুরু ও শিষ্য উভয়েই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইবেন ও তৎকৃত দীক্ষা নিষ্ফল হইবে। যথা—

"ভুক্তি মুক্তি প্রসিদ্ধ্যর্থং পরীক্ষ্য বিধিবদ্‌গুরুঃ।
পশ্চাদুপদিশেন্মন্ত্রমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
গুরুশিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরম্।
উপদেশং দদন্ গৃহ্নন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্॥"

কুলার্ণব তন্ত্র।

ধনলোভাদি কারণে গুরু অযোগ্য শিষ্যকে দীক্ষিত করিলে, অথবা দীক্ষাদান যথাশাস্ত্র না হইলে, যে ফল হয়, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে। যথা,—

"ধনেচ্ছা-ভয়-লোভাদ্যৈরযোগ্যং যদি দীক্ষয়েৎ।
দেবতা-শাপমাপ্নোতি কৃতঞ্চ বিকৃতং ভবেৎ॥
পরশিষ্যে দুষ্টবংশে ধূর্ত্তে পণ্ডিতমানিনি।
স্ত্রীদ্বিষ্টে সময়ভ্রষ্টে ব্যঙ্গে দীক্ষা তু নিষ্ফলা॥
অন্যায়েন চ যো দদ্যাদ্ গৃহ্ণাত্যন্যায়তশ্চ যঃ।
দদতো গৃহ্ণতো দেবি দেবীশাপঃ প্রজায়তে॥
অকৃত্বা বিধিবদ্দীক্ষামযষ্ট্বা গুরুপাদুকাম্।
ইহ দারিদ্র্যমাপ্নোতি দেব্যাঃ শাপঃ প্রজায়তে॥
ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধ্যর্থং পরীক্ষ্য বিধিবদ্‌গুরুঃ।
পশ্চাদুপদিশেন্মন্ত্র মন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
গুরুশিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরম্।
উপদেশং দদন্ গৃহ্নন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্॥
অশাস্ত্রীয়োপদেশন্তু যো গৃহ্ণাতি দদাতি চ।
ভুঞ্জীয়াতামুভৌ ঘোরান্ নরকানেকবিংশতিম্॥
অসংস্কৃতোপদেশঞ্চ যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
বিনশ্যন্তি চ তন্মন্ত্রাঃ সৈকতে শালিবীজবৎ॥
মন্ত্রিপাপঞ্চ রাজানং পতিং জায়াকৃতং যথা।
তথা শিষ্যকৃতং পাপং প্রায়ো গুরুমপি স্পৃশেৎ॥"

কুলার্ণবাদি তন্ত্র।

ধনলাভেচ্ছা, ভয়, লোভ, ইত্যাদি কারণে গুরু যদি অযোগ্য পাত্রকে দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে তিনি দেবতার শাপ লাভ করিবেন এবং তৎকৃত দীক্ষাও অসিদ্ধ হইবে। পরশিষ্য, দুষ্টবংশজাত, ধূর্ত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী,

স্ত্রীদ্বিষ্ট, সময়ভ্রষ্ট (যাহার দীক্ষার কালগত হইয়াছে) ব্যঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ) শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করা নিষ্ফল। অন্যায় পূর্ব্বক যে দীক্ষা দান করে ও সেই দীক্ষা যে গ্রহণ করে, সেই দাতা ও গৃহীতা উভয়েই দেবীর শাপ প্রাপ্ত হয়। বিধিবৎ দীক্ষা গ্রহণ ও গুরুচরণাম্বুজে পূজা না করিয়া, শিষ্য ইহ-লোকে দারিদ্র্য ও পরলোকে দেবীশাপ জন্য ফলভোগ করিবে। শিষ্যের ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তির নিমিত্ত গুরু যথাশাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ মন্ত্রোপদেশ করিবেন। অন্যথা দীক্ষা নিষ্ফলা হইবে। গুরু ও শিষ্য উভয়েই মোহবশতঃ পরস্পর পরীক্ষা না করিয়া, যদি মন্ত্রোপদেশ দান ও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয়েই পিশাচত্ব লাভ করিবেন। অশাস্ত্রীয় উপদেশ যিনি দান করেন ও যিনি গ্রহণ করেন, ইহারা উভয়েই একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত ঘোর নরকভোগ করিয়া থাকেন। মূঢ়বুদ্ধি গুরু অসংস্কৃত পুরুষে উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহার সেই সকল মন্ত্রের শক্তি বালুকা-ক্ষেত্রে শালি-বীজ বপনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। মন্ত্রিকৃত পাপ যেমন রাজাকে স্পর্শ করে, পত্নীকৃত পাপ যেমন পতিকে স্পর্শ করে, তদ্রূপ শিষ্যকৃত পাপও গুরুকে স্পর্শ করিয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় দীক্ষা-পদ্ধতির সারাংশ মাত্র এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল। যাহা প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান কালে গুরু ও শিষ্যের পবিত্র সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া, উভয় পক্ষেই কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে এবং ধর্ম্মভয়-শূন্য স্বার্থান্ধ গুরুগণ কি ভাবে 'গুরু-গিরি' ব্যবসা চালাইয়া, আপনাদের নরকগমনের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছেন। বস্তুতঃ এখন প্রকৃত গুরুও নাই, প্রকৃত শিষ্যও নাই ও প্রকৃত দীক্ষাও নাই। আছে কেবল দীক্ষা-পদ্ধতির বিকৃত ছায়া মাত্র। *

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জাল প্রতাপচাঁদ।

নেপাল।

কাশী হইতে প্রতাপচাঁদ নেপাল যাত্রা করেন।

এত যবে হয় রঙ্গ রূপ সহ স্বরূপাঙ্গ
ত্যজিলেন ক্ষেত্র বারাণস।
চলিলেন দ্রুতগতি যথায় নেপাল ভূপতি
পুরাইতে মনের মানস॥
রাজার সভার মাঝে বিনোদ সন্ন্যাসী সাজে
অকস্মাৎ হইলেন উদয়।

---

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের 'তন্ত্র-তত্ত্ব হইতে সংগৃহীত।

লোকে দেখে চমৎকার জিনি তড়িৎ আকার
অন্ধকারনাশী দীপ্তিময় ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা করেন চরণপূজা
পাদ্যার্ঘ বসিতে আসন।
চকিত হেরি শ্রীমুখ কত না উপজে সুখ
মনে হয় পূর্ব্ব আলাপন ॥

* * * *

করি কৃতাঞ্জলি রাজা ছত্রসিংহ কয়।
আজ্ঞা হউক কোন্ কর্ম্ম করি পরিচয় ॥
হাসিয়া মধুর, ভাষে বচন মধুর।
সত্য প্রকাশিতে যাই বর্দ্ধমানপুর ॥
অসত্য নাশিল ধর্ম্ম ধরা রসাতল।
যাইতে অপেক্ষা করি রাখে নাই খল ॥
খলেরে দলিয়া ধরা রাখিতে জুয়ায়।
ভকতে চেতন দিয়া করিব উপায় ॥
সে কারণে ত্রিজগৎ আকর্ষিব আমি।
পশ্চাৎ ভেটিবে সবে যাই অগ্রগামী ॥

বিরাট।

এত কহি তথা হইতে বিরাটভুবন।
বেহারের শোভা সেই ভুবনশোভন ॥
একছত্রে সেই রাজা শাসন তাহার।
জানাইতে যে জনায় সকল বিস্তার ॥
সভাতলে উপনীত কৃষ্ণ বলরাম।
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা করেন প্রণাম ॥
দীনবন্ধু দয়াময় দৈবকীনন্দন।
বড় ভাগ্য বহু দিনান্তরে দরশন ॥
পাদ্যার্ঘ বসিতে আসন যোগাইয়া।
যোড়করে সম্মুখে রহয় দাঁড়াইয়া ॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইলেন গোপন।
লোকেতে বিদিত প্রতাপচন্দ্র আগমন ॥
সব তথ্য শুনিলেন ভূপতি তখন।
অনুরাগ অতি মত্ত পুলকিত মন ॥
প্রায় সঙ্গে সাজিতে উদ্যত হইল মন।
ইঙ্গিতে জানিয়া হরি করেন বারণ ॥
যবে আকর্ষিব তবে হইব মিলন।
লোকেতে অজ্ঞাত কথা রাখিবে গোপন ॥

কলিকাতা, ৩০/২ মদন মিত্রের লেন, সন্ধ্যাভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩০৯ সাল।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ] আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩০৯ [৯ ও ১০ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

১। তান্ত্রিক-সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ। (শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়) ... ২৩৯

২। কোথা তুমি? (শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) ২৫২

৩। বিস্মৃতির কূলে। (শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) ২৫৪

৪। প্রবাদ প্রসঙ্গ। (শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল) ২৫৫

৫। দুঃখ। (শ্রীশশিভূষণ রায়, বি,এ,) ২৬৪

৬। নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ। (শ্রীআবদুল করিম) ... ২৭১

৭। মীরজাফর খাঁ। (শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ২৮২

৮। জাল প্রতাপচাঁদ। (সম্পাদক) ২৮৮

৯। মেয়েলী মনসা। (শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী) ২৯৬

১০। গ্রন্থ সমালোচনা। ৩০০

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
'দ ভট্টাচার্য্য বি, এ,
প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

বীরভূমি।

৩য় ভাগ] আষাঢ়, ১৩০৯। [৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

তান্ত্রিকী-সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা "কলিকাল" নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি যে, কালশক্তির অপ্রতিহত ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যেক যুগপরিবর্ত্তনের সময় জীবগণের শরীরাবয়ব, প্রকৃতি, রুচি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্তই প্রত্যেক যুগের অবস্থার উপযোগী শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া, প্রতি সৃষ্টির পরেই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং ঐ কারণেই সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনা পদ্ধতির বিধান হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> "কৃতে তু বৈদিকো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং স্মৃতি-সম্ভবঃ।
> দ্বাপরে চ পুরাণোক্তঃ কলাবাগম-সম্মতঃ॥"
>
> তন্ত্র।

অর্থাৎ সত্যযুগে বেদবিহিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে স্মৃতি-সম্ভব ধর্ম্ম, দ্বাপরে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম ও কলিযুগের নিমিত্ত আগম-সম্মত (তন্ত্রোক্ত) ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন,—

> "বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।
> শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
> আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥"

তন্ত্রশাস্ত্র-প্রণেতা ভগবান্ সদাশিব স্বয়ং বলিতেছেন, একমাত্র আগমোক্ত পন্থা ব্যতীত কলিতে মানবগণের গত্যন্তর নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, আগমোক্ত বিধানমতেই কলিতে দেবোপাসনা করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে,—

> "বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥"
>
> উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্।

অর্থাৎ কলিকালে বৈদিকী দীক্ষা, তান্ত্রিকী দীক্ষা ও ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রত-ধারণ করিতে হইবে।

কোন কোন তন্ত্রাচার্য্যের মতে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বিধানমতে কলিতে কোন কার্য্যই করা কর্ত্তব্য নহে। জাতকর্ম্ম, পুংসবন, চূড়াকরণ প্রভৃতি দশ-সংস্কার ও অপরাপর যাবতীয় কার্য্যই তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন করিতে হইবে। তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে দুইটী মাত্র প্রমাণবচন এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

"কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণ-ফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীন ইবোরগাঃ।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥"

তন্ত্র।

কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকলই সিদ্ধ ও আশুফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং জপ, যজ্ঞক্রিয়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে ঐ সকল মন্ত্রই প্রশস্ত। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল সত্যাদি যুগত্রয়ে সফল হইত। পরন্তু সে সমস্ত মন্ত্র কলিতে বিষহীন সর্পের ন্যায় একবারে নির্ব্বীর্য্য ও মৃত হইয়াছে।

কিন্তু এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তসম্প্রদায় ও অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তন্ত্রাচার্য্যগণের উল্লিখিত মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, কলিতে কেবল দীক্ষা ও দেবপূজাদি কার্য্যই আগমোক্ত বিধানমতে করিতে হইবে। পরন্তু তদ্ভিন্ন সমস্ত কার্য্যে শ্রুতিস্মৃতির বিধানই অবলম্বনীয়; শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ তন্ত্র আদৌ গ্রাহ্য নহে। ইহাঁরা কূর্ম্মপুরাণের পশ্চাল্লিখিত বচন কয়েকটীকে অপনাদের মতের পোষক-প্রমাণ রূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যথা,—

"যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎকৃতম্।
এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, ইহলোকে যে সকল তন্ত্রশাস্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ তন্ত্র আদৌ গ্রাহ্য নহে। করালভৈরব নামক যামল ও এই আকারের অন্য যে সকল তন্ত্র ভগবান্ সদাশিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল কলিকাল জন্য লোকদিগের মোহোৎপাদনার্থই বুঝিতে হইবে। ইহারা আরও বলেন, বেদমার্গানুসারেই যে দশ-সংস্কারাদি করিতে হইবে, নিম্নলিখিত মনুবচনে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যথা,—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
গর্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রিবিদ্যে নেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, "বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণরূপ কার্য্য দ্বারাই গর্ভাধানাদি শারীরিক সংস্কার করিতে হইবে; যাহাতে দ্বিজগণ বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ইহলোকেও যাগাদির ফললাভ দ্বারা পরলোকে পবিত্র হইবেন। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতির বীজদোষ ও গর্ভবাস জন্য পাপ হইতে মুক্তি হয়। বেদাধ্যয়ন, মধুমাংসবর্জ্জনাদিরূপ ব্রত, সায়ং ও প্রাতর্হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য সময়ে দেবর্ষি পিতৃতর্পণ গৃহস্থাবস্থায় দারপরিগ্রহ ও সন্তানোৎপাদন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ * ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা মানব এই দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করে।"

বলা বাহুল্য যে, পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্ত উভয় মতের মধ্যে কোন মত সমীচীন ও গ্রাহ্য, সে বিষয়ের বিচার করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপেই অনধিকারী। কেন না, আমরা যখন শাস্ত্রজ্ঞানহীন ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি, তখন ঐ বিষয়ে

---

* পঞ্চসূনা জনিত পাপক্ষয়ার্থই গৃহস্থ দ্বিজগণকে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যথা,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥" মনুঃ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, (অধ্যয়ন, অধ্যাপন) পিতৃযজ্ঞ, (নিত্যশ্রাদ্ধ ও তর্পণ) দেবযজ্ঞ, (নিত্যহোম) ভূতযজ্ঞ (পশুপক্ষ্যাদি সর্ব্বজীবকে নিত্য অন্নাদি দান) ও নৃযজ্ঞ (অতিথি ভোজন)।

কোন কথা বলিতে যাওয়া, আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র; শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণই ঐ বিষয়ের বিচার করিবেন। ফলকথা, কলিকালে দীক্ষা ও দেবপূজাদি কার্য্যমাত্রেই যে আগমোক্ত বিধান অবলম্বনীয়, সে পক্ষে বড় মত-বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আমরা এক্ষণে ঐ মতেরই অনুসরণ করিলাম।

"গুরু ও শিষ্য" নামক প্রবন্ধে আমরা ইত্যগ্রে কেবল দীক্ষা এবং গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্যমাত্রেরই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সাধকগণ কি প্রণালীতে সাধনাকার্য্যে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবেন, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। অতএব অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে সেই কথাটাই সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিব।

তান্ত্রিক সাধকগণ অধিকারীভেদে যে যে ভাব ও যে যে আচার অবলম্বনে সাধনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ঐ ভাব তিন প্রকারে ও আচার সপ্ত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। তিন প্রকার ভাব, যথা—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। সপ্ত প্রকার আচার, যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব কাহাকে বলে, অগ্রে সেই কথাটা বলিতেছি; আচারের কথা পরে বলিব।

"আদৌ পশুস্ততো বীরশ্চরমো দিব্য উচ্যতে।
জ্ঞানেন পশুকর্ম্মাণি জ্ঞানেন বীরভাবনম্॥"

প্রথমে পশুভাব, তাহার পর বীরভাব ও সর্ব্বশেষে দিব্যভাব। কেবল জ্ঞানেরই তারতম্যানুসারে এই ভাবত্রয়ের বিভাগ হইয়াছে। অর্থাৎ পশু, বীর ও দিব্য এই তিনটী ভাব, কেবল জ্ঞানেরই অবস্থাভেদে সংজ্ঞাভেদ মাত্র। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

"জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোরভেদো হি দিব্যভাব উদাহৃতঃ॥
ভেদাভেদবিদো বীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং ক্রমঃ প্রিয়ে।
পশুভাবঃ সোপরমো বীরভাবাববোধকঃ।
দিব্যাববোধকো বীরভাবঃ সোপরমস্তথা॥
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে।
তথা ভাবত্রয়ং দেবি উত্তরারম্ভ সাধনম॥

অতএব মাহশানি বীরাণাং কারণং পশুঃ।

দিব্যানাং বীরভাবশ্চ, ইত্যাদি ॥" বিশ্বসার তন্ত্র।

ভেদ-জ্ঞান ও অভেদ-জ্ঞান ভেদে, জ্ঞান দুই প্রকার। যে জ্ঞানে ঘট, পটাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম ভেদ-জ্ঞান। আর যে জ্ঞানের উদয় হইলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক সত্তাময় উপলব্ধ হয়, তুমি, আমি, জগৎ, পৃথক্ বলিয়া ধারণা হয় না, তাহার নাম অভেদ-জ্ঞান। ভেদ-জ্ঞানকে পশুভাব, ভেদাভেদ-জ্ঞানকে বীরভাব এবং একমাত্র অভেদ-জ্ঞানকে দিব্যভাব বলে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের মনে ভেদ-জ্ঞান থাকে, সেই পর্য্যন্ত তিনি পশুভাবাপন্ন, যখন ভেদ-জ্ঞানের অল্পতা ও অভেদ-জ্ঞানের প্রবলতা হয়, সেই অবস্থায় তিনি বীরভাবাপন্ন ; আর যখন সাধকের ভেদ-জ্ঞান একবারে নষ্ট হইয়া যায়, সেই অবস্থায় তাঁহাকে দিব্যভাবাপন্ন বলে। যেমন জীবগণ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে পশুভাব, পরে বীরভাব ও তদনন্তর দিব্যভাবে আরূঢ় হইয়া থাকেন। উক্ত ভাব-ত্রয়ের মধ্যে পশুভাব, বীরভাবের ও বীরভাব, দিব্যভাবের কারণরূপে পরিগণিত। সুতরাং একটীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, অপরটি ধরা যাইতে পারে না। অর্থাৎ পশুভাবে কার্য্য করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে, বীর-ভাবে অধিকার হয় না আবার বীরভাবের কার্য্যে সফলতা না হইলে, সাধক দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারে না।

পশ্বাদি ভাবত্রয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইল। এইবার সপ্ত আচারের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—

"বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।

সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সৎকৌলমুচ্যতে ॥

ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ ॥"

বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধাচার ও কৌলাচার, এই সাত প্রকার আচার উক্ত ভাবত্রয়েরই অনুগত। অর্থাৎ সাধক যে পর্য্যন্ত পশুভাবে থাকিবেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি ক্রমপরম্পরায় বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচারের নিয়মানুসারে সাধনা করিবেন। পরে বীরভাবে অধিকার লাভ করিলে বামাচারে ও সিদ্ধান্তাচারে এবং সর্ব্বশেষে দিব্যভাবে অধিকারী হইলে, তখন সাধক কুলাচারী হইবেন।

এই সপ্ত আচারের মধ্যে ক্রমপরম্পরায় কোন্ আচারের পর কোন আচার অনুষ্ঠেয় ও শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। যথা,—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥"

সাধারণ আচার অপেক্ষা বেদাচারই শ্রেষ্ঠ। বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তচার অপেক্ষা কৌলাচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতভিন্ন আর শ্রেষ্ঠ আচার নাই। এক্ষণে সপ্ত আচারের লক্ষণ বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ বেদাচার, যথা—

"সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
অপাবৃত শরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ॥
রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্লকে।
ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ॥
মৎস্যং মাংসং মহেশনি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদন্যদ্‌বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়মতৎপরঃ॥"

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে * শয্যাত্যাগ করিয়া যথাবিহিতরূপে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা ও তদনন্তর সাংসারিক আবশ্যক কার্য্য সমাপন করিবে। এবং রিক্ত গাত্রে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে। রাত্রিকালে, উভয় সন্ধ্যাতে ও অপরাহ্ণ সময়ে দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় ভার্য্যাতে উপগত হইবে না। পঞ্চ পর্ব্বদিনে † মৎস্য, মাংস বর্জ্জন করিবে। এতদ্‌ব্যতীত বেদবিহিত যাবতীয় নিয়মেরই পালন করিতে হইবে। অতঃপর বৈষ্ণবাচার, যথা—

* রাত্রি শেষ দুই মুহূর্ত্ত যথাক্রমে ব্রাহ্ম ও রৌদ্র নামে খ্যাত। যথা,—

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥"

পিতামহঃ।

† অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পঞ্চপর্ব্ব কহে।

"অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্ভীতির্ন বিদ্যতে॥
বেদাচারক্রমেনৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটীল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ॥
বিষ্ণুং সমর্পয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবেয়ৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥
তপঃকষ্টাতিসহেন সর্ব্বত্রাচ্যুত-চিন্তয়া।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥"

পূর্ব্বোক্ত বেদাচারের নিয়মানুসারে সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, মৈথুন ও তৎসম্বন্ধীয় সংলাপ বর্জ্জন করিবে। কখনই মৈথুনাদি বিষয়ক চিন্তা করিবেনা। হিংসা, পরনিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে দেবতাপূজা বা মালা জপাদি করিবে না। এইরূপে হিংসাদি দোষ বিবর্জ্জিত বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে থাকিবে। সংসারে যাহা কিছু ভাল, মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, নিজে তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া তৎসমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে। আপনার দেহ, মন, আত্মা অবধি সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় ভাবনা করিবে। কেবল মৌখিক ভাষায় তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বস্বরূপ বলিলে হইবে না; তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে হইবে। এই বৈষ্ণবাচার, বেদাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বলা বাহুল্য যে, এখানে 'বিষ্ণু' শব্দে কেবল মাত্র ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি নহে; ঈশ্বরের সমস্ত সাকাররূপই (কালী, তারা, দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও বিষ্ণু প্রভৃতি) ইহাতে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বৈষ্ণবাচারোক্ত নিয়মে চলিবার সময়, প্রত্যেক দেবতার উপাসকগণ আপনাপন ইষ্টদেবতাকে ঐ ভাবেই ভাবনা করিবেন। অতঃপর শৈবাচারের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—

"বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ।
তদ্বিশেষো মহেশানি পশুহিংসা-বিবর্জ্জনম্॥
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।
তোষয়েৎ বক্ত্রবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্॥
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্কায় কর্ম্মভিঃ।

সিধ্যত্যাশু মহেশানি শৈবাচার-নিষেবনাৎ।
অতস্তাভ্যাং পরো-ধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥”

বেদাচারে যে যে ক্রম বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই শৈবাচারে অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যই ইহাতে করিতে হইবে। পশুহিংসাদি শৈবাচারে একবারেই বর্জ্জন করিবে। এইরূপে হিংসাদি দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধক প্রশান্ত ও মহেশ্বর সদাশিবের চিন্তা এবং তাঁহাতেই সমস্ত কার্য্য ও তৎফল বিন্যস্ত করিবেন। বক্ত্রাবাদ দ্বারা চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট ও সর্ব্বদা তাঁহাকেই শরণরূপে প্রপন্ন হইয়া মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই পরিকর্ম্ম করিতে থাকিবেন। অজ্ঞানমূলক নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানকে একবারে নষ্ট করিতে হইবে। এই প্রকারে শৈবাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই সাধক কৃতার্থতা লাভ করিবেন। এই আচারে পশুহিংসাদি দোষের নিবৃত্তি হইয়া ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল, প্রশান্ত ও তন্ময়ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। অতএব বেদাচার ও বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে দক্ষিণাচারের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা,—

“ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে।
যস্য শরণমাত্রেণ সংসারন্মুচ্যতে নরঃ॥
প্রবর্ত্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ।
অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ॥
বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে।”

* * * *

দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক। সাধকের দক্ষিণাচারে সিদ্ধিলাভ ঘটিলেই, বীর ও দিব্যভাবের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, ও শৈবাচার অপেক্ষাও এই আচার শ্রেষ্ঠ। সাধক রাত্রিকালে বেদাচারোক্ত পদ্ধতিক্রমে ভগবতী জগদম্বার অর্চ্চনা ও বিজয়াপান (সিদ্ধি) করিয়া, অনন্যচিত্তে তাঁহার মন্ত্রজপ করিবেন। এই সময়ে সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র জগদম্বাময় হইয়া যায় এবং ভেদ-জ্ঞান ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, বহির্দৃষ্টি বিলুপ্তপ্রায় হইতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে বীরভাব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া আইসে। এই নিমিত্তই শাস্ত্র দক্ষিণাচারকে দিব্য ও বীরভাবের

প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। দক্ষিণাচারী সাধক চতুষ্পথ শ্মশান, শূন্যগৃহ ও জগদম্বার উপাসনা করিবেন। আরও কতকগুলি স্থানের নাম আছে, তাহা অপ্রকাশ্য। সুতরাং গুরুমুখেই তাহা জ্ঞাতব্য।

দক্ষিণাচারে সাধক সাধনার উচ্চ সোপনে আরোহণ করিয়া থাকেন। এই সময়ে সাধকের রজস্তমোগুণের ক্ষীণতা, সত্ত্বগুণের বিকাশ ও ভেদ-জ্ঞানের বিজৃম্ভন সঙ্কুচিত হইয়া, চিত্ত ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করিতে থাকে। এবং এই অবস্থার দৃঢ়তা হইলেই সাধক তখন বামাচারে উপনীত হয়েন। এক্ষণে বামাচারের লক্ষণ বলা যাইতেছে। যথা—

"বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যৎশ্রুত্বৈব মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্ব ক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্‌বীর-সাধনম্॥"

বামাচার দিব্য ও বীরভাবালম্বীদিগেরই সম্মত। ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধকের সমস্ত সাধনই সফল হয়। যে পর্য্যন্ত পশুভাব তিরোহিত না হয়, তাবৎকাল বামাচারে অধিকার হয় না।

সাধক দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্যে ও সংযতচিত্তে থাকিয়া, রাত্রিযোগে পঞ্চতত্ত্ব * দ্বারা পূজা করিবে। এবং শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া, জগদম্বার মূল-মন্ত্র জপ ও দেবীর পদারবিন্দ ধ্যান করিতে থাকিবেন।

সাধক যখন বামাচারে উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার অতীব উচ্চাবস্থা উপস্থিত হয়। সে সময়ে তিনি নিখিল জগৎ জগদম্বাময় অবলোকন করেন; তাঁহার অন্তর ও বাহিরে কেবল জগম্বার সত্তাই উপলব্ধি হয় এবং ভেদ-জ্ঞান ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে। এই অবস্থায় তাঁহার চিত্ত সুনির্ম্মল, ঐন্দ্রিয়িক বিকার বিদূরিত ও বিবেকবৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণগুলি সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান থাকে; তিনি তখন পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন চক্রের অর্থ গুরুমুখেই জ্ঞাতব্য। এইবার সিদ্ধান্তাচারের কথা বলিব।

* মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, ইহারই নাম পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ মকার। মদ্যের সহিত যে উপকরণ গৃহীত হয়, তাহাকে মুদ্রা বলে।

"অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি প্রপদ্যতে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥
দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্ব্বিশোধিতম্।
সেবেত সাধকো দেবি পশুশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ॥
সৌত্রা মণ্যাং যথা ব্যক্ত পানদোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিন্ তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ॥
অশ্বমেধক্রতৌ বাজি-হত্যা দেষো ন বিদ্যতে।
অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি পশূন্ হিংসন্ ন দুষ্যতি॥
কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালঞ্চ ধারয়ন্।
বিহরেদ্ভুবি দেবেশি সাক্ষাৎ ভৈরবরূপধৃক্॥
শঙ্কাত্যাগাৎ ব্যক্তভাবাৎ তথৈব সত্য সেবনাৎ।
বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥"

এক্ষণে সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ বলা যাইতেছে। সিদ্ধান্তাচারানুষ্ঠানের দৃঢ়তা হইলেই সাধকের তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়। কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অগ্নি যেমন লুক্কায়িত ভাবে থাকে, ও ঘর্ষণের দ্বারা তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়, তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্রে এই পরমজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। অনুশীলন করিলে ক্রমেই সাধকের হৃদয়দর্পণে উহা প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বারা সম্যক্ বিশোধিত পঞ্চতত্ত্ব দেবীর বড়ই প্রীতিকর। অতএব সাধক মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধিত করিয়া, প্রথমে দেবীকে অর্পণ করিবেন ও পরে প্রসাদজ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবেন। সাধক যতদিন পশুভাবাপন্ন থাকেন, ততকাল পর্য্যন্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, ও দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠানেই নিরত থাকিবেন, এবং ক্রমে ক্রমে পশুভাব অন্তর্হিত হইলে, নিঃশঙ্কচিত্তে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা জগদম্বার পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সৌত্রামণী যাগের ন্যায় এই সিদ্ধান্তাচারে প্রকাশ্যভাবে সুরাপান দোষাবহ নহে। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ববধে যেমন কোন দোষ নাই, সেইরূপ সিদ্ধান্তাচারেও পশুহিংসা পাপজনক হইবে না। এই অবস্থায় সাধক কপালপাত্র, (শবমস্তক) রুদ্রাক্ষ ও অস্থিনির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়া, সাক্ষাৎ শিবরূপে

পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। সিদ্ধান্তাচারী সাধকের পশুভাব তিরোহিত হইয়া বীরভাবের অভিব্যক্তি ও বিপর্য্যয়াদি মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া, সত্য জ্ঞানের উদয় হয়। সৌভাগ্যক্রমে সাধক যখন সিদ্ধান্তাচারে উপনীত হয়েন, তখন তিনি জগদম্বার সহিত অভিন্নভাব হইয়া যান; তাঁহার ভেদ-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া „সোহং" জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে তিনি আর বিধিনিষেধের অধীন নহেন। ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই বার শেষ আচার, কৌলাচারের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—

"কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা॥
দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ।
ন কোঽপি নিয়মোদেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥
কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো ন হি॥
কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ম্।
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥"

এক্ষণে কৌলাচার পদ্ধতি বলিতেছি। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই কৌলজ্ঞান জন্মিলে, সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হন—আর তাঁহার কর্ত্তব্যের অবশেষ থাকে না। কুলাচারী সাধকের সাধন বিষয়ে কোন দিক্ কালের নিয়ম নাই। কেন না, তিনি বিধিনিষেধের অধীন নহেন। কুলাচারী সাধক, ব্রহ্মাণ্ডের গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব-মূর্ত্তি। তিনি ত্রিলোকের পূজনীয়। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক আর নাই। সাধক যখন কুলাচারের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, তৎকালে পঙ্ক-চন্দন, পুত্র ও শত্রু, প্রিয় ও অপ্রিয়, শ্মশান ও অট্টালিকা এবং স্বর্ণ ও তৃণে ভাল, মন্দ বস্তু বলিয়া কিছুমাত্র ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। যিনি সর্ব্বভূতে অব্যয় বিভু আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করেন, তিনিই কৌলিকোত্তম। দেহপাতের পর, তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর তাঁহাকে সংসারে আসিতে হয় না।

কৌলাচারের প্রথম ও মধ্যমাবস্থা।

"যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।
সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥
জপপূজাহোমরতো বীরাচার পরায়ণঃ।
আরুরুক্ষুর্জ্জনভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতো মতঃ॥"

কৌলাচারের চরমাবস্থায় সাধকের ধ্যান, জপ, পূজা, হোমাদি, কিছুই থাকে না। তখন আত্মারাম সাধক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মময়ই দর্শন করেন কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত সাধকের ঐরূপ উচ্চতম অবস্থা না ঘটে, তাবৎ-কাল তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতার ধ্যান ও পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাদি করিতে থাকিবেন। এই শ্রেণীর সাধককে মধ্যমাবস্থার কৌল বলে। আর যে পর্য্যন্ত সাধকের হৃদয়ে অভেদ-জ্ঞানের প্রবলতা ও ভেদ জ্ঞানের অল্পতা বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত বীরভাবেই জপ, পূজা, হোমাদিরূপ সাধনাতে নিরত থাকিবেন। এই অবস্থার সাধককে নিকৃষ্ট কৌল কহে, এবং ইহাই সিদ্ধান্তাচারের শেষ ও কৌলাচারের প্রথমাবস্থা।

তন্ত্রোক্ত শক্তি-সাধকগণকে কিরূপ সংযত ও কঠোরতর নিয়মের অধীন হইয়া ক্রমপরম্পরায় বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার অতি-ক্রম করিয়া, তবে বামাচারে অধিকারী হইতে হয়; তৎপরে সিদ্ধান্তাচারে ও কৌলাচারে সাধকের কিরূপ উচ্চতম অবস্থা ঘটে এবং পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিষয়গুলি পাঠক! শাস্ত্রবাক্যে শুনিলেন ত? বস্তুতঃ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত বহু সুকৃতি না থাকিলে, কেহ একই জীবনে বীর ও দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারেন না। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসা-দই প্রকৃত দিব্যভাবের সাধক ছিলেন, এবং মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনকরণে তিনিই প্রকৃত অধিকারী। কথিত আছে যে, রামপ্রসাদের বামাচারে সাধনার সময়ে কতকগুলি কুলোক বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যখন তাঁহাকে 'মাতাল' অভিধানে অভিহিত করতঃ লোকসমাজে কুৎসা রটনা করিতেছিল, তৎকালে তিনি নির্ভীক হৃদয়ে গীতিচ্ছলে ঐ অপবাদের যে উত্তর দিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতি জন্য তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

রাগিণী জংলা,—তাল একতালা।

"মন! ভুলোনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক, মাতাল ব'লে॥

সুরাপান করি না আমি, সুধা খাইরে কুতুহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ্, মদ-মাতালে পাগল বলে॥
অহর্নিশি, থাক বসি, মন! হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচ্‌বে দিশা, বিষম-বিষয়মদ খাইলে॥
যন্ত্রভরা, মন্ত্র সোঁড়া, অণু-ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুলতারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড়ো না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে, মোহের ফলে।
সত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন! রজঃ মিশালে॥
মাতাল হ'লে, বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে, নিদান কালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥"

বলা বাহুল্য যে, রামপ্রসাদের ন্যায় উচ্চতম কৌল-সাধকের পক্ষে সুরা সুধাই বটে! রামপ্রসাদ দৈবশক্তি সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ভক্তবৎসলা জগজ্জননী অন্নপূর্ণা, রামপ্রসাদের পরাভক্তি প্রসূত সঙ্গীতরসে আকৃষ্ট হইয়া কন্যারূপে তাঁহার ভবনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া ও ভগ্নগৃহের বেড়া বান্ধিয়া দিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। একটী গীতে প্রসাদ স্বয়ংই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

প্রসাদী সুর, একতালা।

"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তিদড়া॥
নয়ন থাক্‌তে দেখ্‌লে না মন! কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা যে ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে,
ক'রে দু চার দণ্ড কান্নাকাটা, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই, বন্ধু, দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সী, কড়ি দিবে আটকড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোহোট বস্ত্র গায় দিবে, চারকোণা মাঝখানে ছেঁড়া॥
যেই ধ্যানে, এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ্ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥"

তান্ত্রিকী সাধনাবিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বচন দ্বারা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বীর ও দিব্যভাবের অধিকারী সাধক ব্যতীত আর কাহারও মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব স্পর্শ করিবার অধিকার নাই এবং বর্ত্তমান কালে সেরূপ ভাবের সাধকও ভারতবর্ষে অতীব দুর্লভ। কিন্তু তদ্‌ভিন্ন যাহারা কেবল পানাসক্তি নিবৃত্তি বা বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বামাচার বা কৌলাচারের ভাণ করিয়া অনধিকারে মদ্যাদি স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহারা মহাপাতকী হইয়া জীবনান্তে যে ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।*

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কোথা' তুমি ?†

(১)

এতদিন এত ক'রে
পণ্ডশ্রম হ'লো সব, সব আশা গেল' ভেসে,
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
সুদীর্ঘ বালির বাঁধ মুহূর্ত্তে গেল গো ধ'সে

(২)

কাঁদিতে কাঁদিতে সেযে
দুর্গম সংসারপথে চলে গেল পথ দেখে,
এত যত্ন, এত স্নেহ
সেই আশা ভালবাসা, ফেলে দিয়ে একে একে ;

(৩)

এত কি পড়িল তাড়া,
বারেক দিলেনা সাড়া, চলে গেল ত্বরা করে ;
সুধু দিয়ে স্মৃতিটুকু
খেলা ঘরে খেলে গেলে, চাহিলেনা কিছু ফিরে

---

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত তন্ত্রোক্ত প্রমাণবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পণ্ডিতবর শ্রীযুত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত।

† সাহিত্য, ভারতী, নব্যভারত, পুণ্য, পূর্ণিমা, প্রয়াস, জন্মভূমি, সাবিত্রী, বীণাপাণি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার সুলেখক এবং আলোচনার সহকারী সম্পাদক, সুহৃদবর স্বর্গীয় কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে রচিত।—লেখক।

(৪)

বিধবার দুঃখ হেরি
ঝরিত যে দু'নয়ান,　　আকুল হইত প্রাণ,
এবে সখা চেয়ে দেখ
তোমারি বিধবা প্রিয়া　　তোমা বিনে ম্রিয়মাণ !

(৫)

কোথা' তুমি আছ আজ ?
ফেলিয়ে সংসার-সাজ　　কোন্ দেশে কত দূরে ?
সেথা' কি মরমে সখা,
মানবের ক্ষীণ কণ্ঠ,　　বাজে সে অজানা পুরে ?

(৬)

কোথা' তুমি আছ আজ ?
দেখি নাই বহুদিন,　　একবার এস ফিরে,
দু'জনে বিজনে বসি'
কহিব মনের কথা　　হৃদয়ে রেখেছি ভরে !

(৭)

সকলি যে অন্ধকার,
কোথা তুমি আছ আজ,　　শূন্য কেন সিংহাসন ?
কোথা' সে সাহিত্য-সেবা,
কোথা' সে অমিয়মাখা　　কবিতার প্রস্রবণ ?

(৮)

বঙ্গনারী "লজ্জা" তরে
সতত আবেগ ভরে,　　গাহিত ললিত গান
কোথা' সেই বাঁধা বীণা ?
কোথা' তুমি আছ আজ　　কোথা' সেই সুর তান ?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিস্মৃতির কূলে।

কেন এ সহসা আধেক পথেতে বাঁশরী নীরব আজি ?—
অরুণ কিরণে-আজিকে এ কিগো শুকা'ল প্রসূনরাজি !
প্রেম খরস্রোত কোন্ শিলাতলে পাইল বিষম বাধা ?
একি প্রহেলিকা,—ব্যথিত হৃদয়ে কেন এ পশালে ধাঁ ধাঁ !

সখা গো,—

আছিল নীরবে ব্যথিত পরাণ, সেই ত আছিল ভালো,
কেন রে নিঠুর ! গোপনে আসিয়া জ্বালিলি প্রীতির আলো ?
জ্বালিলি, জ্বালিলি,—কেন না রাখিলি আচল-আড়ালে ঢাকি ?
অভাগার সে যে কনক প্রদীপে লাগে বায়ু থাকি' থাকি !

সখা গো,—

কেন এ এমন ?—ক্ষণেকের তরে আলো বা জ্বালিলে কেন ?
দুয়ারে ফেলিয়ে গেলে সে প্রদীপ পবনমুখেতে হেন ?
চিরতমসায় রহিব, সেইত ;—কেন তবে মাঝ থেকে
আরেরে নিঠুর ! পরাণ ভিতরে প্রীতিস্মৃতি যাস্ রেখে ?

সখা গো,—

এখনো বাতাস বহেনিক বেগে, এখনো নিবেনি আলা,
আশাতৈল হেথা আছে ভরপূর,—এখানো বাড়েনি জ্বালা ;
এখনো প্রদীপ বাড়াইয়া দিলে, ঢাকিলে প্রীতির করে
হয়ত নিবেনা !———

একটি রতন অতীব যতন ক'রে,

অসীম সাগরতলদেশ হ'তে ডুবিয়া ডুবিয়া তুলি'
কবে যেন দিছি পরাণভিতরে রাখিয়া আপনা ভুলি',—

সখা গো !

সেই ত রতন স্মৃতির মন্দিরে জনম জনম কত
তেজোমধুরিমা ছড়াই' দিশায় জ্বলিবেক অবিরত !!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

———

প্রবাদ প্রসঙ্গ। (৩)

বর্গী এল দেশে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গীয়া জননী নিজ নিজ শিশুসন্তানদিগকে ঘুম-পাড়াইবার জন্য বর্গীর ভয় দেখাইয়া থাকেন। তৎকালে বর্গীর কথা শুনিলে ক্ষুদ্র শিশু কেন, শিশুর জন্মদাতা স্বয়ং পিতাও ভয়ে জড়সড় হইতেন। এই মহাবলশালী সর্ব্বলোকভীতিউৎপাদনকারী বর্গীর কথা এই প্রসঙ্গে কিছু বিবৃত করা প্রয়োজন হইয়াছে।

নবাব আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই এক নূতন উপদ্রবের সূত্রপাত হইল। বহুদিন হইতে আরকান প্রদেশের (১) এবং সুন্দরবনবিহারী ফিরিঙ্গিদিগের (২) অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইতেছিল; কালক্রমে সেই উৎপীড়নে দক্ষিণবঙ্গের সমৃদ্ধজনপদ সুন্দর-বনে পরিণত হইয়াছিল, সুতরাং মগ এবং ফিরিঙ্গি দমন করিবার জন্য নবাবসরকার হইতে ঢাকা প্রদেশে ৭৬৮ খানি রণতরি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত এবং "জায়গীর নৌয়ারা" (৩) মহালের সমুদায় রাজস্ব তাহার জন্য ব্যয় হইত। এই সকল অত্যাচারে লোকে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় নিঃশঙ্কচিত্তে বসতি করিতে সাহস করিত না। সুতরাং মধ্যবাঙ্গালার উর্ব্বরভূমিই কালক্রমে বহু জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নবাগতঃ ইউরোপীয় বণিকেরাও এই অঞ্চলেই অধিকাংশ বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিকে

---

(১) "The Mugs of those days were then desolators of the Snder-bans; they in alliance of the Portuguese, helped to reduce the now waste Sunderbans to a jungle though once fertile populous country. So great an apprehension was entertained of them that, as late as 1760 the Government threw a broom across the river below Calcutta to prevent their ships coming up." Revd. Long.

(২) Holwell defines Feringy "as the black mustee Portuguese christians, residing in the settlement as a people distinct from the natural and proper subjects of Bengal, sprung originally from Hindus and mussulmans. Long's seclections Vol. I.

(৩) See Grant's Analysis of Finances of Bengal.

দস্যুতস্করের বিশেষ উপদ্রব ছিল না, মগ, ফিরিঙ্গির দৌরাত্ম্যও শুনা যাইত না,—লোকে এক প্রকার নিরুদ্বেগে নিঃশঙ্কমনেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

সহসা এই সুখের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শালবন অতিক্রম করিয়া, উড়িষ্যার পিরিনদী পার হইয়া, নানা পথে সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী পঙ্গপালের মত বাঙ্গালাদেশের বুকের উপর ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বাদশাহ আরঙ্গজীব এক দিন যাহাদিগকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া উপহাস করিতেন, তোষামোদপরায়ণ পারিষদগণ যাহাদিগকে পিপীলিকাবৎ নখাগ্রে টিপিয়া মারিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেন, সেই মহারাষ্ট্রবল কঙ্কণ প্রদেশের গিরিগহ্বরে অধিক দিন লুকাইয়া রহিল না; মোগলের অধঃপতনকাল নিকট বুঝিয়া বাহুবলে হিন্দু-রাজত্ব সংস্থাপন করিবার আশায়, তাহারা দলে দলে অসিহস্তে দেশবিদেশে ছুটিয়া বাহির হইল। দিল্লীর বাদশাহ তাহাদের হাতে ক্রীড়াকন্দুক হইয়া উঠিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে রাজকরের চতুর্থাংশ "চৌথ" আদায়ের "ফরমান," পাইয়া বাহুবলে ন্যায্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য বাঙ্গালাদেশেও পদার্পণ করিল;—বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহারই নাম "বর্গীর হাঙ্গামা," (১) এবং ইহারাই শিশুদিগের ভীতিউৎপাদনকারী "বর্গী।"

শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।

একদা শতানীক মুনি স্বীয় পুত্রকে জ্ঞানোপদেশ দিবার কালে বলিলেন,—

অটনেন মহারণ্যে সুপন্থা জায়তে শনৈঃ।
বেদাভ্যাসাত্তথা জ্ঞানং শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং॥ (২)

হে পুত্র! মহারণ্যের সংকীর্ণ পথ বাহিয়া যাইতে যাইতে যেমন ক্রমে সুপ্রশস্ত পথে উপনীত হওয়া যায়, তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে উজ্জ্বল জ্ঞানের সঞ্চার হয়। আরো দেখ, ক্রমে ক্রমে এক পা, 'এক পা' করিতে করিতে অত্যুচ্চ অলঙ্ঘনীয় শৈলও উল্লঙ্ঘন করা যায়।

(১) সিরাজদ্দৌলা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং।

শাপাদপি শরাদপি ।

শ্রীরামচন্দ্র মিথিলাতে হরধনু ভঙ্গ করিয়া জানকী সমভিব্যাহারে আযোধ্যায় আগমনকালে পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরশুরাম বলিয়াছিলেন,—

অগ্রতাশ্চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ ।
উভভ্যাঞ্চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি ॥

হে রঘুনাথ ! আমার চতুর্ব্বেদ জানা আছে এবং আমার পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণও আছে। অতএব অভিশাপ এবং শর দ্বারা যে প্রকারেই হউক উভয় বিষয়েই আমি তোমাকে জয় করিব ।

জনক সীতা-বনবাসের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তপোবনে লবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অহো ! পুরবাসিদিগের কি অনধিকার চর্চ্চা, আর রামচন্দ্রেরই বা কি ক্ষিপ্রকারিতা ।

সীত-বনবাস রূপ
　　বজ্রাঘাত সদা মনে করিয়া চিন্তন,
জ্বলিয়া উঠিছে মোর
　　সুদুর্জ্জয় ক্রোধানল প্রচণ্ড ভীষণ ।
অপরাধীগণ আজি
　　জ্বলন্ত এ রোষানলে হবে ভস্মসাৎ,
হয় শাপে নয় চাপে
　　আজি আমি তাহাদের করিব নিপাত । (১)

তেহি নো দিবসা গতাঃ ।

অযোধ্যায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্দারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। একদা ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলিল, তুমি রাজা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখ বর্ণনা কর। তিনি অতি সদাশয়, আমাদের দুঃখ নিবারণ করিবেন। ব্রাহ্মণীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, রাজদরবারে উত্তরীয় বসন না লইয়া যাওয়া অনুচিত। কিন্তু আমার ত তাহারো অভাব,—তবে

(১) উত্তর চরিত—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত ।

আমি কেমন করিয়া যাই? ব্রাহ্মণী জনৈক প্রতিবাসীর একখানি উত্তরীয় বসন আনিয়া দিল।

পথিমধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে ব্রাহ্মণের উত্তরীয় বস্ত্রখানি স্কন্ধচ্যুত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক সরোবরে পতিত হইল। ব্রাহ্মণ গৃহিণীর ভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া উত্তরীয় শূন্য হইয়াই রাজসদনে উপস্থিত হইয়া নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন।

রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণের উত্তরীয় নাই কেন, জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, আসিবার সময় বায়ুতাড়িত হইয়া বস্ত্রখানি এক সরোবরের অগাধ সলিলে পতিত হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র বলিলেন, "অগস্ত্য সমুদ্র উদরস্থ করিতে পারিলেন, আর তুমি সামান্য একটি সরোবর শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখানির উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে না? অতএব তুমি অব্রাহ্মণ,—ভিক্ষা পাইবে না, স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

ব্রাহ্মণ দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে সমস্ত কথা বলিলেন।

গৃহিণী তাঁহাকে একটি শীল (নোড়া) দিয়া বলিল যে, তুমি এই প্রস্তর খানি লইয়া যাইয়া রামচন্দ্রের পদপ্রান্তে স্থাপন করিও, কোন কথা বলিও না। ব্রাহ্মণ গৃহিনীর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে রামচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তেহি নো দিবসা গতা।" একদিন ছিল, যখন আমি পাষাণকে মানবী (অহল্যা উদ্ধার) করিয়াছি। কিন্তু সে দিন আর এখন নাই। পরে যথোচিত পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন।

উত্তর 'রাম চরিতে' লক্ষ্মণ সীতার মনোরঞ্জন করিবার জন্য বনবাস কালের চিত্র সকল দেখাইতেছেন। রামচন্দ্র ও বিশেষ উৎসুক্য সহকারে দেখিতেছেন। দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে লক্ষ্মণ যখন বলিলেন,—

'এই দেখ, আমরা যখন অযোধ্যায় এলেম, পরই এই চিত্র।' রাম তখন সজলনেত্রে বলিলেন, হা! সমস্ত মনে পড়চে—সমস্ত মনে পড়চে।

জীবৎসু তাতপাদেষু নবেদার পরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তেহিনো দিবসাগতাঃ॥

পিতা আছেন জীবিত, মোরা নব বিবাহিত,
লালিত পালিত সবে মাতৃগণ কাছে।

সেকালের কথা সব, মনে পড়ে অভিনব,
সে দিন গিয়াছে হায় সে দিন গিয়াছে ॥*

নষ্টস্য কান্যাগতি।

এক ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র ছিল,—পরিবার প্রতিপালনে নিতান্ত অশক্ত। সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষা করিয়া যে পরিমাণ তণ্ডুল লইয়া গৃহে ফিরিত, তদ্দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। অনন্তর একদা ব্রাহ্মণ-পত্নী বলিলেন যে, শুনিতে পাই, 'সকলেই রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট কিছু কিছু দান পাইয়া থাকে, তুমি কেন একবার তাঁহার নিকট যাও না?' ব্রাহ্মণ বলিল, আমার কি গুণ আছে যে, রাজা আমাকে প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা দিবেন, অথবা আমার এমন কি সামর্থ্য আছে, যদ্দ্বারা কোন দুরূহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারি?'

ব্রাহ্মণী বলিল,—"তুমি রাজার নিকট যাইয়া বলিবে যে, মানুষে যে কার্য্য করিতে অক্ষম হইবে, আমি তাহা করিব। তাহা হইলে তুমি চাকরী পাইবে। আর লোকের অসাধ্য এমন কি কার্য্যই বা আছে? সুতরাং তোমাকে কোন কার্য্যই করিতে হইবে না, উপরন্তু মাস মাস মাহিয়ানা পাইবে।"

স্ত্রীর পরামর্শে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণ রাজার নিকট যাইয়া বলিল, মহারাজ! লোকে যাহা করিতে না পারে, আমি তাহা সম্পাদন করিতে সক্ষম। দয়া করিয়া আমাকে একটী কার্য্য প্রদান পূর্ব্বক অধীনকে প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়।"

'বটে, তোমার এতদূর ক্ষমতা। আচ্ছা তুমি থাক। একশত টাকা করিয়া বেতন পাইবে। উপস্থিত মত কার্য্য করিতে দেওয়া যাইবে।'

ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ঘুচিল। এখন দুবেলা সুখে রসনা-তৃপ্তি করিতে পাইতেছে। কিন্তু ইহাতে রাজসরকারে অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কারণ তাহারাই সমস্ত কাজ করে, ব্রাহ্মণকে কিছুই করিতে হয় না, বসিয়া বসিয়া বেতন খায়। পরিশেষে তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে বলিল যে, প্রায় বার বৎসর হইল, লঙ্কার রাজা বিভীষণ খাজানা দেন নাই। এ বৎসর আদায় করিতে না পারিলে তমাদি হইয়া যাইবে। অতএব ব্রাহ্মণকে বিভীষণের নিকট প্রেরণ করুন।

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

রাজা বলিলেন, 'বিভীষণ ত কোন দিন আমাকে খাজানা দেন নাই, এখন নূতন করিয়া কি প্রকারে তাঁহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা যাইতে পারে।" ষড়যন্ত্রকারীরা পূর্ব্বেই কাগজ জাল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা সেই জাল কাগজ রাজাকে দেখাইয়া বলিল যে, এই দেখুন বিভীষণ চিরকাল কর দিয়া আসিতেছেন। অবশেষে রাজা ব্রাহ্মণকে বিভীষণের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ মনে গৃহে যাইয়া গৃহিণীকে বলিল,—এখন কি করি ? রাজা আমাকে সমুদ্রপারে লঙ্কানগরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। কেমনেই বা সমুদ্র পার হই, আর কেমন করিয়াই বা রাক্ষসপুরে প্রবেশ করি ?

ব্রাহ্মণী। ইহার জন্য এত চিন্তা কেন ? তুমি যেয়ে রাজাকে বল গে, এখান হইতে লঙ্কা বহু দূর অবস্থিত, সুতরাং আমার যাইতে অনেক ব্যয়ের দরকার। রাজা যে টাকা দিবেন, তাহা লইয়া আমরা কোন দূর দেশে গোপনে বাস করিব।

ব্রাহ্মণ। আমার দ্বারা তাহা হইবে না। যখন তাঁহার নিমক্ খাইয়াছি, তখন নিমক্‌হারামি করিতে পারিব না। আমাকে চেষ্টা করিতেই হইবে, এখন অদৃষ্ট যা ঘটে।

তৎপর ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী হইতে কিছু অর্থ লইয়া লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিছুদিন পর সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া সেই ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল কুলরহিত সমুদ্র দেখিয়া 'হা বিভীষণ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সে রোদন বিভীষণের প্রাণে বাজিল। অন্তর্যামী বিভীষণ জানিতে পারিলেন যে, এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নাম লইয়া রোদন করিতেছে। তিনি নররূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।—"ব্রাহ্মণ, তুমি কিসের জন্য রোদন করিতেছ ? লোকে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া দুঃখ করিয়া থাকে, তুমি বিভীষণের নামই বা কেন লইতেছ ?

ব্রাহ্মণ। তাহা আর তোমাকে বলিয়া কি করিব ? এক বিভীষণ ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।

বিভীষণ। ঠাকুর, আমিই তোমার বিভীষণ। বল, তোমার কি প্রার্থনা। আমি সাধ্যানুসারে তৎপরিপূরণে যত্নবান হইব।"

ব্রাহ্মণ। তুমি বিভীষণ হইতে পার না। শুনিয়াছি তিনি রাক্ষস। তোমাকে দেখিতেছি মনুষ্য।

অতঃপর বিভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে বিভীষণ বলিয়া বিশ্বাস করিল, এবং তাহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তচ্ছ্রবণে তিনি বলিলেন,—

"তুমি যাইয়া রাজাকে বলিবে, অদ্য হইতে যে দিবস একবৎসর পূর্ণ হইবে, সেই দিবস আমি শ্বেত বায়সের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, রাজার নবপ্রতি-ষ্ঠিত পুষ্করিণীর নাগদন্তের উপর যাইয়া বসিব। আমি সেই সময় একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারিলে রাজস্ব প্রদান করিব।"

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত ঘটনা বলিল। রাজার কতকটা বিশ্বাস হইল, কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মচারীরা একেবারে হেসেই উড়াইয়া দিল। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। বৎসরের শেষ দিন রাজা নবরত্নপরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্করিণীর তীরে সভা করিয়া বসিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটি শ্বেতকাক সেই নাগদন্তের উপর আসিয়া বসিল। তদ্দর্শনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই কি বিভীষণ?"

বায়স উত্তর করিল,—হাঁ, এখন আমার প্রশ্ন শ্রবণ করুন।

নষ্টস্য কান্যাগতি।

প্রশ্ন আকর্ণন করিয়া সকল পরিষদ চিন্তিত হইলেন। সমস্ত দিবস চিন্তা করিয়াও কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। অবশেষে বায়স বলিল, আমি আবার এক বৎসর সময় দিলাম। বৎসরের শেষ দিবস পুনরায় আগমন করিব। সেই দিবস উত্তর দিতে পারিলে রাজস্ব প্রদান করিব, নতুবা রাজ্যের সকলকেই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করিব।

ছয়মাস গত হইল, কেহই উত্তর স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে বররুচি ভাবিলেন যে, যখন মরিতেই হইবে, তখন এখানে মরি কেন? কোন তীর্থে যাই, মরিতে হয় সেখানে মরিব। এই স্থির করিয়া তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়া গৃহপরিত্যাগ করিলেন। ছয়মাস বনে বনে ঘুরিয়া একদা সন্ধ্যার সময় এক বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, বৃক্ষের উপর হইতে একটী পক্ষী বলিতেছে যে, "আমার বোধ হচ্ছে, মানুষ বসে আছে, মানুষের গন্ধ আসিতেছে, আমাদের মা বাপ আসিলে এখনই উহাকে ভক্ষণ করিবে। উনি যদি নিজশরীর হইতে

একটু রক্ত বাহির করিয়া আমাদের চোখে দেন, তাহা হইলে আমরা চক্ষুদান পাই, পরে আমরা উহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি।”—

বররুচি পক্ষীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ ঈষৎ ক্ষত করতঃ রক্ত বাহির করিয়া পক্ষীদ্বয়ের চক্ষে দিলেন। তাহারা চক্ষুদান পাইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে বলিল যে, আপনি আমাদের এই নীড়ে প্রবেশ করিয়া শয়ন করুন, আমরা আপনাকে পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখি। বররুচি স্বীকৃত হইলেন।

কিছুদিন পরে উহাদের পিতামাতা পক্ষী দুইটী আসিয়া শাবকদ্বয়কে বলিল, “এই ফল ভক্ষণ কর”। তাহারা বলিল, “রাত্রে আমরা আর কিছু খাবনা—ক্ষুধা নাই।”

কিছুক্ষণ মৌন হইয়া অবস্থান করিবার পর বৃদ্ধ পক্ষিটী বলিল; “কি দুর্দ্দৈব! রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্য এত দিনে নষ্ট হইল। পরের কথা শুনিয়া রাজা এক্ষণ ধনে প্রাণে বিনষ্ট হয়!”

শাবকদ্বয় বলিল, কি হইয়াছে?

“রাজা বিভীষণের নিকট রাজস্ব চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বিভীষণ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিতে পারিলে, তিনি রাজস্ব প্রদান করিবেন, নচেৎ রাজ্যশুদ্ধ সকলকে বিনাশ করিবেন। এক বৎসর সময় দিয়াছেন,—বৎসর পূরিতেও আর বেশী দিন বাকী নাই।”

“সে প্রশ্নের কি কোন উত্তর নাই?”

“থাকিবে না কেন।”

“কি, তবে বল দেখি শুনি?”

“রাত্রিতে কি গোপনীয় কথা বলিতে হয়, কে কোথা হইতে শুনিয়া ফেলিবে?”

“এতরাত্রে আর কে এখানে আসিবে।”

“যদি কোন পণ্ডিত কতকটা মাংস লইয়া বররুচি কিম্বা কালিদাসের নিকট সন্ন্যাসী বেশে উপস্থিত হয়, আর বররুচি কিম্বা কালিদাস তাহাকে যদি চিনিতে না পারে, তাহা হইলে যে প্রশ্নের উত্তর হয়।”

বররুচি সব শুনিলেন। অতঃপর তাহারা সকলে নিদ্রিত হইল।

প্রত্যূষে বৃদ্ধ পক্ষী দু’টী আহারান্বেষণে বহির্গত হইলে, বররুচি নীড় হইতে নিক্রান্ত হইয়া উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একটী

'মড়ার মাথা' দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এইত মাস্। মাংস লইয়া কালিদাসের নিকট যাই না কেন? আমিত পণ্ডিত বটে, সন্ন্যাসীর সাজও আছে। আর এখন আমার যেমন অবস্থা, তাহাতে কালিদাস কোন প্রকারেই আমাকে চিনিতে পারিবে না।

তাহাই স্থির হইল। বররুচি সেই মাথা হইতে খানিকটা মাংস লইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে কালিদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন। কালিদাস তৈল মাখিতেছেন। তিনি মাংস হস্তে চুপ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে কালিদাস বলিলেন,—

"ভিক্ষো মাংস নিসেবনং প্রকুরুসে?"

বররুচি। কিং তত্রমদ্যং বিনা?

কালিদাস। মদ্যংচাস্তি তব প্রিয়ং?

বররুচি। প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ!

কালিদাস। বেশ্যার্থেরুচিঃ কুতস্তবধনং?

বররুচি। দ্যূতেন চৌর্য্যেন বা!

কালিদাস। চৌর্য্যদ্যূত পরিগ্রহোহস্তি ভবতো?

বররুচি। নষ্টস্য কান্যাগতিঃ!

অস্যার্থ, কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—

হে ভিক্ষুক, তুমি কি মাংস ভক্ষণ করিয়া থাক?

বররুচি। শুধু মাংস নয়, মদ্যও পান করিয়া থাকি।

কালিদাস। মদ্যও পান করিয়া থাক!

বররুচি। তাহাই শেষ নয়, আমি বেশ্যাও ভালবাসি।

কালিদাস। বেশ্যাসক্ত! তুমি অর্থ কোথায় পাও?

বররুচি। অক্ষক্রীড়া কিম্বা চুরি করিয়া সংগ্রহ করি!

কালিদাস। অক্ষক্রীড়া এবং চৌর্য্যও তোমার অভ্যাস আছে?

বররুচি। নষ্ট ব্যক্তির আর গতি কি?

বররুচি "নষ্টস্য কান্যাগতিঃ" বলিবা মাত্র, কালিদাস সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তর হয়েছে, উত্তর হয়েছে"।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সকল শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অগস্ত্য, পূজাবিধি প্রকটিত করিবার সময়, তদীয় সংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

যবাভাবে তু গোধূমং মুদ্গাভাবেপিমাষকং।
মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবে তু তৈলকং॥

যবের অভাবে গোধূম দিতে পার, মুগের অভাবে মাসকলাইও দেওয়া যাইতে পারে, তথা মধু অভাবে গুড় এবং ঘৃতের অভাবে তৈল দিবে।

এই সকল নিয়মযুক্তি তর্কের ধার ধারে না; সমালোচকের সমালোচনার গণ্ডীর বহির্ভূত। এ সম্বন্ধে কাহারই কিছু বলিবার নাই। সুতরাং আমিও—

মধুরেণ সমাপয়েৎ

বলিয়া অদ্যকার মতন বিদায় গ্রহণ করি।

ব্রহ্মপুরাণকার আমাদের ভোজনবিধির মধ্যে বলিয়াছেন,—

কুর্য্যাৎক্ষীরান্তমাহারং দধ্যন্তং ন কদাচন।
লবণাম্লকটুষ্ণানি বিদাহীনি চ যানিতু।
তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

ক্ষীরান্তে ভোজনবিধি অর্থাৎ দুগ্ধাদি দ্বারা ভোজন সমাপন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কখনও দধ্যন্ত করিবেক না অর্থাৎ ভোজনশেষে দধি খাইবে না। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্যাদি যন্ত্রণাদায়ক হয়, তদ্ধেতু উষ্ণ দোষ সকল নিবারানার্থ মধু দ্বারা ভোজন শেষ করিবে অর্থাৎ সর্ব্বশেষে মধু আহার করিবে।

ওঁ মধু মধু মধু॥

শ্রীব্রহ্মসুন্দর সান্যাল।

দুঃখ।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে সুখ জগতের অভিপ্রেত এবং দুঃখ জগতের অনভিপ্রেত অর্থাৎ কেহই দুঃখ পাইবার জন্য অভিলাষ করে না। সকলেই সুখ পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখবিষয়ে আমাদের অনিচ্ছা থাকিলেও কোন না কোন সময়ে আমাদিগকে দুঃখপাশে আবদ্ধ হইতেই হইবে, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই, দুঃখ কয় প্রকার এবং কি কি? দুঃখ ত্রিবিধ যথা:—(১) আধ্যাত্মিক,

(২) আধিভৌতিক, (৩) আধিদৈবিক। এই ত্রিবিধ দুঃখের অন্য নাম "ত্রিতাপ।" আধ্যাত্মিক দুঃখ :—শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে আত্মা বলে ; * এই আত্মার নিমিত্ত যে দুঃখ, তাহা "আধ্যাত্মিক দুঃখ" নামে অভিহিত হয়। এই দুঃখ দুই প্রকার যথা :—(১) শারীর (২) মানস। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় বলেন "তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ।" শারীরদুঃখ বাত পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্য অর্থাৎ ন্যুনাধিক্য বশতঃ জন্মে। আর মানসদুঃখ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ বিষয় বিশেষদর্শন নিবন্ধন উৎপন্ন হয়। বাহ্যপদার্থ দ্বারা দুই প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে যথা :—"আধিভৌতিক" ও "আধিদৈবিক"। ইহার মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ,ও স্থাবর হইতে জন্মায়। এরূপ দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে কেন ? ভূত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। আধিদৈবিক দুঃখ :—যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক (যাহারা বিঘ্ন করে) ও শনি প্রভৃতি গ্রহগণের দৃষ্টিবশতঃ হইয়া থাকে। এই দুঃখ যে রজোগুণের পরিণাম বিশেষ, তাহা বোধ হয়, সকলেই উত্তমরূপে অবগত আছেন। সুতরাং দুঃখ নাই, একথা বলা যায় না। সাংখ্যমতে সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মার নহে। অন্তঃকরণে অবস্থিত এই ত্রিবিধ দুঃখের সহিত চেতনাশক্তি পুরুষের প্রতিকূলতারূপে (অর্থাৎ দুঃখ যেন না হয়, এই ভাবে) সম্বন্ধকে "অভিঘাত" বলে। "পুরুষ" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় বলিয়াছেন, "পুরি লিঙ্গে শেতে ইতি পুরুষঃ।" লিঙ্গ শরীররূপ পুরে শয়ন করে বলিয়া আত্মাকে "পুরুষ" বলে।

অভিঘাত সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় বলেন "তদেতৎ দুঃখত্রয়েণান্তঃকরণ বর্ত্তিনা চেতনা শক্তেঃ প্রতিকূল বেদনীয়তয়াভিসম্বন্ধোহ ভিঘাত ইতি।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রতিকূলরূপে (ভাল লাগেনা, এই ভাবে) দুঃখের অনুভব হয় বলিয়াই দুঃখত্যাগের বাসনা হয় না। সৎপদার্থ দুঃখের অভাব না করিতে পারিলেও তাহার অভিভব হইতে পারে, এ কথা অগ্রে বলা যাইবে। অতএব দুঃখের অপঘাত একথা ঠিকই বলা হইয়াছে। এখন কি

* শরীর ও ইন্দ্রিয়কে আত্মা কোন শাস্ত্রে বলে না। লেখকও পরে বলেন নাই। বীঃ সঃ।

উপায় অবলম্বন করিলে এই দুঃখত্রয়ের নাশ হইতে পারে। এক মাত্র উপায় শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান, আর কিছুই নহে।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাস্য তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ত তোহ্ ভাবাৎ॥"—সাংখ্যকারিকা।

"দৃষ্টেসাহ পার্থা" এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আশঙ্কা করা হইতেছে। আশঙ্কার তাৎপর্য্য এইরূপ, জগতে দুঃখত্রয় থাকুক, উহাকে পরিত্যাগের বাসনাও হউক, পরিত্যাগের সম্ভাবনাও হউক, শাস্ত্রোক্ত উপায় পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বজ্ঞান দুঃখত্রয় বিনাশে সক্ষমতাও হউক, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানে প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তিগণের জিজ্ঞাস্য হওয়া উচিত নহে। ইহার কারণ এই যে, অতি দুর্লভ শাস্ত্রগম্য উপায় তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য অনেক দৃষ্ট উপায় আছে, উহা দ্বারা সহজে ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। এ বিষয়ে একটী লৌকিক আভাণক (যুক্তি) আছে। "যদি অকে অর্থাৎ নিকটে মধু পাওয়া যায়, তবে পর্ব্বতে আরোহণ করিবার প্রয়োজন কি? অভিলষিত বিষয় লব্ধ হইলে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন? ইহার উত্তর "কেহই নহে।" শারীরদুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বৈদ্যগণ কর্তৃক উপদিষ্ট শত সহস্র উপায় আছে। মানসদুঃখ দূরীকরণের জন্য মনোরম স্ত্রী, পান, ভোজন, বিলেপন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি অল্পায়াসসাধ্য নানা প্রকার ভোগ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে। এইরূপ আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সহজসাধ্য নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন, নির্ব্বাধ স্থানে বাস প্রভৃতি বিবিধ উপায় আছে। সেইরূপ সহজলভ্য মণি মন্ত্র ও ঔষধাদির ব্যবহার করিলে আধিদৈবিক দুঃখ নিবারিত হইতে পারে।

লৌকিক উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হয় না, কারণ লৌকিক উপায়ে একান্ত ও অত্যন্তের অভাব আছে। একান্ত শব্দের অর্থ দুঃখনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাব অর্থাৎ অবশ্যই হওয়া; অত্যন্ত শব্দে নিবৃত্ত দুঃখের পুনরুৎপত্তি না হওয়া বুঝায়। একথা বলা যাইতেছে, যথানিয়মে রসায়নাদি স্ত্রী-নীতি শাস্ত্রের অনুশীলন ও মন্ত্রাদির ব্যবহার করিলেও পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের নিবৃত্তি দেখা যায় না; সুতরাং দৃষ্ট উপায়ের অনৈকান্তিকত্ব আছে। লৌকিক উপায়দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও পুনর্ব্বার জন্মিয়া থাকে। সুতরাং আর কখনও হইবে না, এ ভাবে নিবৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব লৌকিক উপায় পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-

নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করা উচিত। তাহা হইলে দুঃখত্রয় সমূলে বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ ইহার পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইবে না। দেখ, লৌকিক উপায় অবলম্বন করিলে সামান্যাকারে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে না। সেই জন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান হও। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার দুঃখ জন্মে না; কিন্তু লৌকিক উপায় দ্বারা সেরূপ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে জন্মে? অধ্যাত্মশাস্ত্রের পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিয়া ধ্যান-যোগ নিদিধ্যাসনে তত্ত্বজ্ঞান হয়। সংখ্যা-শাস্ত্রে তত্ত্বের নির্ণয় আছে, সেই নিমিত্ত বিষয়বিরক্ত বিবেকী সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পুনর্জ্জন্মের অভাব হয়, হইলে দুঃখের ন্যায় সুখেরও অভাব হয়; সুতরাং আয়ব্যয়, লাভ লোকসান সমান, এরূপ আশঙ্কা হইবে না। সুখে বিরক্ত না হইলে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। আমাদের যাবতীয় দুঃখ আশা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছেঃ—

(১) "আশা হি পরমম্ দুঃখম্ নৈরাশ্যম্ পরমম্ সুখম্।"

(২) "নিরাশো সুখী ভবেৎ পিঙ্গলাবৎ।"

আত্মা নির্গুণ, সুখদুঃখাদি ধর্ম্মরহিত, তথাপি প্রতিবিম্বরূপে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি আত্মায় পতিত হওয়ায় "আমি সুখী," "আমি দুঃখী" ইত্যাদি জ্ঞান হয়। যাহাতে এই প্রতিবিম্ব পতিত না হয়, অন্তঃকরণের সহিত আত্মার ভোগ্য-ভোক্তৃতা সম্বন্ধ বিদুরিত হয়, তাহার এক মাত্র উপায় তত্ত্বানুশীলন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গীতায় বলিয়াছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইহার অর্থ এই, অসৎ হইতে সৎ জন্মে না অথবা সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হয় না। অভিপ্রায় এই যে, সৎ হইতে সৎ জন্মে এবং অসৎ হইতে অসৎ ভিন্ন আর কিছুরই উৎপত্তি হয় না। নরশৃঙ্গাদি অসৎ পদার্থ; সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি আদৌ সম্ভবে না। সেইরূপ দুঃখত্রয় সৎপদার্থ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহার বিনাশ না হইলেও অভিভব হইতে পারে। যাহাতে দুঃখত্রয় সূক্ষ্মভাবে স্বকারণ প্রকৃতিতে লয় পায়, পুরুষে প্রতিবিম্বিত না হয়, সেরূপ হইতে পারে, প্রকৃতিতে সুখ-দুঃখাদি থাকায় ক্ষতি নাই। আত্মায় প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই 'ভোগ' বলে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক

নিবৃত্তি হয় না। যদি হয়, তাহা হইলে তত্বজ্ঞানলাভের প্রয়োজন কি? তত্বজ্ঞান অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাউক, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় কি না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জ্যোতিষ্টোমযাগ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"স্বর্গকামো যজেত"। যাগদ্বারা স্বর্গ সম্পাদন করিবে। যাহা ইচ্ছানুসারে উপস্থিত হয়, দুঃখের বিরোধী, এরূপ সুখবিশেষকে 'স্বর্গ' বলে। উক্ত সুখরূপ স্বর্গ নিজের স্থিতি দ্বারাই সমূলে দুঃখ বিনাশ করে। এতাদৃশ স্বর্গ বিনাশী নহে (ন চৈষ ক্ষয়ী); কেন না, শ্রুতি বলেন, 'অপাম সোমমমৃতা অভূম'। আমরা সোমরস পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি। স্বর্গের বিনাশ স্বীকার করিলে দেবগণের অমরত্ব লুপ্ত হয়। অতএব দুঃখত্রয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ মুহূর্ত্ত প্রহর দিন, রাত্রি, মাস বা সম্বৎসরাদি কালে সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ বৈদিক উপায় অনেক জন্ম পরম্পরায় কষ্ট স্বীকার করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, এরূপ বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা নিরর্থক হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন।

পুনর্ব্বার দুঃখ না হয়, এই অভিপ্রায়ে আমরা তত্বজ্ঞানের উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকি। যাগানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গে গমন করিতে পারিলে, আর দুঃখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না; কারণ স্বর্গ একটী সুখবিশেষ, উহাতে কোনরূপ দুঃখের সংশ্লেষ নাই এবং উহার বিনাশও নাই। যাগাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সহস্র বৎসরের অধিককাল প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তত্বজ্ঞান শত সহস্র লক্ষ কোটি বৎসর বা জন্মেও লাভ হয় কিনা সন্দেহস্থল।

"দৃষ্ট বদানুশ্রবিকঃ সহ্য বিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ॥"

বেদবিহিত যাগাদিরূপ অদৃষ্ট উপায় ও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় অর্থাৎ দুঃখ ত্রয়কে অত্যন্ত ভাবে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ এই যে, যাগাদিতে পশুবধাদি জন্য পাপ হয়; সুতরাং দুঃখের সংশ্রব আছে। যাগাদির ফল স্বর্গাদি বিনশ্বর, সুতরাং কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার দুঃখে পতিত হয়। স্বর্গাদিসুখে তারতম্য আছে, সুতরাং অধিক সুখ দেখিয়া অল্পসুখীর দুঃখ জন্মিতে পারে। ইহার বিপরীত পাপাদি দোষে দূষিত নহে, এমত

উপায় প্রকৃতি পুরুষভেদ সাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর। উহা মহদাদি ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের বিশেষরূপে জ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—ধর্ম্মদ্বারা সুখ, অধর্ম্ম দ্বারা দুখ, অধর্ম্মদ্বারা সুখ, এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। ইহার প্রমাণ বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পরিলক্ষিত হইতেছে :—

"ধর্ম্মেণ গমন মূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্য ধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়া দিষ্যতে বন্ধঃ॥"

ইহার অর্থ :—ধর্ম্মদ্বারা উর্দ্ধ অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে গমন হয়। অধর্ম্মদ্বারা নিম্ন সুতনাদী লোকে গমন হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল বিষয় বিবক্তি সহকারে দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয় না। রজোগুণের কার্য্য বিষয়ানুরাগ বশতঃ সংসার হয়। "সংসার" কাহাকে বলে? "স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ" অদৃষ্টবশতঃ জন্মলাভকে সংসার বলে। শ্রীকৃষ্ণাদির মনুষ্যাদিরূপে জন্ম হইলেও উহা অদৃষ্টবশতঃ নহে, কিন্তু লীলামাত্র।

"তত্র জরা-মরণ কৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ
লিঙ্গস্য বিনিবৃত্ত স্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥"

অর্থঃ—চেতন পুরুষ অর্থাৎ আত্মা জরা মরণ কৃত দুঃখ অনুভব করে, কেন না, শরীর অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সহিত উহার ভেদজ্ঞান থাকে না। অতএব দুঃখটী স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ সংসার অবস্থায় দুঃখভোগ অপরিহার্য্য। পূর্ব্বোক্ত শরীরাদিতে যদিচ নানাবিধ বিচিত্র সুখভোগী আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও জরা ও মরণ জনিত দুঃখ সকলেরই সমান। কৃমি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীরই মৃত্যু ভয় আছে। দুঃখজনক বিষয় হইতে ভীত হয়, মরণ হইতে ভয় হয়, অতএব মরণ দুঃখকর। যাহা হউক, দুঃখাদি প্রকৃতির পরিণাম, উহারা বুদ্ধির গুণ, তবে কি প্রকারে ইহারা পুরুষের হইবে? লিঙ্গশরীররূপ পুরে শয়ন করে বলিয়া আত্মাকে পুরুষ বলে। লিঙ্গশরীরে দুঃখাদির সম্বন্ধ আছে, এই নিমিত্ত চেতন আত্মাও দুঃখাদির সম্বন্ধী হইয়া থাকে, এইরূপ তাৎপর্য্য। লিঙ্গশরীর বৃত্তি দুঃখ কি কারণে পুরুষের হয়? লিঙ্গশরীরের বিনিবৃত্তি না হওয়া বশতঃ পুরুষ হইতে লিঙ্গশরীরের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় পুরুষ আপনাতে লিঙ্গশরীরের সমস্ত ধর্ম্ম আছে বলিয়া জানে। অথবা যে কাল পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি না হয়, তত কাল

যাবৎ পুরুষ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় বলিয়াছেন, "অথবা দুঃখ প্রাপ্তাববধি রাঙাহনেন কথ্যতে, লিঙ্গং যাবন্ন নিবর্ত্ততে তাবদিতি।"

রাজাধিরাজ হউন অথবা ধনকুবের হউন, অন্যান্য দুঃখ না হইলেও বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ও মরণজনিত দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। কোন বস্তু হইতে দুঃখভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তৎসজাতীয় পদার্থ হইতে লোকের ভয় হয়। মরণে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে বলিয়া জাতমাত্র কৃমিরও মরিতে ভয় হয়। ঐরূপ ভয় হয় বলিয়াই পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের অনুমান হইয়া থাকে। জাতমাত্র শিশু ইহজন্মে মরণ-ক্লেশ অনুভব করে নাই, তবে মরণভয় হইবার কারণ কি? এস্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উহার পূর্ব্ব জন্মে মরণ ক্লেশ অনুভব হইয়াছে, তাই আর মরিতে চাহে না।

"লিঙ্গস্য অবিনিবৃত্তেঃ" এই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া লিঙ্গশরীরের পুরুষ হইতে ভেদজ্ঞান না হওয়ায় এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। "লিঙ্গস্য অবিনিবৃত্তেঃ" এই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া লিঙ্গশরীরের বিনিবৃত্তি পর্য্যন্ত এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এস্থলে "আঙ্" উপসর্গ যোগে "নিবৃত্তি" শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকল্পে হেত্বর্থে পঞ্চমী। কেবল দুঃখ বলিয়া কথা নহে, পুরুষের কোন ধর্ম্মই নাই, সমস্তই বুদ্ধির পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে আশাই আমাদের নিখিল দুঃখের কারণ। আশাকে দমন করিতে না পারিলে কোন ক্রমেই দুঃখের মুলোচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। যাহার আশা অল্প, সে অল্প পরিমাণে দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু যাহার আশা বহুল, সে বহুল পরিমাণে দুঃখ অনুভব করে। অভিপ্রায় এই যে, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর, তবেই দুঃখত্রয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, নচেৎ সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিবে। কি উপায়ে আশা দূরীভূত হইবে? নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা! নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহার পর জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞান লাভ হইলে পরমপুরুষার্থ হইবে। তখন আর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ রায়, বি, এ।

নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ।

৫। ছৈয়দ মর্ত্তুজা—(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

দীপক।

গেলা গেলা ওরে শ্যাম না গেলা মাতাইয়া। ধু।
ওরে শ্যাম গেলা কোন্ দেশে।
বৈরাগিনী হৈয়া যাইমু বন্ধের উদ্দেশে॥
চান্দের চান্দনি দিমু সুরুযের * ভাতি।
যদি কর দয়া বন্ধু আজুকার রাতি॥
আউলাএ মাথার কেশ কভু নহি বান্ধে।
রাধা কানু অভিমানে গোপী সব কান্দে॥
আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি॥
বন্ধু যাইব দূরদেশ মনে লাগে ধান্ধা।
বন্ধের হাতে মোহন বাঁশী থুইয়া যাউক বান্ধা॥
সোণা নয় রে রূপা নয় রে আঞ্চলে বান্ধিতুম। †
হৃদের উপর থুইয়া বাঁশী রজনী গোঞাইতুম॥
প্রিয় মোরে বিস্মরণে তিলে যুগ জানি।
প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কাণি॥ ‡
আকাশের চন্দ্র প্রিয় নয়ানের মণি।
আসিবা আসিবা করি পোহাইলাম রজনী॥
যথা তথা যাইও বন্ধু আসিও সকালে।
তিলেক বিলম্ব হৈলে ঝাম্প দিমু জলে॥
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে ওহে পরবাসী।
পঞ্চ দিন লাগিয়া কেন এত উপহাসী॥ § ৬।১৪।

---

* সুরুযের—সূর্য্যের।

† "সোণা রূপা হৈত আমি আঞ্চলে বান্ধিতুম।" পাঠান্তর।

‡ কাণি—অর্থ কি?

§ "মনের মাঝে আছে বুলি তারে বুলি বাঁশী।" পাঠান্তর।

৬। মোছন আলি। পদসংখ্যা ১।

মথুরা বাজারে যাই।
পার করি দে নন্দের কানাই ॥
চলিছে রাধে মথুরা বাজার।
ভাণ্ড ভরি মাথে করি দধির পসার ॥
ঘাঠে চৌকি নন্দের কানাই।
বলে দধি দেরে খাই ॥
নানা ভোলা (?) নূতন যৌবনী।
কিদিয়া মানাই যাইমু ঘাঠোয়াল মাঝি ॥
তুমি কমল আমি ভ্রমর
একা কুঞ্জে চল সাধ পূরাই।
কহে হীন মোছন আলি রাই,
দান করি নয়ালি যৌবন
পার কর কানাই।
তুমি নাগর ধর কাণ্ডার,
আমি দিমু তোরে
পান বানাই ॥ ১। ১৫।

৭। গয়াজ (মহাম্মদ)। পদসংখ্যা ৩।

রামকেলি।

বাহির হৈয়া দেখরে বাথানে বিনোদ রায় সাজে ॥
গোধেনু লইয়া রঙ্গে চলে রাখোয়াল সঙ্গে
চলিতে সুরঙ্গ শিঙ্গা বাজে ॥ ধু
আগে পাছে শতশ ধেনু তার পাছে রামকানু
সঙ্গে করি বলরাম ভাই।
রামে বোলে ভাই কানু সঙ্গে আছে শিঙ্গাবেণু
চল সঙ্গে গীত গাই যাই ॥
দিল্লীর আগে বিস্তর দূর, তার মাঝে ইস্‌লামপুর (১)
তাতে রামকানু করে কেলি।

(১) এই পদের তাৎপর্য্য কি

হীন গয়াজে কহে এই কথা মরম দেহে
এহি কানু আঁখির পোতলী ॥ ১। ১৬।

পটমঞ্জরী।

কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি। ধু।
ঘরথুন (২) বাহির হৈতে, সেই চাল ঠেকিল মাথে,
বৈরী হৈল দুরন্ত ননদিনী।
এইরূপ ছুরতি লইআ, দূরদেশে গেল বন্ধুআ,
নারী হৈল পরের অধীন ॥

* * *

স্বামী মরিআ গেলে, কেমতে রহিব ঘরে,
কাল বুদ্ধি দিল কোন্ ছারে ॥
শাশুড়ী হীরাঁর ধার, ননদী দুর্জ্জন আর,
এই না বাঘের ঘরে আমার বসতি।
হীন গয়াজের বাণী, শুন রাধা বিরহিনী,
ভাবিলে পাইবা নিজ পতি ॥ ২। ১৭।

আর একটি পদের ভাল পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। ইহাঁর রচিত অপর একটি গীত আছে; কিন্তু তাহা বৈষ্ণব পদ বলিয়া বোধ হয় না।

৮। সৈয়দ আইনদ্দিন। পদসংখ্যা ৫।

দেশকারী।

বৃন্দাবনে রাধা কানু রঙ্গের রঙ্গিয়া।
চলরে সখী নবরূপ দেখি গিআ ॥ ধু।
তুমি ত চিকণ কালা রূপেতে মোহন।
কনক বরণ রাধে মিলিছে আপন ॥ (৩)
রাধা বালা নবশশী কানু পূর্ণ চান্দ।
রূপেতে নৈরূপ বৈসে রূপে অনুপাম।
রূপ না থাকিলে কার রাধা কানু নাম ॥

(২) ঘরথুন—ঘর হইতে। 'থুন' পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন; চট্টগ্রামে ব্যবহৃত।
(৩) কনক বরণ রাধে চিন কি আপন।" পাঠান্তর।

কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে হেরি রূপপুর।
সবরূপ একই রূপ পুষ্প কি মুধর॥ (?)১—১৮।

রামক্রিয়া।

সেই, দেখরে রঙ্গ কেলি।
এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥ ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেইরূপে উজ্জ্বল এ জিনি কোটী ভানু॥
খেনে খেনে শ্যাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরসিত॥
কহে ছৈদ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা॥ ২।১৯।

মাধবী।

বিনোদ আজু যাও ঘর।
তোমারে খাইব সাপে, বন্ধু কলঙ্ক রহিব মোর॥ ধু।(৪)
উঠানেত হাটু পানি সন্মুখে গড়খাই।
সোণা হেন বন্ধুআ রাখিমু কোন ঠাই॥
ঘরে থাকে * কুকুর চৌদিকে মান্দার।
কেমতে হইব বাহির বন্ধু ঘরেত আমার॥
ঘরেতে জঞ্জাল রে বন্ধু আর বাপ ভাই। (৫)
মাঝি আলে শুতি আছে ভগিনী-জামাই॥
কহে ছৈদ আইনদ্দিনে মন কর শান্ত।
এক চিত্তে প্রভু ভাব মিলাইব কান্ত॥ ৩ ২০।

আর দুইটি পদ 'পূর্ণিমায়' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর আরো কয়েকটি পারমার্থিক গীত আছে।

৯। আলিরাজা।

ইহার অনেকগুলি পদ আছে ইহার নিবাস চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানান্তর্গত 'ওশখাইন' গ্রামে। ইনি সংসারবিরাগী 'ফকির' ছিলেন; সাধারণতঃ

(৪) "তোমা খাইব বাঘে সাপে কলঙ্ক আমার।" পাঠান্তর।

(৫) "ঘরে আছে ননদ জাল আর বাপ ভাই।" ঐ

'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর গুরুর নাম সাহা কোয়ামদ্দিন। কবির পুত্র 'সর্ফতোল্লা মিঝা'ও এজন ফকির-কবি, তাঁহার অনেক ফকিরী গীত আছে। কবির বংশ বর্ত্তমান। ভূতপূর্ব্ব "আলো" পত্রে ইহাঁর যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ভ্রমাত্মক বোধ হইতেছে। ঐরূপ ভ্রমের বিশেষ কারণও আছে। সময়ান্তরে আমরা আলিরাজার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিব। ইহাঁর অনেকগুলি পদ পূর্ব্বে 'আলো' ও সাহিত্য 'সংহিতায়' প্রকাশিত হইয়াছে।

বেলাবলী।

রূপে হরি (রূপ হেরি ?) মোহিত সদায়। ধু।
পরম সুন্দরী রাধা ভুবনমোহন।
হংসগতি জিনি অতি লজ্জিত খঞ্জন॥
ইন্দ্রানী মেনকা গতি জিনিয়া ভঙ্গিমা।
ভুজঙ্গ পেখন জিনি চূড়ার মহিমা॥
কমল পোতল তনু বায় ঢলি পড়ে।
সততে মোহিত রাণী মুরলার স্বরে॥
হরির মুরলী ধনী পূজে রাত্র দিনে।
হরি রাধা কৃপাদানে আলিরাজা ভণে॥ ১। ২১।

কামোদ।

সদায় রাধার মনে জ্বালা, শুন লো সই। ধু।
কি দিয়া বান্ধিমু হিয়া, মাধবরে না দেখিয়া,
প্রাণি মোর গেল যার সনে।
না দেখিলে চক্রপাণি, নিব্বোধ না মানে প্রাণি,
দহে তনু কালা কামবাণে॥
না দেখি হরির মুখ, বিদরে দারুণি বুক,
সহিতে না পারি প্রেমানল।
হই লাজ মান ছাড়া, কাঁখেত কলসী রাধা
নিঃসরিল ভরিবারে জল॥
হীন আলি রাজা বোলে, গেল রাধা নদীকূলে
দেখিল যমুনাতীরে হরি।

বংশী বাহে গাহে গীত, মজিল রাধার চিত,
কেলি হৈল কার প্রাণে জড়ি ॥ ২।২২ ॥

কুমারী।

কি খেণে আসিলুম ঘাঠে।
নন্দের নন্দন, ভুবনমোহন,
দেখিয়া মরম ফাটে ॥ ধু।
পদ্মনাভ কদম্বশিখরে বসি।
করে বেণু ঝাঁঝরি বদনে পুরে বাঁশী ॥
যেরূপ দর্শনে ভ্রমে ইন্দ্র হর শশী।
যেরূপ শরণে (স্মরণে ?) ডুবি মজিল তপস্বী ॥
সেরূপ দেখিয়া রাধা হৈল উদাসিনী।
লাজ ভয় ধর্ম্ম তেজি শ্যাম কলঙ্কিনী ॥
আলিরাজা গাহে প্রেম রতন উত্তম।
* * * ৩।২৩।

গুর্জ্জরী।

শুন সখি সার কথা মোর।
কুলবধু-প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥ ধু ॥
সে নাগর চিত্ত চোরা কালা যার নাম।
জীতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য্যকাম ॥
মোর জীউ সে কি মতে লই গেল হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে—
প্রেম খেলে নানা রূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ৪।২৪ ॥

গড়া (বিহাগড়া ?)।

কালা তোমা ভাল জনি।
তোমার সঙ্গে প্রেম করি হৈলুম কলঙ্কিনী ॥ ধু ॥
দেখা দিয়া গেলা প্রিয় হৈল কত কাল।
কেমতে রহিলা মোরে দিয়া মায়া জাল ॥

হেম সাধ মনে মোর করি কণ্ঠহার।
ভ্রমর কমলে রাখি হৃদের মাঝার॥
হীন আলিরাজা কহে ভজি গুরু পায়।
এই মাগি পিয়াপদে দেখিতে সদায়॥ ৫।২৫।

রামক্রিয়া।

গোপী শ্যাম প্রেমের সাগরে
রাধা কানু পিরীতি নাগর॥ ধু।
নিত্য মাঠে থাকে হরি, রাখোয়াল সঙ্গে করি,
বংশীর ঠমকে গায় গীত।
শুনি মুরলীর ধ্বনি, কম্পিত রাধার প্রাণি,
পিরীতি বিরহে দহে চিত॥
করুণ বংশীর স্বরে, দেব মুনি জ্ঞান হরে,
আর হৃদে জাগে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণ বংশী সুর, জ্ঞানগর্ব্ব করে দূর,
জাতি ধর্ম্ম লাজ কুলমান॥
রাধা সে বংশীর পদে, মাঠে গেলা কাম সাধে,
জল ছলে কালিন্দীর কূলে।
হীন আলিরাজা ভণে, রাধা কানু রতিরণে,
প্রেমলীলা কদম্বের তলে॥ ৬।২৬॥

দীপক।

কিরূপ দেখিনু সই সই,
অই না যায় পাসরা॥ ধু॥
সেইরূপ হইল নারীর প্রাণ কাল।
হরিল জীবন মোর বুকে দিয়া শাল॥
লেখিল পাষাণে রূপ বজ্রের সমান।
ক্ষুধা নিদ্রা হরিল হরিল লাজ মান॥
হীন আলিরাজা কহে সেইরূপ চিনে॥
* * * ৭।২৭॥

মায়ুরী।

দারুণ বন্ধের লাগি,
প্রেম বিষে জলে তনু রে,
মন নিরোধ না মনে ॥ ধু ॥
প্রেম বাগ তোলাইল অই দূরদেশী।
প্রেমরস ডোরে বান্ধি হৈল পরবাসী ॥
নিত্য পন্থ হেরি থাকি কাঁদি ঝর ঝর।
জর জর হৈল হিয়া কাঁপি থর থর ॥
দেশান্তরী মিত্র নহে জানিলুম এখনে।
এক সঙ্গে না ভুলে না রহে এক স্থানে ॥
আলিরাজা ভণে প্রেম অতিশয় ধনু (?)।
প্রেমানল বিষবাণে ভস্ম হৈল তনু ॥ ৮।২৮ ॥

কল্যাণ।

নানা বর্ণ রূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপাণি।
তা দেখি মোহিত হৈল রাধা কমলিনী ॥ ধু ॥
চামর জিনিয়া কেশ, কপালে তিলক বেশ,
নব ইন্দু ললাটে জিনিছে।
ইন্দ্রধনু জিনি ভুরু, প্রাতঃ স্বর আঁখি চারু,
শুক চঞ্চু নাসাগ্র নিন্দিছে ॥
মুখে পূর্ণ শশী ক্ষীণ, অরর বান্ধুলী পীন,
দন্তে বীজ দাড়িম্ব নিন্দিল।
কণ্ঠ দেখি কম্বুবে, হ্রদ সিন্ধু সরোবরে,
যুগ ভুজে বাসুকী গঞ্জিল ॥
সিংহ জিনি কটি সাজে, কিঙ্কিণী চলিতে বাজে,
রুণু ঝুণু শুনি মোহে মুনি।
নানা আভরণ পরি, মোহন ভঙ্গিমা করি,
হেন রূপে হরে জগ প্রাণি ॥
গাহে আলিরাজা হীনে, সার সেই রূপ বিনে,
আন রূপে না বান্ধিমু চিত।

শুন হয় ত্রিলোচনে, জ্যোতি দিয়া আঁখি সানে,
রাখ সার রূপেত মোহিত (?) ॥ ৯।২৯ ॥

শুদ্ধমল্লার।

জগ-পতি তুমি রূপে মনোহর কালা।
সর্ব্বরূপ জিনি শুদ্ধ শ্যামরূপ ভালা ॥
ত্রিজগতে সর্ব্বরূপে কালা অলুকিত।
শ্যাম জিনি শ্বেত লাল না হয় উদিত ॥
কৃপাসিন্ধু জগবন্ধু তুয়া কালা নিধি।
নিশি কালা মেঘ কালা অলি পিক আদি ॥
শ্যাম রূপ, শ্যাম চন্দ্র শ্যাম অলঙ্কার।
শ্যাম মেঘে পূর্ণাসন করিছে মল্লার ॥
মাতঙ্গ বাহন রাজা স্বর্গের উপর।
মল্লারের আলাপন চাতকের স্বর ॥
গুরুপদ শিরে করি আলিরাজা কহে।
একালা চরণ বিনু মোর গতি নহে ॥ ১০। ৩০।

পূরবী।

বন্ধুয়ারে দেখিলুম কমলদলে তোর রূপ। ধু।
যখনে দেখিলুম শ্যাম কালিন্দীর কূলে।
সেই ধরি রাজহংস নাচে শতদলে ॥
ষট্ চক্র মধ্যে মোর বহে ষট্ স্রোত।
পঞ্চ শব্দে যন্ত্র বাহে গাহে তোর গীত ॥
হীন আলিরাজা ভণে গুরুদাতা সার।
ষট্ কলে রোমে রোমে গুণ গাহে যার ॥ ১১।৩১।

আশোয়ারী।

কানু বিনে রাধার না লয় আনচিত।
জগতের কায়মনে যার যন্ত্র গীত ॥ ধু।
প্রেম বিনু রাধাএ না জানে কোন কাম।
অষ্ট অঙ্গে রাধার নিঃসরে শ্যামনাম ॥

ভক্ষ্য নিদ্রা তেজি রাধা শ্যামপ্রেমে বশ।
সততে হরির সেবা অমূল্য পরশ॥
গুরুর চরণে হীন আলিরাজা ভণে।
জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে॥ ১২। ৩২।

বলিতে ভুলিয়াছি; আলিরাজা অনেক ফকিরী গীত, ধ্যানমালা, সিরাজকুলুপ, এবং জ্ঞানসাগর নামক এই তিনখানি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থগুলির পরিচয় 'পরিষৎ' পত্রিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।

১০। কমরআলি (পণ্ডিত)।

ইনিও অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। তাঁহার গীতগুলির রচনা প্রণালী কেমন অদ্ভুত বলিয়া আমাদের তত ভাল লাগে না। তথাপি, ইহাঁকে নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব কবির শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাঁর নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানান্তর্গত কোন গ্রামে হইবে। পরে সন্ধান করিয়া জীবনী দিবার বাসনা রহিল।

কাপি—ছন্দ বিরহ।

শ্যাম বিনে অন্ধকার আমার হৈয়াছে বৃন্দাবন।
দূতী গো, কোথায় গেল মদন-মোহন॥ ধু।
মথুরাতে রৈল হরি পাইয়া গোপিনীগণ।
ছাড়ি গেল প্রাণনাথ আর আইসে না বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে বাঁশীর রব শুনি না শ্রবণে।
বাঁকারূপ শ্যামের আর দেখিনা চান্দবদন॥
শ্রীকমরালী কহে প্যারি ভাব না এখন।
তরুমূলে নদীর কুলে ঐ দেখ বংশীবদন॥ ১। ৩৩।

কাপি।

কোথা গেলে কালাচান্দের দেখা পাইব।
না দেখিলে দিব * চরণে প্রাণে মরিব॥
ওরে আমি কুলকামিনী,
কালাচান্দের ভাবে হৈলাম তাপের তাপিনী;
অবিরত দহে তনু মদনভাবে।

* দিব—দিব্য?

আমি নারী ছিলাম অবলা,
মোরে পরাধীনী করি গেল ঐ চিকন কালা,
আরে যোগিনীর বেশে আমি নগর ভ্রমিব ॥
বুঝি সে বর নাগর;
কুবুজার প্রেমের ভাবে মথুরা নগর ;
কৃষ্ণ নামটি প্রভাবেতে প্রাণি রাখিব ॥
আরে বৃকভানু রাজকুমারী,
কৃষ্ণলাগি ভাবিও না, অগো কিশোরী,
শ্রীকমরআলি কয় প্যারি,
ব্রজের মাধব আসিব ॥ ২। ৩৪।

কাপি।

ও সই করি হাউসে * পিরীতি,
শরীরে না সয়রে দুর্গতি ॥ ধু।
না বুঝি কালার সনে করিলাম পিরীতি।
রাত্রি দিনে চিন্তা মনে হৈব আমার কোন্ গতি ॥
সন্ধ্যাকালে শুতিলে হয় রাতের নিশি (?)।
শয়নে না ধরে নিদ্রা মোহন বাঁশী ফুকে নিতি ॥
নিশি দিশি কালাচান্দে বাজাএ মোহন বাঁশী।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী আইস রাধে শ্রীমতী ॥
শ্রীকমরালী কহে শুন রসিক যুবতী। †
সঙ্গে মিলি কর কেলি সুখে জনম যাউক বিতি ॥ ৩। ৩৫।

প্রভাত।

বড় কঠিন তোর হিয়া প্রাণের বন্ধুরে
তুই বড় বিনোদিয়া ॥ ধু।
তুই বর বিনোদিয়া, নিত্য নিত্য আসিয়া,
কি টোনা করিলি মোরে।
ঘঠে না রয় মন, সদা প্রাণি উচাটন,
কেমনে পাসরিমু তোরে ॥

* হাউসে—সাধে।
† বিতি—গলিয়া, গত হইয়া।

তুই বন্ধের প্রেম জ্বালা, সদায় শরীর কালা,
কৈমু মনের দুঃখ কারে।
মুই অভাগিনী, ত্রিতাপের তাপিনী
রহিতে না পারম্ ঘরে।
কলঙ্কিনী নারী, ঘোষে জগৎ ভরি,
ননদী বোলে বিপরীত।
লাগাই প্রেমের ফাঁসী হস্তে রাখিছ রশি,
সদায় খিছ নারীর চিত॥
শ্রীকমরালীর বাণী, শুন ওহে সুবদনী,
পুরুষের কঠিন হিয়া;
মধু খাইয়া গেলে, পুনি না আইসে ফুলে
জাতি কুল যায় ডুবিয়া॥ ৪। ৩৬।

ক্রমশঃ।

শ্রীআবদুল করিম।

মীরজাফর খাঁ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্লাইভ বিদ্রোহত্রয়ের শান্তি করিলেন কিন্তু মীরজাফরের অদৃষ্টদোষে পুনরায় একটী নূতন অশান্তির উদয় হইল—বাঙ্গলার প্রান্তভাগে এক নূতন শত্রু উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্য দিল্লীশ্বরের পুত্র সাহ আলম পিতার সহিত বিবাদ পূর্ব্বক এলাহাবাদ ও অযোধ্যার নবাবের সহিত করিয়া পিতার অনুমতি ব্যতীত বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে বিহারদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত এবং ক্লাইভকে এই মর্ম্মে একপত্র লেখেন যে, "যদি আপনি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে ক্রমশঃ এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিব।" ক্লাইভ তদুত্তরে প্রকাশ করেন যে, "মীরজাফর আমার অপরিত্যাজ্য।" ইত্যবসরে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরও ক্লাইভের নিকট এইরূপ এক অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন যে, "তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে দেখিতে পাইলে ধৃত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া

দিবে।” রাজকোষের অর্থাভাব প্রযুক্ত বেতন না পাওয়ায়, সৈন্যগণ নবাবের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই কারণ মীরজাফর বুঝিলেন যে,এসকল সৈন্য লইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের উপায় নাই। বর্ত্তমান বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য অগত্যা তাঁহার বিপদের বন্ধু ক্লাইভের নিকট পুনরায় সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ক্লাইভ ১৭৫৮ খৃঃ পাটনা যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই এ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। রাজপুত্রও এলাহাবাদের সুবাদার নয় দিন কাল পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ স্থান তাঁহাদের অধিকৃত হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজদের আগমন ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে অযোধ্যার সুবাদার, এলাহাবাদের সুবাদারের রাজধানী হস্তগত করিয়াছেন, এই উভয় সংবাদ অবগত হইয়া এলাহাবাদের সুবাদার সাহ্ আলমের নিকট বিদায় লইয়া নিজরাজ্য রক্ষার্থ ব্যস্ত হইলেন। সাহ আলমের সৈন্যগণ অচিরে তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তাঁহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কেবল মাত্র ৩০০ শত লোক তাঁহার নিকট রহিল। ক্রমশঃ রাজপুত্র এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন যে, অবশেষে তাঁহাকে ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থ লোক প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন যে, ক্লাইভের নিকট হইতে তিনি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। এবম্প্রকারে মীর্জাফর উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ক্লাইভের ‘ওমরা’ উপাধি এবং ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতার জমীদারীর রাজস্ব বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন।

এই ঘটনা সমূহের অল্পকাল পরেই মীর্জাফর, ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ কলিকাতায় গমন করেন। তথায় ক্লাইভও নবাবের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করেন। কলিকাতায় নবাবের অবস্থিতিকালে ওলন্দাজদিগের সাত খানি যুদ্ধজাহাজ পঞ্চদশ শত সৈন্য পরিপূর্ণ হইয়া নদীমুখে নঙ্গর করিল। অচিরে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, নবাবের অনুমতি ক্রমেই উক্ত জাহাজ সমূহ উপনীত হইয়াছে। মীর্জাফর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ইংরাজগণকে শাসন করিতে সমর্থ, এইরূপ একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত চুচুড়ায় ওলন্দাজগণের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় জনৈক বণিকের* মধ্যস্থতায় এই সকল পরামর্শ স্থিরীকৃত হয়।

* ইহাঁর নাম খোজাওয়াজিদ। তিনি আলিবর্দ্দীখাঁর নিকট হইতে যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি নবাবদরবার হইতে “ফখরল তোজ্জার” বা বণিক গৌরব

ওলন্দাজ সৈন্যগণের উপস্থিতিতে ক্লাইভ মহাশঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন। সে সময় ইংরেজ ও ওলন্দাজ পরস্পর সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং ইংরেজ পক্ষের ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ওলন্দাজগণের সৈন্য সংখ্যার একতৃতীয়াংশের অনধিক ছিল। যাহা হউক, ক্লাইভ কোন ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। তিনি নিজ প্রকৃতিসিদ্ধ উদ্যম ও নির্ভীকতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গলায় ফরাসীগণের স্বার্থে আঘাত প্রদান করিয়া ক্লাইভ, ওলন্দাজদের প্রভাব লোপের জন্য স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। ক্লাইব নবাবকে বলিলেন, "আপনি সত্বর ওলন্দাজী সৈন্যগণকে এস্থান ত্যাগের অনুমতি প্রদান করুন।" তদুত্তরে নবাব বলিলেন, "আমি হুগলী যাইব এবং স্বয়ং এবিষয়ের নিষ্পত্তি করিব।" অতঃপর নবাব হুগলী পৌছিয়া ক্লাইভকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিলেন যে, "আমি ওলন্দাজদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি। জাহাজগমনের সময় উপনীত হইলেই অচিরে ওলন্দাজদিগের সমস্ত জাহাজ এস্থান পরিত্যাগ করিবে।"

ক্লাইভ অনায়াসেই নবাবের চতুরতা প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উক্ত জাহাজ সমূহ যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারে তদ্বিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণস্থ টানার দুর্গ দৃঢ়ীকরণে যত্নবান এবং প্রথমে যুদ্ধে অগ্রসর না হইবার জন্যও মনে মনে স্থিরসংকল্প হইয়াছিলেন। ওলান্দাজেরা দুর্গের নিকট আগমন পূর্ব্বক সত্বর দুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। তৎপর ওলন্দাজদের ৭ শত ইউরোপীয় ও ৮ শত মালয় সৈন্য জাহাজ হইতে নামিয়া স্থলপথে চুচুড়ারদিকে গঙ্গার পশ্চিম উপকুল দিয়া গমন করিতে লাগিল। চতুর ক্লাইভ ইতঃপূর্ব্বেই ওলন্দাজদিগের

উপাধি প্রাপ্ত হন ও লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছিলেন এবং এরূপ ধনী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সংসারে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইত। এক সময়ে খোজাওয়াজিদ নবাবকে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা নজরানা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি মুর্শিদাবাদবাসী ফরাসীদের এজেন্ট ছিলেন। কিন্তু চন্দননগর অবরোধে তাঁহাদের আশা নির্মূল হইলে ইংরেজ পক্ষে গমন করেন। সিরাজদ্দোলা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই দুর্ভাগ্য সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত তিনিও প্রধান উদ্যোগী হইয়া ইংরেজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবিপ্লবের পর তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজদের নিকট হইতে তাঁহার আশাভরসা সফল হইবার নহে। সেই কারণে তিনি বাঙ্গালায় ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ জন্য বহু সংখ্যক ওলন্দাজ সৈন্য আনয়নার্থ এসময় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

অভিপ্রায় অবগত হইয়া চুচুড়া ও চন্দননগর এই উভয় স্থানের মধ্যভাগে উপস্থিত থাকিবার জন্য কর্ণেল ফোর্ডকে কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ চুচুড়ার দুই মাইল দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিল।

ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যে সন্ধি আছে, একথা ফোর্ড সাহেবও জ্ঞাত ছিলেন, এজন্য একেবারে ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে স্পষ্ট অনুমতি পত্রের জন্য মন্ত্রীসভায় এক পত্র লিখিলেন। ক্লাইভ তাস-ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে ফোর্ডের সেই পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। ক্লাইভ ক্রীড়াস্থল পরিত্যাগ না করিয়া পেন্সিল দ্বারা এইরূপ উত্তর লিখিয়া দিলেন যে—

"বন্ধু ফোর্ড! অচিরে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ কর, আগামী কল্য আমি তোমার নিকট মন্ত্রীসভার অনুমতি পত্র প্রেরণ করিব।" ক্লাইভের এই লিপি করগত হইবামাত্রই ফোর্ড ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শত্রুদলকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। ওলন্দাজদিগের যে সকল যুদ্ধজাহাজ নদী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল জাহাজও সেই সময়ে ইংরেজদের হস্তগত হইল এবং অবশেষে ওলন্দাজদের একটী মহোদ্যোগ সামান্য ধূমরাশিতে পর্য্যবসিত হইল। এই যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র নবাবতনয় মীরণ আনুমানিক ৬।৭ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে চুচুড়ায় উপনীত হইলেন। এবং ইংরেজদের সহিত একযোগে ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণেল ফোর্ড যুদ্ধ সমাপ্তির পরই চুচুড়া অবরোধ করিয়াছিলেন। অচিরে উক্ত স্থান ইংরেজদের হস্তগত হইত কিন্তু ওলন্দাজেরা ক্লাইভের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি চুচুড়ার অধিকার পরিত্যাগ করিলেন এবং যুদ্ধের সমুদায় ব্যয় প্রদানে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের জাহাজ সমূহও পরিত্যাগ করিলেন।

এই সকল ঘটনার অল্পকাল পরেই ১৭৬০ খৃঃ ক্লাইভ অর্থ ও যশোরাশির অধিকারী হইয়া ও ভান্সিটার্টকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, কিন্তু তিন বৎসরব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল।

অতঃপর দেশে শান্তি সুদূরপরাহত হইয়াছিল। বৃদ্ধ নবাব মীর্জাফর রাজ্যের শাসনক্ষমতা পুত্র মীরণের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু মীরণ রাজকর্ম্মচারীবর্গের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার এবং প্রজাগণকে অত্যন্ত উৎ-

পীড়ন করিয়া সাধারণের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; এমন কি তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তৎকালে ইংরাজবর্ণিত সিরাজদ্দোলার দুর্বৃত্ততাও দেশবাসী বিস্মৃত হইয়াছিল। তিনি দুইজন কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করেন; আলিবর্দ্দির নিরপরাধিনী বিধবা কন্যা ঘেসেটী বেগম ও আমীনা বেগমদ্বয়কে নৌকারোহণ করাইয়া নিমজ্জনের অনুমতি প্রদান করেন। সুখের বিষয়, দুরাচার অল্প দিন মধ্যেই ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করে। মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত বেগমদ্বয় মৃত্যুকালে "বজ্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে" এই বলিয়া মীরণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

এদিকে দিল্লীশ্বরের পুত্র সাহ আলম জনসাধারণের এবম্বিধ অসন্তোষে সাহসী হইয়া দ্বিতীয়বার বিহার আক্রমণার্থ সচেষ্ট হইলেন এবং পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা কাদিম হোসেন খাঁও স্বীয় সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহার তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সম্রাটতনয় যেই কর্ম্মনাশা অতিক্রম করিয়া বিহারের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি শ্রবণ করিলেন যে, সম্রাটের নিষ্ঠুর মন্ত্রী ইমাদ-উল্‌-মূলক সম্রাটকে হত্যা করিয়াছে (পিতার মৃত্যুর পর সাহ আলম ভারতের অধীশ্বর ও অযোধ্যার নবাব তাঁহার মন্ত্রীত্বে নিয়োজিত হন। সাহ আলম হীনবল ও প্রজাহীন অবস্থায় নাম মাত্র সম্রাট ছিলেন, অধিক কি, তাঁহার রাজধানীও শত্রুর হস্তে ছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যের জনৈক পলাতক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত ছিলেন মাত্র)। সম্রাট পাটনার দিকে অগ্রসর হইলে সাহসী রামনারায়ণ উক্ত নগর রক্ষার্থ যত্নবান হইয়া মুর্শিদাবাদে ইংরাজ সৈন্যের ত্বরিত সাহায্যার্থ বিনয় সহকারে পত্র লিখিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎকালীক ইংরাজাধ্যক্ষ কর্ণেল কলিয়ড্‌ স্বীয় অধীনস্থ ইংরাজসৈন্য এবং মীরণ ও তদানুসঙ্গিক নবাব সৈন্য সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ পাটনা যাত্রা করিলেন। অবশেষে কাপ্তেন নক্সের কৌশলে সম্রাট পরাজিত হন। এইরূপে ইংরাজের বাহুবল ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত-হইতে থাকে। অতঃপর মীরণকে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন, ১৮৬০ সালের ২ জুলাই রজনী সমাগত হইল, আকাশ-মণ্ডল ঘনতমসাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি পাতের সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল, মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভা বহির্গত হইয়া জীবগণের দর্শনক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে লাগিল; মীরণ স্বীয় পটমণ্ডপে উপবেশন করিয়া একান্তঃকরণে

গল্প শ্রবণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তথায় সহসা একটী অশনিসম্পাত হইল। তৎক্ষণাৎ একবিংশবর্ষীয় যুবক মীরণ তাঁহার দুইজন ভৃত্যসহ প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।* রাজমহলে মীরণের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। অদ্যাপি মীরণের সমাধি রাজমহলের সরিফা বাজার নামক স্থানে জঙ্গলময় একটী বাটীতে অযত্নরক্ষিত হইয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পুত্রের অকালমৃত্যুতে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর যারপর নাই শোকাকুল হইলেন, রাজ্যেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিল। নবাবসৈন্যগণ তাহাদের পূর্ব্ব প্রাপ্য বেতন লাভের জন্য খড়্গহস্তে রাজপুরী বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল এবং অবশেষে মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম তাহাদের প্রাপ্য বেতন দানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহারা নিরস্ত হইল। অতঃপর মীরজাফর কার্য্যবশতঃ নিজ জামাতাকে দূতরূপে কলিকাতার ইংরাজদরবারে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস নামক দুইজন ইংরাজ, কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মীরকাশিমের বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। অচিরে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ইংরাজ কর্ম্মচারীবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিল। পুনরায় মীরকাশিম নবাবাদেশে কলিকাতার ইংরাজদরবারে গমন করিলে, তাঁহার কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট ও মীরজাফরের প্রতি রুষ্ট হইয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে প্রদেশত্রয়ের (বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার) সহকারী নবাবের (ডেপুটী শজিম) পদ প্রদানে মনস্থ করেন। ইহাতে মীরকাশিমের কোনই আপত্তি রহিল না। কিন্তু ইংরাজেরা নবাব মীরজাফরের সমীপে এই কথা উত্থাপিত করিলে বৃদ্ধনবাব ইহাতে সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ইংরাজদের আদেশক্রমে ইউরোপীয় সৈন্যেরা নবাবপুরী অধিকারে উদ্যত হইলে, নবাব বাধ্য হইয়া এবিষয়ে সম্মতি দান করিলেন। নবাবের ইচ্ছানুসারে কলিকাতা বা মুরশিদাবাদ যে কোন স্থানেই হউক তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা হইল। নবাব চিরপরিচিত মসনদের অন্তরালে কাপুরুষের ন্যায় অবস্থিতি করিতে নিতান্তই লজ্জাবোধ করিয়া কলিকাতাবাসে মনস্থ করিলেন। মীরজাফর যথাকালে

* শুনা যায়, তৎকালে মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, "মীরণের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, পুণ্যশ্লোক বৃটীশ পুরুষগণ নাকি তাহাকে কৌশল পূর্ব্বক নিহত করিয়াছিলেন।" (মুর্শিদাবাদ কাহিনী ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভূতপূর্ব্ব নবাবগণের সঞ্চিত বহুমূল্য রত্নরাজী অপহরণ পূর্ব্বক প্রিয়তমা পত্নী মণিবেগমকে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

(মীরজাফরের জীবনের অবশিষ্টাংশ তাঁহার দ্বিতীয়বারের শাসন সময়ে অর্থাৎ মীরকাশিমের শাসনকাল বর্ণনার পর লিখিত হইবে।)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জাল প্রতাপচাঁদ। (৫)

জাল রাজা অনুচরগণের সহিত শ্রীখণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। রামসুন্দর তর্কবাগীশের পুত্র গৌরকিশোরও তাঁহার একজন ভক্ত হইলেন। তবে গ্রামে দুষ্টলোকের অভাব ছিল না। তাঁহারা জাল রাজাকে জুয়াচোর বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি অনেক অত্যাচার করিল। তিনি কিন্তু নীরবে সকল সহ্য করিলেন। শ্রীখণ্ড হইতে তিনি যখন বর্দ্ধমান যাত্রা করেন, তখন এই সকল লোক তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ক্রটী করেন নাই। যাহা হউক, আট দিবস শ্রীখণ্ডে বাস করিয়া জাল রাজা বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

বর্দ্ধমান যাত্রা।

অষ্টম দিবস রাত্রি বসি একাসনে।
বিরূপাক্ষে কহেন রূপ মধুর বচনে॥
প্রভাতে চলিতে হইবে পুরী বর্দ্ধমান।
বুঝিয়া করহ যেবা উচিত বিধান॥
শিবিকা বাহন বাবু করিয়া তৈনাৎ।
জোড় করে নিবেদন করেন সাক্ষাৎ॥
প্রভাত সময় রূপ করেন গমন।
কি মনে মন্ত্রণা কেবা জানিবে এমন॥
শিবিকা বাহনে যবে করিলেন যাত্রা।
দৈত্য দানব কুলে পাই এই বার্ত্তা॥
করতালি দিয়া সবে ধাইল ছাওয়াল।
কেহ কয় কেশ কাটি করহ বেহাল॥*

* কেশ কাটার কথায় মনে হইল, যখন জাল রাজা বর্দ্ধমান যাইতে উদ্যত হন, তখন

ইচ্ছাতে সহায় কয়েকজন মুসলমান।
শিবিকা ঘেরিয়া যায় পশ্চিম সরাণ॥
কান্দর পার করি তারা ফিরে আইসে ঘর
তাহা সবার প্রতি তুষ্ট জগৎ ঈশ্বর॥
কিঞ্চিৎ ভুলায় যেবা ঈশ্বরের কর্ম্ম।
নীচ সে উত্তম হয় আছে এই ধর্ম্ম॥ *
সে দিবস করি বাস পোসলা গ্রামেতে।
শিবিকা বাহন প্রতি দয়া করি পথে॥
উগ্রক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব নাম নফর দত্ত।
তারে কৃপা করিলেন জানিয়া মহত্ব॥
সেবার তৈনাৎ সেই রহে রজনীতে।
তুষ্ট হয়ে চলিলেন রজনী প্রভাতে॥
খড়ী নদী দক্ষিণে করজনা নামে গ্রাম।
তথি মধ্যে বসত রামকৃষ্ণ ধরে নাম॥
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি কর্ম্ম চারি কর্ম্ম তার।
ভক্তি করি লইয়া যায় গৃহে আপনার॥
স্বহস্তে রন্ধন করি করাইল ভোজন।
কতেক সৌভাগ্য তার কে করে বর্ণন॥

*   *   *

গোলাপ বাগানে উপস্থিত।

তারে কৃপা করি হরি প্রভাত সময়।
বর্দ্ধমানে গোলাপাক্ষ বাগানে উদয়॥
শিবিকা বাহন তথি করেন বিদায়।
কাননরক্ষক মালি আসিয়া যোগায়॥
আকৃতি প্রকৃতি দেখি ছোট মহারাজ।
আকুল অন্তর মত্ত বিসরিল কাজ॥

* রামসুন্দর তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, আপনার বিরহে কেমন করিয়া থাকিব"? প্রভু নিজের চুল খানিকটা কাটিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার স্মারক এই চুল রাখিয়া দাও।" তর্কবাগীশ মহাশয় সেই চুল নৈষধ কাব্য মধ্যে রাখিয়া দেন, এবং ছাত্রদের পাড়াইবার সময় তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া অকুল হইতেন। জাল রাজার মোহিনী শক্তি ছিল।

রঙ্গবেরা ঘর মধ্যে যথা রত্ন শৃঙ্গ।
দ্বাররুদ্ধ ঘুচাইয়া বৈসেন নরসিংহ।
মধুমোদক কুলে জন্ম নাম হারাধন।
নিকটে বসত সেই করে দরশন॥
ছোট মহারাজ বলি মনেতে জানিয়া।
মাতা পিতা বর্ত্তমান কহিল আসিয়া॥
শুনি তার মাতা পিতা উর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
মৃত্যুদেহে প্রাণ যেন দেখা দিল তায়॥
দৃষ্ট মাত্রে পূর্ব্ব সূত্রে করি পরিচয়।
ভক্তি যোগে প্রাণপণে জোড় করে কয়॥
আজ্ঞা হয় সেবার আয়োজন কিছু করি।
যে কিঞ্চিৎ উপকরণ আনিবারে পারি॥
দয়ার নিধান দেন নিদান বিধান।
তব বাঞ্ছা যেবা হয় কর সমাধান॥
আম্র জাম কাঁঠাল নারিকেল অনুপম।
বদরি দাড়িম্ব আদি কত লব নাম॥
মেওয়া আদি নানা জাতি ফল ফুল আর।
সন্দেশ পক্কান্ন কিছু করিল যোগাড়॥
সকল সামগ্রী লয়ে যোগাইল ডালি।
রাজঅন্তঃপুরে যেয়ে জানাইল মালি॥
শুনিয়া ব্যগ্রতা বড় বধূ ঠাকুরাণী।
লিখি পাতি ভবগবতী দাসী ডাকি আনি॥
যে জন সন্ন্যাসী গোলাপবাগ মধ্যে বসি।
সে জনার করে পত্র দিও লো রূপসী॥
নজরে নজর দিবে বচনে বচন।
প্রত্যুত্তর শুনি শীঘ্র কহ বিবরণ॥
লয়ে পাতি ভগবতী দাসী চলে রঙ্গে।
দাসীর দাসী প্রতিবাসী তারা দুইজন সঙ্গে।
নানা যোগ রাজভোগ উপযুক্ত দ্রব্য।
কেহ ডালি মাথে তুলি হাতে করি গব্য॥

অবিবাদ মনাহ্লাদ সন্ন্যাসী নিকটে।
রাখি গব্য নানা দ্রব্য রহি করপুটে॥
হেরিরূপ রসকূপ পুলকিত অঙ্গ।
সবিশেষ হৃষীকেশ করেন প্রসঙ্গ॥
সচকিতে বচনেতে বুঝিয়া ইঙ্গিত।
অন্দরেতে জানাইতে চলিল ত্বরিত॥
শুনি বাক্য মানি ঐক্য বধূঠাকুরাণী।
অন্তরে অন্তর নাই মনে মনে জানি॥
পরাণের ভয়ে প্রাণ কম্পিত সঘনে।
ফুকারী কহিতে নিষেধ বিধির বিধানে॥
মনে মনে সানন্দিতা সতত অন্তর।
মেঘে ঢাকা প্রকাশিল রাকা সুধাকর॥
সদা শুভাশুভ জানাইবা ভগবতী।
নিভৃতে নিযুক্ত করি রাখেন সম্প্রতি॥
যথায় সন্ন্যাসী তথা সহ সঙ্গে ফিরি।
দেখি কোথা কোন লীলা প্রকাশেন হরি॥

পরাণ বাবুর ভয় ও মন্ত্রণা।

তদন্তরে কহি শুন লীলার তরঙ্গ।
শুনিল পরাণ বাবু এসব প্রসঙ্গ॥
ভূপতি বৈকুণ্ঠবাসী সহজে নির্ভয়।
রাজ্যাধিকারী যে হইয়া সর্ব্বময়॥
প্রতাপচন্দ্র জীবিত মান জানি মনে মনে।
বিয়োগ বৃত্তান্ত কথা ছিল বিস্মরণে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে আসি দিবেন দেখা।
কখন ছিল না মনে এমত আশঙ্কা॥
প্রতাপচন্দ্র আগমন শুনি অকস্মাৎ।
মুখে বাক্রুদ্ধ বুকে পড়ে বজ্রাঘাত॥
যোষিতাকৃতি সাজে শিবিকা বাহনে।
সন্ন্যাসী নিকটে যায় দেখিবার মনে॥

দৃষ্টমাত্র চিনিয়া না চিনে দুরাচার।
মালীরে নিগ্রহ করে করি অহঙ্কার॥
বিভোগেতে উন্মত্ত শুন সে বৃত্তান্ত।
ত জশচন্দ্রে বশীকরণ করিয়া নিতান্ত॥
নিজপুত্রে পোষ্যপুত্র ঘঠাইয়া ঘটন।
অন্দর বাহিরবাসী সুখেতে মগন॥
মানমত্ত মাতোয়ার আর কারে ডর।
তৃণবৎ মন্যতে জগৎ কে আছে সোসর॥
এত মত গর্ব্ব মনে থর্ব্ব নাহি হয়।
বধিতে সন্ন্যাসী প্রাণ নাহিক সংশয়॥
এই প্রতাপচন্দ্র যদি দশজনে কয়।
কহিতে কহিতে মিথ্যা কেহ সত্য হয়॥
সত্য মিথ্যা করিবারে মন্ত্রণা অপার।
বলে ছলে অর্থব্যয় করিব সংহার॥
বিলাত পর্য্যন্ত সীমা করি আপনার।
সহায় ইংলণ্ডাধিপতির অধিকার॥
অর্থ সামর্থ্য হীন হইব যখন।
জানিব নিশ্চয় প্রতাপচন্দ্র আগমন॥
অপারগে বিবেচনা করিব তখন।
ভবিষ্যৎ ভাবনার কোন প্রয়োজন॥
এমত বিচার মনে করি আরবার।
অথল অসহায় জনে করিব সংহার।
দেখিতে ফকির সাজ সহজে ফকির।
না জানে নীরদ ঝাঁপা আছয়ে মিহির।

গোলাপবাগ হইতে দূরীকরণ।

পরাণ বাবু,

পুত্ররাস বাবু, তারে কহিল কর্কশ।
সন্ন্যাসীরে দূর কর করিয়া সাহস॥

পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি রাম্বু বাবু যায়।
গতমাত্র প্রতাপচন্দ্র রূপ হেরি তায়॥
কত না করুণা করি যোড় করে কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়॥
সিংহের আসনে কি শৃগাল শোভা পায়।
নিজাসনে বসিলে মনের দুঃখ যায়॥
হাসিয়া সন্ন্যাসী কহেন শুনিয়া বচন।
তোমার যেমন মন আমার তেমন॥
অলক্ষ সাহা ফকির আমি দেখ না আমায়
কেন হেন বল আমি আছি নিরাশ্রয়॥
তব পিতৃ অনুমতি হয় যদি জানি।
জিজ্ঞাসি আসিয়া কহ তবে কথা মানি॥
শ্রুতমাত্র রাম্বুবাবু পিতার নিকটে।
দ্রুতগতি চলি যায় কহে করপুটে॥
যথার্থ প্রতাপচন্দ্র দেখিল নয়নে।
করিয়া গৌরব আনি, এই লয় মনে॥
এত কথা যেই মাত্র কহিল সন্তান।
ক্রোধে কহে দুর্ব্বচন করিয়া বাখান॥
পুত্র যোগ্য নহরে গোঁয়াড় সম ভাব।
হিতাহিত কিছুই না জানিস লাভালাভ॥
হিতে বিপরীত শুনি অবাক্ সন্তান।
বিচারিল মনে মনে পিতা যে অজ্ঞান॥
ইহা হইতে বিশ্বাসঘাতক নাহি আর।
ভাণ্ডিয়া পরের ধনে যার অধিকার॥
পিতার অসত্য দেখি সত্যের উদয়।
অহিংসিত হইয়া বাস ত্যজিয়া আলয়॥ *

* সঞ্জীব বাবু বলেন, কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মহুরী পরাণ বাবুকে এইরূপ কথা বলেন। "কুঞ্জবিহারী এই অপরাধের নিমিত্ত পদচ্যুত ও রাজবাটি হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন।"

সক্রোধিত পরাণের পরাণ আকুল।
ইতস্তত: করিতে হইল মহাভুল॥
সহরে দারগারে করিল ইঙ্গিত।
ধনলোভে সন্ন্যাসী ঘাতনে উপস্থিত॥
উপনীত যেই মাত্র সন্ন্যাসী গোচরে।
তার প্রতি কটাক্ষ করেন নরবর॥
হেরিতে হিল্লোল অঙ্গ পুলকিত হয়।
কুরনীশ করিয়া কত যোড় করে কয়॥
ছোট মহারাজ ভিন্ন হেন চিহ্ন কার।
অনাশ্রিত অনাদরে থাকা নহে আর॥
এতেক ইঙ্গিত ভাষ ইঙ্গিতে জানিয়া
চলিলেন গোলাপাক্ষ কানন ত্যজিয়া।
আসে পথে হারাধন মদকের মাতা।
অধীনী বধিয়া মহারাজ যাবেন কোথা॥
ঈষৎ হাসিয়া তারে করেন প্রবোধ।
একখেলা খেলাইতে আছে অনুরোধ॥
ঝাড়িখণ্ড পথ হইতে ফিরিয়া আসিব।
নিরাপদে সকলের সাধ পূরাইব।

কাঞ্চননগরে গমন।

কাঞ্চননগর পথে করিলেন গমন।
নবগঞ্জে বাঁকা নদীর পুলে আরোহণ॥
পূর্ব্বে যেন সেতুবন্ধ রাবণ কারণ।
করি বঙ্কেশ্বরী বন্ধ বিপত্তিতারণ॥
অনায়াসে দুঃখী লোক পাবে পারাপার।
সেতুবন্ধ হইতে অধিক উপকার॥
নরমাঝে নবকীর্ত্তি লোক জানাইতে।
অখ্যাতি রহিবে পুনঃ জানি বা জগতে।
তথা হইতে কাঞ্চননগরে উপনীত।
জনরব লোক মাঝে হয় বিপরীত॥

বাল্য যুবা কি প্রবীণ নারী কুলবতী।
ত্যজি কুল করি ভুল যোগায় আরতি ॥
রূপদরশনে মনোল্লাস সবাকার।
পূর্ব্বে যেন বৃন্দাবনে হয় গোপিকার ॥

* * * * * *

ছোট মহারাজ আগমন বেণু রব।
শ্রুতমাত্র অস্ত ব্যস্ত ত্বরান্বিত সব ॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরবাসী যত।
অন্ধবধিবাসি অতি ব্যগ্র চিত ॥
স্বদেশী বিদেশী যত কত বা কহিব।
দিবা নিশি কোলাহল মহা মহোৎসব ॥
দরশন করণে লোক সবে আনন্দিত।
অর্দ্ধ উদয় যোগ যেন প্রকাশিত ॥
সাবেক সর্ব্বক্ষণের চেনা পরিচিত জন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে যাই আগে করি দরশন ॥
কাঞ্চননগরের জমিদার কমল রায়।
অট্টালিকা বাসা ঘর বসি আছেন তায় ॥
পূর্ব্ব পরিচিত লোক দৃষ্ট মাত্র চিনি।
ছোট মহারাজ বাহাদুর বটেন ইনি ॥
কেহ কেহ সন্দেহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসয়।
কে তুমি কি জন্য হেথা থাকেন হেথায় ॥
সত্য পরিচয় পাইলে যায় মনোদুঃখ।
মনের সন্দেহ দূর পাই বড় সুখ ॥
অজ্ঞাতবাসের বাকি আর সপ্ত মাস।
তে কারণে পরিচয় কহেন উপহাস ॥
প্রতাপচন্দ্র নহি আমি অলক্ষ সাহা ফকির
ফিরিতেছি সসাগর হইয়া অস্থির ॥
নিজ জন তপাসিয়া ফিরি ঘরে ঘরে।
স্বজন পিরিতি জন্য তারে বাসি পর ॥

সে জনার শান্তি হেতু ব্যস্ত অতিশয়।
অবিধির পর বিধি এই পরিচয়॥
এ কথার প্রত্যুত্তর কেহ না কহিল।
সত্য প্রতাপচন্দ্র বলি অন্তরে জানিল॥
দরশন করণে লোক প্রেমেতে পুলক।
ঐহিকের মায়ামোহ পরিহরি শোক॥
নিরখিতে চাঁদমুখ সদা সানন্দিত।
গৃহকার্য্য পরিত্যজ্য করি আচম্বিত॥
কেহ কারে দেখে না করয়ে যাতায়াত।
পাসরে আপনা হেরি জগতের নাথ॥
কে জানে কেমন ভাব আছে মনে মন।
প্রকাশে চেতন পাবে এবে অচেতন॥

মেয়েলী মনসা।

হিন্দুর দেব-দেবী প্রতি মাসেই সাময়িক উপচার দ্বারা অর্চ্চিত হন, ইহা হিন্দুর ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু মাসে মাসে, পক্ষে পক্ষে দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন, হিন্দুপত্নীও এরূপ অর্চ্চনায় পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহারা যে সমস্ত কঠিন ব্রত পালন করেন, অন্য জাতির পক্ষে তাহা বিস্ময়কর। বালিকা বয়স হইতেই হিন্দু রমণী ব্রতচারিণী, বালক বয়স হইতেই হিন্দুগণ কঠিন সংযমে অভ্যস্ত! কেন না, তাঁহারা ধর্ম্মকে প্রাণের ন্যায় ভালবাসেন। ঈশ্বরসান্নিধ্য অর্থাৎ মুক্তি হিন্দুর কাম্য। ধর্ম্মে মুক্তি আছে; ঈশ্বর-প্রীতি সম্পাদন দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়। তজ্জন্যই তাঁহারা নানা উপচারে, নানাবিধ বিধানে ঈশ্বরের পূজা করেন। এরূপ ঈশ্বর-প্রীতি অন্য ধর্ম্মে নাই।

মনসা পৌরাণিকী দেবী। মহাভারতে ইনি বাসুকীর কনিষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া বর্ণিতা। বংশ রক্ষার জন্য বাসুকী ইহাঁকে জরতকারু মুনির সহিত বিবাহ দেন। জরৎকারুর ঔরসে ইহাঁর গর্ভে আস্তিক নামে একটী পুত্র জন্মে। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে যখন সমগ্র নাগকুল ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছিল, তখন আস্তিক নাগবংশ রক্ষা করেন। সেই হইতে মনসা,

নাগমাতা এবং নাগাকুল ইহাঁর আজ্ঞাকারী। মনসাকে তুষ্ট করিতে পারিলেই নাগকুল সন্তুষ্ট থাকে। তজ্জন্য শ্রাবণে সর্পভয়ের আধিক্য হেতু, হিন্দু রমণীগণ ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ব্রতচারিণী অর্চ্চনা দিনে ইহাঁকে প্রদত্ত উপচার দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। অন্নাহার করেন না, নাগমাতার সন্তোষ উৎপাদনই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। পুরাণোদ্দিষ্টা মনসার সহিত আমার সম্বন্ধ নহে। হিন্দুরমণীর নিকটে মনসার ব্রতকথায় যে বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে। এই কল্পিত উপাখ্যান গদ্যেপদ্যে রচিত,—আমরা ঠাকুরমার নিকট হইতে অন্ততঃ এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপাখ্যান অতি সরল এবং সাধারণ বিশ্বাস ইহার ভিত্তি। অতিপ্রকৃত লীলা বর্ণনা যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সেই দেশের লেখক এই উপাখ্যান বিবৃতির সাহায্যে, অতি সহজেই যে তাহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিবরণ স্বরূপ প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এখন উপাখ্যানটী বিবৃত করিব।

কোনও গৃহস্থের ৭টী স্ত্রী। এক একটী বৎসর ৭ ভাগ করিয়া, প্রত্যেক স্ত্রী সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যেক স্ত্রীকে বৎসরে ৫২ দিন কাজ করিতে হইত, একজনের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অবশিষ্ট কয়েক জন আহার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কার্য্য করিতেন না। গৃহস্থ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন শ্রাবণের প্রাতে মৃদুমন্দ বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছিল। আকাশ মণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন। গৃহস্থপত্নীগণ একত্র বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছিলেন। পরে নিজ নিজ মনের ইচ্ছার আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমা বলিলেন ;—

"আজকের মত দিন হয়,
বাপ্ মায়ের বাড়ী হয়,
গরম ভাত খেয়ে শু'য়ে ঘুম যায়।"

অন্য জন বলিলেন ;—

আজকার মত দিন হয়,
বাপ্ মায়ের বাড়ী হয়,
ভাজা মাছ আর গরম ভাত খেয়ে শু'য়ে ঘুম যায়।

এইরূপ অন্যান্য সকলেই মনের কথা কহিলেন, কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠা কিছু বলিলেন না। তখন অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে ধরিলেন; "তাহাকে অন্ততঃ কিছু বলিতেই হইবে।" কনিষ্ঠার পিতৃলোকে কেহ ছিল না। সে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিবে? সুতরাং সে পূর্ব্ববৎ নীরব রহিল। সপত্নীগণ অভিমানিনী, বলিলেন; "আমরা বল্লেম আর পেলেম, তুই বলবি পাবিনে। মুখের কথা, মুখেই থাক্‌বে! মনের কথা মনেই লুক'বে!" তখন অগত্যা কনিষ্ঠা বলিলেন;—

"আজকার মত দিন হয়,
মা বাপের বাড়ী হয়,
পোড়া অখিল মাছ (?)* আর পান্তা ভাত খেয়ে শুয়ে ঘুম যায়।"

তাহার পর রমণীবৃন্দ স্নানে চলিলেন।

আড়াইরাজ, মুনিরাজ (সর্পদ্বয়) পৃথিবীতে পূজা লইতে আসিতেছিলেন; পথি মধ্যে দাবানলে সর্পযুগলের শরীর দগ্ধ হওয়ায় নিকটস্থ বৃষ্টি-সঞ্চিত কর্দ্দমাক্ত জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়া শরীরের জ্বালা নিবৃত্তি করিতেছিলেন। † এমন সময় গৃহস্থপত্নীগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্ষুদ্রকায় সর্পযুগলকে দেখিয়া সকলের মৎস্যভ্রম হইল। তখন প্রথমা কনিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; "দ্যাখ দ্যাখ ছোট বউ, তোর কথাই সত্যি হল। তুই যা বল্লি, তাই ফল্ল! এখন তোর অখিল মাছ ল'য়ে ঘরে চল।"

ছোট বউ দেখিয়া অবাক! কিন্তু হইলে কি হয়? সপত্নীগণের প্ররোচনায় স্নানান্তে সর্পযুগলকে সযত্নে বৃক্ষপত্রাবৃত করিয়া লইয়া বাটীতে আসিলেন। সবে তাঁহার হস্তে গৃহস্থালীর কর্ত্তৃত্ব আসিয়াছিল; সুতরাং রান্না ঘরে তাঁহার অধিকার। তিনি অগ্রে রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া, একটী মৃৎ পাত্রে ঢাকনি ঢাকা দিয়া অখিল মাছ (!!!) দুটীকে রাখিয়া দিলেন এবং বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে দগ্ধ শরীরের যন্ত্রণার উপশম হইলে সর্পযুগল পাত্রের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, ফণা বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিলেন। ঘটনা ক্রমে ছোট বউর দৃষ্টি সেদিক নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, তিনি যাহা মৎস্য মনে করিয়া আনিয়াছিলেন

* আমরা "অখিল" মৎস্যের অন্য নাম অবধারণ করিতে পারি নাই।

† পুরাণে অষ্ট নাগের উল্লেখ আছে। মনসা পূজার সঙ্গে তাহাদেরও পূজা হইয়া থাকে। তাহাদের নাম যথাক্রমে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ। ইহার মধ্যে আড়াইরাজ, মণিরাজ অনন্ত ও বাসুকি বলিয়া অনুমান হয়।

সে দুটী সর্প! সে সর্পও যা, তা নহে, অশেষ চিত্রালঙ্কৃত বিস্তৃত ফণা-শোভিত ভয়ঙ্কর বিষধর!

"ওমা! ওমা লোকে কি কবে।
সাপুড়ের মেয়ে, সাপুড়ের ঝি,
দেশে দেশে অখ্যাতি রটবে!
তোমরা বাপু কে?
দেশের জীব দেশে যাও!
আমায় খালাস দাও।
আমার মান বজায় থাক।"

তখন নাগদ্বয় বিপদাপন্ন! তাঁহাদের দগ্ধ যন্ত্রণা উপশমিত হইলেও গৃহে প্রত্যাগমনের ক্ষমতা বিলুপ্ত! সুতরাং বিনীত ভাবে ছোট বউকে বলিলেন,

"দেখ মানবীর বিটি * আমরা তোমার নষ্ট ক'রবোনা। দিন কত আমাদের এখানে থাক্‌তে দাও, একটু ভাল হলেই চ'লে যাব! তোমার যথাসাধ্য উপকার ক'রবো!"

ছোট বউ আর কিছু বলিলেন না। নাগদ্বয়ের কাতরোক্তিতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি নূতন ভাণ্ডে নূতন ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া, নাগযুগলকে সংগোপনে রাখিয়া দিলেন, এবং প্রতি দিন কাঁচা দুগ্ধ ও পাকা রম্ভা উভয়কে যোগাইতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নাগদ্বয় বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

এদিকে ছোট বউর নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরাইয়া আসিল। তখন তিনি নাগদ্বয়কে বলিলেন, "দেখ, আমার কাল শেষ হ'ল, এখন আমার সতীনের পালা। তোমাদিগকে দেখ্‌লে মেরে ফেলে দেবে। লোকে একটা কাণাকাণি ক'রবে। ব'লবে, সাপুড়ের মেয়ে, সাপুড়ের ঝি, গোপনে গোপনে সাপ পোষে! তোমরা দেশের জীব দেশে ফিরে যাও।" তখন সর্পদ্বয় অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মা মনসা সোণার খাটে গা,
রূপার খাটে পা দিয়ে ব'সে আছেন।
সোণার বাটায় পান খা'চ্চেন,

* বিটি—মেয়ে। মানবের বিটি—মানবের মেয়ে অর্থাৎ মানবী।

রূপার বাটায় পিক্ ফেলচেন,
শ্বেত চামরের বা হ’চ্চে !

এমন সময় আড়াইরাজ মুনিরাজ তথায় উপস্থিত হ’লেন।

মনসা অনেক দিন প্রিয়তম নাগযুগলের অদর্শনে দুঃখিতা ও চিন্তিতা ছিলেন; সহসা উভয়কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দস্রোত বহিল। তিনি তাঁহাদের এরূপ অযথা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উভয়ে আমূল সমুদয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন;

"মা! মানবের বিটির গুণের ধার শোধ দিতে হবে। আমারা তাকে এখানে আনুব!"

নাগ-মাতা অবাক!

"দেবে মানবে ঘর,
এমন ভাগ্য তার!
মাছ খায়, মিছে বলে। *
অনিত্য শরীর ধরে!

এ হ’ল নাগের পুরী! এখানে মানবীকে আন্‌লে, বাপু! বিপদ ঘটবে! দেবনামে কলঙ্ক রট্‌বে। অমন কথা ব’লোনা।"

নাগদ্বয়ও নাছোড়বন্দা! "তা হবে না মা, আমরা তাকে এখানে আন্‌বোই আন্‌বো!"

অগত্যা দেবীকে স্বীকার করিতে হইল। তখন নাগদ্বয় দেবীর আদেশ লইয়া, ছোট বউকে আনিবার জন্য পুনরায় গৃহস্থের আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। †

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

১। রাজর্ষিকুমার—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ভক্ত-প্রবর ধ্রুবের চরিত্র অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। ভক্তি ও করুণ রসে গ্রন্থখানিকে বড়ই উপাদেয় করিয়াছে। আমাদের এক বন্ধু এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকবার অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

---

* মনসা এক কথায় মানবের প্রকৃতির সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে এরূপ সর্টিফিকেট প্রাপ্ত জীব দেবলোকে স্থান পাইবার অযোগ্য। এই উপাখ্যান রচয়িতা বিশেষ সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই। লেখক—

† লেখকের শারিরীক অসুস্থতা প্রযুক্ত প্রস্তাব অসমাপ্ত রহিল। বীঃ সঃ।

২। অমিয়গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী বিরচিত। নানা বিষয়িণী কবিতায় এই গ্রন্থ খানি পরিপূর্ণ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর এই গ্রন্থের ভূমিকায় নগেন্দ্রবালার কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইঁহার রচনায় বিশেষতঃ পদ্য রচনায় কি এক মধুর আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে, তাহা কেবল হৃদয় সংবেদ্য ; ভাষায় উহা ব্যক্ত হইবার নহে। কবিতাতে ইনি ইঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। কবিতাগুলি পড়িলে বোধ হয় যে, সংগীতরাজ্যে বামাকণ্ঠের মাধুরী যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত, কবিতারাজ্যেও যেন বামাকণ্ঠের সেইরূপ বিশেষত্ব আছে। অতি সহজ সচরাচর প্রচলিত বাঙ্গালা কথা উচ্চ গভীর ভাব প্রকাশের কিরূপ উপযোগী, নগেন্দ্রবালার প্রতি কবিতাতেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সুলভ।" ইহার উপর আমরা কথা কহিতে সাহসী নহি। আলোচ্য গ্রন্থে রাধানাথ বাবুর কথিত সমস্ত গুণ গুলিই আছে। গ্রন্থ খানি বড় সুন্দর হইয়াছে।

৩। আজগুবি গল্প—"উৎসাহ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল বিরচিত। সরল, মধুর ভাষায় গল্প লিখিতে ব্রজ বাবুর বেশ ক্ষমতা আছে। গল্প পড়িতে পড়িতে বোধ হয়, যেন কল্পনার মোহন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। ছোট ছোট ছেলেরা এই গল্প গুলি পড়িয়া বেশ আমোদ উপভোগ করিবে সন্দেহ নাই। মূল্যও যৎসামান্য।

৪। মাহিষ্য সিদ্ধান্ত—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। অতি উত্তম ভাষায় শাস্ত্রোক্ত নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মহাভারতী মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে কৈবর্ত্তজাতি মাহিষ্য নাম গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। ভাষা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী, বিচার-প্রণালী তেমনই সুন্দর।

৫। হোমিওপেথিক কলেরা চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীকিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ; কলিকাতা ২।১ ও ২।২ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ হানিমান হোম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। আমরা জানি কিশোরী বাবু একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী হোমিওপেথিক চিকিৎসক। তাঁহার বহুবর্ষের অভিজ্ঞতার ফল অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের সাহায্যে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত ভীষণ ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ছাপা ভাল, কাগজও ভাল। হানিমান হোমে অথবা ১৬৬ নং অপার চিৎপুর রোডে কিশোরী বাবুর নিকট এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কোথায় ছিল ? সকলেই জানেন, চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন। নান্নুর যে তাঁহার বাসস্থান, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না, কেন না, ইহা তাঁহার পদ হইতেই প্রমাণ হইতেছে। তবে নান্নুর যে তাঁহার জন্মস্থান ছিল, একথা ত কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কেন না, একথার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের জ্ঞাতি কি কুটুম্ব কেহ নান্নুরে নাই। চণ্ডীদাস কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে যদি কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একজন মিথিলাদেশবাসী পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে কীর্ণহারে আসিয়া থাকেন। তিনি বলেন, চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী ছিলেন। মজঃফরপুর জেলায় উচৈচট্ গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তথায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এখনও রহিয়াছে। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত ছিলেন। চণ্ডিদাস কিন্তু মূর্খ ছিলেন। এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত হইতেন। একদিন অতি মাত্রায় লাঞ্ছিত হওয়ায় তিনি সরস্বতীর আরাধনা করেন ও সিদ্ধিলাভ করেন। ক্রমে চণ্ডীদাস অসাধারণ পণ্ডিত হয়েন। কিছু দিন পরে তিনি পুরুষোত্তমযাত্রা করেন। আর দেশে ফিরিলেন না। মিথিলার বর্ত্তমান লোকে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানে। তাহার পর তিনি যে মধুর সঙ্গীতে বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা না জানুক, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জানিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। না জানিলে চণ্ডীদাসের স্মৃতি মিথিলা হইতে বিলুপ্ত হইত। পাণ্ডিত্যে লোক অমর হয় না, কবিত্বে হয়।

তবে এক কথা এই উঠিতে পারে, চণ্ডীদাস যদি মিথিলাবাসী হইলেন, তবে তাঁহার পদাবলী বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত কেন ? একথার সহজ উত্তর এই চণ্ডীদাস বহুদিন এদেশে থাকিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালীর বোধগম্য ভাষায় কবিতা রচনা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আমরা আজ এই পর্য্যন্ত লিখিয়া নিরস্ত হইলাম। যখন কথাটা উঠিল, তখন সুধীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩০৯ সাল।

বীরভূমি।

৩য় ভাগ]　　ভাদ্র, ১৩০৯।　　[৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

শাস্ত্রোক্ত বলিদান-রহস্য।

মানবগণের হিংসা-প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বলিদান ব্যবস্থার ন্যায় সুন্দর সুব্যবস্থা বোধ হয়, আর হইতেই পারে না। অতএব আমরা এই প্রবন্ধে পাঠকগণকে বলিদানের রহস্য বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন করিব।

বেদমূলক সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র সকল, মানবগণের প্রকৃতিভেদেই উপাসনা-ভেদ করিয়াছেন। সমগ্র মানবমণ্ডলী সাধারণতঃ ঐ প্রকৃতি-ভেদেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা সাত্ত্বিক প্রকৃতিক, রাজস-প্রকৃতিক ও তামস-প্রকৃতিক। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যেই ঐ প্রকার প্রকৃতি-ভেদ ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত মানব-শরীরে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, তাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিক; যাহাদের দেহে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান, তাহারা রাজস ও তমোগুণ-প্রধান দেহধারী জীবকেই তামস-প্রকৃতিক বলে। জীবদেহে গুণবৈষম্য ঘটিবারও নানা কারণ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণই হইল, জীবের পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। এতদ্‌ব্যতীত পিতৃমাতৃগুণ, দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা এবং জন্মকালীন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি-বৈচিত্র্য ও প্রভাববশতঃও গুণবৈষম্য বা প্রকৃতি-ভেদ ঘটিয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কাহাকে বলে ও তাহার ক্রিয়া-প্রণালী, গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বীরভূমিতে প্রকাশিত "ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক সৃষ্টিবিবরণ" নামক প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রবন্ধ পাঠের সময় পাঠকগণ সেই স্থানটী একবার দেখিয়া লইবেন। ফলতঃ গুণ-ভেদে মানব-প্রকৃতি যেমন ত্রিবিধ, তদ্রূপ উপাসনা-পদ্ধতিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে প্রকৃ-

তির লোক, তিনি সেই প্রকৃতির সহিত মিশিয়াই ভগবানের উপাসনা করিবেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিক লোক সাত্ত্বিক-ভাবে রাজসিক লোক রাজসভাবে ও তামসিক লোক তামস-ভাবে উপাসনা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ উপাসনা কখন কল্যাণদায়িনী হয় না। কেন না ত্রিগুণময়ী মহামায়ার মায়ায় অভিভূত সংসারী জীবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তি বা অনুরাগ জন্মিতেই পারে না।

ভগবদুপাসনার মূল উপকরণই হইল, একমাত্র ভক্তি। ভক্তি একটী ভাববিশেষ এবং কেবল মনের সহিতই তাহার সম্বন্ধ। মানস-প্রত্যক্ষ বা অন্তরে অন্তরে নিজে অনুভব করা ব্যতীত, কেবল ভাষার দ্বারা ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ অথবা সেই আনন্দময় ভাবটী প্রকৃতরূপে অভিব্যক্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে।"

শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

ঈশ্বরে পরা আনুরক্তির নামই ভক্তি। কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত ধনের প্রতি যেরূপ আসক্তি, স্ত্রৈণব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি যেরূপ আসক্তি, সেইরূপ আসক্তি ভগবানে হইলেই তাহা ভক্তিপদবাচ্য হয়। সৌভাগ্যক্রমে সাধকের অন্তঃকরণে যখন পরা-ভক্তির উদয় হয়, তখন আর তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; তিনি ভগবানের সহিত এক হইয়া যান।

ভক্তি, প্রেম ও স্নেহ স্বরূপতঃ একই পদার্থ। কেবল পাত্র-ভেদে সংজ্ঞাভেদ মাত্র। এ তিনেরই অর্থ, আত্মবোধ বা অন্তরের সহিত ভালবাসা। আমরা লোকব্যবহারে দেখিতে পাই, সংসারী ব্যক্তিমাত্রই নিজের প্রিয়বস্তু স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনকে ভোগ করা[illegible]ইতে পারিলেই, আনন্দিত হয়—তৃপ্তিলাভ করে। অর্থাৎ সেই বস্তু নিজে [illegible]গ করিলে যেরূপ আনন্দ, যেরূপ তৃপ্তি হইত, প্রিয়জনের ভোগেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেন এমন হয়? স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনে লোকের আত্মবোধ অর্থাৎ নিজের আত্মা হইতে তাহাদের আত্মা অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান থাকে বলিয়াই তাহাদের ভোগে ঐরূপ আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলেই আর সেরূপ আনন্দানুভূতি হয় না। এখানে লোকব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, ইহা লৌকিক প্রেম বা স্নেহের লক্ষণ মাত্র। ভগবদ্ভক্তি এই আকারের হইলেও ইহা অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের বস্তু। ভগবানের সহিত একাত্মতা

লাভই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্যই শাস্ত্রে উপাস্য-দেবতাকে অভেদ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ"

নিজে শিব হইয়া শিবপূজা করিবে।

"কালিকামাত্মবৎ পশ্যেৎ তথা সেবেত চাত্মবৎ॥"

কালিকাকে (ভগবানকে) আত্মবৎ অর্থাৎ নিজ প্রকৃতির অনুরূপে চিন্তা করিবে। ও আপনার মতই সেবা করিবে। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন;—

"যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

যাহা সাধারণতঃ প্রিয় ও নিজের যাহা প্রিয় বস্তু, ভগবদুপাসনার সময় তাহাই তাঁহাকে উপচার দিতে হইবে। নিজের প্রিয় বস্তু সাধারণের অপ্রিয় হইলেও তাহাও দিবে। বলা বাহুল্য যে, যে সমস্ত বস্তু সাধারণতঃ অনিষ্ট-জনক ও পবিত্রতার হানিকারক বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ পলাণ্ডু ও লসুন প্রভৃতি দ্রব্য, নিজের প্রিয় হইলেও অবশ্যই তাহা দেবতাকে দেওয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"নাভক্ষ্যং দদ্যান্নৈবেদ্যম্।" বিষ্ণুসংহিতা।

যে বস্তু নিজের ভক্ষণীয় নহে, এমন বস্তু ভগবানকে নৈবেদ্য (উপচার) দিবে না। উপচার প্রদানকালে ভগবান কেবল সাধকের ভাবের প্রতিই লক্ষ্য করেন; কিন্তু নিবেদ্য উপচার দ্রব্যের প্রতি নহে। কেন না তিনি যে "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।"

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, তাহার ফলিতার্থ এই দাঁড়াইল যে, ভগবানকে ভক্তি করিতে হইলে,—ভালবাসিতে হইলে, যিনি যে প্রকৃতির লোক ও যাঁহার যাহা প্রিয় বস্তু, তিনি সেই ভাবেই ভগবানের উপাসনা করিবেন এবং সেইরূপ বস্তুই উপচার দিবেন।

কিন্তু সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা সকলেরই সমভাবে প্রীতি-কর হইবে। আমার যাহা প্রিয়, তোমার পক্ষে তাহা অপ্রিয়; আবার তোমার যাহা প্রিয়, অন্যের পক্ষে তাহা অপ্রিয়। বস্তুতঃ কেবল প্রকৃতি-ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন রসযুক্ত আহারীয় পদার্থে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে আহারীয়

পদার্থও ত্রিবিধ। সত্ত্বগুণাধিক লোকের সাত্ত্বিক আহার, রজোগুণাধিক লোকের রাজসিক ও তমোগুণাধিক লোকের তামসিক আহারই প্রিয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

ভগবদ্গীতা।

যে সকল আহারীয় পদার্থ আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য অকৃত্রিম সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধন করে, যাহা সুরস ও সুস্নিগ্ধ, যাহার ক্রিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা হৃদ্য (কোন প্রকার বিকট বা উগ্র গন্ধযুক্ত নহে) তাদৃশ আহারই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণরসযুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী (অত্যন্ত উত্তাপবর্দ্ধক) এবং যে সকল আহার দুঃখ, শোক ও আময়ের (ব্যাধি) বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল আহারই রাজসিক লোকের প্রিয় হয়। আর যে সকল আহারীয় দ্রব্য অর্দ্ধপক্ক, বিরস (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়াছে) পূতি (পচা) পর্য্যুষিত (বাসি) উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ও অমেধ্য (অপবিত্র) তাহার নাম তামসিক আহার এবং তামসপ্রকৃতিক লোকেরই তাহা প্রিয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে মৎস্য ও মাংস সাধারণতঃ রাজসিক আহারের পর্য্যায়ে স্থান পাইলেও অবস্থাভেদে তাহা তামসিক আহার ও তামসপ্রকৃতিক লোকেরও প্রিয়। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়তঃই প্রতিপন্ন হইল যে, মৎস্য-মাংসপ্রিয় রাজস ও তামস অধিকারীমাত্রই শাস্ত্রানুমোদিত পবিত্র মৎস্য মাংস দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, এবং তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে,—

"বিনা মৎস্যৈর্ব্বিনা মাংসৈনার্চ্চয়েৎ পরদেবতাম্।"

মৎস্যমাংস ব্যতীত দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। আবার শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে,—

"রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত-সংযুতঃ।"

রাজসপ্রকৃতিক লোকেরা মাংসশোণিতযুক্ত বলিই দেবতাকে অর্পণ করিবেন।

কিন্তু যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক, মৎস্য ও মাংস তাঁহাদের পক্ষে একবারেই অপ্রিয়। সুতরাং বলিদানে তাঁহাদের অধিকার নাই। সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক দিগের উপচার-দান বিষয়ে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

সাত্ত্বিক সাধকেরা জপ, যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। কেন না তাহাই যে তাঁহাদের প্রিয়বস্তু।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস অধিকারী কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রত্যে-কের লক্ষণ কি, এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক-উচ্যতে॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

ভগবদ্গীতা।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিনটী লইয়াই কর্ম্মের বিধি। আর করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এই তিনটীই কর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহের মধ্যে সর্ব্বস্থানব্যাপক এক অব্যয় পরমাত্ম তত্ত্বরূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহার নাম "সাত্ত্বিক জ্ঞান।" যে জ্ঞান দ্বারা পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তুমি, আমি, জগৎ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া ধারণা হয়, তাহাই রাজসজ্ঞান। আর যে জ্ঞানের উদয় হইলে, কোন একটী দৃশ্য পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া উপলব্ধি হয়, এবং যাহা অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞান, তাহারই নাম তামসজ্ঞান। কামনারহিত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া অনাসক্ত ভাবে যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই "সাত্ত্বিককর্ম্ম"। ফলকামনা করিয়া বা অহঙ্কারবশে কোন ব্যক্তি কষ্টসাধ্য কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে "রাজসকর্ম্ম" বলা যায়। আর ভাবী শুভাশুভ, ধনক্ষয়, হিংসা ও নিজের সামর্থ্যাদি বিচার না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই "তামসকর্ম্ম" নামে কথিত হইয়া থাকে। ফলকামনাশূন্য, অনহংবাদী, ধৃতিমান্, উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতেও যিনি নির্ব্বিকার চিত্ত, তিনিই "সাত্ত্বিককর্ত্তা"। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি ও হর্ষ-শোকযুক্ত, তাহার নাম "রাজসকর্ত্তা"। আর যে ব্যক্তি অসাবধান, অবিবেকী, উদ্ধতস্বভাব, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, সেই লোকই "তামসকর্ত্তা"। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে,—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥"

ভগবদ্গীতা।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া 'অবশ্যকর্ত্তব্য' বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিকযজ্ঞ। কোন প্রকার ফলকামনা করিয়া অথবা দম্ভবশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা রাজস। আর বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অন্নদানহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন যে যজ্ঞ, তাহাই তামসযজ্ঞ নামে কথিত হইয়া থাকে। দেব, দ্বিজ, গুরু ও জ্ঞানীগণের পূজা, শৌচ, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই গুলি কায়িক তপস্যা। যাহাতে কাহারও উদ্বেগ না হয়, এই প্রকার সত্য, প্রিয় ও হিতজনক বাক্যপ্রয়োগ এবং বেদাভ্যাস, এই গুলি বাচিক তপস্যা। আর চিত্তপ্রসাদ, অক্রূরতা, আত্মচিন্তা, মনঃসংযম ও অকপটতা, ইহারই নাম মানসিক তপস্যা। এই ত্রিবিধ তপস্যা ফলকামনাশূন্য হইয়া, পরম শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠিত হইলে, সাত্ত্বিক তপস্যা নামে কথিত হয়। প্রশংসা, সম্মান, ও অর্থাদিলাভের উদ্দেশে

এবং দম্ভবশতঃ যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস, রাজস তপস্যা অস্থির এবং তাহার ফলও ক্ষণভঙ্গুর। আর মোহজনিত দুষ্ট আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মপীড়ন সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, অথবা পরের অনিষ্টসাধনই যে তপস্যার উদ্দেশ্য, তাহাই তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পবিত্র দেশে, পবিত্র কালে,সৎপাত্রে নিষ্কামভাবে"অবশ্য কর্ত্তব্য"বোধে যে দান করা যায়, তাহার নাম সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকারের আকাঙ্ক্ষায় বা প্রত্যুপকার করিবার জন্য অথবা পারলৌকিক ফল উদ্দেশে যে দান করা যায়, সেই ক্লেশযুক্ত দানকে রাজসিক দান বলে। আর অদেশে, (কর্ম্মভূমির বাহিরে, ম্লেচ্ছাদি দেশে) অবিহিত কালে, অপাত্রে, অনাদর বা তিরস্কার সহকারে যে দান করা যায়, তাহাই তামসদান নামে কথিত হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ, পাঠক! শাস্ত্রবাক্যে শুনিলেন ত? বস্তুতঃ কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রকৃতির লোক, তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারেই সকলে স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, কলিপ্রাবল্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রকৃত সাত্ত্বিক লোক সমগ্র ভারতবর্ষে, অন্ততঃ গৃহস্থমণ্ডলীতে একবারে দুর্ল্লভ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়, দুই দশ জন রাজসিক ব্যতীত এখনকার প্রায় লোকই তামসপ্রকৃতিক। সুতরাং বৈধ বলিদানে সকলেই সমান অধিকারী। শাস্ত্রোক্ত বলিদান-বিধি কোন নির্দ্দিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার অর্চ্চনোপলক্ষে ব্যবস্থিত হয় নাই। রাজস ও তামস প্রকৃতির লোকমাত্রই সমস্ত উপাস্য-দেবতার নিকট বলিপ্রদান করিতে পারেন। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর রাজসিকী ও তামসিকী পূজাতেও বলিদানে অধিকারী। তবে দেবতাবিশেষে বলিযোগ্য পশু নির্ব্বাচনে শাস্ত্রে কিছু কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর বলিদানে মৃগ, শশ ও ছাগপশুই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্রৈবার্ষিক কৃতক্লীব, (খাসি) বৃদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ ছাগই বিষ্ণুর বলিদানে প্রশস্ত।

আধুনিক বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক মহাশয়গণ পূর্ব্বসঞ্জাত কুসংস্কারবশে আমাদের এই উক্তিকে হয় ত প্রলাপোক্তি বলিয়াই মনে করিবেন, এবং বিষ্ণুর নিকট খাসি বলিদানের কথা শুনিয়া, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই ইহা আমাদের কপোল-কল্পিত কথা নহে—ইহা শাস্ত্রের কথা। বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"মার্গং মাংসং তথা ছাগং শাশং সমনুগৃহ্যতে।
এতানি মে প্রিয়াণি স্যুঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে॥"

বসুন্ধরার প্রতি ভগবদ্‌বাক্য।

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বলিতেছেন,"বসুন্ধরে! মৃগ-মাংস, ছাগ-মাংস ও শশক-মাংস আমার বড়ই প্রিয়। অতএব তাহাই আমাকে প্রদান করিবে।" আবার তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ শ্বেতো বৃদ্ধো হ্যজাপতিঃ।
বার্দ্ধীনসঃ স বিজ্ঞেয়ো মম বিষ্ণোরতিপ্রিয়ঃ॥"

নিরুত্তর তন্ত্র।

তিন বৎসর বয়স্ক কৃতক্লীব, (খাসি) শ্বেতবর্ণের বৃদ্ধ ছাগের নাম বার্দ্ধীনস। এই বার্দ্ধীনস আমার (বিষ্ণুর) বড়ই প্রিয়।

ফলকথা, বিষ্ণুর রাজসী বা তামসী পূজাতে বলিদানের নিষেধ কোথাও নাই। যদি কোন স্থানে সেই প্রকার নিষেধবাক্য থাকে, তাহা সাত্ত্বিকী পূজোপলক্ষেই বুঝিতে হইবে। কেন না যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি সকল একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তখন বেদমূলক সনাতন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র সকলে উক্তরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা থাকা, কখনই সম্ভবপর নহে। প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলিদান নিষিদ্ধ হইলে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, অশ্ব-বলি দ্বারা কখনই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করাইতেন না। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব যে পরম বৈষ্ণব, একথা মহাভারত-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

আরও এক কথা আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত একখানি বৈষ্ণব-প্রধান গ্রন্থ। ঐ ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিজগণকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানচ্ছলে যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, প্রয়োজনবোধে ও পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ দ্বারাই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যজ্ঞে পশুবধ কখনও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। যথা,—

"স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্॥
তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশঞ্চাদদপস্মৃতিঃ॥

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্‌গুরুঃ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণামাহ দুষ্টমেতদকর্ম্মকম্‌॥
জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎকর্ম্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্ত বিধিং রুষা॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, একদা মহারাজা ইক্ষ্বাকু মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবার জন্য রাজপুত্র বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বিকুক্ষে! যাও পবিত্র মাংস আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। বিকুক্ষি রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্রই বনগমন করিয়া ক্রিয়াযোগ্য বহুতর মৃগ বধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি এরূপ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পিতার অষ্টকা শ্রাদ্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া, তন্মধ্য হইতে একটা শশক ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর, তিনি অবশিষ্ট মাংস সকল পিতৃসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিলে, মহারাজ ইক্ষ্বাকু সেই মাংসের শ্রাদ্ধোচিত সংস্কার করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবকে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ ধ্যানবলে রাজপুত্রের শশক ভক্ষণের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে "এই মাংস দূষিত হইয়াছে—ইহা কর্ম্মার্হ হইবে না।" তাহার পর রাজা রোষবশতঃ রাজপুত্র বিকুক্ষিকে দেশ হইতে একবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কেন না শ্রাদ্ধীয় মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণ করাতে তাঁহার সদাচার পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞ, বর্ষে বর্ষে মাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে সম্পন্ন করিতে হয়, এবং ইহা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি "দ্বিজ" শব্দে কথিত হইয়া থাকেন) পক্ষে শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বিজগণই ঐ শ্রাদ্ধ না করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সে মহাভারতের আমলের, সে পৌরাণিক কালের শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম আর এখন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। কালমাহাত্ম্যে সেই পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া এক্ষণে নানা শাখায় নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীনমতে শ্রদ্ধাশীল দুই দশ জন ব্যতীত, এখনকার প্রায় সমগ্র বৈষ্ণবসমাজই শাস্ত্রবিবর্জ্জিত, সদাচারপরাঙ্মুখ ও বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ ত্রিকালদর্শী; সর্ব্বজ্ঞ ঋষি-

গণের বাক্যে আর তাহাদের বিশ্বাস নাই। পয়রাদিছন্দে গ্রথিত, বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ সকলই এখন তাহাদের শাস্ত্রস্থানীয় হইয়াছে। চোর, ডাকাইত, ও ব্যভিচারদোষদুষ্ট প্রভৃতি অসৎপথাবলম্বী ব্যক্তিগণের শেষজীবনে এই ধর্ম্মই এখন একমাত্র আশ্রয়স্থল। হাড়ি, মুচি, মেথর প্রভৃতি অস্পর্শীয় অন্ত্যজ জাতিরাও একবার ভেক লইয়া 'বৈষ্ণব' হইতে পারিলে, আর তাহাদের হীন-জাতিত্ব থাকে না। তখন তাহারা "বৈষ্ণব ঠাকুর" নামে অভিহিত ও বিপ্রবৎ পবিত্র জাতি হইয়া, পংক্তিভোজনে অধিকার পাইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজ যে, দিন দিন অধঃপতিত ও কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, সে পক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। আবার ইংরেজিশিক্ষিত নব্যদলের মধ্যে নূতন আর এক সম্প্রদায় গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব দেখা দিয়াছেন। ইঁহারা হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটাকে একবারে উঠাইয়া দিয়া সমাজকে একাকার করণে বদ্ধপরিকর। যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিধর্ম্মীরাও ইচ্ছা করিলে, বৈষ্ণব হইতে ও সমাজে আশ্রয় লইতে পারে, ইহাই ইঁহাদের মত। ফলতঃ প্রকৃতিভেদে উপাসনাভেদ, ও অধিকার বিচারের কথাটা, এখন সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ হইতেই একবারে উঠিয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, ইহা কলিপ্রাবল্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একাকারেরই পূর্ব্বলক্ষণ। কলির প্রারম্ভ হইতেই এই দুর্লক্ষণ,—এই একাকারের লক্ষণ, ভারতে দেখা দিয়াছে। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধাবতারে সর্ব্বপ্রথমে বেদবিহিত যজ্ঞ ও যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা প্রচার করিয়া, লোকদিগের মোহোৎপাদনরূপ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত ও সাম্যনীতির ফলস্বরূপ রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অপরাপর প্রকার নানা উপধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার ফুল ফল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান যে লোকমোহনার্থই বুদ্ধাবতার হইয়াছিলেন, একথা শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। মহাকবি জয়দেব বলিয়াছেন,—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
> সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
> কেশবধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"
>
> দশাবতার বর্ণন।

মর্ম্মার্থ এই যে, হে হরে! হে জগদীশ! তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া,

বেদবিহিত যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছ এবং পশুবধে সদয়হৃদয়তা দেখাইয়াছ। অতএব তোমার জয় হউক।

বলিদানের রহস্য বুঝাইতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে দুই একটা অবান্তর কথারও আলোচনা করিতে হইল। যাউক সে কথা। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাইতেছে। বলিদান বা যজ্ঞে পশুবধের বৈধতা প্রতিপাদন জন্য আমাদের আরও একটী শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলক কথা বলিবার আছে। মানবগণ যে, অহরহঃ সংসার-জ্বালায় জ্বালাতন হইতেছে, অবিদ্যামূলক একমাত্র বিষয়াশক্তিই তাহার মূলকারণ। বিষয়াশক্তির ন্যায় ভয়ঙ্কর রিপু আর নাই। এক বিষয়াশক্তি হইতে মানবের কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অতি সংক্ষেপে, অথচ পরিষ্কার ভাষায়, তাহা বুঝান হইয়াছে যথা,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, নিরন্তর বিষয়চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই তাহাতে আসক্তি জন্মে, এবং সেই আসক্তি হইতেই কামনার উদয় হয়। কামনা কোন কারণে প্রতিহত হইলে, তাহা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রোধ হইতে মোহ ; (অজ্ঞানতা) মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ ; স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং তাহার পরেই ঘোর অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

বস্তুতঃ এই বিষয়াসক্তি হইতেই জীবের সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যাবৎ জীবের মনোমধ্যে বিষয়াসক্তি থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি বা সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণের কোনই সম্ভাবনা নাই। সংসারী মানবমাত্রই প্রকৃতির অধীন—স্বভাবের অধীন এবং স্ব স্ব স্বভাবকর্ত্তৃকই সকলে পরিচালিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়াসক্তি যখন সেই প্রকৃতিসঞ্জাত একটা গুণবিশেষ, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করাও ত সহজসাধ্য নহে! কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যে কখনই জীবের প্রবৃত্তি বা অনুরাগ জন্মিতে পারে না। তবে এখন উপায়? উপায় অবশ্যই আছে। আমাদের মঙ্গলময় শাস্ত্রই বিষয়াসক্তি-নিবৃত্তির অতি প্রকৃষ্টতম উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিষয়াকৃষ্ট চিত্তস্য যন্মহৌষধ মুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্॥"

অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার আসক্তি থাকে, সেই বিষয় দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে ক্রমে সেই আসক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং আসক্তিত্যাগের তাহাই একমাত্র মহৌষধ।

কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব। মনে কর, স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ছাগমাংস তোমার অতীব প্রিয় পদার্থ। সুতরাং তাহাতে তোমার বড়ই আসক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে যদি তুমি নিজের রসনাতৃপ্তির কথা কিয়ৎকালের জন্যও ভুলিয়া গিয়া, ভক্তিযোগ সহকারে স্বকীয় উপাস্য দেবতার অর্চ্চনোপলক্ষে অথবা শ্রাদ্ধাদিরূপ পিতৃযজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধানমতে পশুহনন ও দেবাদিকে তাহা উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজে প্রসাদ গ্রহণের নিয়ম করিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তোমার মাংসাহার-লালসা ত সংযত হইবেই; তদ্ভিন্ন মাংসের প্রতি তোমার যে অনুরাগ ছিল, সেই অনুরাগ ভগবচ্চরণে সমর্পিত হইয়া, ভক্তিভাববশতঃ তাঁহার কৃপালাভেও সমর্থ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম দ্বারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই চারি বারের বেশী মাংস ব্যতীত শাস্ত্রমতে অন্য বৃথা মাংস খাইবার ত কাহারও অধিকার নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃদ্ব্রাহ্মণ-কাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জ্জয়েৎ॥"

যমঃ।

ব্রাহ্মণগণের কামনা হেতু ব্রাহ্মণভোজনরূপ যজ্ঞে অথবা দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদিরূপ পিতৃযজ্ঞে যে মাংস প্রোক্ষিত হয়, কেবল সেই মাংসই সকলে খাইতে পারেন। পরন্তু যিনি নিয়মী, অর্থাৎ মাংসাহার এককালীন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য এ বিধি নহে। মাংসভোজন-বর্জ্জনকারির পুণ্যের সীমা নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধ-ফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ॥"

যে বিপ্র মাংসত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং তিনি গৃহে বাস করিলেও মুনি। আবার মনু বলিয়াছেন,—

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি ন তু খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥"

যিনি বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, এবং যিনি মাংসাহার বর্জ্জন করিয়াছেন, এই উভয়ের পুণ্যফলে কিছু মাত্র ইতরবিশেষ নাই।

কিন্তু কেবল মাত্র উদরতৃপ্তির উদ্দেশে যে পশু হত হয়, অথবা দেবার্চ্চনার ভাণ মাত্র করিয়া, যে ব্যক্তি অবিধি পূর্ব্বক পশুহনন করে, সেই দুরাচার ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এবং হত-পশু-শরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। যথা,—

"বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অপ্রোক্ষিত বৃথা মাংসভোজনোপলক্ষে মনু আরও বলিয়াছেন,—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

অর্থাৎ বৃথা পশু-হননে অনুমতিদাতা, হত পশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপাককারী, মাংসপরিবেশক এবং মাংস-ভক্ষক এই সাত ব্যক্তিকেই ঘাতক বলা যায়।

পরন্তু যজ্ঞার্থে যে পশুবধ হয়, যাজ্ঞিকের তাহাতে হিংসা-পাপ হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কেবল যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন। যজ্ঞের দ্বারাই জগৎ রক্ষা হয়। অতএব যজ্ঞে যে বধ, তাহা অবধ (অহিংসা) মধ্যেই পরিগণিত।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভুষণ্ডী রামায়ণ।

শ্রীশ্রীরাম।

অথ রামায়ণ লিখ্যতে।

বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম কিবা জলধর॥
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান।
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে।
ভরত শত্রুঘ্ন পাশে তালবৃন্ত করে॥
দশরথ পৃষ্ঠে নিহালে নয়নে। (?)
অগ্রে ব্যগ্র হনুমন্ত পবন-নন্দনে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চারি পাশে কপিগণ।
জাম্বুবান মন্ত্রী সখা রাজা বিভীষণ॥
সভায় বসিয়া সদা শাসয়ে ধরণী।
ধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু রঘুমণি॥
দয়াবান রাম নাম নিলে মুক্তি পায়।
অপার সাগর পার অনায়াসে যায়॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
পৃথ্বীচন্দ্রে রচে গীত অপূর্ব্ব রচনা॥ ১॥
রঘুনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভাষায় রচায়ে সে ভূষণ্ডী রামায়ণ॥
লঙ্কেশ্বর রাবণ হইল মহারাজা।
তপস্যা কঠোর করি হইল মহাতেজা॥
বাহুবলে ত্রিভুবন হইল বিজয়।
দেবতা সকল দ্বারী আজ্ঞা ভৃত্য রয়॥
পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র হইল বহুগণ।
মহাসুখে রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ॥

একদিন মনে হইল কালে করি ডর।
মৃত্যু নাই হয় আমি হইয়ে অমর॥
বিধাতা কিরূপে মোর লিখেছে মরণ।
তাহা নাই হয় যাহে করি আয়োজন॥
মন্ত্রী তার ছিল শুক সারণ আখ্যায়।
জিজ্ঞাসে রাবণ তাহে নিকটে ডাকায়॥
কহে মম মৃত্যুবিধি কিরূপে লিখিল।
মন্ত্রী মনে করে দায়ে এবার পড়িল॥
কি জানি অপ্রিয় বাক্য শুনি ক্রোধ করে।
আমরা না কই এই কহে অন্য পরে॥
এত মনে করি কয় শুনহ রাজন।
আমি না কহিতে পারি ইহার কারণ॥
কর্ম্ম বিচক্ষণ দুই ভাই রাছে বনে।
হিমালয় পার্শ্বে চিন্তা করে নারায়ণে॥
জিজ্ঞাসিলে তাহারে জানিবে মহাশয়।
শুনি রথ আরোহণে জায় হিমালয়॥
দূরে রথ রাখি মূর্ত্তি হইয়া ব্রাহ্মণ।
দুই জন পাশে স্তুতি করয়ে রাবণ॥
সমাধিতে ছিলা মুনি না করে উত্তর।
বিনয় বচনে কাল গেল সে প্রহর॥
রাবণ করিল মনে বিনয় বচনে।
কেন বা পাইব কার্য্য ভয় না দরসনে॥
বিনা ভয়ে মৈত্রতা না হয় কদাচিত।
জ্বলন্ত পাবক ন্যায় হইল কুপিত।
নিজমূর্ত্তি ধরে করে করি প্রহরণ।
দশ মুণ্ড বিংশ ভুজ প্রলয় কারণ॥
অট্ট অট্ট হাস বহু করয়ে গর্জ্জন।
মুনির সমাধি গেল চাহে ঘন ঘন॥
কয় কি কারণে তব হইল আগমন।
রাবণ কহিল এক করি নিবেদন॥

বিধাতা আমার মৃত্যু কিরূপে লিখিল।
তাহা নাই হয় কিসে জিজ্ঞাসিতে আইল ॥
কর্ম্ম বিচক্ষণ ফল শুন মহাশয়।
বিধাতা তোমার এই করিল নির্ণয় ॥
কোশলের মহারাজা তাহার তনয়া।
কৌশল্যা তাহার নাম বটে দেবকায়া ॥
অযোধ্যার পতি দশরথ নরবর।
রঘুকুলে মহারাজা বড় ধনুর্দ্ধর ॥
তাহার সহিত বিভা কৌশল্যার হবে।
তাহার তনয় দৈত্যকুল বিনাশিবে ॥
তুমি একা নও ধরণীর নিশাচর।
সকল নাশিব সেই রঘুকুলবর ॥
শুনিয়া রাবণ কয় শুন মহাশয়।
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম হইব নিশ্চয় ॥
কৌশল্যারে বধ কৈলে অন্যে না হইব।
অমর হইয়া রাজ্য সকলে ভুঞ্জিব ॥
পৃথিবীর নিশাচর সভে রক্ষা পাবো।
লইয়া সকল গণ আনন্দে রহিবো ॥
কোশল সে দেশ কোথা দেখাও ব্রাহ্মণ।
কর্ম্মবিচক্ষণ ফল শুনহ রাজন ॥
তপস্যায় আছি আমি যাইতে না পারিব।
আমা দোহা হইতে কার্য্য সাধন নহিব ॥
যোগবলে জানি সেই কহিল তোমারে।
দশরথে সম্বন্ধ হইয়াছে দৃঢ়তরে ॥
বিধির লিখন যাহা তাহাই হইবে।
অনাহত শ্রম রাজা কার্য্যে না আসিবে ॥
শুনি কোপে রাজা দোহে করিয়া বন্ধন।
রথে করি লইয়া যায় কৌশল ভুবন ॥
কৌশল ভুবনে দেখে চতুর্দ্দিকে শিখী।
প্রলয় সমান জলে নাহি দেশ দেখি ॥

কোন মতে অগ্নি পার হইতে নারিল।
প্রলয় সময় জেন গর্জ্জিয়া উঠিল॥
শুনি শুক সারণ সে জানিল কারণ।
ত্বরা করি গেল ইন্দ্রজিতের ভুবন॥
কহিল তোমার পিতা ডাকিল তোমারে।
মেঘ সঙ্গে লইয়া জাও আর পরিবারে॥
শুনি মেঘনাদ সৈন্য করিয়া সাজন।
মেঘ লইয়া ত্বরা করি করিল গমন॥
মেঘনাদে দেখি কয় মেঘে নিয়োজয়।
নির্ব্বাণ করিয়া শীঘ্র দেও অগ্নিচয়॥
মেঘগণে আজ্ঞা দিল বর্ষিতে রাবণ।
প্রলয় কালের মত করয়ে বর্ষণ॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সসৈন্যে রাবণ।
বেড়িয়া ঘেরিল সেই রাজার ভুবন॥
অনেক পড়িল সৈন্য ভূপতি কাতর।
রাবণে কহয়ে স্তুতি বাক্য বহুতর॥
রাবণ কহয়ে তব কন্যা দেহ মোরে।
আনিয়া ভূপতি কন্যা দিল কৌশল্যারে॥
কৌশল্যা লইয়া শীঘ্র জায় নৃপবর।
লঙ্কা জাইয়া সিংহাসনে বৈসে নিশাচর॥
মন্ত্রীগণ ডাকি আনে অমাত্য সকলে।
কহে সভে কন্যা এক পাইল কৌশলে॥
ইহার উদরে যেই সন্তান হইবে।
সংসারের নিশাচর সেই সে বধিবে॥
ইহারে বধিলে রক্ষা পাবে নিশাচর।
আনন্দে থাকিব সভে হইয়া অমর।
দুষ্টগণ কয় বধ উচিত ইহার।
বিভীষণ কয় রাজা করহ বিচার॥
আপনে পণ্ডিত জানি যশ ত্রিভুবনে।
নারীবধ অনুচিত নাই করি মনে॥

বিশেষে কুমারী কন্যা পূজ্য সভাকার।
বধ করা নয় রাজা জে হয় বিচার ॥
কারাগারে বন্দী কর এই যুক্তি হয়।
দেবগণ যথা বন্দী তথাকারে রয় ॥
রাবণ কহেন রঘুকুল বলবান।
কি জানি বা লইয়া জায় ভাবিয়ে নিদান ॥
বিভীষণ কয় তব মৈত্র জলচর।
রাঘব যাঁহার নাম অতি কলেবর ॥
তাহে সমর্পণ কর রাখিবে যতনে।
কার সাধ্য জলে হইতে করয়ে হরণে ॥
স্বস্তি বলি রাঘবে বেড়া কৈল নৃপতি।
আইল রাঘব সেই আজ্ঞামাত্র তথি ॥
মঞ্জুসে করিয়া কন্যা কৈল সমর্পণ।
রাঘব কহয়ে রাজা করি নিবেদন ॥
আহার করিলে চরে রাখিব কন্যারে।
পুণরায় উদরে সে রাখিবো তাহারে ॥
ইতি মধ্যে কন্যা কেহু করয়ে হরণ।
মম দোষ নয় ইহা কৈল নিবেদন ॥
ইহা বোলি কন্যা লইয়া করিল গমন।
মঞ্জূসে থাকয়ে কন্যা উদরে পূরণ ॥
চরয়ে যখন কন্যা চর মধ্যে রাখে।
পুণরায় গ্রাসে কন্যা উদরেতে থাকে ॥
নিঃশঙ্কে রাবণ রাজা থাকে সিংহাসনে।
বন্দী করি রাখিলেক কর্ম্ম বিচক্ষণে ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
ভূষণ্ডী কাকের মত করিব রচনা ॥২॥

ত্রিপদী।

রাবণ হরণ কৈল　　দশরথ বার্ত্তা পাইল
চিন্তাযুক্ত হইল রাজনে।

মনে করে নৃপবর বধ কৈল নিশাচর
আর কন্যা না পাই জতনে ॥
উপায় করয়ে চিন্তা কেমনে পাইবে কান্তা
সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত মন।
কৌশলের অধিপতি শুদ্ধসত্ব মহামতি
বেদমন্ত্রে করিল বরণ ॥
সুমন্ত্র মন্ত্রীরে আনি দশরথ কয় বাণি
শুন কই উদ্যোগ কারণ।
রাবণ হইল দুষ্ট কোন মতে করি নষ্ট
সমরের কর আয়োজন ॥
সুমন্ত্র কহেন রাজা নিশাচর মহাতেজা
শিব সন্নিধানে পাইয়া বর।
তাহারে বা কেবা পারে অপার সাগর পারে
কেবা তার প্রবেশে নগর ॥
মোরে আজ্ঞা এই হয় জাই আমি হিমালয়
আরাধনা করি পশুপতি।
যদি হর বর দিব কামনা পূরণ হব
আসি তার করিব যুকতি ॥
শুনি দশরথ কয় উচিত এ যুক্তি হয়
শীঘ্র তুমি করহ গমন।
সুমন্ত্র ত্বরায় যায় হিমালয় গিরি পায়
চিন্তা করে দেব ত্রিলোচন ॥
কঠোর তপস্যা কৈল মহাদেব তুষ্ট হইল
বর দিতে আইলা মহেশ্বর।
করজোড়ে মন্ত্রী কয় দেব দেব দয়াময়
এই আমি চাহি দেহ বর ॥
লঙ্কার রাক্ষস জত পরাভব পায় তত
যদি মম সঙ্গে করে রণ।
তথাস্তু বলিয়া হর সুমন্ত্রেরে দিলা বর
প্রণমিয়া আইলা ভুবন ॥

দশরথ তুষ্ট হইলা　　প্রেম আলিঙ্গন দিলা
হেন বেলে নারদ গমন।
রঘুনাথ পদে মতি　　চায় ভূমি নিশাপতি
চিন্তি সদা শ্রীরামচরণ ॥৩॥

পয়ার।

নারদে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইল॥
রাজা কয় মহামুনি তব আগমন।
পবিত্র হইল তনু পবিত্র ভুবন॥
কি কারণ আগমন কহ কৃপা করি।
মুনি কন কই রাজা তোমা বরাবরি॥
কৌশলের রাজা সুতা কৌশল্যা সুন্দরী।
তোমার সহিত বিভা দিব মনে করি॥
বরণ করিল রাজা দেবের বিধানে।
হরিয়া লইল তারে লঙ্কার রাবণে॥
তোমারে তাহারে রাজা উদ্ধারিতে হয়।
নহিলে কলঙ্ক রঘুকুলে মাত্র রয়॥
রাজা কয় তাহে আমি হইয়া লজ্জিত।
উদ্যোগে আছিয়ে কিন্তু না হয় ত্বরিত॥
সাগরের পার লঙ্কা শঙ্কাযুত স্থান।
কাহারে পাঠাই তথা কেবা বলবান॥
মুনি কন পাঠাইলে নারিবে তাহারে।
মঞ্জুসে করিয়া কন্যা রাখাছে সাগরে॥
রাঘবের উদরে থাকয়ে দিবানিশি।
চরণের কালে চরে রাখয়ে মঞ্জুসি॥
সেই কালে চুরি করি যদি কেহ আনে।
তবে সে পাইবা কন্যা কহিল বিধানে॥
রাজা কয় হেন সাধ্য আছয়ে কাহার।
কিরূপে জাইবে সেই সাগরের পার॥

মুনি কন আমি এই করিয়াছি ধার্য্য।
তোমার প্রধান সখা গড়ুরের কার্য্য ॥
স্মরণ করহ ভূপ আসিব এখন।
করিব তোমার কার্য্য নিতান্ত বচন ॥
শুনি দশরথ সখা গড়ূরে স্মরিল।
তৎক্ষণাৎ সেইখানে গড়ুর আইল ॥
কহে সখা কি করিব কহ বিবরিঞা।
দশরথ কন কন্যা রাবণে হরিয়া ॥
লইয়া গেল রাখিয়াছে মঞ্জুসে তাহায়।
রাঘব উদরে থাকে কদাচ বাক্রায় ॥ (?)
চরণে রাখয়ে চরে মঞ্জুস সহিত।
পুণরায় গ্রাস করে উদরে পুরিত ॥
চরে রাখে সেই কালে কন্যারে লইয়া।
আনি দাও সখা শীঘ্র ত্বরিত হইয়া ॥
শুনিয়া গড়ুর জান সাগরের পার।
দেখে কন্যা মঞ্জুসে আছয়ে জলধার ॥
চঞ্চুতে লইয়া শীঘ্র করিল গমন।
উপনীত হইল আসি অযোধ্যা ভুবন ॥
দেখি দশরথ কন্যা অতি তুষ্ট হইল।
সুমন্ত্র মন্ত্রীকে আনি বয়ান কহিল ॥
কন্যা লইয়া যাও তুমি কৌশল নগর।
কন্যা দিয়া কহিবে ভূপতি বরাবর ॥
বিধিমত বিভা দিলে আনিবো কন্যারে।
সসৈন্যে থাকিবে তুমি রাজার দুয়ারে ॥
দুষ্টগণ আইসে নষ্ট করিবে সমরে।
সাবধানে সদত থাকিবে তার পুরে ॥
কন্যা লইয়া সুমন্ত্র চলিলা ত্বরা করি।
উপনীত হইল কৌশল বরাবরি ॥
দেখি রাজা তুষ্ট হইয়া কন্যা কোলে করে।
বিবাহের আয়োজন নগরে মন্দিরে ॥

রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
ভূষণ্ডি কাকের মত করিব রচনা ॥৪।

পয়ার।

রাঘব আসিয়া দেখে কন্যা নাই চরে।
কেবা চুরি করিলেক ভাবয়ে অন্তরে ॥
মৈত্রের জে কার্য্য আমা হইতে না হইল।
অনাহূত রাখি কন্যা অযশ পাইল ॥
রাবণ নিকটে জাঞা কহে স্তুতি বাণী।
চরে কন্যা কেবা চুরি কৈল নাহি জানি ॥
পূর্ব্বে আমি নিকটে করিল নিবেদন।
চরে রাখি আহারার্থে করিব ভ্রমণ ॥
ইথে কেহু লইয়া জায় কহিব আসিয়া।
যে হয় উচিত রাজা কর বিবচিয়া ॥
রাঘবের মুখে শুনি চিন্তয়ে রাবণ।
এমত দুর্গ মধ্যে কন্যা কে কৈল হরণ ॥
মনে করে কর্ম্মবিচক্ষণে বন্দী কৈল।
কেবা লইয়া গেল কন্যা জিজ্ঞাসিতে হইল ॥
এত মনে করি যথা কর্ম্মবিচক্ষণ।
জাইয়া জিজ্ঞাসে কন্যা কে কৈল হরণ ॥
কার উপদেশে কন্যা কেবা লইয়া গেল।
কৃপা করি এই কথা কহিবারে হইল ॥
নিজ পীড়া মনে নাই করয়ে সুজন।
ঘর্ষণে অধিক গন্ধ করয়ে চন্দন ॥
কর্ম্মবিচক্ষণ কয় শুন মহাশয়।
নারদের উপদেশে জানিয়া বিষয় ॥
দশরথ গড়ুরেরে দিল পাঠাইয়া।
কন্যা লইয়া গেল সেই চঞ্চুতে করিয়া ॥
দশরথে দিল সে কৌশল পাঠাইল।
যোগবলে জানি সেই তোমারে কহিল ॥

শুনি কোপে রাবণ ডাকয়ে পুত্রগণে।
ইন্দ্রজিত আদি আসি কর‍য়ে স্তবনে॥
জে আজ্ঞা সে মহারাজ করিয়ে এখন।
শুনিয়া রাবণ কয় শুন পুত্রগণ॥
সকলের শত্রু জাবে এই করি মনে।
আনিলাম কৌশল্যারে করিত ভক্ষণে॥
দুষ্ট বিভীষণ বাক্যে সাগরে রাখিল।
গড়ুর আসিয়া চুরি করি লইয়া গেল॥
কৌশলে আছয়ে কন্যা আনহ বান্ধিয়া।
কেহ যদি জুঝে তারে আসিবে বধিয়া॥
আমি জাই নারদেরে করিয়া বন্ধন।
আনিয়া রাখিবো যথা বন্দী দেবগণ॥
আজ্ঞামাত্র ইন্দ্রজিৎ সৈন্যগণ লইয়া।
চলিল কৌশল অতি ক্রোধযুক্ত হইয়া॥
ঘেরিল নগর সভে ভয়ে কম্পবান।
সুমন্ত্র লইয়া সৈন্য হইল আগুয়ান॥
দুই দলে মহাঘোরতর যুদ্ধ হইল।
শিবের আছয়ে বর রাক্ষস নারিল॥
যে ক বাণ সুমন্ত্র সে করিল সন্ধান।
সকলে লইয়া গেল জার জেই স্থান॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দ্রজিৎ পৈল লঙ্কা।
দেখিয়া রাক্ষসগণ সভে পাইল শঙ্কা।
খর ও দূষণ যুদ্ধ অনেক করিল।
সুমন্ত্রের যুদ্ধে তার বহু সৈন্য পৈল॥
চতুর্দ্দশ সহস্র লইয়া পলাইল।
দণ্ডকের বন জাইয়া বসতি করিল॥
রাক্ষস সকল যুদ্ধে হইল পরাভব।
দশরথে সুমন্ত্র কহেন এই সব॥
দশরথ কন শীঘ্র কর আয়োজন।
বিবাহ করিয়া আনি অযোধ্যাভুবন॥

রাবণ সতত ভাবে বিষ্ণু বড় বীর।
তারে পরাভাব কিসে করে নহে স্থির॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
পয়ার প্রবন্ধে রাম গুণের বর্ণনা॥৬॥
রাবণ করয়ে মনে বিষ্ণু বলবান।
কিরূপে বিজয় হঞা লই তার স্থান॥
একা পারি না পারি বা ভাবি মনে মনে
বিষ্ণু শত্রু আছে বলি পাতাল ভুবনে॥
একতা হইয়া দুই জনে করি রণ।
পরাভব করি লই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
এত মনে করি জায় পাতাল ভুবন।
বলিদ্বারে উপনীত হইল রাবণ॥
দেখে দ্বারে গদাপাণি আছে একজন।
রাবণে না কয় কিছু প্রবেশে ভুবন॥
শয়নে আছিল বলি দেখা না পাইল।
সিংহাসন ছিল তথি রাবণ বসিল॥
আলাপে আনন্দে দোহে বসিয়া সভায়।
আগমন কারণ সে জিজ্ঞাসিল তায়॥
রাবণ কহেন বিষ্ণু তব শত্রু হয়।
আমার সে শত্রু সেই জানিবে নিশ্চয়॥
মনে করি দুই জনে একত্র হইয়া।
যুদ্ধ করি বিষ্ণু পরাভব করি জাইয়া॥
মনোযোগ কৈলে কার্য্য অবশ্য হইব।
সংসারের মধ্যে দোঁহে জয়বান হব॥
আমার আছয়ে লঙ্কা শঙ্কা নাই তায়।
বৈকুণ্ঠের অধিপতি করিব তোমায়॥
বলি কন বটে তুমি অবশ্য পারিবা।
কিন্তু কিছু কই তায় বিষয় জানিবা॥
গদাপাণি দ্বারে কেহু দেখাছে নয়ানে।
তার ভয়ে বাহির হইতে নারি স্থানে॥

আর এক কহি শুন রাক্ষসের পতি।
ঈশানে আছয়ে এক পর্ব্বত আকৃতি॥
দেখ তারে তোল দেখি করি আকর্ষণ।
তবে সে জানিব বলবান যোগ্যরণ॥
শুনিয়া ঈশান জায় ভুপতি রাবণ।
দেখয়ে পর্ব্বত অতি প্রকাণ্ড পুরণ॥
বাহু পসারিয়া গিরি তুলিবারে যায়।
নড়াইতে শক্তি তায় নহিল তথায়॥
তথা হইতে আসি বলিরাজে নিবেদয়।
নড়াইতে শক্তি মোর নহিল নিশ্চয়॥
বলি কয় নড়াইতে নারিলে রাবণ।
ছিল মধুকৈটভের কর্ণের ভুষণ॥
তাহারে বধিল বিষ্ণু এত বল ধরে।
সংসারের মধ্যে তারে সমরে কে পারে।
আমি খর্ব্ব দেখি দান দিতে কৈল মন।
এক পদে লইলেন এ তিন ভুবন॥
এক পদে লইলেন আকাশ সকল।
এক পদ শিরে দিয়া রাখিলেন তল॥
গদাপাণি হইয়া স্থিতি আমার দুয়ারে।
বৈরীভাব করি কভু নারিবে তাহারে॥
ভক্তিবশ ভগবান শুনহ রাজন।
সর্ব্বদা করহ চিন্তা দেব নারায়ণ॥
অমর হইতে চাও সেই কোন দায়।
রাজ্যের অধিক চাও তুচ্ছ দেওয়া তায়॥
বৈকুণ্ঠভুবনবাস ভাবিলে সে হয়।
মহাসুখে সতত থাকিবে মহাশয়॥
এই যুক্তি কই তব জেবা লয় মনে।
বিদায় করিল তারে সন্তোষ বচনে॥
রঘুনাথ পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
রামায়ণ রচি কিছু অপূর্ব্ব রচনা॥৭॥

কৌশলের রাজা অতি হৃষ্ট হইল মনে।
কৌশল্যার বিভা দিল দশরথ সনে॥
বিবাহ করিয়া কন্যা আনে অযোধ্যায়।
সুমন্ত্র রহিল দ্বারী রাজার আজ্ঞায়॥
রঘুপতি পদে মন করি নিয়োজন।
পয়ারে রচিত সে ভূষণ্ডী রামায়ণ॥৫॥
রাবণ চলিল রথে নারদ উদ্দেশে।
পথে যেই মুনি দেখে তাহারে জিজ্ঞাসে॥
নারদ কোথায় আছে কহ মুনিগণ।
মুনি কয় ব্রহ্মপুরে আছয়ে রাজন॥
উপনীত হইল রাবণ ব্রহ্মপুরে।
নিশা হইল রথপরি থাকিল দুয়ারে॥
প্রভাতে নারদমুনি রামগুণ গাইয়া।
বাহির হইলা পুরী হরষিত হইয়া॥
দেখিয়া রাবণ ধরি আকর্ষণ কৈল।
বাহুযুদ্ধ করি মুনি রাবণে নারিল॥
দুই ভুজে বান্ধি লইয়া রথের উপরে।
আইল রাবণ রাজা লঙ্কার ভিতরে॥
সিংহাসনে বসি ডাকি সব পরিবার।
কহয়ে এখন এবে কি করি ইহার॥
কেহ কয় বন্দী রাখ কেহ কয় নয়।
কেহ কয় সাগরে ফেলাও মহাশয়॥
শুনি বাণি রাণী মন্দোদরী আসি কয়।
নারদ করিতে বধ উচিত না হয়॥
দেবঋষি তপস্বী পরম জ্ঞানবান।
দেবগণে সদা যার কয়য়ে বাখান॥
মুক্তি করি দেও রাজা যান নিজস্থান।
তবে সে জানিবে নাথ নিশ্চয় কল্যাণ॥
মন্দোদরী বাক্যে রাজা মুক্তি করি দিল।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি ব্রহ্মপুরে গেল॥

সর্ব্বদা আসিয়া লঙ্কা করে আশীর্ব্বাদ।
ভয়ে সদা ভীত কিবা করয়ে প্রমাদ॥
একদিন রাবণ নারদে জিজ্ঞাসয়।
বাহুবলে ত্রিভুবন হইলাম জয়॥
আর নাই বীর দেখি যে তিন ভুবনে।
বাহুকুণ্ডূয়ণ আর করি কার সনে॥
নারদ কহেন সত্যলোকে বীর আছে।
বনপারে মহারাজা গেলে তার কাছে॥
শুনিয়া রাবণ রাজা পুষ্পক বিমানে।
সহ সৈন্যে সত্যলোক করিল গমনে॥
নগর বাহির রথ রাখি এক স্থানে।
জলাশয় দেখে তথা অতি সুনির্ম্মানে॥
স্বর্ণময় জল রাঙ্গা স্বর্ণের সোপান।
সিদ্ধ মুগ্ধ জল পানে নাহিক বাখান॥
সুন্দরী সকল জল লয় কুম্ভে ভরি।
স্বর্ণের কলস কক্ষে শত শত ধরি॥
রাবণে দেখিয়া নারীগণ হাস্য করে।
বিকৃতি আকার আর না দেখি সংসারে।
কেহ কয় বালকের খেলাবার লাগি।
আমি লব কেহ কয় আমি তাহে ভাগী॥
রাবণে বান্ধিয়া গলে লইয়া জায় বলে।
জেমত বান্ধিয়া জায় লইয়া ছাগলে॥
লজ্জায় লজ্জিত রাজা নাই পারে বলে।
বন্ধন ঘুচাইয়া পলাইয়া জায় ছলে॥
রথে চড়ি রাবণ আইল নিজালয়।
অপমানে সতত দুঃখিত মনে রয়॥
নারদে ডাকিয়া পুণঃ করয়ে জিজ্ঞাসা।
কার বলে এত বলী কহ সত্য ভাষা॥
নারদ কহেন বিষ্ণুবলে বলী হয়।
বিষ্ণু সে সভার শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥

রাবণ কহেন শরীরের রক্ত লব।
ইহা বলি বাণে ছেদি রক্ত নিল সব॥
কলসে করিয়া লইয়া জায় নিজপুরী।
রাখে উচ্চে কয় বিষ রয় মন্দোদরী॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
রামায়ণ গ্রন্থ এই অপূর্ব্ব রচনা॥ ৮॥
অনেক লইয়া নারী কানন ভ্রমণে।
চলিল রাবণ বনে হরষিত মনে॥
করয়ে অনেক ক্রীড়া নারীগণ লইয়া।
শতেক বৎসর জায় কাননে বহিয়া॥
মন্দোদরী একা গৃহে থাকে ধৈর্য্য ধরি।
আইলা নারদ মুনি তার বরাবরি॥
কহেন রাবণ জত করয়ে বেহার।
শুনি রাণী মন্দোদরী বিরহ অপার॥
মনে করে বিরহে না রাখিব জীবন।
রাখিয়াছে রাজা বিষ করিব ভক্ষণ॥
এত মনে করি কলসের রক্ত খাইল।
সেই দিন হইতে রাণী গর্ভবতী হইল॥
মনে করে নাথ গৃহে নাইক আমার।
গর্ভবতী দেখে হবে কুলের খাঁকার॥
যদি রাজা দেখিব বধিব মোর প্রাণ।
কিরূপে এ গর্ভ যায় করে অনুমান॥
দশ মাস গেল কন্যা প্রসব হইল।
তড়িতের লতা জেন দেখিতে পাইল॥
স্বর্ণের কলস করি সাগরে ফেলিল।
বিষম রোদানী তাহা গরাস করিল॥
রোদানী লইয়া আসি মিথিলা নগরে।
রাখিল কলসী তথি মৃত্তিকা ভিতরে॥
কৃষক চসয়ে চাষ সেই ভূমিতলে।
উঠিল কলস সীতা লাগি সেই স্থলে॥

কৃষক জনক ভূপে দিল সে কলসী।
কলস ভিতর কন্যা পাইল রূপসী ॥
জনক করিল মনে দেবতার কায়া।
অবনীতে অবতার কৈল মহামায়া ॥
রাণীকে দিলেন রাজা কন্যা রূপবতী।
পালন করয়ে রাজা জানিয়া সন্ততি ॥
দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে শশী।
ত্রৈলোক্যে তুলনা নাই এমত রূপসী ॥
শুনি মুনিগণ সব আইলা দরশনে।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা করিল পূজনে ॥
সভে কন কন্যা রাজা পাইলে কোথা হইতে।
যেরূপ পাইল রাজা কন বিস্তারিতে ॥
শুনিয়া সকল মুনি চান দরসন।
অনাইলা কন্যা সভে কৈলা নিরীক্ষণ ॥
দেখি সভে কন শুন জনক রাজন।
এই কন্যা যোগমায়া নিতান্ত বচন ॥
বিষ্ণুর বল্লভা বিনা অন্যের না হয়।
নাম সভে রাখি এই শুন মহাশয় ॥
সীতা হইতে হইলা সেই নাম এক সীতা।
জানকী বোলিব নাম জনকের সুতা ॥
মৈথিলী কহিবো মিথিলায় উৎপত্তি।
বসুতে উৎপত্তি সেই কই বসুমতী ॥
নাম রাখি মুনিগণ হইলা বিদায়।
শিবের করিতে তপ নরপতি জায় ॥
বহুদিন তপ কৈল, জনক রাজন।
বর দিতে আইলা তবে দেব ত্রিলোচন ॥
মনমত বর নেয় জনক নৃপতি।
তুষ্ট হইয়া ধনু এক দিলা পশুপতি ॥
ধনুকে রাখিবে গৃহে হইবে বিজয়।
কারু সাধ্য নাই হবে ধরিয়া তুলয় ॥

রাবণ বিদায় হইয়া আইল লঙ্কায়।
সিংহাসনে বসি মন্ত্রীগণেরে ডাকায়॥
কয় ত্রিভুবন আমি হইলাম জয়।
লইয়ে বৈকুণ্ঠ এবে মনে এই হয়॥
ইহার যে যুক্তি হয় কহ মন্ত্রীগণ।
কিরূপে এ হয় কার্য্য কি করি সাধন।
মন্ত্রীগণ কয় বিষ্ণুবল দেবগণ।
দশদিকপালে আন করিয়া বন্ধন॥
ক্রমে ক্রমে দেবগণ আন হইয়া জয়।
দুর্ব্বল হইব বিষ্ণু কহিল নিশ্চয়॥
যুদ্ধ যত হয় তাহা করহ রাবণ।
পরাভব পাবো বিষ্ণু শুনহ রাজন॥
মন্ত্রীবাক্য শুনি তুষ্ট হইলা রাবণ।
ধরিয়া আনয়ে দশদিকপালগণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসি স্তুতি কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা হয় মহাশয়॥
রাবণ কহয়ে লব বৈকুণ্ঠ ভুবন।
সহায় হইবে সভে এই নিবেদন॥
দেবগণ কয় রাজা সহায় হইব।
কিন্তু বলবান বিষ্ণু যুদ্ধে না পারিব॥
মনে করে বিষ্ণু বড় হয় বলবান।
কিরূপে করিব যুদ্ধ করে অনুমান॥
দেবগণ নারিল অসুর না পারিল।
বিষ্ণু পরাভব কিসে হয় না জানিল॥
ত্রিকালজ্ঞ হয় মুনি কর্ম্ম বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসা করিতে তথা চলিল রাবণ॥
জিজ্ঞাসে রাবণ কর্ম্ম বিচক্ষণ।
বিষ্ণু বলহীন কিসে কহিবে কারণ॥
কর্ম্ম বিচক্ষণ কয় বন্দী তব ঘরে।
জ্ঞানবুদ্ধি যোগবল গেল সে অন্তরে॥

রাবণ কহেন এই দেও উপদেশ।
মুক্তি করি দিব জাবে আপনার দেশ ॥
কর্ম্মবিচক্ষণ কয় শুন মহাশয়।
যজ্ঞদান জপে বলবান বিষ্ণু হয় ॥
পৃথিবীর কর্ম্মকাণ্ড করহ হরণ।
অবশ্য ত্যজিব বিষ্ণু বৈকুণ্ঠভুবন ॥
সন্তোষে রাবণ দোঁহে বিদায় করিল।
কর্ম্মবিচক্ষণ হিমালয় পাশে গেল ॥
দূতগণে ডাকিয়া রাবণ সভে কয়।
ভ্রমণ করহ তুমি সকল আলয় ॥
যজ্ঞদান যথা হয় করহ রাবণ।
বনে বনে মুনিগণে করহ ভক্ষণ ॥
এত বোলি দূতগণে নিযুক্ত করিল।
আপনে অনেক স্থানে ভ্রমিয়া ফিরিল ॥
সমীরণ নামে মুনি শিলা তার নারী।
কন্যা আশে তপস্যায় থাকে বনচারী ॥
অবিরত মহামায়া করয়ে চিন্তন।
কন্যা এক দাও মাতঃ এই নিবেদন ॥
উপনীত রাবণ হইল তার পাশে।
আইলাম তব সন্নিকট যুদ্ধ আশে ॥
সমীরণ কন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
যুদ্ধ যোদ্ধা নাহি রক্ষা করহ রাবণ ॥
কহেন রাবণ দিগ্‌বিজয়ী হইল।
তোমারে হইব জয়ী মনেতে আছিল ॥
না পারিলে যদি পরাভব পত্রী লিখ।
লিখিয়া দিলেন মুনি স্বাক্ষরে অধিক ॥
রাবণ কহেন যদি পরাভব হইলা।
রাজকর দিয়া বনে থাকে লইয়া শিলা ॥
মুনি কয় করযোগ্য কিয়াছে আমার ॥
শরীর কেবল মাত্র যে ইচ্ছা তোমার ॥

অবতার করি হরি ধনুক ভাঙ্গিব।
অন্যের এ সাধ্য রাজা কদাচ নহিব॥
বর পাইয়া জনক আইল নিজালয়।
করিলা প্রতিজ্ঞা এই সকলে শুনয়॥
জে ভাঙ্গিব করি খান খান।
তাহারে তনয়া সীতা করিব প্রদান॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
কাব্য রামায়ণ এই করিল রচনা॥ ৯॥

ত্রিপদী।

জনক প্রতিজ্ঞাবাণী　　শুনি জত নৃপমণি
ধনু ভাঙ্গিবার আশে যায়।
ধনুর নিকটে যায়　　তুলিতে না পারে তায়
লজ্জাযুক্ত হইয়া পালায়॥
যত যত বীর আইসে　　যায় ধনুকের পাশে
কারু সাধ্য নহে তুলিবারে।
সীতা পাবো মনে আশ　　নাই জায় নিজ বাস
জায় সভে তপ করিবারে॥
রাবণ শুনিয়া পণ　　চিন্তাযুক্ত হইয়া মন
নাম মোর আছে ত্রিভুবনে।
যদি ভাঙ্গিবারে নারি　　লজ্জা হব দিগ্ চারি
অপযশ কবে সর্ব্বজনে॥
নিশায় জাইয়া দেখি　　পারি কিনা পারি লখি
যদি ধনু পারি তুলিবারে।
প্রভাতে প্রকাশ হব　　সভামধ্যে জাইয়া কব
ধনু ভাঙ্গি আনিব সীতারে॥
রাবণ নিশায় জায়　　জনক ভুবন পায়
ধনুঘর করে অন্বাসনে।
বাণ রাজা মনে করি　　সেও আসে সেই পুরী
দুই জন একত্র ভুবনে।

বাণে কয় নিশাচর বট তুমি বীরবর
ভাঙ্গ ধনু দেখি যে পৌরুষ।
বাণ কন মম গুরু শিব বাঞ্ছা-কল্পতরু
প্রণমিয়া হইব সন্তোষ ॥
দেখিয়া পবিত্র তনু আমার ইষ্টের ধনু
আমার কি সাধ্য ভাঙ্গিবারে।
তুমি কি করিয়া মনে আসিয়াছো এ ভুবনে
ধর ধনু পারো তুলিবারে ॥
রাবণ কহেন আমি সহিত জগত স্বামী
তুলিয়াছি কৈলাস শিখরে।
এ ধনু কি যোগ্য মম নহে এক বাহু সম
আইলাম মাত্র দেখিবারে ॥
দুই জনে বোলা বোলি জায় নিজ পুরী চলি
একা রেতে পরাভব পাইল।
আর জত রাজগণে কেহ নাই করে মনে
সভে ভয়ে কম্পমান হইল ॥
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ রামগুণ মহানন্দ
শ্রবণে পবিত্র কলেবর।
রঘুপতি পদে মতি চাহে ধরা খপাপতি (?)
মন যেন থাকে নিরন্তর ॥ ১০ ॥

পয়ার।

ইক্ষাকু বংশে দশরথ মহারাজা।
পুত্রের সমান সে পালন করে প্রজা ॥
অযোধ্যানগরে বাস রাজচূড়ামণি।
বাহুবলে সসাগরা শাসিল ধরণী ॥
কৌশল্যা প্রথম জায়া কেকই দ্বিতীয়া।
সুমিত্রা সুন্দরী অতি বণিতা তৃতীয়া ॥
আর শত শত রাণী ভোগ্যা যোগ্যা রয়।
সন্তান কারণ রাজা যজ্ঞ আরম্ভয় ॥

কৌশল্যার গর্ভে জন্ম হইলেন জ্যেষ্ঠ।
বশিষ্ঠ রাখিল রাম নাম সভে শ্রেষ্ঠ ॥
কেকইর গর্ভে হইলা ভরত সুন্দর।
সুমিত্রা লক্ষ্মণ প্রসু শত্রুঘন বর ॥
চারি পুত্র হইল রাজা আনন্দে অপার।
সুখে রাজ্য করে লইয়া সর্ব্ব পরিবার ॥
বিশ্বামিত্র সহায়ে চলিলা রঘুবর।
মিথিলা নগর গেলা জনকের ঘর ॥
হরধনু ভাঙ্গিরাম পূর্ণ কৈলা পণ।
দশরথ আইলা সহ পরিবারগণ ॥
রামে সীতা বিভা দিলা জনক ভুপতি।
উর্ম্মিলা আপন কন্যা লক্ষ্মণ সঙ্গতি ॥
ভ্রাতৃকন্যা মাণ্ডবী ও কীর্ত্তি দুই নারী।
ভরত সে শত্রুঘনে সমর্পন করি ॥
চারিপুত্র পুত্রবধু লইয়া দশরথ।
অযোধ্যা গমনে ভৃগু আগুলিল পথ ॥
দর্প দুর করি হরি আইলা অযোধ্যায়।
দ্বাদশ বৎসর বাস করিল তথায় ॥
পিতৃ আজ্ঞা অনুজায়ে কানন গমন।
সীতা সহ রাম আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
দণ্ডকে অনেক নিশাচরে বধ করি।
পঞ্চবটী বনে বাস করিলেন হরি ॥
সূর্পণখা কর্ণ নাসা করিয়া ছেদন।
সমরে বধিল খর দূষণের গণ ॥
রাবণ হরিয়া সীতা লঙ্কায় রাখিল।
মাতৃবৎ সদা সেবা তথায় করিল ॥
বায়ুপুত্র আসি রাম সেবক হইল।
সুগ্রীবের সঙ্গে তথা মৈত্রতা করিল ॥
বালি বধ করি রাজা করিল তাহারে।
হনুমান এক লম্ফে তরিলা সাগরে ॥

সীতার সংবাদ আনি দিল রঘুবরে ॥
সমরে রাক্ষসগণে করিয়া নিধন।
শেষে যুদ্ধে রাবণের করিল নিধন ॥
সীতার উদ্ধার করি লইয়া পরিবার।
পুষ্পক বিমানে আইলা সাগরের পার ॥
অনুব্রজি ভরত আইলা সহগণ।
পথে রাম সীতা সহ হইল দরশন ॥
অযোধ্যা নগরে রাম হইলেন রাজা।
দরশন আশে সব আইলেন প্রজা ॥
শাসন করিয়া ধরা রাম রাজ্য করে।
লক্ষ লক্ষ শিবলিঙ্গ স্থাপিল শিখরে ॥
মুনিগণ দরশনে আইলা অযোধ্যায়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম সকলে বসায় ॥
মঙ্গল জিজ্ঞাসে রাম মুনিগণে কয়।
তোমার প্রসাদে মুনিগণের নির্ভয় ॥
রাক্ষসে ভক্ষণ জত কৈল মুনিগণ।
গণনা না হয় কত করি নিবেদন ॥
দুষ্টের দমন হেতু তব অবতার।
কৃতার্থ করিলে প্রভু দুখ নাই আর ॥
সীতারে সম্ভাষা মুনিগণ সব কৈল।
তোমার প্রসাদে মাতা ধরা সুস্থ হইল ॥
বক্রী জে আছয়ে মাতা করত স্মরণ।
তুমি সে জগতকর্ত্রী পালন কারণ ॥
কৃপা করি কর মাতা থাকুক সংসার।
জানিবে জগতমাতা আপনি কুমার ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
রামায়ণ কাব্যগীত অপূর্ব্ব রচনা ॥ ১১ ॥

পয়ার।

মুনিগণ মুখে রাম শুনিয়া কথনে।
কহেন কি আর দুষ্ট আছয়ে ভুবনে ॥

মুনিগণ কন শুন প্রভু নারায়ণ।
রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ আছে দুষ্টজন॥
আছয়ে যে রাবণ আছ লঙ্কার মাঝারে।
অমর অসুরগণ আছে যার দ্বারে॥
শক্তি ভক্তি মুক্তি হেতু বিনা নাই তার।
তাহারে সমরে বধে সাধ্য নহে কার॥
জানকী জানেন তার সব বিবরণ।
আমরা সে দাস মাত্র করালো স্মরণ॥
শুনি মুনিবাক্য রাম সীতারে জিজ্ঞাসে।
কহ সত্য কেবা জান ইহার বিশেষে॥
সীতা মনে করে এক লঙ্কার কারণে।
কত দুখ দিল আর কি করে এখনে॥
পতিব্রতা পতি আজ্ঞা করিতে পালন।
করজোড় করি রামে করে নিবেদন॥
ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ জানে বহুতর।
আমি নারী কি জানিব নহি সতন্তর॥
পিতার আলয়ে স্থিতে আইলা এক মুনি।
বৈখট তাহার নাম অতি বড় জ্ঞানী॥
চতুর্ম্মাস্যা বাস হেতু কহিলা পিতারে।
রাজা ভাগ্য মানি তারে রাখিলা মন্দিরে॥
সেবা হেতু মোরে তথা কৈল নিয়োজন।
চারি মাস সেবা করিলাম অনুক্ষণ॥
বরষা প্রভাতে মুনি হইলা বিদায়।
প্রসন্ন হইয়া মোরে হইলা বরদায়॥
কহিলা হইবে রঘুনাথের বনিতা।
পালিবে সংসার হইয়া সকলের মাতা॥
রাম সহ বন যাবে দ্বাদশ বৎসর।
হরিয়া লইব তথি লঙ্কার ঈশ্বর॥
রাবণে বধিয়া রাম উদ্ধার করিবা।
আসিয়া অযোধ্যাপুরী আনন্দে রহিবা॥

আছয়ে রাবণ এক আহুলঙ্কা মাঝে।
তোমা হইতে বধ সেই হইবেক পাছে॥
ইহা বোলি মুনি গেল আপন কাননে।
ইহা বিনা নাই জানি কৈল নিবেদনে॥
রাম কন কেমন রাবণ সে জানিবো।
অবশ্য লইয়া সৈন্য আহুলঙ্কা জাবো॥
আনিয়া পুষ্পকরথ করি আরোহণ।
আহুলঙ্কা রঘুনাথ করিলা গমন॥
সীতা রাম লক্ষ্মণ চলিলা বিভীষণ।
হনুমান সুগ্রীব অঙ্গদ কপিগণ॥
জাম্বুবান অযোধ্যায় রাজসেনাগণ।
মুণিগণ রথে চড়ি করিলা গমন॥
আহুলঙ্কাদ্বারে আসি হইলা উপনীত।
দ্বারে আছে ঘণ্টা এক অতি বিপরীত॥
ঘণ্টাধ্বনি যেই জন আসিয়া করিবে।
তাহার সহিত রাজা সংগ্রামে যুঝিবে॥
রাবণ সহস্রবাহু অতীব আকৃতি।
গমন করিলে পদভরে কাঁপে ক্ষিতি॥
সমুদ্র সদৃশ চতুর্দ্দিকে সেনাগণ।
সমর করিতে নাই পারে কোনুজন॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
রচিল অপূর্ব্ব রামায়ণ শুদ্ধমনা॥ ১২॥
হনুমানে আজ্ঞা কৈলা প্রভু রঘুমণি।
তুমি জাইয়া কর রাজদ্বারে ঘণ্টাধ্বনি॥
আজ্ঞামাত্র ঘণ্টাধ্বনি কৈল হনুমান।
শুনিয়া রাবন মনে করে অনুমান॥
পৃথিবীতে এমত আছয়ে মহাবীর।
আমার সমরে কেহ হইবেক স্থির॥
দূতে কয় দেখ জাঞা কোন বীর আইল।
দেবতা দানব বুঝি বিস্মরিত হইল॥

শত শত দূত জায় সৈন্য দেখিবারে ।
দেখি বীরগণ সব আছয়ে দুয়ারে ॥
দেখি জাঞা কয় রাবণের বরাবর ।
আসিয়াছে ভল্লুক বানর আর নর ॥
হাস্য করি কয় মম যুদ্ধ যোগ্য নয় ।
তথাচ আইসাছে যুদ্ধে জাইবারে হয় ॥
এত বোলি ধনুর্ব্বাণ লইয়া বাহিরায় ।
সন্ধানে সহস্র বাণ সৈন্যমুখে ধায় ॥
জাহার যথায় বাস তথায় রাখিল ।
হনুমানে কদলী কাননে পাঠাইল ।
কিস্কিন্ধায় সুগ্রীব অঙ্গদ কবিগণে ॥
লঙ্কায় রাখিল বাণ বীর বিভীষণে ।
যথা জার কুটীর পাঠাইল মুনিগণে ॥
অযোধ্যারে পাঠাইল রাজসেনাগণে ।
রঘুনাথ লক্ষ্মণ থাকিলা মূর্চ্ছা হইয়া ॥
জানকী ভাবয়ে রাম পার্শ্বেতে বসিয়া ।
রাবণ সহস্র বাহু জাইয়া নিজঘর ॥
পূজয়ে অভয়াপদ চিন্তিয়া অন্তর ।
সীতা মনে ভাবি মূর্ত্তি হইলা অসিতা ॥
চতুর্ভুজ অভয়া বরদা মুণ্ডকাতা ।
করালবদনা মুক্তকেশী উলঙ্গিনী ॥
চতুর্দ্দিকে উপনীত চৌষট্টি যোগিনী ।
হান হান করে নাচে সভে দিগম্বরা ।
অট্ট অট্ট হাস্য ভাস্য অতি ভয়ঙ্করা ॥
ঘণ্টাধ্বনি ক'রে করে হুহুঙ্কার শব্দ ।
শুনিয়া দানব ডরে ত্রিভুবন স্তব্ধ ॥
শুনিয়া ঘণ্টার ধ্বনি রাজা চমকিত ।
পুণরায় কেবা আইল এই বিপরীত ॥
কেহ হউক জাইতে হইল করিবারে রণ ।
তনয়ে ডাকিয়া আনি দিল সিংহাসন ॥

সসৈন্যে সমরে রাজা গমন করিল।
বাহির হইয়া শ্যামা দেখিবারে পাইল॥
কয় মাতা কৃপা করি করহ উদ্ধার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাই আর॥
অসিতা করিলা আজ্ঞা যোগিনী সকলে।
ভোজন করহ সৈন্য সভে কুতূহলে॥
কাটি কাটি মুণ্ড সভে করয়ে ধারণ।
রুধিরের ধারা পানা সভার ভোজন॥
রাবণ সহস্র বাহু করিয়া ছেদন।
কটী বেড়া কৈল হইল করের ভূষণ॥
সমরে সকলে আশি নাচে সর্ব্বজনা।
আনন্দে করয়ে সভে রুধিরের পানা॥
সৈন্য শেষ হইল তবু নাই করে ক্ষমা।
নাচিলা চীকারি সভে ঘোররূপা শ্যামা॥
ধরাধর নড়ে পড়ে ধরণী অস্থির।
ধরিতে অনন্ত নারে অশক্ত শরীর॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
পয়ার প্রবন্ধে রাম গুণের বর্ণনা॥
ব্রহ্মার নিকট ধরা করয়ে আদাস।
রক্ষা কর প্রভু তব সৃষ্ট জায় নাশ॥
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা আইলা তথায়।
দেখেন সমরে নাচি অসিতা বেড়ায়॥
দেখে রঘুনাথ অচেতন রথপরি।
জাইয়া জাগায় বিধি পাদপদ্ম ধরি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উঠি না দেখেন সীতা।
চমকিত হইয়া উভয়ে চারি ভিতা॥
রাবণে লইয়া গেল সেই ভয় মনে।
একবার উদ্ধারিল অনেক যতনে॥
এবার লইল উদ্ধারের হেতু নাই।
চিন্তিত দেখিয়া বিধি কন তার ঠাঁই॥

অচেতনে ছিলা প্রভু না জান বারতা।
সম্মুখে দেখহ সীতা হইয়াছে অসিতা ॥
করলাবদনা দিগম্বরী মুক্তকেশী।
সহস্র যোগিনী সঙ্গে নাচে কারে হাঁসি ॥
পদভরে ডরে ধরা জায় রসাতল।
রক্ষা কর প্রভু সৃষ্ট তোমার সকল ॥
শুনি রাম চমকিয়া দেখেন অসিতা।
লক্ষ্মণে কহেন এই না হয় বনিতা ॥
সীতারে ভক্ষণ বুঝি করিয়াছে শ্যামা।
নাচি নাচি কারে ধরে নাহি দেখি ক্ষমা ॥
সীতা হারাইল ভাই চলো দেশে জাই।
কহিব কি সভে আর জননীর ঠাঁই ॥
লক্ষ্মণ কহেন আমি দেশে না জাইবো।
অসিতা চরণে জাইয়া পড়িয়া রহিবো ॥
অসিতা সম্মুখে গেলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধরিয়া দুজনে কৈলা কর্ণের ভূষণ ॥
কোনু মতে ক্ষমা নাই ভাবয়ে বিধাতা।
হেন বেলে শম্ভুনাথ আইলেন তথা ॥
বিধি হন কালী ক্ষমা তোমা হইতে হয়।
যে উচিত হয় তাহা কর মহাশয় ॥
শুনি শম্ভুনাথ জাইয়া পড়িলা চরণে।
অসিতা চরণ বক্ষে ধরিলা জতনে ॥
দক্ষিণ চরণ বক্ষে বাম উরু পরি।
হরে দেখি লজ্জিতা হইলা দিগম্বরী ॥
সংবর অসিতা মূর্ত্তি কন ত্রিপুরারি।
ছাড়ি ঘোর মূর্ত্তি সীতা হইলা সুন্দরী ॥
কর্ণ হইতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে ছাড়ি দিল।
লজ্জায় লজ্জিতা হইয়া ধরায় বসিল ॥
নগ্না মগ্না হইয়া কৈল দুষ্টের দমন।
এবে লজ্জা নাই জাবো অযোধ্যা ভুবন ॥

বিধি হর কন লজ্জারূপা দিগম্বরি।
বট তুমি সর্ব্বরূপা সর্ব্বরূপ ধরি॥
হইলা সুন্দরী এবে কি লজ্জা তোমার।
রঘুনাথ বামা হইয়া বৈস পুনর্ব্বার॥
দরসন করিয়া জুড়ায় দুনয়ান।
প্রণাম করিয়া জাই অপনার স্থান॥
বিধি হর বাক্যে সীতা বামেতে বসিল।
লক্ষ্মণ লইয়া ছত্র মস্তকে ধরিল॥
বিধি হর স্তব করি হইলা বিদায়।
পুষ্পক বিমানে সীতারাম চড়ি জায়॥
অযোধ্যায় উপনীত হইলা শ্রীরাম।
দেখিয়া সকল লোক পূর্ণ পাইল কাম॥
সিংহাসনে বসিলেন বামে লক্ষ্মী সীতা।
লক্ষ্মণ সম্মুখে ধরিলেন স্বর্ণ ছাতা॥
পাশে ভরত শত্রুঘন তালবৃন্ত ধরে।
অগ্রে ব্যগ্র হনুমন্ত বহুস্তুতি করে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কপিগণ বিভীষণ।
সভায় বসিল সব অযোধ্যার গণ॥
ধর্ম্ম অবতার রাম ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
শরদে শারদী পূজা প্রতি ঘরে ঘরে॥
মুনিগণ আসি সপ্ত সাত পাঠ করে।
মহাপূজা করে রঘুনাথ নিজ ঘরে॥
বশিষ্ঠ পুরোধা বাক্য করে উচ্চারণ।
পূজক হইয়া রাম করয়ে পূজন॥
শিবযুক্ত নবমীতে করিয়া বোধন।
নিত্য নিত্য ভদ্রকালী করয়ে পূজন॥
অধিবাস ষষ্ঠী দিনে সায়াহ্নে করিল।
সপ্তমীর প্রাতে পত্রী প্রবেশ হইল॥
মহাষ্টমী দিনে মহা করিয়া পূজন।
সন্ধি পূজা কৈল হইয়া হরষিত মন॥

বহু বলি দিয়া মহা নবমী পূজন।
বিজয়া দশমী দিনে কৈল বিসর্জ্জন ॥
এইরূপ প্রতিবর্ষ কৈল রাম পূজা।
দেখিয়া সেমত পূজা করে সব প্রজা ॥
মহাসুখে রামচন্দ্র রাজ্যভোগ করে।
এগারো সহস্র বর্ষ অযোধ্যা নগরে ॥
শস্যময়ী পৃথিবী আনন্দময় জন।
রচিল পয়ারে সত্য এই রামায়ণ ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
পৃথ্বীচন্দ্রে রচে গীত অপূর্ব্ব রচনা ॥ ১৪ ॥
অনন্ত রামের লীলা অনন্ত বর্ণনা।
সাধ্যমত কবিগণ করয়ে রচনা ॥
কল্পে কল্পে কত মত কৈল রাম লীলা।
জেবা জত জানিলেক করিতে রচিলা ॥
চতুঃষষ্ঠী লক্ষ গ্রন্থ হইল রামায়ণ।
অমর নগরে সব থাকিল বর্ণন ॥
পৃথিবীতে লক্ষ গ্রন্থ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকের পুরে মন আশ ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা ॥
স্মরণে পঠনে তনু পবিত্র নিতান্ত।
ভবার্ণবে পার সার অভয় কৃতান্ত ॥
রামায়ণ স্মরণে জতেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ করিয়া নির্ণয় ॥
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ গ্রন্থ সদা কর সার ॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পৃথ্বী চন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ ॥
ইতি সমাপ্ত।

সন ১২৩৯ সাল। তারিখ ১৭ই বৈশাখ।

দেবস্থান--কংকালিতলা

এই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ জ্বালাময় সংসারে, স্বর্গের জিনিস যদি কিছু থাকে, তবে তাহা দেবস্থান। তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত-প্রলেপ দিতে, ঘোর পাপান্ধকারে পুণ্যের তীব্র-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে, এমন বুঝি আর কিছুই নাই! মানব আত্ম-গ্লানির তীব্র কষাঘাতে ও অধর্ম্মের অসহ্য তাড়নায় নিষ্পেষিত হইয়া এবং ভবিতব্যের নৈরাশ্যপূর্ণ আলেখ্য প্রতি বিষণ্ণ হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া যতই ম্রিয়মাণ হউক না কেন, দেবস্থানে গমন করিলেই ক্ষণকালের জন্যও তাহার কঠোর তমসাচ্ছন্ন মলিন হৃদয় ধর্ম্মের শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত হইবেই হইবে। দৈবী শক্তির পুণ্যময় আকর্ষণে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মৃতকল্প প্রাণ অনুতাপের বৈদ্যুতিক প্রবাহে উদ্বেল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। দেবস্থল পবিত্রতার বিলাসস্থল, দ্যুলোক ও ভূলোকের সন্ধিস্থল, প্রেমের রঙ্গস্থল ও ভক্তির জন্ম স্থল বলিয়াই প্রেমিক ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে এবং যেন সেই মহান বিশ্ব-যন্ত্রের অযুত তার নিঃসৃত গম্ভীর ঝঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়া এক অব্যক্ত বাঙ্মনোতীত একতানময় স্বর্গীয় সংগীতে সমগ্র জগৎকে প্রতিধ্বনিত, মুখরিত, রোমাঞ্চিত ও আন্দোলিত করিয়া তুলে। প্রেমিক ভক্ত যখন তাহার বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর নিঃসঙ্কোচ ভাবে চিত্ত স্থাপন করিয়া উদার ভগবৎ-প্রেম-পূরিত গদ গদ ভাবে দেব-মন্দিরের দিকে তাহার প্রেমাশ্রু-সিক্ত করুণ-নেত্র-যুগল ন্যস্ত করেন, তখন তাঁহার হৃদয় কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবের অমৃত-তরঙ্গে ওতঃপ্রোত হইতে থাকে। সে সময় ঐ ভক্তের অন্তঃকরণে ঐ অমৃত-সুখ-সম্ভোগ স্বপ্ন কি মায়া, কি মতিভ্রম, কি সুখ, কি দুঃখ, ইহার কোনটী সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তিনিই জানেন, ভক্ত তাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণে সনাতন চিন্ময়ের সেই দিব্য মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে যেন সমগ্র জগতের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়। তাই বলিতেছি, দেবস্থানের মত পবিত্র শান্তি-পূর্ণ প্রাণারাম স্থান জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্মের অনুশাসনে পাপহৃদয় সংযত না হইতেও পারে, রাজার কঠোর শাসনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া দুষ্ট মানব নিরুদ্বেগে কালযাপন করি-তেও পারে, বক্তার গভীর উপদেশের প্রতি বিরক্তি-সূচক মুখভঙ্গিও করিতে

পারে, নটের গভীর মর্ম্মস্পৃক্ করুণ আর্ত্তনাদ তাহার পাপ পরিপূর্ণ হৃদয়কন্দরকে ক্ষণকালের জন্য সন্তাড়িত না করিতেও পারে; কিন্তু দেবস্থান, যাহারা পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকেও নিজ মোহিনী শক্তি-প্রবাহে ক্ষণকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখে, হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দেয়। পরকাল আছে, ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, পাপের বিভীষিকা কি ভয়ঙ্কর, ইত্যাদি মহতী বার্ত্তা যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে আসিয়া তাহার কর্ণপটহে আঘাত করে, সেই আঘাতে তাহার মর্ম্ম-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; বেদ-ধর্ম্ম রহিত মানবও ক্ষণকালের জন্য জগৎ সংসার ভুলিয়া সেই ঈশ্বরের পদপ্রান্তের দিকে ধাবিত হয়। হে পরমেশ! পাপী যদি পাপের স্রোতে চিরদিনই ভাসিতে থাকে, তবে তোমার পবিত্র পুণ্যময় নামের সার্থকতা কি? পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন দেবস্থলে তোমার উদার প্রীতি মানব উপভোগ করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমার জীবন একটী দেবস্থানের সংস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল, সেই পুণ্য-ক্ষেত্রের সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই, তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাই যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর ষ্টেসনের ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে সাধকদিগের লীলাভূমি কংকালীতলা অবস্থিত। আমার আবাসস্থান কীর্ণাহার হইতে নয় মাইল ব্যবধান মাত্র। আমি আমার জনৈক আত্মীয় সমভিব্যাহারে সে দিন কংকালীতলা গমন করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকাল, বেলা অপরাহ্ণ। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, বোধ হইতেছে যেন দিবসাধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বর্ণময় নূপুর তাঁহার একটী চরণ হইতে দৈবাৎ খসিয়া পড়িতেছে। ঐ বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত দেব নূপুরের নির্ম্মাণ পারিপাট্য বশতঃ ঔজ্জ্বল্য এতই অধিক যে, দূর হইতে তাহার রন্ধ্র-দেশ অবলোকন হইতেছে না। একদিকে দেব ত্বিষাম্পতি অস্ত যাইতেছেন, অপর দিকে দেব নিশাপতি উদিত হইয়া প্রকৃতির সহিত মানবদশার নিত্য সম্বন্ধের সূচনা করিয়া দিতেছেন।

প্রদোষে বালচন্দ্র-রঞ্জিত মেঘে স্থির হইয়া থাকাতে বোধ হইতেছে, দিন-মণির বিরহে যেন দিবসশ্রীর গণ্ডস্থল আরক্ত হস্ততলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। লোহিতবর্ণ সূর্য্য-কিরণ, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর পতিত হওয়াতে যেন প্রকৃতি দেবীর কৌষেয় বসনাঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে।

দেবী-মন্দিরের পাদতল বিধৌত করিয়া কোপাই নাম্নী সংকীর্ণা স্রোতস্বিনী "দেহি পদ-পল্লব মুদারম্" গাহিতে গাহিতে উত্তরাভিমুখে চলিয়া, কেহ না বলিয়া দিলেও স্থানটীকে পীঠস্থান বলিয়া অপরিচিতের বোধগম্য করিয়া দিতেছে। ক্রমে আমরা দেবীর মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, প্রথমেই কয়েকটী ভ্রমর মুখরিত সহকার তরু অতিথিগণের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। ভৈরবী মাতার যত্নে নানা জাতীয় পুষ্প, সৌরভ বিস্তার করিয়া আশ্রমটীকে আমোদিত করিতেছে। একটী সদ্য সমাধি স্থান নয়নপথে পতিত হইল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মায়ের জনৈক ভক্ত শ্যামানন্দ স্বামী নামক মহাপুরুষ ১১৩ বৎসর বয়সে সমাধিস্থ হইয়াছেন। পরে আমরা মায়ের মন্দিরে যাইয়া মাকে ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিলাম। দেবীর সেবাইত সারদাপ্রসাদ গোস্বামীর সহিত কিয়ৎক্ষণ আমাদের কথাবার্ত্তা হইল।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম, এখানকার জমিদার কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রমানাথ ঘোষ। তাঁহার পত্তনিদার বোলপুর তালতরিয়া নিবাসী ৺ নোটনচন্দ্র ঘোষ। মায়ের সেবার জন্য বিস্তর জমি আছে। সারদাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এখানে নয় বৎসর আছেন; তিনি পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। তিনি মায়ের নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নিজ প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কংকালীতলা ৫১টী পীঠের মধ্যে একটী পীঠ। এখানে মায়ের কটিদেশ (কাঁকাল) পতিত হইয়াছিল। এখানে রুরু নামে ভৈরব, কাঞ্চীশ্বর নামে শিব এবং রণরঘু নামে বিষ্ণু আছেন। দেবী কংকালী অপ্রকাশিতা,—নদীতীরস্থ একটী ক্ষুদ্র কুণ্ডের মধ্যে আছেন। সেই স্থানেই উদ্দেশে পূজা হইয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পূজার বিপুল আয়োজন হয়, সেই দিন ভক্তগণের প্রদত্ত দুগ্ধ, গঙ্গোদক, নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য প্রভৃতিতে কুণ্ডের জল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। কাঞ্চীশ্বরের মন্দিরের বামভাগে একটী বিল্ব বৃক্ষ মূলে ২টী তৈলাক্ত শৃঙ্গ মদদৃপ্ত বৃষভ গিলিত চর্ব্বণ করিতেছে। সারদাপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর বুদ্ধিকৌশলে মায়ের ভাল ভাল জমিগুলিতে শস্যোৎপত্তির জন্যই ঐ বৃষভদ্বয় নিযুক্ত। সমাগত অতিথিগণের সেবা ও পরিচর্য্যা দেখিয়া ভৈরবী মাতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেকগুলি সন্ন্যাসী মন্দিরের প্রাঙ্গণে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া

আছেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামীর গৃহটী দেখিলাম বেশ সুসজ্জিত; রাইটীং ডেস্ক, দোয়াত, কলমদান, নানাবিধ পুস্তক, নানাবিধ মাসিক সাপ্তাহিক ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ইত্যাদিতে গৃহভ্যন্তরভাগটী "নস্থানং তিল ধারণং" হইয়া রহিয়াছে। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তিনি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত রুচি ও অতিথি সেবায় তৎপর, নিঃস্বার্থ পরোপকার ভিন্ন এই দূরদেশের নির্লোভ যুবক সন্ন্যাসীর অন্য কিছু কর্ম্ম নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,জরা মৃত্যু ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিন্তা মনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, এমত সময়ে একটী সাধক সুদূর গগন-বিপ্লবকারী নিশীথ কালীন পাপিয়ার সংগীতের ন্যায় সাধকপ্রবর রাম প্রসাদের কয়েকটী গান গাহিয়া মনকে ভক্তিপ্রবণ করিয়া তুলিলেন। ধন্য রামপ্রসাদ! মায়ের প্রকৃত ভক্ত ভিন্ন এরূপ স্বর্গীয় সঙ্গীত আর কাহার হৃদয়ে উদিত হইতে পারে?

সেই সংগীত শ্রবণে শক্তিরূপিনীর মহাশক্তি আমার শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেন আমার প্রাণহীন দেহে এক নব জীবনের অবতারণা করিল। পুণ্যের শুভ্র জ্যোতিতে পাপের কৃষ্ণ রেখা মুছিয়া গেল। জ্বালাময় সংসার-কণ্ডূতি হইতে যেন ক্ষণকালের জন্য অব্যাহতি পাইলাম। মনে হইল, যেন মায়ের পদতলে বসিয়া কেবল কাঁদি। আহা সে ভাবের বুঝি অভিব্যক্তি নাই। সেই এক দিন আর এই এক দিন। জীবনের মধ্যে সেই এক দিন, যে দিন সসীমের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অসীমের মহাখেলা দেখিয়াছি, মাতৃ ঐশ্বর্য্যে যে পাপী পুণ্যবান সকল পুত্রই সমান অধিকারী, তাহা সেই এক দিন বুঝিয়াছি। সেই এক দিন যে দিন বিশ্বযন্ত্রের সহিত তিতন্ত্রী মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিয়াছি—

"মন তুই কাঙ্গালী কিসে—
তোর ঘরের ভিতর অমূল্য-ধন চিন্‌লিনা তা সর্ব্বনেশে।"

ধিক তোমায় নাস্তিক! ধর্ম্ম জগতে যদি কোনও নিষ্ঠুর জীব থাকে, তবে তাহা তুমি। সুকোমল ভাবের যদি ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মূর্ত্তি থাকে, তবে তাহা তোমার হৃদয়েই আছে। ভক্তের সরস হৃদয়ে নীরস সত্যের বিষ ঢালিয়া দিবার জন্যই বুঝি তোমার জন্ম। ভক্ত তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া একটু আনন্দ লাভ করিবে, আর তুমি কে, যে তুমি কল্পনা বলিয়া অকারণ তাঁহার সেই সাধের বৃন্দাবনে আগুন লাগাইয়া দিবে? তুমি কে যে তুমি ভ্রান্তযুক্তির সম্মার্জ্জনী প্রহারে সাধকের হৃদয়মন্দির হইতে

তাঁহার সেই ভক্তিপূজিত নিত্য প্রাণারাম দিব্য মূর্ত্তিটীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে? এ ভাবের কি বুঝ তুমি নাস্তিক!

তুমি ত কোন ক্ষুদ্র জীব, কোটি-কল্প যুগযুগান্তর ধরিয়া এই গভীর রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য জলের বুদ্‌ বুদ্‌ মত কতশত অনন্ত কাল সাগরে ভাসিল, আবার পরক্ষণেই কোথায় লীন হইয়া গেল, কে জানে? এ মন্দাকিনীর সহিত হাস্য পরিহাস করিতে গিয়া ঐরাবতের ন্যায় অপদস্থ হইও না। যুক্তি-চঞ্চুপুট বিস্তার করিয়া ও বিশাল জলধির পরিমাণ নির্ণয় করিতে চাহিও না। তোমার কঠোর যুক্তি-কর-স্পর্শে ভাবের সুকুমার পুষ্প এখনই শুষ্ক হইয়া যাইবে। সমগ্র সুষমা বিনষ্ট হইবে। তাই বলি, যদি প্রেমের সাগরসঙ্গম দেখিতে চাও, হৃদয়-মরুতে গোলাপের সুষমা দেখিবার বাসনা কর, তবে ভক্তের দিব্য হৃদয়টী দু চারিদিনের জন্য ধার কর, যদি তাহা কিছু রসাস্বাদ করিতে পারে, ক্ষতি নাই, কিন্তু সাবধান! দেখিও যেন তোমার চিরাভ্যস্ত ভ্রান্ত মত লইয়া ভক্ত হৃদয়ের সেই সুন্দর আলোক চিত্রন যন্ত্রটীকে বিকল করিয়া দিওনা।

মন্দির প্রদক্ষিণানন্তর মঠাধিস্বামীর সহিত আমরা বাহিরে আসিলাম। তিনি নানা কথা কহিতে কহিতে আমাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিলেন, পরে সন্ধ্যার বন্দনাদির জন্য চলিয়া গেলেন।

আশ্রমের অভাবাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম যে, মায়ের কুণ্ডটী যদি বাঁধান হয় এবং মন্দিরটী যদি সংস্কার হয়, তাহা হইলেই তিনি কৃতার্থ। অন্ততঃ বীরভূম জেলাস্থ ভূম্যধিকারিগণের এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে যত্নকরা কর্ত্তব্য।

যে স্বপ্নের সাগরে এতক্ষণ ভাসিতেছিলাম, বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল পরেই সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পাপের প্রাণ স্বর্গের ঐশ্বর্য্যে তৃপ্ত হইবে কেন? সংসারের কর্কশ কোলাহলে অমরাবতীর সে বংশীধ্বনি ডুবিয়া গেল। ক্রমে আমরা নদীতীর অতিক্রম করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলাম। স্বভাবের এমন মনোহর দৃশ্য যেন আর কখনও দেখি নাই। মন্দিরের অনতিদূরে নদীর নাতি প্রশস্ত বেলাভূমিতে একটী মনোরম সহকার-তরু-প্রধান বনস্থলী। যদিও সেস্থানে কৃষ্ণসার শৃঙ্গের দ্বারা মৃগীর নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে না, সত্য, তথাপি ঘন নিবিষ্ট পাদপ শ্রেণী ও লতা-বিতানে স্থানটী আচ্ছন্ন থাকায় দর্শকের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে

আম্রাটবী মধ্যে স্থানে স্থানে সাম-গান-নিরত মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ শিশুর ন্যায় পরিষ্কৃত ভূমি সকল দেখিয়া জনৈক কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এস্থান গুলি কি জন্য পরিষ্কৃত হইয়াছে? জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর করিল মহাশয়! এস্থানে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন নিকটবর্ত্তী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ মায়ের মেলা দর্শনার্থী যাত্রিগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া ফল, মূল, মিষ্টান্ন ও সুশীতল জল দ্বারা যথাবিহিতরূপে পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। সে দিন জনতা-বাহুল্য প্রযুক্ত জল সমল হয়, এজন্য তৎপূর্ব্বদিন সকলে যত্নপূর্ব্বক জল তুলিয়া নূতন মৃৎপাত্রে শীতল করিয়া রাখে। উদ্যানাভ্যন্তরে সূর্য্যালোক প্রবেশের অধিকার নাই; নানাবিধ বনজ বৃক্ষের সমাবেশ থাকায় এস্থানে যেন চির বসন্ত বিরাজিত; সমীরণ তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিয়া অবিরাম মায়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। "কুসুম-পরাগ-রেণু-বাসিত ভূষিত তনু" অলিকুল গুণ গুণ রবে মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। রাশীকৃত শিরীষ কুসুম স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে; আর কি কুসুম-পেলবা শকুন্তলা জন্মিয়া এই সকল কুসুম সদয়ভাবে কর্ণে পরিধান করিবেন? নানাবিধ লতা সদা তীরস্থ মুগ্ধা সাওতাল বালিকাগণকে দয়িতের কণ্ঠালিঙ্গন শিক্ষা দিবার জন্যই যেন সহকার তরু সকলকে বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছে। তটভূমিতে শত শত বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান হইয়া যেন স্রোতস্বিনীর সেই কলতানময় অব্যক্ত সংগীত শ্রবণ করিতেছে। নদীও যেন সেই কুহুতান মুখরিত বৃক্ষ-শ্রোতৃবর্গের একান্ত ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া তটভূমিতে তরঙ্গ শির আনত করিয়া কীর্ত্তনগায়কদিগের ন্যায় বিনীত অভিবাদনে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছে। মানব আমরা, আমরা সে গানের কি বুঝিব! সে নীরব সংগীতের আবরণে যে কি মধুময়ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা সেই বিশ্বময়ই জানেন। আমরা স্তম্ভিত হৃদয়ে ক্ষণকাল নদীর সেই নীরব সঙ্গীত ও তরঙ্গ নিচয়ের কাতর মিনতি শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তরঙ্গিণীর শীকর-সংপৃক্ত বায়ুসেবন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম।

এই তীর্থটীর প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেন কবিত্ব পূর্ণ। প্রকৃত দেবী এই স্থান তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া যেন কবি ও ভক্ত-গণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এখানে আসিলে কবির কল্পনা-সমুদ্রে উজান বহিতে থাকে; ভাবের উৎস স্বতঃই খুলিয়া যায়। সভ্যতার অহমিকা, বিজ্ঞানের প্রহেলিকা, কিংবা দর্শনের কুহেলিকা এখানে নাই। এই

"মধুকর-নিকর-করম্বিত, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরের" আকর্ষণ এতই পবিত্র যে, এখানে আসিলে কবি কেন, সকলেরই জীবন জড়তা ও মলিনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সৌম্য-সুন্দর শান্তশীতল, শিবময় সনাতন ভগবদ্ প্রেমের সাগর সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হয়। *

শ্রীকুলদাপ্রসাদ সেন।

রঙ্গলাল বাবুর গান।

বিশ্বকোষ বৃহদ্ অভিধানের অনুষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭৪ সালে ডাঁড়কা গ্রামে প্রেম সম্বন্ধে শত শত গান রচনা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সেই গানের খাতা হারাইয়া গিয়াছে। আজি সে সময়ের তাঁহার রচিত দুইটি গান লিখিয়া পাঠাই এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের মত প্রচার করেন, সে সময়েরও তাঁহার রচিত একটি গান পাঠাইতেছি। যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, আপনার বীরভূমিতে প্রকাশ করিবেন।

(১)

(ঠেকা)

অকূলে পারেরি অর্থ ছিল না হে ভক্তাধীন।
মন প্রাণ বাঁধা রাখি চরণ লইনু ঋণ।
এ ধারে না উদ্ধার পাব, মন প্রাণ না ফিরে নেব,
আমি ঋণের দায় বাঁধা রব তব পাশে চিরদিন।
এ ঋণে না আছে শাস্তি, খাতকের পাতক নাস্তি,
রঙ্গলাল তাই ভাবিয়া পরিশোধে উদাসীন।

* বীরভূমে এমন অনেক দেবস্থান আছে। সেই গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ও তৎসংসৃষ্ট ঐতিহাসিক-তত্ত্ব যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া পাঠান, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিব।

(২)

(একতালা)

চিন্তে নারিনু চিন্তা হ'লো সার।
অন্তে তোমারি তদন্ত হ'লো দিন অন্ত
অন্ত না পাইনু কিছু তার।
সখা সুজ্ঞান প্রদানে, রাখহে নিদানে;
ভ্রমে ঘুরাওয়না আর।
আমি হয়েছি তোমারি, তুমি প্রাণহরি
অন্তে হইও হে আমার।

(৩)

(আড়া খেমটা)

বেঁচে গেলুম ওলো দিদি একাদশীর দায়ে।
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি, বিধবা রমণীর বিয়ে।
শাঁখা খাড়ু নড়বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে,
সাড়ি সিঁদুর পরে আবার বেড়াবো লো এয়ো হয়ে।
জামাই আস্‌বেন্‌ শ্বশুর বাড়ী, সাজ্‌ করিব তাড়াতাড়ি,
গা দুলিয়ে চল্‌বো আবার হরেক রকম্‌ বাহার দিয়ে।

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাভূষণ

রাধা।

ওলো বিরহিনী ফিরে চল,
মিছে হেথা কাঁদিয়া কি ফল!
সেও লো গিয়েছে চলি'　　কঠোর চরণে দলি'
তোমার ও হৃদয় কোমল!
যমুনা বহিছে ধীরে,　　তোমার নয়ননীরে
তপ্ত আজি সে বারি শীতল;—
কত আর একাকিনী　　রবে হেথা, বিরহিনী,
হৃদে লয়ে দুঃসহ বেদনা!
কাজ নাই ফিরে চল,　　কেন এত দুঃখ বল,
কে সহে লো এহেন যাতনা!
ওই দেখ ছায়া ঢাকা কদম্বের ডালে
ময়ূরী নাচে না আর তালে তালে তালে,
কোকিল বকুলশাখে,　　কুহু কুহু নাহি ডাকে,
গুপ্ত থাকি' পাতার আড়ালে।
যমুনা নয়নজলে　　কেঁদে কলতানে চলে,
ঢেউগুলি দুঃখে ভেঙে যায়;
বাঁশরী বাজেনা আর,　　ফুরায়েছে রব তা'র,
ডাকে না সে "লো রাধিকা আয়"!

তা'রে নাহি জেনে শুনে দিয়াছিলে প্রাণ,
এখন রোদন্ বৃথা, বৃথা অভিমান!
চল সখি গৃহে যাই,　　কেঁদে আর কাজ নাই,
চেয়ে দেখ সন্ধ্যা আসে ঘিরে'।
ঘরে ফিরে গেল সবে,　　কেমনে একেলা রবে
বসি' আর যমুনার তীরে!

সই লো বাসনা আর　বাঁশরী ডাকিলে তা'র,
তা'র কথা ভাবিস্‌না মনে ;
প্রভাতে ভুলিয়া যাস্‌　যদি তা'রে কাছে পাস্‌,
দেখা যদি হয় লো স্বপনে !

শ্রান্ত দেহ ভেঙে আসে আধ ঘুম ঘোরে,
হায়রে নিঠুর কালা কি কহিব তোরে !
সই মোর কথা শোন,　শান্ত কর ক্লান্ত মন,
ঘরে চল কি কাজ হেথায় !
তুই এ যমুনাকূলে　রয়েছিস সব ভুলে,
নিঠুর সে না জানি কোথায় !
তুই লো যূথিকা-মালা, তা'র লাগি ঝালাপালা
করিস্‌ না কোমল হৃদয় !
হেরি' ও মলিন মুখ　সখি লো বিদরে বুক,
সরলার প্রাণে কত সয় !
সজনি লো,
লিখে রাখ হৃদিমাঝে　আজি এ বসন্ত সাঁঝে
কালা অতি কঠিন নিদয়,
বুঝিয়াছি তাহার হৃদয় !

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

—o—

সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কোন এক দ্বিজ ত্রিবিধ দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে নিজবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল, "ভগবান্! ইহলোকে পরম যাথার্থ্য কি এবং কি করিলে কৃতকৃত্য হইতে পারা যায়।" মহর্ষি কপিল বলিলেন, "আচ্ছা কহিতেছি, শ্রবণ কর।" প্রকৃতি অষ্ট প্রকার যথাঃ—(১) অব্যক্ত, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, ও পঞ্চ-তন্মাত্রা। অব্যক্তঃ—যাহা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না? কেন হয় না? উঃ—আদিমধ্যান্ত বিহীন ও নিরবয়ব বলিয়া। "অনাদি মধ্যান্তত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ"। উক্তঞ্চ "অশব্দমস্পর্শ সরূপমধ্যয়ং তথাচ নিত্যং রসগন্ধ বৰ্জ্জিতং। অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ॥ "বুদ্ধি" কাহাকে বলে? উঃ—অধ্যবসায়ের নাম বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি অষ্টরূপাঃ—ধর্ম্ম,জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য। ধর্ম্মঃ—শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান। জ্ঞানঃ—শব্দাদি বিষয়ে অপ্রবৃত্তি। বৈরাগ্যঃ—শব্দাদি বিষয়ে অনভিষঙ্গ। ঐশ্বর্য্যঃ—অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। প্রথমোক্ত চারিটী সাত্বিক; আর শেষোক্ত চারিটী তামসিক। ধর্ম্মদ্বারা মানবের উর্দ্ধাগমন অর্থাৎ স্বর্গলাভ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ, বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতিলয় এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা অপ্রতিহতগতিত্ব হয়। এই হইল অষ্টরূপা বুদ্ধি। অহঙ্কারঃ—অভিমানের নাম অহঙ্কার। "আমি শব্দ করিতেছি।" "আমি স্পর্শ করিতেছি," "আমি শত্রুহনন করিয়াছি" ইত্যাদিকে অহঙ্কার বলে। অহঙ্কার ত্রিবিধঃ—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, (৩) তামস। পঞ্চ-তন্মাত্রাঃ—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। প্রথমটী হইতে শব্দের; দ্বিতীয়টী হইতে স্পর্শের, তৃতীয়টী হইতে রূপের, চতুর্থটী হইতে রসের ও শেষোক্তটী হইতে গন্ধের উপলব্ধি হয়। শব্দ কয় প্রকার? উঃ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, ষড়জর্ষভ, গান্ধার,মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। স্পর্শ কয় প্রকার? উঃ—মৃদু, কঠিন, কর্কশ, পিচ্ছিল, শীত ও উষ্ণ। রস ছয় প্রকারঃ—কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল, ও লবণ। গন্ধ দুই প্রকারঃ—সুরভি ও অসুরভি। এখানে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা শেষ হইল।

"প্রকৃতি" শব্দের অর্থ কি? উঃ—প্রকৃষ্টরূপে সে সৃষ্টি করে। "প্রকুর্ব্বন্তি ইতি প্রকৃতয়ঃ।" বিকার ষোড়শ প্রকারঃ—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকারঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে কেন? উঃ—স্ব স্ব কর্ম্ম করে বলিয়া। কোন্ ইন্দ্রিয়ের কি কার্য্য এখন পর্য্যালোচনা করা যাউক। শ্রোত্র দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি। ত্বক্ দ্বারা আমরা স্পর্শ করি। চক্ষু দ্বারা আমরা বস্তুর রূপ দেখি। জিহ্বা দ্বারা আমরা রসের আস্বাদন করি এবং ঘ্রাণ দ্বারা আমরা গন্ধ অনুভব করি। বাক্ দ্বারা বাক্যোচ্চারণ, হস্ত দ্বারা আদান প্রদানাদি, পাদ দ্বারা বিহরণাদি, পায়ু দ্বারা মলাদির উৎসর্গ ও উপস্থ দ্বারা আনন্দানুভব হইয়া থাকে। মনঃ—উভয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক ও কর্ম্মাত্মক উভয়ই বটে। পঞ্চভূতঃ—পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ। শব্দাদি পাঁচটী গুণ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই গুলি জলের গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ এই তিনটী গুণ তেজের। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী বায়ুর গুণ। আকাশের গুণ কেবল শব্দ। পুরুষের লক্ষণ—অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিৎ ও অপ্রসবধর্ম্ম। কি হেতু অনাদি? উঃ—আদ্যন্তমধ্য নাই বলিয়া। কি হেতু সূক্ষ্ম? উ—নিরয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া। কি হেতু সর্ব্বগত? উঃ—সকল ঘটে বিদ্যমান বলিয়া। কি হেতু চেতন? উঃ—সুখ, দুঃখ, মোহোপলব্ধি রূপিত বলিয়া। কি হেতু নির্গুণ? উঃ—সত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণের অতীত বলিয়া। কি হেতু নিত্য? উঃ—অকৃতকত্ব ও অনুৎপাদকত্ব হেতু। কি হেতু অকর্ত্তা? উঃ—উদাসীন বলিয়া। কি হেতু ভোক্তা? উঃ—সুখ দুঃখ পরিজ্ঞান হেতু। কি হেতু ক্ষেত্রবিৎ? উঃ—গুণাগুণ জানে বলিয়া। কি হেতু অপ্রসবধর্ম্ম? নির্জীবতায় হেতু কিছুই উৎপাদন করে না বলিয়া। নিম্নলিখিত গুলি পুরুষের পর্য্যায়শব্দঃ—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, জন্তু, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, সবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণী, কু, অজ, য়ঃ, কঃ, সঃ, এষঃ। এইগুলি পঞ্চ বিংশতি তত্ব—অষ্ট প্রকৃতি ষোড়শ বিকার ও পুরুষ। পুরুষ এক নহে, পুরুষ বহু। সুখ, দুঃখ, মোহ, সংস্কার জন্ম, মরণ ইত্যাদির নানাত্ব হেতু পুরুষ বহু। যদি পুরুষ এক হয়, তবে একের বন্ধনে বা মুক্তিতে সকলের বন্ধন বা মুক্তি হয় না কেন? একের সুখে সকলের সুখানুভব হয় না কেন? একের দুঃখে সকলের দুঃখ হয় না কেন? একের মরণে সকলের মরণ হয় না কেন? এরূপ হইতে পারে

না। সুতরাং পুরুষ এক নহে, বহু। পুরুষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে :—

"এষ এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
সহি সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
শিব একো মহানাত্মা যেন সর্ব্বমিদম্ ততম্॥
একো যথাত্মা জগতি প্রকৃত্যা বহুধা কৃতঃ।
পৃথক্ বদন্তি চাত্মানং জ্ঞানাদেকঃ প্রবর্ত্ততে॥

ত্রৈগুণ্য কাহাকে বলে? উঃ—সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকে ত্রৈগুণ্য বলে। সত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক, আর তমঃ মোহাত্মক। এই হইল ত্রৈগুণ্যের ব্যাখা। সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর কাহাকে বলে? উঃ—উৎপত্তিকে সঞ্চর এবং প্রলয়কে প্রতিসঞ্চর বলে। প্রতিসঞ্চর কি প্রকারে হয় দেখা যাউক। ভূত সকল তন্মাত্রায়, তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অব্যক্তে লীন হয়। কিন্তু অব্যক্ত কোথায়ও লীন হয় না। পঞ্চ অভিবুদ্ধি কি কি? উঃ—অভিবুদ্ধি, অভিমান, ইচ্ছা, কর্ত্তব্যতা ও ও ক্রিয়া। "এই কার্য্যটী করা উচিত" এই যে অধ্যবসায়, তাহার নাম বুদ্ধি ক্রিয়া। "আমি করিতেছি" এই ভাবকে অহঙ্কার ক্রিয়া বলে। ইচ্ছা শব্দের অর্থ বাঞ্ছা। সংকল্প মনের কার্য্য। শব্দাদি বিষয়ালোচন শ্রবণাদি লক্ষণ যুক্ত কর্ত্তব্যতা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া। পঞ্চ কর্ম্মযোনি :—ধৃতি, শ্রদ্ধা, সুখাদি বিবিদিষা অবিবিদিষা। শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

"বাচি কর্ম্মাণি সংকল্পে প্রতিষ্ঠাং যোঽভিরক্ষতি
তন্নিষ্ঠস্তৎ প্রতিষ্ঠশ্চ ধৃতেরেতত্তু লক্ষণম্ ;
অনসূয়া ব্রহ্মচর্য্যম্ যজনম্ যাজনম্ তপঃ।
দানম্ প্রতিগ্রহো হোমঃ শ্রদ্ধায়া লক্ষণম্ মতম্॥
সুখার্থো যস্ত সেবেত বিদ্যাম্ কর্ম্ম তপাংসি চ।
প্রায়শ্চিত্তপরো নিত্যম্ সুখোঽয়ম্ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পঞ্চ বায়ু কি কি? উঃ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণবায়ু মুখ নাসাতে, অপান পায়ুতে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠেতে, আর ব্যান সর্ব্ব নাড়িতে অধিষ্ঠান করে। পঞ্চ কর্ম্মাত্মা :—বৈকারিক, তৈজস,

ভূতাদি, সানুমান, ও নিরনুমান। বৈকারিক শুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। তৈজস অশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। ভূতাদি মূঢ় কর্ম্মের কর্ত্তা। সানুমান শুভ মূঢ়কর্ম্মের কর্ত্তা। নিরনুমান শুভামূঢ় কর্ম্মের কর্ত্তা। পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা কি কি? উ:—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী অনাদিতত্ত্ব। পুরুষ নির্গুণ, চেতন, বহু ও বিভু অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী। প্রকৃতি অচেতন, বিভু, এক ও পরিণাম স্বভাব। পুরুষের সন্নি-ধানে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়। উপাদান (সমবায়ী) কারণ অর্থাৎ অবয়ব-দ্রব্যের গুণ অনুসারেই কার্য্যদ্রব্যে গুণ জন্মে। অতএব কার্য্যের গুণ দেখিয়া কারণের গুণ কল্পনা করা যাইতে পারে। সাম্যবস্থা প্রাপ্ত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণের নাম প্রকৃতি। অবয়বের বিভাগ হইতে যেখানে শেষ হয়, আর বিভাগ চলেনা, তাহারই নাম মূলকারণ প্রকৃতি। নৈয়া-য়িক পরমাণুতে বিশ্রাম স্বীকার করেন, পরমাণু নিরবয়ব ও নিত্য। সাংখ্য-কার আরও সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। সাংখ্যের তন্মাত্র ও ন্যায়ের পরমাণু একস্থানীয় হইতে পারে, প্রভেদ এই, পরমাণু নিত্য, তন্মাত্র জন্য। সাংখ্যমতে অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। অনভিব্যক্ত অবস্থায় কার্য্যবর্গ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন বা আবির্ভূত হয়, এই মতে আবির্ভাবের নাম উৎপত্তি এবং তিরোভাবের নাম বিনাশ। অদৃষ্টবশতঃ পুরুষের সন্নিধান বিশেষে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়। সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বরের অঙ্গীকার নাই। জন্যেশ্বর স্বীকার আছে, অর্থাৎ জীবগণই তপস্যা-বলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ব্যাপক হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা দের সংযোগ বিশেষ, প্রকৃতিভোগ্য হয়, আর পুরুষ ভোক্তা হয়। প্রকৃতি-পুরুষের উক্ত সম্বন্ধরূপ সংযোগ হইতেই সৃষ্টি হয়। প্রলয়কালে গুণত্রয় সমভাবে থাকে, কেহ কাহাকে অভিভব করে না। সুখ, দুঃখ, মোহ স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়া মিত্রভাবে অবস্থান করে। পুরুষের সংযোগ বিশেষ হইলে গুণত্রয়ের আর সে ভাব থাকে না, তখন তারতম্য ঘটে, এক অপরকে অভিভব করে। এইরূপে গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ

শ্রীশশিভূষণ রায় বি, এ।

আত্মসমর্পণ

এ অনন্ত বিশ্বমাঝে
একাকী পড়িয়া আমি,
সভয়ে ডাকিছি তোমা,
'কোথা হে প্রাণের স্বামি
কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য,
কোটি গ্রহ, কোটি তারা-
অনন্ত সৃষ্টির যাঁর
ক্ষুদ্রতম বিন্দুধারা।
ফুৎকারে অনন্ত সৃষ্টি,
ফুৎকারে নিমেষে লয়,
কি মহান্ সেই স্রষ্টা,
কি অসীম শক্তিময়!
কোটি রবি, শশী তারা
যদিরে বিলীন হয়,
তথাপি সৃষ্টির যাঁর
হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটয় ;
এ হেন অনন্ত মাঝে
একাকী পড়িয়া আমি,
ভয়ে কাঁপি থর থর,
কোথা বিভো! কোথা তুমি
এ বিপুল সৃষ্টি মাঝে
পৃথিবী রেণুর কণা,
কোথায় আমার স্থিতি!
আমি তবে কোন্ জনা!
অনন্ত বিশ্বের সনে
তুলিত হইলে হায়!
কেবা আমি খুঁজিলেও
কিছু নাহি পাওয়া যায়।
কে আমি কোথায় পড়ি
বিস্ময়ে পূরিত মন,
কে সে আমি মহা দম্ভে
করি সদা বিচরণ!
মৎকুণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র
এ বিশ্ব ভূতলে আমি,
আমি তবে কোন্ জন
বলছে জগৎস্বামি!

ঝঞ্ঝাবাতে ধূলিকণা
যেমতি চালিত হয়,
নাহি তার শক্তি কিছু
যথা রাখ তথা রয়।
হে প্রভো! হে বিশ্বপতে!
হে অনন্ত বিশ্বময়,
আমিও তেমতি বিশ্বে
নাহি ইথে সংশয়।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—
তাহার হতেও হীন,
কীট আমি, ধূলি আমি,
না, না—তা হতেও দীন!
কিবা আমি, কোথা আমি,
কত তুচ্ছ শক্তি মোর,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ
এযে দেখি মহাঘোর!
আমিই কিছুই নহি,
আমার ক্ষমতা কিবা ;
সূর্য্যই অস্তিত্ব শূন্য,
দিবসের কোথা বিভা?
পৃথিবী রেণুর কণা—
আমি তবে কোথা নাথ!
কিবা মম উপাসনা—
কিবা মম প্রণিপাত!
কি উদ্যম, কি সাহস,
কিবা চেষ্টা, কিবা যত্ন ;
কি উন্নতি, কি পতন,
কিবা ধূলি, কিবা রত্ন!
কি জীবন, কি মরণ,
কি বিষাদ, কি হরষ ;
কি মূর্খতা, কি পাণ্ডিত্য,
কি সরস, কি নীরস!
কিবা সুখ, কিবা দুখ,
কিবা হাসি, কিবা কান্না ;
কিবা পাপ, কিবা পুণ্য,
কি [illegible] কিবা [illegible] ।

কিছু নয় — কিছু নয়,
সব মাটী—সব ছাই!
আমার অস্তিত্ব কোথা
খুঁজিয়াত নাহি পাই!

টুটিয়াছে মোহ ফাঁস,
ফুরায়েছে অহঙ্কার,
আমিত কিছুই নহি,
তুমি মাত্র সারাৎসার।

আদি তুমি, অন্ত তুমি,
তুমি সর্ব্ব, তুমি নিত্য,
তুমি শক্তি, তুমি স্থায়ী,
অক্ষর, অব্যয় সত্য।

চিরকাল আছ তুমি,
চিরকাল রবে তুমি,
ক্ষণেকে জনম মোর
ক্ষণেকে লুকাব আমি।

কলের পুতুল আমি,
যা করাও তাই করি,
যা বলাও তাই বলি,
যা ধরাও তাই ধরি!

হাসি কাঁদি—যাহা কিছু,
সকলি তোমারি খেলা;
মূলে আমি কিছু নই,
সকলি তোমার লীলা!

হে অনাদি, হে অনন্ত,
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি!
যাহা ইচ্ছা—তাহা কর,
রাখ, মার—যাহে মতি।

ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি,
অতি তুচ্ছ ভস্ম ছাই;
কি যাচিব তব পাশে
যাচার সাহস নাই।

সকলি তোমার ইচ্ছা,
সকলি তোমারি নাথ!
ভস্ম আমি—কি যাচিব!
ভয়ে করি অভিলাষ।

কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র—
তব ভয়ে কম্পবান;
কি যাচিব তব পাশে,
ভয়ে কাঁপে এ পরাণ!

কীটের চরণ-ধূলি
এ বিশ্ব ভূতলে আমি,
অনন্ত অসীম সৃষ্টি
তুমি তাঁর স্রষ্টা স্বামী।

সর্ব্বশক্তিমান তুমি,
তোমাতে নিহিত সব,
আমাতে কিছুই নাহি,
আমি যে জড়ের শব।

কিছুই জানিনা আমি,
কিবা আমি—কোথা বাস,
কেন বা সৃজিলে মোরে,
কিবা তব অভিলাষ।

কোথা হতে কোথা তুমি
আনিয়া ফেলেছ হায়!
আবার ফেলিবে কোথা,
ত্রাসে কাঁপে এ হৃদয়!

শক্তিহীন, বলহীন,
আমি দীন নিরুপায়;
যাহা ইচ্ছা—তাহা কর,
সব তব শোভা পায়।

কালের সাগরে আমি
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের প্রায়,
আমার আমিত্ব কিবা
কিছুই না বুঝি হায়!

কি উদ্দেশ্যে সৃজিয়াছ,
আমি কিছু জ্ঞাত নই;
ক্ষুদ্রতা হেরিয়া মম
নিয়ত স্তম্ভিত রই।

বিফল বাসনা মম,
বিফল সে অভিলাষ;
আমারি অস্তিত্ব নাই,
[illegible]

যাহে তুমি সুখী হও,
তাই তুমি কর নাথ !
তুমি হে বিশ্বের পতি
করি কোটি প্রণিপাত !

ইচ্ছা হয় সুখী কর,
ইচ্ছা হয় কর দুখী ;
যাহে তুমি সুখী হও,
তাহাতেই আমি সুখী।

যাহা করিবার দাও
তাহাই করিব আমি ;
যে আদেশ কর তুমি,
তাহাই পালিব আমি।

নাহিক আপত্তি কিছু,
নাহি মম অভিলাষ ;
তোমারি—তোমারি শুধু
পূর্ণ হোক্ অভিলাষ।

হও বা না হও তুমি
আমার, হে ভবধব ;
জানিতে চাহি না তাহা,
আমি কিন্তু সদা তব।

তোমারি, তোমারি আমি—
তোমা ছাড়া কোথা যাই ;
তুমি আদি, তুমি অন্ত,
তোমা ছাড়া কিছু নাই।

দাও দুঃখ, দাও তাপ,
দাও জ্বালা, দাও কষ্ট,
দাও শোক, দাও রোগ,
তুমি যাহা বুঝ ইষ্ট।

দুখে যদি সুখী হও,
দাও তবে—দাও দুখ,
আনন্দে সহিব তাহা,
কভু না হব বিমুখ।

ক্রীড়ার পুত্তলি আমি,
কিবা মম অধিকার ;
সকলি তোমার সাধ্য—
তুমি শক্তি-মূলাধার।

যাহা ইচ্ছা তাহা কর,
তুমি অখিলের নাথ ;
আমি তব পদযুগে
করি কোটি প্রণিপাত।

আমি তো কিছুই নহি,
এ বিপুল বিশ্বতলে ;
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা
পূর্ণ হোক কালে কালে।

আমার আমিত্ব আর
নাহি কিছু মম মনে ;
তোমারি বাসনা নাথ !
পূর্ণ হোক এ জীবনে।

শ্রীসৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ ভাগ।] কার্ত্তিক, ১৩০৯ [১ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	মৃগমদ কস্তুরী।	(শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়)	১
২।	রাজ প্রতাপচাঁদ।	(সম্পাদক)	১০
৩।	ইয়ুনিভার্সিটী কমিশন রিপোর্ট ও ভারতীয় শিক্ষা।	(শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী)	২০
৪।	মুমূর্ষু-কৃত্যে শোকাপনোদন।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়) ...	২৮

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

বীরভূমি।

৪র্থ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩০৯। [৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মৃগমদকস্তূরী।

লতাকস্তূরী গাছড়া জিনিস। মৃগমদ কস্তূরী গাছড়া নহে—জান্তব পদার্থ, জন্তুর শরীরে উহার উৎপত্তি। এক প্রকার হরিণ আছে, তাহাদের পুরুষ জাতির নাভির স্থানে একটী কোষ হয়। সেই কোষে কস্তূরী জন্মে। এই জাতীয় হরিণকে কস্তূরীমৃগ বলে।

কস্তূরীমৃগ যেখানে সেখানে থাকে না। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে, সাইবিরিয়াতে, চীনে এবং টঙ্কিনে ইহাদের বাস। হরিণ জাতির স্বভাব,—তাহারা দল বাঁধিয়া এক সঙ্গে অনেকে থাকিতে ভালবাসে; এক সঙ্গে অনেকে মিলিয়া চরিয়া বেড়ায়। মৃগমদ হরিণের স্বভাব সে রকম নয়। তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা শশকের মত। তাহারা একস্থানে একাকীই থাকে।

এই হরিণ অধিক বড় হয় না। লেজের গোড়া হইতে মাথা পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাত লম্বা। আমাদের বাঙ্গালাদেশে সচরাচর ছাগল যত বড় দেখা যায়, কস্তূরীমৃগও প্রায় তত বড়। ইহাদের শিং নাই। উজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষু ঢলঢল করিতেছে। তারা ও দুই কোন্ মিস্‌মিসে কাল; বিধাতা যেন অপাঙ্গ ভরিয়া দলিত কজ্জল মাখাইয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। কাণ লম্বা, কর্ণ এবং চক্ষু দেখিলেই যেন বুঝা যায়, এই হরিণ অতিশয় ভীরু। অল্প শব্দ পাইলেই কাণ খাড়া করিয়া চকিত চিত্তে, চঞ্চল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া পলায়।

ইহাদের ঘাড় হইতে পিঠের অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘন ঘন লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা। বিলাতিপুস্তকে এবং রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচারে কস্তূরীমৃগের যে চিত্র আছে, তাহা ঠিক নয়। ঘাড়ের উপর এবং পৃষ্ঠদেশে যে প্রকার লোম আঁকা হইয়াছে, তাহা খুব ছোট দেখায়। পূর্ণবয়স্ক মৃগের ঘাড়ের লোম

আরও অনেক বড়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্রের ভুল ধরি না, তিনি তো কেবল দাগার উপর দাগা বুলাইয়াছেন; কিন্তু বিলাতি ছবিতে ভুল হইল কেন, জানি না।

লোমগুলি মিহি নয়, খুব মোটা মোটা। কিন্তু মোটা হইলেও কর্কশ নয়;— বেশ নরম, ছুঁইলে যেন মনে হয় শশকের গায়ে হাত পড়িয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গের লোমের বর্ণ একরকম নয়; ঘাড়ের এবং পিঠের লোমও এক রকম নয়,—শাদা, কাল ও পাটকিলে মিশানো। শিকারীরা বলে ঋতুভেদে বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটে। গ্রীষ্মকাল আসিলে অধিকাংশ লোম কাল হইয়া পড়ে। শীতে শাদা হয়, আর অন্য অন্য ঋতুতে কাল, শাদা ও পাটকিলে মিশিয়া থাকে। ~~বুড়া হইলে মানুষের মাথার চুল পাকে,—কাল চুল শাদা হইয়া যায়।~~ বুড়া হইলে কস্তূরীমৃগেরও অধিকাংশ লোম শাদা হয়।

ঘাড়ে পিঠে এবং গায়ে লোমগুলি খুব ঘন করিয়া সাজানো। এইরূপ নিবিড় লোম সমাবেশের ~~পারিপাট্য দেখিলে~~ বুঝা যায়,—এই পশু গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানের নয়। যেখানে হিমের প্রভাবে মহিষের শিং কাঁপিয়া উঠে, সেই চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতের গায়ে ইহারা চরিয়া বেড়ায়।

কস্তূরীমৃগের লেজ খুব ছোট। অন্য কোন হরিণের গজদন্ত নাই; কস্তূরীমৃগের মুখের দুই পাশে দুইটী গজদন্ত আছে। উপর পাটির কস হইতে সরু লম্বা দাঁত দুইটী বাহির হইয়া নিম্ন পাটির ঠোঁটের উপর বক্র হইয়া আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। খুর পশ্চাদ্দিক্ হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়া সম্মুখে তীরের ফলার মত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। ক্ষুরের দুই পাশ এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত ধারাল। ডগা ঠিক যেন নরুণের মত সূচল। ~~বোধ করি, বোতলভাঙ্গা কাচের মত ইহাদের ক্ষুরেও কামাইতে পারা যায়।~~

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির ভিতরে কিছুই নিরর্থক নাই, বিশ্বব্যাপারের সূক্ষ্মবিষয়ে বুদ্ধি যায় না, নচেৎ বুঝিতে পারিলে, সকল কাজেই তাঁহার এক একটী গূঢ় অভিপ্রায় বাহির হইয়া পড়ে। কস্তূরীমৃগের ক্ষুর এত সূচল কেন এবং লম্বা দাঁত দুটী নিম্নদিকে কেন বক্র হইয়া আসিয়াছে, উহাদের প্রকৃতি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল পা এবং মুখ সাজাইবার জন্য সূক্ষ্ম ক্ষুর এবং বক্র গজদন্ত দেন নাহি। ঈদৃশ ক্ষুর এবং দাঁত হরিণদের প্রাণরক্ষার উপায়। পর্ব্বতের খুব উচ্চ ঢালু প্রদেশে,

মৃগমদ হরিণ আজও সত্যযুগের মান্মথ হয় নাই,—এখনও এই মৃগ পাওয়া যায়। যখন কস্তূরীমৃগ আছে, তখন খাঁটি কস্তূরীও আছে, কিন্তু সে জিনিস ~~শিকারীদের নিজস্ব করা একচেটিয়া, তাহা~~ খরিদদারদের ভাগ্যে জোটে না। ~~খরিদদারেরা পায় রক্ত মাংস, নাদি ও আটা,—শ্রবণসুখের জন্য পায় সেই মধুর নামটী,—বিশুদ্ধ আসল মৃগমদ কস্তূরী।~~

খাঁটি কস্তূরী খুব কম মিলে; কিন্তু গ্রাহক অনেক। যে জিনিস কম জন্মে, কিন্তু ~~যাহার~~ কাট্‌তি বেশী, তাহাতেই অধিক ভেল। কলিকাতায় সুস্বাদু খাঁটি ঘৃত আর নাই। ঘৃতের ভিতরে শুধুই সাপ বেঙের চর্ব্বি। আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা কস্মিন্‌কালে আমেরিকার আমেজন নদ দেখেন নাই। শিক্ষকেরা মানচিত্রে একটা লম্বা কাল সূতার মত দাগ দেখাইয়া আমেজন নদ বুঝাইয়া দেন। খাঁটি দুগ্ধ কেমন, কলিকাতার লোককে সে কথা বুঝাইতে হইলে চক্ষের কাছে বকের একটা পালক ধরিতে হয়। ~~আর খাঁটি মৃগমদ কস্তূরী নাই।~~ খাঁটি কস্তূরী কেমন, একথা বুঝইতে হইতে হইলে ছুঁচো শুঁকিতে পরামর্শ দিতে হয়। ছুঁচো শোঁকা ভিন্ন অন্য সহজ উপায় আর কিছুই দেখি না। ~~জগতে আর মোসাই নাই, খাঁটি কস্তূরীও নাই।~~ শিকারীরা খাঁটি কস্তূরী দেয় না, দিলে তাহাদের ব্যবসায় চলে না।

গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অনেক কস্তূরীর পরীক্ষা করিয়াছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে খাঁটি জিনিস কখনও চক্ষে ঠেকে নাই। নেপালের এবং নাইনীতালের আমাদের পরম আত্মীয় ব্যবসায়ীও খাঁটি জিনিস দিতে পারেন নাই। আসাম এবং দার্জিলিং হইতে আমার আত্মীয়েরা যে জিনিস পাঠা-ইয়াছিলেন, তাহাও খাঁটি নয়। বিশেষ সুযোগে আমি তিন বারে তিনটী আসল নাভি পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে সুবিধা সচরাচর অদৃষ্টে ঘটে না।

শিকারীরা অনেক প্রকারে জিনিস ভেল করে। পাহাড়ের দুর্জ্জয় শীতে মাংস প্রভৃতি পচে না, দীর্ঘকাল থাকিলে শুকাইয়া যায়, তাই শিকারীরা হরিণের পেটের চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া তাহার মধ্যে টাট্‌কা রক্ত পূরিয়া দেয়। পরে এমন কৌশলে সমস্ত টুকু কোঁচকাইয়া আঁটিয়া বাঁধে যে, ঠিক প্রকৃত নাভির মত লোম পাক দেওয়া; উপরে চেপ্‌টা কাটার দাগ,—ফলকথা নাভিটা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, তাহা বুঝিয়া লইতে কিছু কষ্ট হয়।

এই গেল নাভির কথা। কস্তূরী তেল করিবারও কৌশল অনেক। আসল কস্তূরী কাল ও কটাসে। কটাসে কস্তূরীই ভাল। দানা ছোট ছোট; চট্‌চটে ও চেপ্‌টা চেপ্‌টা। চিবাইলে অল্প তিক্ত লাগে ও দাঁতে জড়াইয়া যায়। অধিক নাড়িয়া চাড়িয়া আঘ্রাণ লইলে এবং অধিক পরিমাণে খাইলে গা বমিবমি করে। এই সকল গুণের অনুকরণ করিবার নিমিত্ত শিকারীরা পুর্ব্বাহ্নে কস্তূরীমৃগের রক্ত, মাংস ও বিষ্ঠা একত্র কুটিয়া তাহাতে গাছের আটা তিক্তপাতার রস মিলাইয়া পুনঃ পুনঃ ছাগমূত্র দিয়া শুকাইয়া রাখে। টাট্‌কা নাভির ছিদ্রে নল পরাইয়া দিলে ভিতরে কস্তূরী গাঢ় হইয়া যায়। তখন নলটী খুলিয়া আসল কস্তূরী বাহির করিয়া লইয়া ভিতরে মৃগটার টাট্‌কা রক্ত, সীসা, বালি ও, প্রস্তুত করা কুট্টিত মাংস প্রভৃতি পুরিয়া দেয়। কাজেই নাভিটার বাহিরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভিতরের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার যো নাই। অতএব ভিতরে খাটি জিনিস আছে কি না, তাহা বুঝিতে হইলে নাভিটী কাটিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু কেবল চোখের দেখায় জিনিসের ভাল মন্দ বিচার হয় না। চাকিলে নয়, নাড়িলে চাড়িলে নয়, আঘ্রাণেও নয়। রাসায়নিক পরীক্ষাই বিশুদ্ধ কস্তূরী চিনিবার একমাত্র উপায়। কি প্রকারে বিশুদ্ধ কস্তূরী চিনিতে হয়, তাহার উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

উৎকৃষ্ট কস্তূরী চিনিবার নিমিত্ত চক্রদত্তে যে উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

"ঈষৎ ক্ষারানুগন্ধা তু দগ্ধা যাতি ন ভস্মতাম্।
পীতা কেতকগন্ধা চ লঘুস্নিগ্ধা মৃগোত্তমা।"

যে মৃগমদ ঈষৎক্ষার গন্ধযুক্ত; পোড়াইলে ভস্ম হয় না। পীতবর্ণ, এবং যাহাতে কেয়া ফুলের মত অল্প অল্প ঠাণ্ডা গন্ধ আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট।

প্রাচীন পুস্তকে আছে বলিয়া এই প্রমাণটা তুলিয়া দিলাম। কস্তূরী পরীক্ষার প্রশস্ত উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। কস্তূরীতে বালি মিশ্রিত থাকিলে চিবাইলে কির্‌কিরে লাগে।

২। রক্ত মিশ্রিত থাকিলে ছুরীর ফলাতে কস্তূরী রাখিয়া অগ্নি শিখার উপরে ধরিলে পুড়িবার সময়ে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তদ্ভিন্ন উহার পার্ক্লোরাইড্ অব্ মার্কিরির দ্রব দিলে রক্তের আল্‌বুমেনের তলানী পড়ে।

৩। সীসা থাকিলে ছুরীর ফলাতে কস্তূরী রাখিয়া অগ্নি-শিখার উপরে ধরিলে সীসা গলিয়া বাহির হইয়া যায়।

৪। খাঁটি কস্তূরী পোড়াইলে অগ্নির শিখা শাদা রঙের হয়; এবং পুড়িয়া গেলে খুব হাল্কা ও স্পঞ্জের মত ফাঁপা কয়লা পড়ে।

৫। চা ভিজাইবার মত খুব ফুটিত উষ্ণজলে কাঁটা প্রস্তুত করিলে বিশুদ্ধ কস্তূরীর শতকরা আশী ভাগ দ্রব হইয়া যায়। কস্তূরী ভেল হইলে অনেকটা পড়িয়া থাকে; খারাপ জিনিসের কিছুই দ্রব হয় না। বিশুদ্ধ কস্তূরীর কাণ্টা কটা ও লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ।

৬। বিশুদ্ধ সুরাতে কস্তূরী ভিজাইলে প্রায় অর্দ্ধাংশ গলিয়া যায়। অরিষ্টের বর্ণ রক্তপীত। তাহাতে জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধবৎ হয়।

৭। ইথারে ভিজাইলে খাঁটি কস্তূরীর প্রায় কিছুই থাকে না।

৮। বিশুদ্ধ কস্তূরীর কাণ্টে লিট্মস্ দ্রব দিলে রক্তবর্ণ হয়। কৃত্রিম জিনিসে সেরূপ হয় না।

৯। খাঁটি কস্তূরীর কাণ্টে পার্‌ক্লোরাইড্ অব্ মার্করি দ্রব মিশাইলে কিছুই তলানী পড়ে না।

১০। খাঁটি জিনিসের কাণ্টে হীরাকস, আসিটেট্ অব্ লেড্ কিংবা মাজুফলের কাণ্ট মিশ্রিত করিলে তলানী পড়ে। কৃত্রিম জিনিস হইলে ঐ সকল দ্রব্যের সহযোগে তলানী পড়ে না।

১১। ঐ কাণ্টের সঙ্গে নাইট্রেট্ অভ সিলভার দ্রব মিশাইলে শ্বেতবর্ণ তলানী পড়ে। তাহার পর উহা আলোতে রাখিলে ফিকে নীলবর্ণ হইয়া যায়।

১২ নাইট্রেট্ অব্ মার্করির সঙ্গে ঐ কাণ্ট মিশ্রিত করিলে কটাবর্ণ তলানী পড়ে।

১৩। ইথরের অরিষ্ট জলের উপরে রাখিয়া বাষ্পস্বেদ দ্বারা উড়াইয়া দিলে নিম্নে কটাবর্ণ, চট্চটে আটার মত দ্রব জমিয়া যায়, উহাতে জল মিশাইলে দুগ্ধবৎ হয়।

মৃগমদকস্তূরীর রাসায়নিক পরীক্ষার কথা এই পর্য্যন্তই ভাল। মৃগমদ কিনিতে হইলে আগে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মুখে চাকিয়া এবং নাকে আঘ্রাণ লইয়া কিনিলেও ঠকিতে হয়। ~~এখানে আরও একটা বেশী কথা বলিয়া রাখি; বাহারে আকাশকুসুম এবং বিশুদ্ধ নামের মৃগমদকস্তূরী ক্রয় করিতে গেলেই হাতে হাতে ঠকিতে হয়।~~

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

জাল প্রতাপচাঁদ।

পরাণ বাবুর নানা কৌশল ও কাঞ্চননগর হইতে দূরীকরণ

কাঞ্চননগরে প্রতাপচাঁদের আদর দেখিয়া পরাণ বাবুর ভয় হইল।

জনরবে পরাণের প্রাণ উড়ে যায়।
কিসে নিবারণ করি এহেন জনায়॥
আপন জননী তারে কহিল বিশেষ।
তন্ত্র মন্ত্র আরব্ধ করিল দিতে ক্লেশ॥
মন্ত্র বাণ নিক্ষেপণ করে তুষ্ট চিত।
অঙ্গে না পরশি বাণ ছেদ হইল ভিত॥
অট্টালিকা করি ভেদ বাণ গেল চলি।
অন্তর্য্যামী জানিয়া করেন পদচালি॥
কথার প্রসঙ্গে কথা করেন প্রচার।
বাণ ব্যর্থ হইল পাইল সমাচার॥
সহরে হইল গোল ভাবিত পরাণ।
কেমনে সন্ন্যাসী যায় করয়ে সন্ধান॥
রহিলে সন্ন্যাসী বড় হইবে সঙ্কট।
করিল সংবাদ মেজেষ্টরের নিকট॥
সহর হইতে দূর করি দিবার প্রার্থনা।
সাদর করিতে সাধ নাতক পরোয়ানা॥
এ আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলেক মেজেষ্টর।
জজকে জানায় একথার প্রত্যুত্তর॥
শুনি জজ মাজেষ্টর কালেক্টরে লইয়া।
ভাক্ত সন্ন্যাসী হইলে আনিব ধরিয়া॥
এভাবে সাহেব লোক যায় দেখিবারে।
পাঠায় চাপরাশী এক থাকিয়া অন্তরে॥
সন্ন্যাসীরে কহয়ে আসিয়া করে দেখা।
হুকুমে চাপরাশী যায় মর্জ্জি করি বাঁকা॥
গতমাত্র দৃষ্ট করি টুটে অহঙ্কার।

জোর হাতে বিনয়ে কহিল সমাচার।
শুনিয়া সন্তোষ হইয়া কহিলেন হাসি।
কি কাজ সাহেব দেখা আমিত সন্ন্যাসী॥
দেখিবার থাকে সাধ আসুক সাক্ষাৎ।
পূর্ব্বরীত বর্ত্ত মত করিব পশ্চাৎ॥
শুনিয়া চাপরাশী আসি কহিল সাহেবে।
বাক্যছন্দ বন্ধ ভাবি মনে মনে ভাবে॥
তিলেক না তিষ্টেন তথা আইল স্বস্থানে।
হুকুম রদুল অনুমানি মনে মনে॥
সত্য ছোট মহারাজ বাহাদুর না হইলে।
জজ মেজেষ্টরকে এমত কেবা বলে॥
স এব লোকঃ স এব ধর্ম্মঃ মিথ্যা তাকি হয়।
বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিল নিশ্চয়॥
মনে মনে পরাণের ভয় উপজিল।
নানা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল॥
জানিলেন অন্তর্য্যামী পরাণের অন্তর।
নিশাভাগে রাত্রিযোগে হইয়া সত্বর।
বিষ্ণুপুর গড় মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
কিয়ৎকাল রহি সান্তাইব বাহুক্লেশ॥

বিষ্ণুপুরে গমন।

শ্রীরাজের ছত্রধারী মল্লাবলি নাথ।
আতিথ্য স্বীকার করি তারে অকস্মাৎ॥
স্বপ্নসম জানাইতে পাইয়া চেতন।
সত্বরে আসিয়া রূপ করি দরশন॥
সেবার আলয়ে সেবা নিযুক্ত করিয়া।
পরিচয়ে পরিচয় মাগিল আসিয়া॥
অলক্ষ্য সাহা ফকির বলি দেন পরিচয়।
শুনিয়া রাজার মন না হয় প্রত্যয়॥

ছোট মহারাজ প্রতাপচন্দ্র মনে হয়।
করেন তঞ্চক রাজার হইল সংশয়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভঙ্গিতে হইল মন।
জল মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন অনুক্ষণ।
মহাহ্রদ গম্ভীর জল দহ যারে কয়।
স্নান ছলে সেই জলে নামাই আশয়॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া হরি চলি যাই তথা।
দহ মধ্যে ডুবিলেন শুন তার কথা॥
প্রহর পর্য্যন্ত ডুবি থাকিলেন হরি।
রাজা আদি সব লোক হাহাকার করি॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিয়া অন্তর।
দহ হইতে উঠিলেন জগৎ ঈশ্বর॥
যে হয়েন সে হয়েন সেবা করিব চরণ।
গোপালচন্দ্র মহারাজার এই হইল মন॥
বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ কহয়ে বচন।
প্রতাপচন্দ্র মহারাজা বটেন এই জন॥
কপট পরিচয় দেওয়া বুঝিল অন্তর।
ভক্তিভাবে কিন্তু সেই সেবাতে তৎপর॥
বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ময়।
জনবর কলরব হইল অতিশয়॥
পরস্পর পরাণচন্দ্র করিয়া বিচার।
বাঁকুড়ার মেজেষ্টরের করয়ে দরবার॥
দিবানিশি মনে মনে রচিয়া মন্ত্রণা।
না থাকেন সন্ন্যাসী দেশে করিল প্রার্থনা॥
স্বয়ং মেজেষ্টর বিষ্ণুপুরেতে পয়ান।
আপন নজরে দেখে কত ভঙ্গিমান॥
পরিচয় মাগিতে কহেন পরিচয়।
অলক্ষ্য সাহা ফকির আমি ফিরি নিরাশ্রয়॥
যেথানে পিরিতি পাই যাই সেই স্থান।
সন্ন্যাসী প্রকৃতি এই কর অনুমান॥

তর্জ্জন গর্জ্জন কত করে মেজেষ্টর।
নির্ভয় শরীর যার তার কারে ডর ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন কথা আমান্য করিয়া।
মৌনী হইয়া থাকিলেন আসনে বসিয়া ॥
দারগায় মদদ রাখি করিয়া পরাণ।
নিজতক্তে বসিয়া করেন অনুমান ॥
পরাণচন্দ্র বাবুর চাকর মোক্তিয়ার।
মেজেষ্টর তাহার স্থানে লইয়া ইজাহার ॥
যাহাতে সন্ন্যাসী জেলায় থাকিতে না পায়।
ইজাহার উপলক্ষে কৌশলে জানায় ॥
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যাইতে জেলান্তর।
অচিরাৎ পরোয়ানা হইল সাদর ॥
দারোগা মারফতে করে পরোয়ানা জারি।
শোকে বিষ্ণুপুর মগ্ন হইল যে ভারি ॥
ত্যজিল আহার নিদ্রা নিরানন্দ সবে।
ব্রজনাথ মথুরা গমন যেন হইবে ॥
তথি মধ্যে দেখ এক খেলার তরঙ্গ।
গবর্ণর কৌন্সিলে কথা হইল প্রসঙ্গ ॥
অকস্মাৎ ইংরাজী চিঠি কেবা করে জারি।
শ্রুতমাত্র কৌন্সিলেরা যথার্থ বিচারি ॥
পূর্ব্ব পরোয়ানা পরিবর্ত্তে পরোয়ানা।
ইচ্ছামত থাকিবেন কে করিবে মানা ॥
তৃতীয় দিবস মধ্যে জারি আচম্বিত।
বিষ্ণুপুরবাসী যত শুনি চমকিত ॥
কেহ কহে কেহ যদি সন্ন্যাসী অতীত।
এত কি ক্ষমতা ধরে দরবার শাসিত ॥
আরত সন্ন্যাসী আইসেন হাজারে হাজার।
এত ক্ষমতাপন্ন কোথা দেখ আর ॥
প্রত্যক্ষ অনুমান সিদ্ধান্ত মানি।
নিশ্চয় জানিও প্রতাপচন্দ্র বটেন ইনি ॥

পূর্ব্বপরিচিত চিহ্ন যথার্থ বিচারে।
সত্য প্রতাপচন্দ্র বিনা অন্য কেবা পারে॥
নিরাপদে চতুর্ম্মাস তথায় বিরাজ।
*　　*　　*

কারাবাস।

বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপচাঁদ জামকুরি নামক স্থানে গমন করেন। তাঁহার অনুচরগণ ইতঃপূর্ব্বে আসিয়া জুটিয়াছিল। সেখান হইতে কাশীপুর নামকস্থানে যান। তথাকার রাজা গৌরনারায়ণ * তাঁহার খুব যত্ন করেন। তাহার পর প্রতাপচাঁদ স্বদলে বাঁকুড়া যাত্রা করেন।

স্বরূপাঙ্গ করি রঙ্গ লিখি পরিচয়।
যাহাতে ম্লেচ্ছ কর্ম্মকারক প্রত্যয়॥
ম্লেচ্ছ জান্দরেল মানভূমে করি থানা।
তাহার নিকটে পত্রী করেন রওনা॥
লিপিতে বিশেষ জানি না করে নিষেধ।
নিজধাম যাইতে বিধি তাহে নাহি ভেদ॥
পদাতিক সহ সঙ্গে স্বরূপাঙ্গ চলি।
শিবিকা বাহনেতে মনের কুতূহলী॥
রাণীদত্ত শিবিকায় রূপ আরোহণ।
ক্রমে ক্রমে চলিলেন বন উপবন॥
চলে পদাতিক করি লঙ্গা তলোয়ার।
কি হইবে সম্মুখ জিবে দেখি চমৎকার॥
বাকুন্দা সহর মধ্যে যেই উপনীত।
শাঙ্গা হাতি দেখি দারোগা কম্পিত॥
ম্লেচ্ছ হাকিম হুদ্দা নিষেধিতে ভার।
অবিচার কর্ম্ম জানি হয়ে হুসিয়ার॥
কাটকে আটক করি করিল মন্ত্রণা।
আগে সরি যাইয়া চলিতে করে মানা॥

---

* সঞ্জীব বাবু বলেন রাজা জয়সিংহ।

স্বরূপাঙ্গ শুনিলেন এতেক কাহিনী।
ঈষৎ ক্রোধ হয় উপরোধ নাহি মানি॥
প্রাণভয়ে দারোগা নাজির বরাবর।
সবিশেষ সমাচার কহে সরাসর॥
নাজির প্রতিবন্ধ হয় তাহা না মানিয়া।
দোষহীন চলি যান লোক জানাইয়া॥
নাজির সংবাদ মেজেষ্টরে জানাইল।
শ্রুতমাত্র হয় আরোহণে আগাইল॥
ম্লেচ্ছো দেখিয়া স্বরূপাঙ্গ ক্রোধ করি।
শুনিয়া না শুনিয়া গমন ত্বরাত্বরি॥
রহুন হুকুম দেখি চলি মেজেষ্টর।
পণ্টনের কাপ্তেনে জানায় সত্বর॥
লইয়া পণ্টন এক কম্প তথা হইতে।
মোকাম বেলগুমি আসি ঘেরিল রাত্রিতে
সেনার শৈথিল্য তথি অলস সময়।
ধর মার শব্দ বিনা আন কথা না কয়॥
ইচ্ছাতে ইচ্ছুক হরি কে করে খণ্ডন।
করি সাধন হলেন ম্লেচ্ছ বন্ধন॥
যুগাদি মাসের চতুর্বিংশতি দিবসে।
বন্ধন স্বীকার করেন ম্লেচ্ছ নিবাসে॥
তথায় পরাণ চন্দ্র বাবুর মোক্তিয়ার।
ত্বরা করি লিখিয়া পাঠায় সমাচার॥
পত্র পাঠে হ'য়ে ব্যস্ত করিয়া মন্ত্রণা।
প্রত্যুত্তর পত্র মধ্যে লিখিল বাসনা॥
বিংশতি সহস্র মুদ্রা হস্তীর উপরে।
অবিলম্বে পাঠায় নজর মেজেষ্টরে।
বশীভূত অর্থেতে রূসত্ত লাল বাবু।
পূর্ব্বমায়া ত্যজি হতবুদ্ধি হয় কাবু॥
গোপীদত্ত রাঘব ভঞ্জ জীব পশুবৎ।
সত্য মিথ্যা করিবারে সবে এক মত॥

বাকুন্ধার পাঠক কৃষ্ণ থাকে মোক্তিয়ার।
সবে মিলি এক যুক্তি করিয়া এবার॥
এ ভয় যাহাতে শান্তি হয় অচিরাৎ।
করিবে অবশ্য কহে করি জোড়হাত॥
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ে চলে তিন জন।
বাকুন্দার মোক্তার সনে হইল মিলন॥
একে মেজেষ্টর ক্রোধে অতিশয় ক্রোধ।
তাহাতে স্বপক্ষ পরাণ বাবুর উপরোধ॥
মাতিল মাতঙ্গ সম মত্ত অনিবার।
নানা ছিদ্র ঢুরিল করিতে অবিচার॥
জমিয়ৎ বস্তু ইজাহারি প্রতাপচন্দ্র।
কৌশলে এত্তালা করি বাঁধিল নরেন্দ্র॥
মিথ্যা সাক্ষী ইজাহার মতলবের পক্ষে।
লিখিল জোবানবন্দী কেবা করে রক্ষে॥
ধরিয়াছে ধরি চোর এত মনে সাধ।
অধরা ধরিতে চোর বড়ই প্রমাদ॥
শুনিলেন সাক্ষীর বিপক্ষ আচরণ।
বাক্যে বাক্যে করি রদ দুই চারি কথন॥
সক্রোধিত স্বরূপাঙ্গ ব্যঙ্গ উপহাস।
সাক্ষী মেজেষ্টর প্রতি করেন আভাষ॥
বাকুন্দা নিবাসী লোক মিথ্যা সাক্ষী জানি।
অপ্রমাণ বাক্য কত কহিল কাহিনী॥
ছোট লোক উচ্ছিষ্ট হারি পেলি মারে কত। (?)
সম্মায়নি হাথে কত মারিতে উদ্যত॥ (?)
ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণরক্ষা পলাইয়া যায়।
বর্ব্বর বলিয়া অখ্যাতি লোকে গায়॥
রূপ স্বরূপাঙ্গ করি কুঠারি বন্ধন।
গাছ মরিচের ধূমা যোগায় তখন॥
অষ্টম দিবস রাখি এই মত করি।
লোক জানাইতে লীলা প্রকাশেন হরি।

অষ্টম দিবসান্তরে দেখি মেজেষ্টার।
ঝলকে রূপের ডালি রূপ মনোহর॥
আহার খর্ব্বতা করি কত কষ্ট দিল।
দ্বিতীয় সঙ্গীত পদ অনুপ রচিল॥

*　　*　　*

কারাগারে হরি বন্দী　　ম্লেচ্ছ না পায় সন্ধি
কত নন্দী করে মত্ত বেশে।
বাবু দুর্গামঙ্গল　　শুনিয়া বন্ধন বোল
উত্তরোল মনের সাহসে॥
বিপদে কুলাব কার্য্য　　সাপক্ষ হইয়া সাহায্য
যে পারি কিঞ্চিৎ সাধ্য বলে।
এই মনে করি আস　　ত্যজিলেন নিজ বাস
বনবাস জঙ্গল মহলে॥
বাকুন্দার করি বাসা　　পুরাণ মনের আশা
রূপ স্বরূপাঙ্গ দরশনে।
তিন অংশ এক ঠাঁই　　আহ্লাদের সীমা নাই
হনুমন্ত মিলিল সেখানে॥
মনোগত মনকথা　　সবে বিচারি বারতা
স্থির যথা বিধাতা লিখিত।
খেলিব অলক্ষ্য খেলা　　বুঝা তার নিজ লীলা
করি হেলা হিতে বিপরীত॥
জীব জন্য এত ক্লেশ　　সহিবেন হৃষীকেশ
সবিশেষ পশ্চাৎ বিদিত।
পরস্পর করি খেদ　　বিচ্ছেদে পুনঃ বিচ্ছেদ
কহি ভেদ চেতন চরিত॥
ক্ষেত্রমোহন সিংহ পর　　করি ক্রোধ মেজেষ্টর
কহে কহ সমর্থ যে বোল।
কি জন্য সহায় হইলে　　অবিচার কেন করিলে
সঙ্গে তৈনাত দিয়া গোল॥
ক্ষেত্রমোহন সিংহ কয়　　পরিচয় পরিচয়
প্রতাপচন্দ্র জানিলাম মনে।

মহতের এই নীত সবার করিতে হিত
সাশ্রুরীত (?) করিল সদনে ॥
ইথে ধর কিবা দোষ, কি করিলাম অপৌরুষ
কেন রোষ করি অবিচার।
সত্য কোথা মিথ্যা হয় অধর্ম্মের নাহি জয়
কি সংশয় হও শাস্তি তার ॥
তেজশ্চন্দ্র মহারাজ ধীরাজ জগমাঝ
এ কি লাজ সে জন সন্তানে।
করিলে যে অপমান বিচারে কওয়াবে মান
যার মান যাবে তার স্থানে ॥
এত কহি ক্ষেত্রমোহন সিংহ চলিলেন।
রূপ স্বরূপাঙ্গ সাক্ষাতে দেখিলেন ॥
মন মত মেজেষ্টর না শুনিয়া বোল।
নজরবন্দী থাকিতে হুকুম উত্তরোল ॥
হাকিমান হুকুম রহুল করে কেবা।
সহজে আটক হরি ঘটাইলেন যেবা ॥
* * * *

হুগলি গমন।

বাঁকুড়ায় বন্দী রূপ সহ স্বরূপাঙ্গ।
তথি মধ্যে দৈবযোগ দেখনা তরঙ্গ ॥
সদর কৌন্সল হতে আইল পরোয়ানা।
বাকুন্দার মেজেষ্টরে তম্বি করি নানা ॥
হুগলি আসন মধ্যে হইবে বিচার।
যতনে প্রতাপচন্দ্রে পাঠাইতে তার ॥
চৈত্র মাস রহি তথা হুগলি গমন।
বাকুন্দায় স্বরূপাঙ্গ করিল বন্ধন ॥

মহা হুলস্থুল।

হুগলিতে হুলস্থুল ঘটে দরবার।
বিনা আহ্বানে আইসে নানা সহকার ॥

মিলিলেন বিভীষণ অংশ অবতার ।
ম্লেচ্ছকুলেতে সে গিরিল নাম যার ॥
সাহা * সাহেব বলিয়া নাম সুগ্রীব সোসর ।
লুটিস নীল বেনট নল যার অনুচর ॥
সুরীত শ্রীনাথ বাবু অতি প্রিয়তম ।
পূর্ব্ব পরিচিত জন এবে আছে ভ্রম ॥
কুবের যক্ষেশ্বর ধনের ঈশ্বর ।
রাধাকৃষ্ণ বসাক বাবু তাহার কিঙ্কর ॥
ততোধিক জয়গোপাল পরিবার ।
দিয়া ধন তোষে মন এত শক্তি যার ॥
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র পবিত্র সে জন ।
পরহিতকারী এত তপির কারণ ॥
আর কত লোকে কত যোগাইল ডালি ।
সহর কলিকাতা হদ্দ চুঁচুড়া হুগলি ॥
হইল রূপের মেলা আলো ত্রিভুবন ।
দরশন করণে লোক পাশরে আপন ॥
ইথে সসিয়ান জজ করি অবিচার ।
বর্ষ এক আটক ফাটকে অবিচার ॥
চল্লিশ সহস্র মুদ্রা, মেয়াদের পর ।
তাইন জামিন হইলে পর অবসর ॥
প্রতাপচন্দ্র প্রতি এই হুকুম সাদর ।
স্বরূপাঙ্গ প্রতি হুকুম হয় স্বতন্তর ॥
বর্ষ এক মেয়াদ বাদ হইলে জামিন ।
দশ সহস্র মুদ্রা করি তাহার তাইন ॥
হইবেন তবে অবসর স্বরূপাঙ্গ ।
ম্লেচ্ছ অবিচার সংপ্রতি হয় সাঙ্গ ॥

* W. D. Shaw.

ইয়ুনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট ও

ভারতীয় শিক্ষা।

ভারতবর্ষের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে আমরা যে সমস্ত সুবিধা এবং সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপর সাধারণ সকলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার চেষ্টা এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতাকেই আমরা সে সকলের মধ্যে মুখ্যতম বলিতে পারি। প্রাচীন ভারতে কি ছিল, তাহার সহিত তুলনায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে সব আলোচনার প্রয়োজন নাই, সে প্রাচীন স্মৃতির চিতাভস্ম লইয়া চিন্তা করিয়া সুখ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে ইংরেজ রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশে শিক্ষার বিস্তৃতির সহিত বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার বিস্তৃতির তুলনা হয় না। তখনকার শিক্ষা এবং তদ্বিষয়ে সুবিধার সহিত এখনকার শিক্ষা সুবিধার তুলনা হইতেই পারে না। মাতৃভাষার উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেই যুগের বঙ্গভাষাও এই যুগের বঙ্গভাষার মধ্যে কতদূর পার্থক্য! এ যুগের বঙ্গভাষা তদপেক্ষা কত দূর উন্নত! এই উন্নতির মুলে যে ইয়ুরোপীয় শিক্ষা-প্রণালীর কৃতকার্য্যতা বিশেষরূপে বর্ত্তমান, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা ইংরাজি পড়িয়া মাতৃভাষাকে আদর করিতে শিখিতেছি, তাহার শোভা সম্পত্তি এবং অনুকরণ বিষয়ে যত্নবান হইতেছি,—ইংরাজিই আমাদিগকে সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, ইংরাজির সাহায্যেই আমরা সেই ভাণ্ডার হইতে শত শত অমূল্য মণি মাণিক্য আহরণ পূর্ব্বক মাতৃভাষার বরবপুঃ সজ্জিত করিতেছি; এবং বৈদেশিক ভাণ্ডার হইতেও রত্নান্বেষণ এবং আহরণ শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং ইংরাজি ভাষার এবং শিক্ষা-প্রণালীর নিকট আমরা যে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, তাহা আর বলিতে হইবে না। ইংরাজি শিক্ষা ভাল অথবা সংস্কৃত শিক্ষা ভাল, ইংরাজিতে আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান খর্ব্ব করিতেছে কি না, আমরা সে সমস্ত আলোচনা করিতে চাহি না। কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তদ্বারা আর্থিক, মানসিক অনেক প্রকারের উপকারের ও সুবিধার আশা আমাদের বিশেষরূপেই বর্ত্তমান

আছে; সুতরাং ইংরাজি উচ্চশিক্ষার প্রচলন যাহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে আমরা একান্ত উৎসুক এবং সচেষ্ট। সদাশয় গবর্ণমেণ্টও এপর্য্যন্ত আমাদের সেই আশা পরিপূরণ কল্পে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সময় সময় আবশ্যক মত উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় শিক্ষার অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এডুকেশন কমিশন, এডুকেশন ডিস্‌প্যাচ্ ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টের সেই ইচ্ছার ফল। এই সব তদ্বির তদারকে এপর্যান্ত উচ্চ শিক্ষা ক্রমশঃই দেশ মধ্যে বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া আসিতেছে এবং তদ্বারা দেশের দরিদ্র পল্লীবাসিগণের যে কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। দেশীয় সদাশয় অনেক ব্যক্তি এই শিক্ষার উন্নতিকল্পের সহায়তা করিতেছেন; অনেকে আবশ্যকীয় স্থল সমূহে বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকেরাও স্বীয় স্বীয় সন্তানগণের উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় অন্নবস্ত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতা হ্রাস করিয়াও মাসিক চাঁদা প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন; সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর হইতে এই সব বিদ্যালয়ের উন্নতি, স্থায়িত্ব শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি কল্পে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং পিতা যেমন সন্তানের স্বীয় ক্ষমতায় দণ্ডায়মান ও ভ্রমণের চেষ্টাকে আনন্দপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন এবং প্রতি পদে স্বীয় সবল হস্ত তাহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রাখিয়া তাহাকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেন, গবর্ণমেণ্টও ঠিক সেইরূপ ভাবে এই সব বিদ্যালয়কে উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন সে জন্য আপামর সাধারণ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সম্প্রতি গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের নিয়োগক্রমে যে এক বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দেশীয় উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ কল্পে বসিয়াছিল, তাঁহারা তদ্বিষয়ে যে রিপোর্ট জাহির করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ভারতীয় সকলেই বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। যদি ঐ কমিশনের পরামর্শ মত শিক্ষা-বিষয়ক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ ধনী সন্তান ব্যতীত মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রাবস্থার লোকদিগের পক্ষে সন্তানগণের উচ্চশিক্ষা প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

দেশীয় সকল সংবাদ পত্রেই এবিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। প্রবীণ সুযোগ্য সহযোগী বেঙ্গলী পত্র ঐ রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বেই কোন সূত্রে উহার আভ্যন্তরিক বিষয় অবগত হইয়া আসন্ন বিপদের বার্ত্তা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাপন করেন এবং তদ্বিরূদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সহিত আন্দোলন করিতে থাকেন; তারপর দেশীয় লোকদিগের ব্যগ্রতায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। এখন সকলেই ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলে ভারত-সভার পক্ষ হইতে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বৃহতী সভায় উহার আলোচনা হইয়াছে। সে সভায় অনেক বড় বড় বক্তা উপস্থিত ছিলেন। সভা হইতে কমিশনের প্রতিবাদ করিয়া এক দরখাস্ত বড়লাট সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। উপাধিধারীগণও সিনেট হলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা করিয়া এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে বলিয়া রাখি, আমাদের বঙ্গের গৌরবরবি সুসন্তান মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ঐ কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি কমিশনের অধিকাংশ সভ্যগণের কতকগুলি মতে একমত হইতে না পারিয়া পৃথক মন্তব্য দাখিল করিয়াছেন। যে সমস্ত পরামর্শ গ্রাহ্য হইলে দেশে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইবে, পূজনীয় গুরুদাস বাবু সে সবগুলিই স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় বিচার পূর্ব্বক সুন্দর-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট ইহাই আশা করি। তাঁহার মত ধার্ম্মিক, স্বদেশপ্রেমী ইহা ভিন্ন আর কোন্ পথ অবলম্বন করিতে পারেন? সুতরাং তাঁহার এই স্বাভাবিক চরিত্র ধর্ম্মের বিশেষ প্রশংসাবাদ বা ধন্যবাদ আর কি করিব?

আমাদের 'বীরভূমি' দেশের সেবক; শিক্ষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক। এজন্য আমরাও অতি সংক্ষেপে বর্ত্তমানে এবিষয় একটু আলোচনা করিব; আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের যে ইহার সহিত বিশেষ স্বার্থসম্বন্ধ জড়িত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কমিশন অনেক কথাই বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে কয়টি প্রধান আলোচ্য তাহা এই:—

১। যে সব বিদ্যালয়ে কেবল এল্, এ, পর্য্যন্ত পড়া হয়, সে সমস্তকে হয় বি, এ, শ্রেণী খুলিতে হইবে, না হয় এণ্ট্রান্সে নামিতে হইবে। হরিশ-

চন্দ্রের মত অথবা ত্রিশঙ্কুরমত অন্তরালে থাকিতে পাইবে না। ইহাদের এইরূপ দুই নৌকায় পা দিয়া থাকাতে নাকি বড় ক্ষতি হয়!

২। শিক্ষাবিধানের সৌকর্য্যার্থে বেতনের হার বেশ চড়াইয়া দিতে হইবে; অল্প বেতনের শিক্ষা অল্প হয়, সুবিধার হয় না; বেশী ছেলে ভর্ত্তি হইয়া একটা হট্টগোল হয়, বেশী বেতনের হার হইলে কলেজ শ্রেণীতে গরীবের ছেলেরা—যাহাদের তেমন কুশাগ্রধী নহে, বৃথা পয়সা খরচ করিতে আসিবেনা। যাহারা বুঝিতে সক্ষম, শিক্ষার ফল দেখাইতে সক্ষম, তাহারাই আসিবে। ইহাতে যদিও শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু কম হইবে, কিন্তু শিক্ষার বনিয়াদ পাকা হইবে, শিক্ষা ভাল হইবে।

৩। আইনের কলেজ সরকারী তত্ত্বাবধনে আনিতে হইবে। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় আইন বিদ্যালয় হইবে; আর সব উঠাইয়া দিতে হইবে।

৪। কলেজ প্রভৃতিতে যে আয় হয়, তাহা সত্ত্বাধিকারী লইতে পারিবেন না।

৫। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কোন ইংরাজি পাঠ্য বই থাকিবে না; এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্কুলে শেষ পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহাতে যাহারা পাশ হইবে, তাহারাই এণ্ট্রান্স দিতে পারিবে। পরীক্ষার পাশের নম্বর বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। এণ্ট্রান্স স্কুল য়ুনিভার্সিটি ভুক্ত করিতে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীর সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে, সকল স্কুলই সব বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের অধীন থাকিবে।

৬। কলেজ সমুহের বন্দোবস্ত ভাল করিতে হইবে, শিক্ষার সুবিধার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন প্রয়োজন, কলেজ সমূহকে তাহা সমস্তই করিতে হইবে। বালকগণের নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতিরও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইত্যাদি।

কমিশন অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কয়েকটি আমরা লিখিলাম। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে যুবক ও বালকগণের পক্ষে হিতকর, সে বিষয় সন্দেহ নাই, আমাদেরও তাহাতে অন্যমত নাই। বালকগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যবিধানের জন্য কমিশন যাহা সব বলিয়াছেন, তাহা আমরাও অনুমোদন করি। তাহাদের নৈতিক উন্নতি, পাঠের ও জ্ঞানের উন্নতি, শিক্ষা সহবৎ, আচার ব্যবহার, তরিবৎ ইত্যাদির উন্নতি প্রভৃতির বিষয় আমারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি,

কমিশনের পরামর্শ ও আমরা বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিব। পরীক্ষার কঠোরতা আর কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, যাহাতে বালকগণ মুখস্থ বিদ্যা সম্বল করিয়া পাশ না করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করে, সে উপায় করা হয়, তাহাতেও আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট। কিন্তু আদৎ গলদ্ গোড়ায়। কমিশন উচ্চ শিক্ষা বৃদ্ধিকল্পে যে কলেজের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছেন, এফ, এ, কলেজ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন, বেতনের একটা নিম্নহার সরকার তরফ হইতে বাঁধিয়া দিতে বলিতেছেন, আইন কলেজ সব উঠাইয়া দিতে বলিতেছেন, এই সব বিষয়েই আমাদের আপত্তি এবং দেশের সর্ব্বসাধারণেরই আপত্তি।

এফ্, এ, কলেজ গুলি দ্বারা যে দেশের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ হইবার নহে। অনেক দরিদ্র সন্তান অল্প খরচে এই সব কলেজের কৃপায় এফ্, এ, পাশ করিয়া উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই সব কলেজের দ্বারায় উচ্চ শিক্ষার কোন ক্ষতি হইতেছে, তাহাত কেহই বলিতে সাহস করেন নাই, আর আমরাও সেরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাই নাই। স্বীকার করি, অনেক এফ্, এ কলেজে উপযুক্ত পুস্তকাবলী, যন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তাহাদের শিক্ষা দেওয়ায় অনেক ত্রুটী আছে, কিন্তু সে জন্য তাহাদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলাটা সুযুক্তি বলিয়া আমরা বলিতে পারি না। তাহাদের দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তাহারা ভাল সাজ সরঞ্জাম, শিক্ষার উপযোগী বিষয় সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, তাহাতে বাধ্য করা হউক, সে জন্য কেহ আপত্তি করিবে না, কিন্তু তাহাও বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সাজ সরঞ্জামের সমতুল্য সাজ সরঞ্জাম মফস্বলের কলেজ সমূহের পক্ষে করা সম্পূর্ন অসম্ভব। যাহা না হইলে নয় এইরূপ বিষয় সমূহে তাহাদিগকে বাধ্য করা হউক, এই কথা আমরা বলিতে পারি। যাহাদের সেরূপ সামর্থ্য আছে, তাহারা তাহা করিবে, যাহাদের নাই, তাহারা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। ইয়ুনিভার্সিটি উপযুক্ত লোক পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া এই সব কলেজ মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থা বেশ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের মন্তব্য অনুসারে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহা না করিয়া, তাহারা বি, এ, হইতে পারিবে না, এই কারণে তাহাদের মৃত্যু ব্যবস্থা করা কোন ক্রমেই সমীচীন

নহে। তাহারা যেরূপ আছে, সেই পদে তাহারা উপযুক্ততার সহিত কার্য্য করিতেছে কি না, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদে উঠিবার যোগ্যতার অভাব বশতঃ তাহাদিগকে পেষণ করিয়া মারিয়া ফেলা কিরূপ যুক্তি, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাহারা যে বিশেষ খারাপ ফল দেখাইতেছে তাহাও প্রমানিত হয় না। এরূপক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি এই নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু অনেক গরীব ভদ্রলোকের ছেলে পিলের কলেজ প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইবে, অনেকের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কষ্টজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কলেজ দ্বারা যে মফস্বলের গরীব ভদ্রলোকদিগের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কমিশন বলিতেছেন যে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর হইলেই থাকিতে পারিবে, তাহার মধ্যেও কথা উঠিতে পারে যে, প্রথম শ্রেণীর হইলে যে তাহাদের সমস্ত দোষ দূর হইয়া যাইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? তাহা হইলেই যে ভালরূপ যন্ত্র-তন্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম করিবে, ভাল লোক রাখিবে, তাহার অর্থ কি? সে জন্যও তো বিশ্ব বিদ্যালয়কে পরিদর্শক রাখিতে হইবে, পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে! সে পরিদর্শন, পর্য্যবেক্ষণ এখনও ২য়, শ্রেণীর উপর করিলে কি ক্ষতি হইবে, আমরা বুঝিতে অক্ষম।

তারপর বিদ্যালয় সমূহের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিষয়ে আমাদের প্রধান আপত্তি। কমিশনের যুক্তি এই যে, অল্প বেতনের হার করিয়া অনেক কলেজ অধ্যক্ষ কেবল ছেলে বাড়াইবার দিকে চেষ্টা করেন। শিক্ষা প্রণালীর সৌকর্য্যাদি বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ দেন না; সরকার হইতে বেতনের একটা নিম্ন হার বাঁধিয়া দিলে এরূপ হইতে পারিবে না। আরও কথা এই যে অল্প বেতনের জন্য অনেক গরীব অল্প মেধাবী বালক কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়, তাহারা তেমন শিক্ষা লাভও করিতে পারে না, অথচ ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র। এ যুক্তিরও বিশেষ সারবত্তা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে উপলব্ধি হয় না। কলেজের অধ্যক্ষগণ বেতন সম্বন্ধে কি করেন না করেন, সরকার বাহাদুরের তাহা দেখিবার বিশেষ অবশ্যকতা কি? তাঁহারা যখন সরকারী সাহায্যপ্রার্থী নহেন, তখন সে বিষয় তাঁহারা যেমন ইচ্ছা করুন, বিশ্ববিদ্যালয় রীতিমত আইনকানুন করিয়া একটা নির্দ্দেশ করুন যে, প্রত্যেক কলেজকে এইরূপ সব বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তো হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ যাহা চাহেন, সেরূপ ভাবে সব আছে কিনা, হইতেছে কিনা, তাহা দেখুন পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান করুন, তাহার পর যাহা উদ্ধৃত হয়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহা ইচ্ছা তাই করুন; তাহাতে কি আপত্তি ?

দরিদ্র বালকগণ অল্প মেধাবী বলিয়া তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইবে না, এটাও বড়ই একদেশদর্শিতা। যাহারা অল্প মেধাবী অথচ পরিশ্রমী, তাহারা একবার না হউক, দুই বারে কি তিন বারে উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে, এরূপ প্রমাণ আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত। চেষ্টার দ্বারা পুরুষাকারের প্রবল প্রভাবে মানুষ অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকে। আমরা এরূপ লোকের বিষয়ও জানি যে, প্রবেশিকায় অতিমন্দ বালক বলিয়া পরিগণিত ছিল, অঙ্ক-শাস্ত্রে কিছু মাত্র পারদর্শিতাছিল না, প্রধান শিক্ষক তাহাকে পড়িতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রবেশিকা কোনরূপে পাশ করিয়া বিশেষ চেষ্টাদ্বারা অঙ্ক শাস্ত্রে এরূপ দক্ষতা দুই বৎসর মধ্যে লাভ করিয়াছিল যে, দ্বিতীয় বিভাগে এফ্, এ পাশ করিয়াছিল এবং অঙ্ক শাস্ত্রে তাহার ১ম বিভাগোপযোগী নম্বর ছিল। সুতরাং কাহার মেধা কোন সময় কি ভাবে খুলিবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। এরূপ স্থলে একটা উচ্চ ধরণের বেতনের হার করিয়া দিয়া দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার পথরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। দরিদ্রগণের মধ্য হইতেই প্রায়শঃ মনীষীগণের উদ্ভব হয়, ইহা একটা চলিত কথা। দেশের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে অধিক মন্দ হইতেছ, লোকের অর্থকৃচ্ছ্রতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; এরূপ স্থলে বেতনের বৃদ্ধি প্রস্তাব উত্থাপিত করা কোন ক্রমেই অনুকূল বোধ হয় না। তাহা হইলে অনেকেরই বড় বেশী কষ্ট হইবে। আমরা জানি, অনেক পিতা স্বীয় আহার বিহারে অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্তানের পাঠের খরচ যোগাইয়া থাকেন, কমিশন একবার বিবেচনা করিবেন, এরূপ লোকদিগের দশা নবীন নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে কিরূপে হইবে। এবিষয় আমরা আর বেশী আলোচনা কি করিব। একজন দরিদ্র বলিয়া সে উচ্চ শিক্ষা পাইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা কি সঙ্গত ?

কমিশন উপযুক্ত দরিদ্রদিগের জন্য বৃত্তিদানের প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; অনেক প্রকার বাধা বিঘ্নে তাহা প্রতিহত হইবে, তাহারও অনেক প্রকার অপব্যবহারের আশঙ্কা আছে। তদপেক্ষা ও বিষয় ছাড়িয়া দিলেই কোন গোল নাই। ছাত্রগণ অর্থপুস্তক

সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি মুখস্ত করিয়া পাশ হইয়া যায়, একথা অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ। আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, একথা যথার্থ, কিন্তু সে জন্য ছাত্রগণকে দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল-বিভাগের ছাত্রগণের কথাই ধরুন:—তাহারা যে ইংরাজি সাহিত্য পুস্তক পাঠ করে, তাহার অনেক স্থল তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের তুলনায় বড় বেশী কঠিন। তাহার ভাব আয়ত্ত করা ও তাহা স্বীয় ক্ষমতায় প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। De Quinc র এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি নানা সমাসালঙ্কার ভূষিত পদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অথবা Smiles এর গম্ভীরপদা সরস্বতীর অর্থগৌরব উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষে বড় সহজ নহে; প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ করাইয়া দিতে শিক্ষকের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যায়, তথাপি যেন বোধ হয় বালক বুঝিতে পারিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে মুখস্ত করিতে হয়। ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক এত যে তাহাদের অনেকের ভাষাও এরূপ যে, সমস্ত পুস্তক বুঝিয়া পড়িয়া শেষ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা সংক্ষিপ্ত সারকেই সার করিতে বাধ্য হয়; শিক্ষককেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিতে হয়। পাঠ্য পুস্তকের ঔৎকর্ষ, পরীক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রভৃতির দিকে মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে এসব বিষয়ের অনেক উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমরা ভরসা করি। ইতিহাস প্রভৃতির ইংরাজি যাহাতে অতি সহজ হয়, সেরূপ ভাবে পুস্তক নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইংরাজির পাশ নম্বর আর একটু বেশী হউক, আমরা তাহাতে আপত্তি করি না, এবং আহ্লাদিত চিত্তেই সম্মতি দিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনেও যেন অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এবং প্রশ্ন করিতেও যেন সেইরূপ ভাবে প্রশ্ন করা হয়। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী এই যেন বিবেচনা করা হয়। সে ভাষা বিজ্ঞান, ধাতু তত্ত্ব প্রভৃতি অধীয়ান নহে, তাহা যেন স্মরণ থাকে। এণ্ট্রান্সস্কুল বিশ্ব-বিদ্যালয় ভুক্ত করিতে হইলে এখনও ইনস্পেক্টর বাহাদুরের মত না লইয়া আর হয় না সুতরাং সে বিষয় আরও বাঁধাবাধি নিয়ম করিয়া কড়াকড়ি করিবার কি আবশ্যকতা, আমরা বুঝি না। যাহা আছে, ইহাতে যদি ভাল কাজ না হয় তবে নবীন প্রণায়ই যে হইবে তাহা বোধ হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি কেবল নিয়ম প্রণয়নে ব্যস্ত না থাকিয়া তাহাদের

পালিত হওয়ার বিষয়েও বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কাজ ভাল হইতে পারে। শুধু নিয়ম বন্ধনেই কি ফল হইতে পারে ?

গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্কুল শেষ পরীক্ষার প্রবর্ত্তনে বিশেষ কি লাভ আর তাহার আবশ্যকতা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। বিশেষতঃ আমাদের স্থান সংক্ষিপ্ত সুতরাং আপাততঃ আমাদের এখানেই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। আবশ্যক বোধ করিলে অবসর ক্রমে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। এই সকল নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে দেশের সকল বড় লোকেই প্রতিবাদ করিতেছেন এবং আমরা বিশেষ ভরসা করি, সদাশয় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর দেশের এত লোকের আবেদনে উপেক্ষা করিবেন না। * উপসংহারে আমরা এক বিষয়ে কমিশনকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তাঁহারা দেশীয় ভাষাকে আরও প্রসর দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা সাহিত্য-সেবী দরিদ্র, আমাদের মাতৃভাষার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর দেখিলে আমরা বড়ই সুখী হইব। ইতি ১৩০৯ সাল ২২শে ভাদ্র।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মুমূর্ষু-কৃত্যে শোকাপনোদন। †

যে কালের প্রতীক্ষায় আর্যগণ ধর্ম্মব্রতে ব্রতী থাকিয়া আনন্দে সমস্ত জীবন উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন; যে পুণ্যরাজ্যের প্রজা হইবার মানসে আর্য্যগণের ঐহিক সমস্ত কর্ম্মস্রোত একই ধারায় প্রবাহিত হইতে; যে লোক উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, এই দৈহিক বিকার সকল আর ভোগ করিতে হয় না; যথায় রোগ নাই, শোক নাই, জড়শক্তির বিভীষিকা

---

* এই প্রবন্ধ প্রেসে প্রেরিত হওয়ার পর, এ সম্বন্ধে লাট সাহেবের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক যে সকল বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, লাটসাহেবও তাহার অনেক গুলিতে আপত্তি করিয়াছেন। বীঃ সঃ—

† এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ প্রণীত "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। লেখক কেবল স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র।

নাই, ইচ্ছার প্রতিঘাত নাই—বাদ, বিসম্বাদ, অন্যায়, অধর্ম্ম, কিছুই নাই; পরন্তু যথায় লোকে স্বকৃত ধর্ম্মোন্নতি অনুসারে উন্নত হইয়া জ্ঞানানন্দে, প্রেমানন্দে—সর্ব্বানন্দে অনুপম সুখসম্ভোগ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে; যে দিন এই কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যধাম (ভারতবর্ষ) ত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যলোকে যাত্রা করিতে হইবে; আর্য্যগণ সেই মহাপ্রয়াণের দিনকে ইহজীবনের মধ্যে পরম পুণ্যকাল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, দেশাদেশ ও পাত্রাপাত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই আর্য্যগণ ইহজীবনে পুণ্যকার্য্যের অবসর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষের সেই দিন এতই পুণ্যকাল যে, সে দিনে আর্য্যগণ বহির্জ্জগতের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

"পুণ্যকালাস্তদা সর্ব্বে যদা মৃত্যুরুপস্থিতঃ।
তদা গোভূহিরণ্যাদি দত্তম ক্ষয়তামিয়াৎ॥"

গোদান, ভূমিদান, হিরণ্যদান—সর্ব্বস্বদান করিয়াও চিত্তভার লাঘব করিবার জন্য সেই দিন আর্য্যগণের মন স্বতঃপ্রেরিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই দিনেই যথার্থ বৈরাগ্য ভাব হৃদয়ে দেখা দিয়া থাকে; এবং সেই দিনই সংসারের বিষয়, আশায়, ধন, মান, সকলেরই যথার্থ ছবি অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয়। সেই সর্ব্বস্বত্যাগের দিন যখন উপস্থিত হইবে, তখন মমতার গ্রন্থি সকল একে একে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকিবে। মানব কালচক্রে ভ্রাম্যমান হইয়া ইহসংসারে চিরদিনই যে মমতার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন; প্রবৃত্তিসমূহকে যে জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বোধে তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন ক্ষেপণ করিয়াছিল, যখন সেই মমতা—সেই প্রবৃত্তি সমূহের আবাসভূমি এই দেহ করাল কালের প্রবল বাত্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকিবে, তখন এই কর্ম্মভূমিতে মঙ্গল কার্য্যের জন্য যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, তাহাই ব্যগ্রচিত্তে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

"বন্ধুপুত্রকলত্রাদি ক্ষেত্রধান্যধনাদিষু।
মিত্রবর্গে চ দৈত্যেন্দ্র মমত্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥
মিত্রানমিত্রান্ মধ্যস্থান্ পরান্ স্বংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যর্থনোপচারেণ ক্ষাময়েৎ স্বকৃতং স্মরণ॥

ততশ্চ প্রযতঃ কুর্য্যাৎ উৎসর্গং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শুভাশুভানাং দৈত্যেন্দ্র বাক্য চেদমুদাহরেৎ॥

* * *

ন মেঽস্তি বান্ধবঃ কশ্চিৎ বিষ্ণুমেকং জগদ্‌গুরুম্।
মিত্রপক্ষে চ মে বিষ্ণুরধশ্চোর্দ্ধং তথাগ্রতঃ॥
পার্শ্বতো মূর্দ্ধি পৃষ্ঠে চ হৃদয়ে বাচি চক্ষুষি।
শ্রোত্রাদিষু চ সর্ব্বেষু মম বিষ্ণুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
ইতি সর্ব্বং সমুৎসৃজ্য ধ্যাত্বা সর্ব্বত্র বাচ্যুতম্।
বাসুদেবেত্যবিরতং নাম দেবস্য কীর্ত্তয়েৎ॥
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু শয়ীতঃ প্রাক্‌শিরাস্ততঃ।
উদক্‌শিরা বা দৈত্যেন্দ্র চিন্তয়ন্ জগতঃ পতিম্॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

যে দিন বন্ধু-বান্ধব ক্ষেত্র-ধান্যাদি হইতে স্বেচ্ছাত মমতা বিনিবর্ত্তন করিয়া ইহজীবনের সমুদায় কৃতকর্ম্ম স্মরণ করতঃ মিত্রামিত্র, আত্মপর, সকলের নিকট হৃদয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ইহসংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করিতে হইবে; পশ্চাৎ শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্ম হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া বিষ্ণুতে সমর্পণ করিতে হইবে; যখন বন্ধুবান্ধবগণ সকলে চিত্ত হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকিবে; যখন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, আলোক জগতের সমুদয় অবলম্বনই মুমূর্ষুর সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে তিরোধান করিতে থাকিবে; যখন উর্দ্ধ, অগ্র, মূর্দ্ধি, পশ্চাৎ, শ্রোত্র, চক্ষু, হৃদয়-কুত্রাপি কেহই আর অধিষ্ঠান করিবে না, তখন সেই জগদেকশরণ্য জগদ্বন্ধু সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই তাহার চক্ষু, কর্ণ, মন, সকলকে ব্যাপিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিবেন। পবিত্র দর্ভাসনে উত্তরশিরা বা পূর্ব্বশিরা হইয়া তখন বিষ্ণুর পরমপদই প্রার্থনা করিতে হইবে।

পৃথিবীরূপ বৃহচ্চুম্বকের উত্তর প্রান্ত আমাদের আবাসস্থান হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এ দেশে উত্তর প্রান্তের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণের প্রবলতা অধিক। জীবের মস্তিষ্কে সমুদায় স্নায়ুর মূলই নিহিত রহিয়াছে। সেই মূলগুলি যাহাতে সচৈতন্য থাকে, সেই উদ্দেশেই

মুমূর্ষুকে উত্তর শিরায় শয়ান রাখিতে হয়। এমন শুভজনক নিরবলম্বন যোগ জীবের ভাগ্য ইহজীবনে আর কখনই সম্ভবটিত্‌ হয় না। সে দিন সুপবিত্র গঙ্গাতীরে নাভিমগ্ন বা তদিতর স্থানে জলপূর্ণ গর্ত্তে পাদদ্বয় নিমগ্ন করিয়া অথবা তুলসী-সন্নিহিত তিলবিকীরিত গোময়োপলিপ্ত মণ্ডলাঙ্কিত স্থানে শিলারূপী দেবতীর্থ শালগ্রাম সমীপে যোগবেশ ধারণ করিয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে ইষ্টদেবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

"কর্ম্মযোগাদ যদা দেহী মুক্তস্তত্র নিজং বপুঃ।
তুলসী-সন্নিধৌ কুর্য্যান্মণ্ডলং গোময়েন তু॥
তিলাংশ্চৈব বিকীর্য্যাথ দর্ভাংশ্চৈব বিনিক্ষিপেৎ।
স্থাপয়েদাসনে শুভ্রে শালগ্রামশিলাং তদা॥

প্রেতকল্পঃ।

পরলোকগমনোন্মুখ আত্মীয়ের যোগচর্চ্চার ব্যাঘাত না হয়, এজন্য আত্মীয়গণ সে দিন তাহার সর্ব্বাগাত্রে গন্ধমাল্যানুলেপন, ও ধাতুদ্রব্যে নবচ্ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাকে যোগীবেশে সজ্জিত করিয়া দিয়া থাকেন। পাছে মনোবৈকল্যে ইষ্টদেবের বিস্মৃতি হয়, একারণ আত্মীয়বর্গ বাদ্যোদ্যম সহকারে কেবল হরিনামানুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন বায়ুরনিলমৃতমথেদং ভস্মান্তং কায়ঃ। ওঁ ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ক্রান্দোস্মর কৃতংস্মর" ইত্যাদি উপনিষদ্‌ সকল মুমূর্ষুর নিকট পঠিত হইতে থাকে। ফলতঃ এমন যোগের দিন—এমন আনন্দের দিন জীবের পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। একারণ মুমূর্ষুকৃত্য যথা ভাবে সম্পাদিত হইলে, আর্য্যগণ তাহাকেই সদ্‌গতি বলিয়া থাকেন।

"এবং জাতবিধানস্য ধার্ম্মিকস্য তদা খগ।
ঊর্দ্ধচ্ছিদ্রেণ গচ্ছন্তি প্রাণাস্তস্য মুখেন হি।
মুখঞ্চ চক্ষুষী নাসে কর্ণৌ দ্বারানি সপ্ত চ॥
এভ্যঃ সুকৃতিনো যান্তি যোগিনস্তালুরন্ধ্রতঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত ভাবে মুমূর্ষুকৃত্য সম্পাদিত হইলে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির ঊর্দ্ধচ্ছিদ্র অর্থাৎ মুখ, চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণ, এই সপ্ত দ্বার দিয়া প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া থাকে। যোগিগণের প্রাণ তালুরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হয়। এই সদ্‌গতির

জন্যই পুত্র-পৌত্রের প্রয়োজন। নতুবা "মাতাপিত্রোর্মৃতৌ যেন কারিতং মুণ্ডনং নাহি আত্মজঃ স কথং জ্ঞেয়ঃ সংসারার্ণবতারকঃ॥"

জীবনের মধ্যে যত প্রকার গুরুতর কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অন্ত্যক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম। গীতায় আছে,—

"যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

মুমূর্ষু কালে জীব যে ভাবে অবস্থিত করিয়া থাকিয়া দেহত্যাগ করে, পরকালেও তাহার সেইরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্মশানবন্ধুই আর্য্যের মতে পরম বন্ধু। যথা "রাজদ্বারে শ্মশানে চ য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"

মৃত্যুলক্ষণ বিশেষরূপে অবগত না হইয়া লোকে পাছে যথাকালে মুমূর্ষুকে গঙ্গাবাসী বা তাহার অন্ত্যক্রিয়ার আয়োজন করিতে না পারে; পাছে সেই অসময়েও তাহাকে ঔষধ ভক্ষণের জন্য ব্যস্ত করে এবং প্রাণপ্রয়াণ সময়ে পাছে অনশন-ব্রত ("প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কুর্য্যাদনশনং খগ") ধৃত না হয়, এই এই জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি-বলে মৃত্যুলক্ষণগুলি—এমন কি মৃত্যুর অনেক কাল পূর্ব্ব হইতেই এমন সুন্দররূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বস্তুতঃ আমরা ইহকালকে পরকালের এত অনুগত জানি বলিয়াই, আমাদের শাস্ত্রে মৃত্যুবিজ্ঞান ও নাড়ীবিজ্ঞান অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রে সেরূপ নাই। আজিকাল আমরা সুসভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে ও পূর্ব্ব পুরুষগণকে অবোধ ও কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া নিন্দা করিতে শিখিতেছি বটে" কিন্তু আমাদের জন্মকৃত্য ও মৃত্যুর কিছু মাত্র স্থিরতা নাই। সুতরাং এখন আমরা শৃগাল কুকুরাদির ন্যায় জন্মগ্রহণ করিতেছি—আবার তাহাদেরই মত অযথা ভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩০৯ সাল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩০৯. [২য় সংখ্যা

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ।	... ...	৩৩
২।	মুমূর্ষু-কাব্যে শোকাপনোদন।	(শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়) ...	৪৫
৩।	প্রবাদ প্রসঙ্গ।	(শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল)	৪৮
৪।	নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ।	(শ্রীআবদুল করিম)	

কীর্ণাহারের স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণাহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২্ টাকা এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

বীরভূমি।

৪র্থ ভাগ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩০৯।　　[৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ।

বড়ারি রাগ।

কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন।
বিষ মিশাইলে যেন এ ঘর করণ॥
পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
হাসিতে হাসিতে শ্যামের পীরিতি করিয়া।
নাহি যায় দিবা নিশি মরয়ে ঝুরিয়া॥
পীরিতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
তবে কেন বাঢ়াব লেহা কালিয়ার সনে॥
পীরিতি গরলে মোর হেন গতি ভেল।
আছিল সোনার দেহ হৈয়া গেল কাল॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে।
এমন পীরিতি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে॥ ২১০॥

রামকেলি রাগ।

সই আর কি জীবনে সাধ।
একুল ওকুল,　　দুকুল ভরিয়া,
বড়া হৈল পরমাদ॥
শাশুড়ী ননদী,　　গঞ্জে দিবারাতি,
তাহা বা সহিব কত।
পাড়ার পরশি　　ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত।

অবলা পরাণ এত কিনা সয়
শুনগো পরাণ সই।
মনের বেদনা যতেক যাতনা
আপন বলিয়া কই ॥
এ ঘর করণ কুলের ধরম
ভরম সরম গেল।
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল
নিশ্চয় মরণ ভেল ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধা
সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরজনা
কানুসে রহেছে বাটে ॥২১২॥

সুই রাগ।

সই রহিতে নারিনু ঘরে।
নিরবধি বলে কানু কলঙ্কিনী
একথা কহিব কারে ॥
ঘরে গুরুজনে যত আছে মনে
কালার কলঙ্ক সারা।
বিরলে যাইয়া সেখানে বসিয়া
নয়নে গলয়ে ধারা ॥
কি করিব বল, ইহার উপায়
শুনগো মরম সখি।
এ পাপ পরাণ সদাই চঞ্চল
ঘরে স্থির নাহি থাকি ॥
বিষে ভেল গৃহ ভোজন না রুচে
ঘুম নাহিক হয়।
শ্যাম পরসঙ্গ বিনে নাহি আর
শ্রবণ তা পানে রয় ॥
গৃহকাজে চিত না রহে বেচত (?)
কালার ভাবনা গাঢ়া।

চণ্ডীদাসে বলে শ্যামের পীরিতি
সকলি হইব ছাড়া॥ ২১৩॥

রাগ শ্রী।

সই মরিব গরল খেয়ে।
কানুর পীরিতি বিরহ বেয়াধি
আমারে বেড়ল সিয়া॥
কত না সহিব অবলা পরাণে
কুবচনে ভাঙ্গা দেহ।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
আন কি বুঝিব কেহ॥
হেন মনে করি বিষ খেয়ে মরি
দূরে যাউ যত দুখ।
অখলা রমণী কুলের কামিনী
সবার হউক সুখ॥
কত না সহিব সে কুবচন
সহিতে হইনু কালি।
হেন করি মনে এ ঘর করণে
দিবসে আনল জ্বালি॥
চণ্ডীদাসে বলে এমন পীরিতি
বিষম প্রেমের লেহা।
পীরিতি আরতি যার উপজিল
তার কি আছয়ে দেহা॥ ২১৪॥

শ্রীরাগ।

কুলের ধরম তরম সরম
সকলই হইল ছাড়া।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিনু
এবে সে হইল গাঢ়া॥
কে জানে এমন পরিণামে হব
এমন পাইব দুখ।

তবে কি পীরিতি করিমু আরতি
এ হেন প্রেমের সুখ ॥
এই দেখি ধারা প্রাণ হৈল সারা
বাঁচিতে সংশয় ভেল।
আছিল আমার সোণার বরণ
কাল হইয়া গেল ॥
চণ্ডীদাসে কহে শ্যামের পীরিতি
যে ধনী করিয়াছে।
পীরিতি আদর সে জন করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে ॥ ২১৫ ॥

রাগ বড়ারি ॥

সই আর কিছু কৈও নাগো।
সকল বজর পাড়িয়া পড়ল
গোকুলে নন্দের পো ॥
কে জানে পাইব এত অপবাদ
স্বপনে নাহিক জানি।
তবে কি তা সনে বাড়ামু মরমে
আথড় কুলের ধনী ॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
দেখিয়া কালিয়া কানু।
বিরহ বেয়াধি কত বা সহিব
কবে সে ত্যজিব তনু ॥
শুনহ সজনি হেন মনে করি
গরল ভখিয়া মরি।
তবে ঘুচে তাপ বিষম সন্তাপ
গোপতে গুমরি মরি ॥
কহে চণ্ডীদাস হিত আশ্বাস
পীরিতি এমতি রীত।
কেন এত তুমি করিছ বিষাদ
ক্ষণেক ধৈরয চিত ॥ ২১৬ ॥

রাগ আসাবরি।

সই কি ছার ই ছার ঘরে।
শ্যাম নাম নিতে না পারি গৃহেতে
তবে তারা হেদে মরে॥
কেবল রাধার পরিবাদ সার
সে সব কুলের মণি।
লোক চরচারে মনু মনু
কি ছার পরশী গণি॥
আমি সে লয়েছি শ্যাম হেমমালা
হৃদয়ে পরিয়াছি।
কহে যত জন শত কুবচন
সে বাহি লইয়াছি॥
চণ্ডীদাসে বলে শ্যাম সুনাগর
ভজহ কিশোরী গোরী।
লোক পরিবাদ মিছা যত হয়
গোকুলে গোপের নারী॥ ২১৭॥

সুই রাগ।

বিরলে বসিতে আছিল শুতিয়া
শুনগো পরাণ সখি।
নিশিতে আসিয়া দিল দরশন
কমল নয়ন আঁখি॥
পেয়ে বহুধন অমূল্য রতন
থুইতে নাহিক ঠাঁই।
কোন খানে থোব সে হেন সম্পদ
মোর পরতীত নাই॥
যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিরহ বেদনা অতি।
রাখে পেয়ে ধন আমার তেমন
ইহা না রাখিব কতি॥

আজি নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বন্ধুয়া মিলন কোলে।
হাসি বিনোদিনী কহে আধবাণী
কাসিয়া হাসিয়া বোলে॥
না পাই কহিতে বিরল হইয়া
মনে মোর যত আছে॥
চণ্ডীদাসে বলে আসি প্রিয়া মোরে
সে কথা কহিবে পাছে॥ ২১৮॥
ইতি মিলন রসোল্লাস ইত্যাদি॥

কেশপাশ দিয়া চরণ মুছায়ে
বিচিত্র পালঙ্কে লই।
অতি সুবাসিত বারি ঢালি ধারা
ধোওল চরণ দুই॥
মৃগমদ ভরি চন্দন কটোরি
অগরু তিমির তায়।
মনের হরিষে সুনাগরী রাধা
লেপিছে শ্যামের গায়॥
নানা ফুল দাম অতি সুশোভন
গলে পড়াইল রাধা
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘন,
তিলেক নাহিক বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ যেন শশধর
যেন পূর্ণিমার শশী॥
রাই সে চকোর পাই নিরন্তর
পিবই অবশ রাশি॥
চণ্ডীদাসে কহে হেন মনে করি
শুনহ কিশোরী রাধে।
মনের মানসে পাশ আশ দিয়া
দুটি করে যেন বাঁধে॥ ২১৯॥

তথা।

এক তরুবর দেখ উপজল
চারু শাখা ভেল তায়।
দুটি চাঁদ তাহে ফলল সুন্দর
দুই ফুল দেখি প্রায়॥
ফুলের উপরে পাঁচ শশধর
আচম্বিতে আসি রয়।
ফণীরত কিবা থগে থগে থগে
চাঁদে চাঁদে অতিশয়॥
ফণীতে ময়ূর দেখি একপর
মেঘে মেঘে আচ্ছাদিয়া।
কোকিল কুক্কুট ডাকিছে বেকত
উঠহ রসের প্রিয়া॥
দারুণ ননদী শাশুড়ী অবোধ
অবোধ পাড়ার লোকে।
নানা কথা কয়ে দিবেক আসিয়া
দিবেক গঞ্জনা মোকে॥
কি বলিব দুটি ও রাঙ্গা চরণে
সকল গোচর আছে।
চণ্ডীদাসে কয় তুরিতে গমন
লোকে আসি দেখে পাছে॥ ২২০॥

রাগ রাম কেলি।

বঁধু ছাড়িয়া না দিব তোরে।
মরম যেখানে রাখিব সে খানে
হেন মোর মন করে॥
লোক হাসি হউ যায় জাতি যাউ
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তুমি গেলে যদি শুন গুণনিধি
আর কোথা তুয়া পাব॥

আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
থুইতে সোয়াস্ত নাই।
এখন মরম দশা উপজিল
জুড়াব কোন বা ঠাঁই॥
কাহারে কহিব কেবা পিত্যাইব
আমার যাতনা যত।
তোমার কারণে এতেক সহি এ
নহে পরমাদ হত॥
রাধার বচন শুনি সুনাগর
গদ গদ ভেল দেহা।
আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ
মরমে বেঁধেছি লেহা॥
চণ্ডীদাস কহে দুই এক হয়ে
ইহার না হয়ে ভিন্ন।
বিহিসে বসিয়া দুহুঁ মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥ ২২১॥

কামোদ রাগ।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি॥
তুমি বিদগধ গুণের সাগর
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বেঁধেছ পীরিতি
অখল ব্রজের বামা॥
জাতিকুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ লইয়াছি।
যে কয় সে কয় তোমার বড়াই
এ দেহ সঁপিয়াছি॥

আনের অনেক আছে কত জন
রাধার কেবল তুমি।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিয়া
রাধারে না হয় বাম।
লোক মুখে শুনি তোমার মহিমা
সরল পঙ্কজ নাম॥ ২২২॥

রাগ সিন্ধুড়া।

বন্ধু তুমি নিদারুণ নয়ে।
তোমার কারণে কত পরমাদ
নিশ্চয় করিয়া কয়ে॥
বেদন কহিব কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন আমার কাটিয়া পড়য়েক
এমতি করয়ে বুক॥
যদি কোন থানে কাঁদি লোক স্থানে
শাশুড়ী ননদ তারা।
শ্যাম নাম বলি কাঁদে কলঙ্কিনী
এমতি তাহার ধারা॥
হেন করে মন শুনি কুবচন
গরল ভখিয়া মরি।
তার নাহি দায় শুন শ্যাম রায়
তোমারে ছাড়িতে নারি॥
তোমা হেন ধন ছাড়িব কেমনে
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
আর কোথা গেলে পাব॥
২২৪॥২২৫ প্রকাশিত।

ধানসি রাগ।

রাই কহে শুন কে জানে পীরিতি
আরতি রসের লেহ।
আন কেবা জানে রসের মাধুরী
বুঝিতে পারয়ে কেহ॥
পীরিতে আঁখরে যেমন পূরিত
কিছু কিছু জানে কেহ।
রসের রসিক রসে আরোপিত
সেই সে জানয়ে সেহ॥
কোন কুল রামা পীরিতি না জানে
সে জন আছয়ে ভাল।
মুই সে পীরিতি করিয়া পশিনু
এ দেহ হইল কাল॥
কায়মনচিত্তে ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লয়েছে রাধা।
এহেন সুখের ঘর বাঁধিয়াছি
তাহা কেন কর বাধা॥
অনেক যতনে পীরিতি রতন
ভাঙ্গিতে তিলেকে পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি।
চণ্ডীদাসে বলে এমন পীরিতি
শুনিতে জগৎ বশ।
দোঁহে সে জানয়ে দোঁহার তথ্য
আনে কে জানয়ে রস॥ ২২৬॥

কামোদ রাগ।

ঈষৎ হাসিয়া রাই পানে চেয়ে
কহে বিনোদিয়া কান।
তোমার মহিমা চাতুরী ইহা
কে জানয়ে আন॥

পরম দুর্লভ আনন্দ কৈশর
নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ারে হিয়ারে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিএ ধেনুর পাল।
গোলক ত্যজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল।
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি গান।
রাধা বিনে সব সুখের বৈভব
মনেতে নাহিক আন ॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসেন কতি।
এসব চাতুরী কেবা সে বুঝিব
কার আছে এত গতি ॥ ২২৭ ॥
রাগ কানড়া।
রাই তোমার মহিমা বড়ি।
গোলক ত্যজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি ॥
রসতত্ত্ব খানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি ॥
বস্তু বস্তু ভেদ রসচারু বেদ
ভেদ আছে নয় রস।
চারু সে পল্লব ছয় ছয় গুণ
ইহা কি আনের বশ।
নবস্ত ফরতি (?) আঠার প্রকার
পাঁচ গুণ তার হয়।

তর তম করি রসিক বুঝিলে
সিদ্ধি সাধনে কর ॥
ব্রজ ব্রজপুর ব্রজের মহিমা
তুমি সে ইহাতে রতি।
আট আট গুণ তটস্থ হইলে
বুঝিতে পারয়ে রীত ॥
চণ্ডীদাসে কহে এই সে মাধুরী
ব্রজেশ্বরী প্রিয় রাধা।
অসীম চাতুরী দোঁহার পীরিতি
প্রেম সুধা রসে বাধা ॥ ২২৮ ॥

রাগ করুণা বরাড়ি ॥
তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা
কেহ সে নারিয়াছে।
ভব বিরিঞ্চির তার অগোচর
কেহ সে জানিয়াছে ॥
কত শত শত ভাব অনুরত
যেমন মজিয়া থাকে।
কোটিক গুটিক এক কোন থানে
রসিক পাইয়া থাকে ॥
রসে রস পূরি প্রেমের পাসরি
সায়রে খুঁজিলে পাবে।
* * *
নয় গুণ যারে লবে ॥
এত তিন তটস্থ এ তিন বেকত
শতগুণ যাতে বসি।
তর তম করি বিচার করিলে
সেই এর অভিলাষী।
চণ্ডীদাস কহে গুণে গুণ মিশি
এ তিন বস্তু সাধে।

আছে এক রতি তাহে নাহি গতি
একথা বুঝিতে সাদে ॥ ২৯১ ॥

মুমূর্ষ-কৃত্যে শোকাপনোদন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গতবারে স্থানাভাবে আমরা সমস্ত কথা শেষ করিতে পারি নাই। শাস্ত্রে আছে ;—

"আতিবাহিক-সংজ্ঞোহসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ অপর প্রাণীর নয়, পরন্তু কেবল মনুষ্যের মৃত্যুকালে আতিবাহিক নামক একটী দেহ জন্মিয়া থাকে। ("ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ") মৃত্যুকালে এই দৃশ্যমান স্থূলদেহ হইতে তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই তিনটী ভূত বিচ্ছিন্ন হইয়া উর্দ্ধে গমন করে এবং অপর একটী নরদেহ গঠনের আয়োজন করিতে থাকে। শরীরের সমস্ত উষ্মা, ও প্রাণাপান বায়ু সকল প্রতি গ্রন্থি হইতে আকৃষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে একত্রিত হয় এবং পশ্চাৎ সেই সমস্ত জ্যোতিঃ উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তরূপে ভূতত্রয়ের উর্দ্ধ গমন সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তি বড়ই অস্থির হইয়া থাকে। সেই অস্থিরতাকেই লোকে শয্যাকণ্টক বলে। মস্তিষ্কের উর্দ্ধে যে দেহের সংস্থান হইতে থাকে, তাহার সাহায্য করাকেই ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কহে। এই ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধার জন্য মৃত্যুর পরক্ষণেই শবদেহে অগ্নি সংযোগ না করিয়া দ্বাদশ দণ্ড কাল অপেক্ষা করা আবশ্যক। ফলতঃ ধাতু দ্রব্যে নবদ্বার রুদ্ধ করিলে কি প্রকারে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার সাহায্য হয়, বিবিধ উপচারে কি প্রকারে ঐ উর্দ্ধদেহের পুষ্টিসাধন করিতে হয় ও দশপিণ্ড দান দ্বারা কি প্রকারে দশাবয়বের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে, ইত্যাদি কথা বারান্তরে আলোচ্য। পরন্তু এই ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকালে মুমূর্ষ ব্যক্তি যাহাতে শান্ত ও সুসমাহিত থাকিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের স্মরণ করিতে পারে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া বন্ধুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমাদের সহজ শরীরেই কোন প্রকার ধ্যান বা ইষ্ট স্মরণ করিবার সময় মনের চাঞ্চল্য বশতঃ কত বাজে কথা—

কত অনাহূত ভাব আসিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু মানবের মৃত্যু-রূপ বিষম বিপদ সময়ে বিষয়াসক্ত চঞ্চল মনকে স্থির রাখা কত দূর জ্ঞানের কার্য্য,—তাহা সহজেই অনুমেয়।

"নিত্যমুক্তো জগৎসাক্ষী আত্মাদেহেঽজোঽমরঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়যুতো জীবঃ শব্দাদিবিষয়ৈর্বৃতঃ।
কামরাগাদিভির্যুক্তঃ কর্ম্মকোষ সমন্বিতঃ॥
পুণ্যবাসনয়া-যুক্তো নির্ম্মিতে যেন কর্ম্মণা।
সম্প্রবিশ্য নবে দেহে গৃহে দগ্ধে যথা গৃহী॥

অর্থাৎ যখন জগৎসাক্ষী নিত্যমুক্ত অজর অমর আত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া কর্ম্মকোষ সমন্বিত কামরাগাদি এবং স্বীয় পুণ্য বাসনা ও পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত নবগেহে গৃহদগ্ধ গৃহীর ন্যায় প্রবেশ করিতে থাকিবে ; যখন,—

"বিমানমাদায় কিঙ্কিণী জালমালি যৎ। *
আয়ান্তি দেবদূতাশ্চ লসচ্চামরশোভিতাঃ॥
ধর্ম্মতত্ত্ববিদঃ প্রাজ্ঞাঃ সদা ধার্ম্মিকবল্লভাঃ।
তদৈবদং কৃতকৃত্যং স্বর্বিমানেন নয়ন্তি তে॥"

যখন কিঙ্কিণীজালজড়িত চামরশোভিত ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ধর্ম্মবন্ধু দেবদূতগণ মুমূর্ষুকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তৎসমীপে অবস্থান করিতে থাকিবেন, সে সময়ে যদি আত্মীয়গণ তাহার নিকট ক্রন্দন করিতে অথবা বিষয় ব্যবস্থার জন্য তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে, তবে সেটি যে কি নিদারুণ অবস্থা, তাহা একবার সকলে ভাবিয়া দেখ। সেই বাক্যহীন অসহায় অবস্থায় মুমূর্ষুকৃত্যের ত্রুটী হইলে, আত্মীয় স্বজনের উপর অভিসম্পাত হইয়া থাকে। মুমূর্ষুর নিকট অশ্রুত্যাগ করিলে সে ব্যক্তির সদ্‌গতি হয় না। সে মায়াচ্ছন্ন হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অসহায়ভাবে সে তাহার প্রতীকার করিতে না পারিয়া সে সময়ে দারুণ বেদনাগ্রস্ত হয়, শাস্ত্রকারগণ এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ কারণ প্রত্যেক সংহিতায় মুমূর্ষুকৃত্যে শোকাপনোদনের একটী করিয়া স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। পিতৃদয়িতায় আছে,—

"মা শোকং কুরুতাঽনিত্যে সর্ব্বস্মিন্ প্রাণধারিণি।
ধর্ম্মং কুরুত যত্নেন যো বঃ সহ গমিষ্যতি॥
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গনম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্‌বুদ-সন্নিভে॥

গম্ভী বসুমতীনাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ।
ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি ॥
পঞ্চধা সংভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিবেদনা ॥
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্ম্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥
শোচমানাস্তু সস্নেহা বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
পাতয়ন্তি গতঃ স্বর্গমশ্রুপাতেন রাঘব ॥
শ্রূয়তে হি নরব্যাঘ্র পুরা পরমধার্ম্মিকঃ।
ভূরিদ্যুম্নো গতঃ স্বর্গং রাজা পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥
স পুনর্ব্বন্ধুবর্গস্য শোকবাষ্পেন রাঘব।
কৃৎস্নে বৈক্লবিতে ধর্ম্মে পুনঃ স্বর্গান্নিপাতিতঃ ॥
অতিশোকাগ্নিনা দগ্ধঃ পিতা তে স্বর্গতশ্চ্যুতঃ।
শপেত্বাং মন্যুনারিষ্টস্তস্মাদুত্তিষ্ঠ মা শুচ ॥"

অনিত্য জীবিতের জন্য শোক করিও না। ধর্ম্মই জীবের নিত্য সহচর অতএব যত্ন সহকারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। জলবুদ্‌বুদ্ সন্নিভ কদলীস্তম্ভবৎ অসার মনুষ্যলোকে যে জন সার অন্বেষণ করে, তাহার ন্যায় মূঢ় আর নাই। যখন বসুমতী, সমুদ্র, দেবতা সকলেই কালে নাশ প্রাপ্ত হয়, তখন ফেনবৎ মর্ত্ত্যলোকই বা কেন নষ্ট না হইবে? পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহ যদি স্বকর্ম্মবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে পরিবেদনাই কি? বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উচ্চের পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ আছে—জীবিতেরও মরণ আছে। বন্ধু বান্ধবগণ যদি পরলোকগতের জন্য শ্লেষ্মাশ্রু বিসর্জ্জন করে, তবে প্রেতগণ তাহা অবশভাবে ভোগ করিয়া থাকে। একারণ পরলোকগতের জন্য রোদন করিতে নাই; বরং যাহাতে তাহাদের সদগতি হয়, যত্ন সহকারে তাহা সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। হে রাঘব! স্নেহাস্পদ বন্ধুবান্ধবগণ শোকাকুল হইয়া অশ্রুপাত করিলে স্বর্গগত ব্যক্তিও ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। হে নরব্যাঘ্র! শুনিয়াছি, পুরাকালে পরম ধার্ম্মিক মহারাজ ভূরিদ্যুম্ন স্বকীয় পুণ্যকর্ম্ম বশতঃ স্বর্গগত হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহার বন্ধু

বান্ধবগণের সাতিশয় শোকাবেগ প্রযুক্ত ধর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় তিনি স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। অতএব হে মহারাজ! অতি শোকাগ্নিদগ্ধ হইয়া আপনার পিতা যদি স্বর্গভ্রষ্ট হয়েন, তাহা হইলে ক্রোধবশতঃ তিনি আপনাকে অভিসম্পাৎ করিবেন। অতএব শোক ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করুন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাদ প্রসঙ্গ। ৪

প্রবাদ উৎপত্তির কাল নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জাতীয় জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। জাতীয় উন্নতি ও লোকের বহুদর্শিতা জন্মাইলে প্রবাদের উপকরণ, পরে প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রবাদ কাহাকে বলে, প্রবাদের নাম লক্ষণ কি? প্রবাদের প্রধান লক্ষণ; উহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত হয়। ছন্দোবন্ধ বিশিষ্ট বাক্য প্রবাদে দেখা যায়। কিন্তু ছন্দোবন্ধ বিশিষ্ট বাক্য হইলেই যে প্রবাদ হইবে তাহা নহে। কোন কবির কোন বাক্য জনসাধারণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া সমাজে বা দেশে প্রচলিত হইলে তাহা প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রবাদের অন্যতম লক্ষণ। প্রবাদে উপমেয় প্রায়শঃই উহ্য থাকে।

প্রবাদের ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং কবিত্বময়। এই জন্য কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে নিকটই প্রবাদ আদরের বস্তু। লোকে দশটি কথায় যাহা না বুঝাইতে পারে, প্রবাদের তিনটী মাত্র কথায় তাহা বিশদ রূপে পরিব্যক্ত হইবে। তজ্জন্য জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই প্রবাদের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট প্রবাদ সাদৃত হওয়ার ইহাও একটি কারণ।

উচ্চশ্রেণীর কবিগণের অনেক উক্তি প্রবাদে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের অনেক উক্তি প্রবাদরূপে গৃহীত হইয়াছে।

যার জন্য করি চুরি, সেও বলে চোর।

পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত অনেক চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি অনেক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহার ফলভোগী চোর ভিন্ন তাহার পরিজনবর্গের

মধ্যে অন্ত কেহ হয় না। বাল্মীকি পূর্ব্বে রত্নাকর নামক দস্যু ছিলেন। তিনি দস্যুতা পূর্ব্বক পরিবার ভরণপোষণ করিতেন। ভগবান প্রজাপতির উপদেশ ক্রমে, তিনি তাঁহার মাতা, পিতা ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কি কেহ তাহার এই পাপের ভাগী হইবে? 'না পাপের ফল একা তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, পরিজনবর্গের উত্তর শ্রবণ করিয়া বাল্মীকি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

যার জন্ত করি চুরি, সেও বলে চোর।

এই প্রবাদে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, চুরি করিয়া পরিবার প্রতি-পালন করিলেও তাহার ফলভোগী একা চোরকেই হইতে হইবে। অর্থাৎ চুরি করাই পাপ।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে মালিণীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন,—

তোমার লাগিয়া, চুরি করে গিয়া
গালিলাভ-হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া, চুরি করি গিয়া
সেইজন কহে চোর॥

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার।

বিদ্যার সহিত সুন্দরের প্রথম পরিচয় হইলে, বিদ্যা তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করেন। সুন্দর উপবেশন করিয়া বলেন,—

বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার,
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার।
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে,
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ,
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে বায় বন্ধ।
দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই,
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই।
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর,
হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর।

জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে,
দেখলো লজ্জার হাতে সেই জন হারে।
হারিয়ে লজ্জার হাতে কথা নাহি যার,
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার।
রতির সহিত দেখা হইবে যখন,
কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন।
অধোমুখী সুমুখী অধিক পায় লাজ,
সাক্ষী হৈও সখিগণ কহে যুবরাজ।

যুবরাজ সুন্দরের কথা শুনিয়া বিদ্যার এক সখী বলিল,—

সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর,
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর।
উত্তমে অধমে মিলে অধম অধমে,
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে।
আমি যদি কথা কহি একে হার আর,
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার।
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ,
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ।

মাকড় মাল্লে ধুকড় হয়।

রাজার ছেলেটি অতি নিষ্ঠুর। একদিন সে একটী মাকড়সা বধ করে। রাজা পণ্ডিতের কাছে বিধিপ্রার্থী হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় অশেষ শাস্ত্র-সাগর মন্থন পূর্ব্বক শ্লোকাবলী আওড়াইয়া প্রমাণ করিলেন, মাকড়সা বধ ব্রাহ্মণ বধের তুল্য এবং প্রায়শ্চিত্তে দুই লক্ষ টাকার একখানি ফর্দ্দ দাখিল করিলেন। ঘটনাক্রমে কিছু দিন পরে পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রটীও একটী মাকড়সার প্রাণবধ করিল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থাই হইল না,— রাজা সে কথা পণ্ডিকে স্মরণ করিয়া দিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—

"ভাল দেখেছেন রাজা মশা'য়, মাকড় মাল্লে আবার কি হয়? মাকড় মাল্লে ধুকড় হয়।"

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

যশোহর জেলায় উদো এবং বুদো নামে দুইটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাকাইত ছিল। অসংখ্য অনুচরবর্গের মধ্যে গোদা এবং মেদো নামে তাহাদের দুইজন অনুচর ছিল। উদো এবং বুদোর সৌভাগ্য দেখিয়া উহাদের গাত্র-কণ্ডূয়ণ উপস্থিত হইল। উহারা তাহাদের মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদা উদো বুদো একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে যাইবে স্থির করিল। গোদা এবং মেদো জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই গৃহস্বামীকে সাবধান করিয়া আসিল। পরে রজনীতে তাহারা ডাকাইতি করিতে গেলে, জাগ্রত গৃহস্থেরা উদো এবং বুদোকে ধৃত করিয়া বেদম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রহারের চোটে তাহারা উভয়েই রক্তবমন করিতে করিতে নশ্বর কায়া ত্যাগ করতঃ শান্তিধামে প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে উদো এবং বুদোর শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল। গোদা এবং মেদোই শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্থির হইল। সকলেই পুরোদমে শক্তির উপাসনা করিল। গোদা মেদো যবাপুষ্পতুল্য লোহিত নেত্রে শ্রাদ্ধ করিতে বসিল। ক্রমে ক্রমে সুরার গুণ ধরিতে লাগিল, তাহাদের চেতনা বিলুপ্ত হইল, রক্ত মস্তকে উঠিল। পিণ্ড প্রদানের কালে তাহারা উদোর পিণ্ড স্থানে বুদোর পিণ্ড এবং বুদোর পিণ্ড স্থানে উদোর পিণ্ড প্রদান করিল।

ভাল নাম রেখেছে মা, ঠ্যাংঠেনে খোঁড়া।

জননী পুত্রের নাম ঠ্যাংঠেনে রাখিয়াছেন। এই মধুর নামটি রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রটি জন্মাবধি অতিশয় কৃশ। কিন্তু আকৃতি ও গঠন প্রণালী অতি সুন্দর। কৃশতার জন্য মাতা তাহাকে ঠ্যাংঠেনে বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু অন্যান্য লোকে ঠ্যাংঠেনে খোঁড়া বলিয়া ডাকিত।

পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। লোকে তাহাকে ঠ্যাংঠেনে খোঁড়া বলিয়া ডাকিত বলিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। অবশেষে বিরক্তির মাত্রা সহ্য করিতে না পারিয়া সে দেশত্যাগ করিল।

ঠ্যাংঠেনে যাচ্ছে, যেতে যেতে এক স্থানে দেখিতে পাইল, একজনের সমুদয় গাত্র দদ্রুতে পরিপূর্ণ। সে তাহার নিকট যাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। লোকটী বলিল, "আমার নাম রূপচন্দ্র"। ঠ্যাংঠেনে তখন হাসিয়া বলিল,—

দাদ ছাড়া চর্ম্ম নাই রূপচন্দ্র নাম।

তৎপর ঠ্যাংঠেনে এক বিল (জলাশয়) পার হইয়া, একজন লোককে সেই গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "এ গ্রামের নাম 'শুক্‌না"। ঠ্যাংঠেনে উত্তর শ্রবণে বলিল,—

দাদ ছাড়া চর্ম্ম নাই রূপচন্দ্র নাম,
জল ছাড়া হাঁট্‌লাম না শুক্‌না গ্রাম।

তাহার পর যাইতে যাইতে ঠ্যাংঠেনে শুনিতে পাইল, একটী স্ত্রীলোক "অমরিরে বাবা" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সে জানিল, সেই স্ত্রীলোকের "অমর" নামে এক পুত্র ছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর যাইতে যাইতে ঠ্যাংঠেনে শুনিতে পাইল, এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে,—"লক্ষ্মী রাড়ী আয়" লক্ষ্মী উত্তর করিল "আসিতেছি"। তৎপর ঠ্যাংঠেনে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, লক্ষ্মী ধান্যের লড়া (ধান কাটিয়া লইয়া গেলে যে দুই একটা শিস্ পড়িয়া থাকে, পূর্ব্ববঙ্গে তাহাকে লড়া বলে) কুড়াইতেছে। তখন সে আর হাস্যের উদ্দামতরঙ্গ দমন করিতে পারিল না। উচ্চ হাস্যের সহিত বলিল,—

দাদ ছাড়া চর্ম্ম নাই রূপচন্দ্র নাম,
জল ছাড়া হাঁট্‌লামনা শুক্‌না গ্রাম।
অমরি মরে গেল, লক্ষ্মী কুড়ান লড়া,
ভাল নাম রেখেছে মা ঠ্যাংঠেনে খোঁড়া॥

তাহার পর তাহার আর যাওয়া হইল না, দেশে ফিরিয়া আসিল।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ভগবান অর্জ্জুনকে সাংখ্য-যোগ উপদেশ দিবার কালে বলিয়াছেন,—

* * * *

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

কোন বিষয়ে আসক্তি হইলেই উহা পাইবার জন্য অতিশয় লোভ হয়। তখন যদি সেই তীব্র অভিলাষে প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে ক্রোধের উদ্রেক হয়।

ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সদুপদেশ সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, কাজেই বিবেকশক্তি নষ্ট হয়। বিবেক শক্তি নষ্ট হইলে বিনষ্ট হইতে হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, লোভ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, গীতার এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে একটী গল্পের অবতারণা করা হইল।

একদা কোন কপোতরাজ পরিবারবর্গ সমভিব্যবহারে আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। তণ্ডুল দেখিয়া তাহার অনুচরেরা উহা ভক্ষণ করিবার অভিলাষ পরিব্যক্ত করিলে রাজা বলিল যে, এ বিজন অরণ্যে তণ্ডুল আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, কোন ব্যাধ আমাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত জাল বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে তণ্ডুল ছিটাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং আমাদের তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে অবতরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া এক দাম্ভিক কপোত বলিল যে, বৃদ্ধ হইলেই তাহার বুদ্ধি নাশ হয়। এই নিবিড় অরণ্যে প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া আমাদিগকে ধৃত করিতে ব্যাধ আসিয়া জাল বিস্তার করিয়াছে, আপনার কি বুদ্ধি! অতঃপর রাজার কথা না মানিয়া তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে অবতরণ করিলে সকলেই জালে আবদ্ধ হইল। এই হেতু সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণং।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

এক ব্রাহ্মণের মাত্র একটী পুত্র ছিল। নবম বর্ষে পুত্রের উপনয়ন অন্তে বিবাহ দিয়া পাঠার্থে তাহাকে বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। ২০।২৫ বৎসর নিরন্তর গুরুর আলয়ে অবস্থান করতঃ ভৃত্যের ন্যায় গুরু-আজ্ঞা রীতিমত পালন করিয়া, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র স্বদেশে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অনেক দিবস পর বাড়ী আসিয়াছে,—বিবাহের পর আর এক দিনও

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাই ব্রাহ্মণ দুই দিন পর পুত্রকে বলিলেন, বৎস! শ্বশুরালয়ে গমন কর। অনেক দিবস তুমি তথায় যাও নাই। একবার যাইয়া বধূমাতাকে সঙ্গে করিয়া আন।

পিতৃ আজ্ঞানুসারে পুত্র পর দিবস প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতঃ হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক উৎকণ্ঠাকুল প্রিয়জন সন্দর্শন লোলুপের ন্যায় শ্বশুরালয়াভিমুখে যাত্রা করিল। সমস্ত দিন প্রখর রবি-কিরণে সন্তপ্ত হইয়া দিবা অবসানকালে সে এক গ্রামের মধ্যে পথিপ্রান্তে একটী বৃক্ষমূলে ক্লান্তি অপনয়নার্থ উপবেশন করিল।

ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে অনেকক্ষণ,হেন কালে সে দেখিল, অদূরে এক কানন মধ্যে একটী পুরুষ প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখে যে, একটী স্ত্রীলোকও সেই দিকে প্রবেশ করিল। তাহাদের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। সে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং যাহা দেখিতে পাইল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পবিত্র লেখনী কলুষিত করিতে পারি না। ব্রাহ্মণ অতি বিষণ্ণ মনে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করিল।

অল্পক্ষণ পরেই প্রেমিক-যুগল, তাহার পাশ দিয়া স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য ধাবিত হইল। তাহারা নিকটে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল,—

"অমুক গ্রাম (তাহার শ্বশুর বাড়ী যে গ্রামে) এখান হইতে কত দূর?" তাহারা বলিল,—"এইত সেই গ্রাম।"

ব্রাহ্মণ শ্বশুরের নাম করিয়া বলিল, "অমুকের বাড়ী কোন দিক্?"

স্ত্রীলোকটীত জানেনা যে, এই তাহার আরাধ্য দেবতা—ইনিই তাহার স্বামী। অতি শৈশবস্থায় একবার মাত্র শুভদৃষ্টির সময় তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর কত বর্ষ অতিবাহিত হইল, কত ঘটনা ঘটিল, কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাই সে বলিল,—

"আসুন, আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি।"

ব্রাহ্মণ উঠিল, তাহার ক্ষুদ্র মোটটি কুক্ষিগত করিয়া গাত্রোত্থান করিল আর পিশাচীর পৈশাচিক কাণ্ডের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। পথিমধ্যে পিশাচী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?'

ব্রাহ্মণ জন্মভূমির নাম করিলেন। উত্তর শুনিয়া পিশাচীর হৃদয়ে যেন কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। হঠাৎ একবার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। কিন্তু মরুভূমিতে বারিবিন্দু কতক্ষণ থাকে? তাহারও সে চিন্তা দেখিতে দেখিতে মন হইতে বিদূরিত হইল। পরে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তাঁহার সহিত আপনার কি প্রয়োজন? তিনি আপনার কেহ হন নাকি?"

"আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছি, এখন কিছু বলিতে পারিতেছি না। যদি তোমার শুনিবার প্রয়োজন থাকে, তবে সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, সব বলিব।"

শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। 'এই বাড়ী' বলিয়া পিশাচী অন্দরে প্রবেশ করিল।

নূতন জামাই আসিয়াছে বলিয়া বাড়ীতে মহাধূম পড়িয়া গেল। জামাই ভোজনের নিমিত্ত বিশাল আয়োজন হইতে লাগিল। জামতা দেখিবার নিমিত্ত গৃহিণী দাসী প্রেরণ করিলেন। জামাই বাবু অন্তঃপুরে নীত হইলেন।

তাহার স্ত্রী, সেই পিশাচিনী স্বামীর পদধৌত করিয়া কেশগুচ্ছ দ্বারা অতি যত্নে নেহাৎ সতীর ন্যায় মুছিয়া দিল। ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে বলিল,—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।"

আমাদের উদ্দেশ্য এইখানেই সিদ্ধ হইল। কিন্তু এইখানে নিরস্ত হইলে গল্পটী অসমাপ্ত রহিয়া যায় এবং পাঠকগণেরও রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনাবোধে পরবর্ত্তী অংশও বিবৃত করিলাম।

জামতা জলযোগ করিয়া পুনরায় বহির্বাটীতে আগমন করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। এদিকে আহারেরও ডাক পড়িল। কিন্তু 'অসুখ করিয়াছে' বলিয়া জামতা আহার করিতে সম্মত হইল না। একেত তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাহার উপর স্বচক্ষে স্ত্রীর এইরূপ কদর্য্য ব্যবহার দেখিয়া কি তিনি সেই কুলটার হস্তের অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন? তাই ব্রাহ্মণ অসুখ হইয়াছে বলিল।

যথাসময়ে জামাতা বাবু শয়নমন্দিরে নীত হইলেন। তাঁহার সেই সতী সাধ্বী স্ত্রী আসিয়া কত হাস্য, কত গল্প করিতে লাগিল। কত ভালবাসা

জানাইতে লাগিল, কত মান, কত অনুরাগ দেখাইতে লাগিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ভিন্ন তাহার সহিত দ্বিতীয় বাক্যব্যয়টিও করিলেন না।

অতঃপর স্ত্রী ভাবিল যে, এত তাহা হ'লে সব জানিতে পারিয়াছে। এ থাকিলে ত আর আমার মঙ্গল নাই, ইহাকে তাড়াইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিশাচিনী পালঙ্কের নিম্ন হইতে একখানি খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ঘোর আর্ত্তনাদে তথায় বাড়ীর লোকজন আসিয়া জুটিল, তখন সেই পাপীয়সী বলল,—

"এই খড়্গ দ্বারা ইনি আমাকে হত্যা করিতে উঠিয়াছিলেন, ইহাকে এখনই দূর করিয়া দাও।"

কন্যার কথাই প্রামাণ্য ও অগ্রগণ্য হইল। ব্রাহ্মণ সেই রাত্রেই অর্দ্ধচন্দ্র পাইয়া বহিষ্কৃত হইলেন।

পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে ব্রাহ্মণ সেই দেশের রাজবাড়ীতে উপনীত হইলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রাজা দ্বার-পণ্ডিতদিগের সহিত সভাস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণও তাহাতে যোগ দিলেন। পরিশেষে তাঁহারই জয় হইল, ব্রাহ্মণ অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিলেন।

পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিতে দেখিয়া, রাজা আগন্তুক ব্রাহ্মণের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দ্বারপণ্ডিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার একটী মুদ্রাদোষ দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, বোধ হয় ব্রাহ্মণের উনপঞ্চাশের ছিট্ আছে। বেশ বিচার তর্ক করিতেছে, করিতে করিতে পাগলের ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' অনেকে যেমন কথার মধ্যে 'বুঝিতেছ না' 'তারপর' ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে, ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কথার মধ্যে 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" বলা বোল ধরিলেন। যাহা হউক, রাজা ভাবিলেন, চিকিৎসা করিলেই আরোগ্য হইবে।

পরদিবস ব্রাহ্মণের চিকিৎসার্থে রাজবৈদ্য নিয়োজিত হইল। চিকিৎসা আরম্ভ হইল,—১০।১৫ দিবস গত হইল, কিন্তু কিছুমাত্র উন্মত্ততার হ্রাস হইল না। ঐ এক বুলি—'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' তদ্দর্শনে রাজা বৈদ্যকে বলিলেন,—"এতদিনেও যে কিছু করিতে পারিলে না। বৈদ্য বলিল, "বোধ

হয় ঔষধ পথ্য নিয়ম মত খাওয়ান হইত না। আপনি যদি পণ্ডিতজীকে অন্দরে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন, তবে আমি একবার পরীক্ষা করিতে পারি!"

রাজা রাণীর অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

পণ্ডিত ওরফে আমাদের সেই ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে নীত হইলেন। তাঁহার গৌরকান্তি দেখিয়া রাজনন্দিনীর মন টলিল। সে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ কিন্তু অটল, অচল,—নির্ব্বিকার চিত্ত; কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু নৃপনন্দিনীর প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিয়াছে—সে প্রেমের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। একদা রজনীতে খরতর প্রবাহী প্রেম-স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণের কক্ষে উপনীত করিল। গভীরা রজনীতে একাকিনী রাজদুহিতাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই, রাজকন্যার হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল।

পরদিবস প্রাতে বৈদ্য আসিয়া দেখে, অন্তঃপুরে আসিয়া ব্রাহ্মণের রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, আর একটী উপসর্গ বাড়িয়াছে, এতদিন কেবল "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" বলিত, অদ্য তাহার সহিত, "বেঁধে মার্‌লে করি কি" রোগ হইয়াছে।

বৈদ্য রোগী দেখিয়া গিয়া রাজসমীপে সমস্ত বিবৃত করিল। তচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, দিন কতক তুমি ব্রাহ্মণকে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা কর দেখি। খরচ পত্র যাহা লাগে, সরকার হইতে পাইবে।"

বৈদ্য রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, ব্রাহ্মণকে নিজালয়ে লইয়া গেল। বৈদ্যপত্নীর একটী উপপতি ছিল। বৈদ্য বাটী হইতে বাহির হইলেই, নাগর নাগরী সকাশে উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মণকে উন্মাদ বিবেচনা করিয়া তাহার সাক্ষাতে তাহারা হাস্য-পরিহাসাদি সমস্তই করিত। ব্রাহ্মণ নেহাৎ বেকুবের মত সমস্তই দেখিয়া যাইত মাত্র, কিছুই বলিত না।

একদা অন্য এক গ্রাম হইতে কবিরাজের ডাক আসিল। কবিরাজ প্রাতঃকালে সেইস্থানে যাত্রা করিল। এদিকে বৈদ্য-পত্নী শ্রীযুক্ত নাগর মহাশয়ের ভোজনের জন্য অশ্বমেধের আয়োজন করিলেন। রোহিত মৎস্য

ইত্যাদি করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল। সকাল সকাল রান্না হইল। যথা সময়ে নাগর আসিলেন। নাগরী জামাই আদরে তাহাকে খাইতে দিলেন। অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে, ইতি মধ্যে বৈদ্য বাটীতে আসিয়া হাজির! তাহার সে সময় আসিবার কথা ছিল না বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক পথ যাইয়া শুনিতে পায় যে, তাহার রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। তাই সে অসময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

বৈদ্যের আগমনঃবার্ত্তা পাইয়া নাগর ভাতের থাল ফেলিয়া উঠিল। নাগরী তাহাকে তাড়াতাড়ি এক স্থানে লুকাইত করিয়া, বৈদ্যের কাষ্ঠপাদুকা হস্তে বহির্বাটীতে যাইয়া বলিল, "বাড়ীতে জল নাই, তুমি পুষ্করিণী হইতে পা দুখানি ধুইয়া এস।" বৈদ্য পদপ্রক্ষালন করিতে রওনা হইলে, এদিকে নাগর মহাশয় ভোঁ দৌড় দিলেন।

বৈদ্য হস্তমুখ ধৌত করিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একমাত্র পুত্র ক্রন্দন করিতেছে। সে পুষ্করিণীতে গেলে, গৃহিণী মিছামিছি পুত্রকে বিশাল এক চপেটাঘাতে রোরুদ্যমান করিয়াছেন। সে পুত্রের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,গৃহিণী বলিলেন, "তুমি গেলে ছোঁড়া বলিল যে,রুই মাছের মাথা খাব। তাই আজ রুই মাছের মাথা এনে ভাল করে রেঁধে খেতে দিলাম, তা এখন খাচ্ছে না। তাই রাগভরে এক চড় দিয়াছি। ঐ দেখ সব ছেড়েউঠে পড়েছে।"

কবিরাজ বলিল,—"যাক্ ছেলেমানুষের কথা ধরতে নেই। এখন আমার খেতে দিবে কি?"

"ঘরে ত আর কিছুই নেই, রান্না করিবারও সময় অতিবাহিত হয়েছে।" পরে নাগরের উচ্ছিষ্ট পাত্র দেখাইয়া গৃহিণী বলিল,—"ঐ যে খোকার পাতে চারটা ভাত আছে মাত্র।'

বৈদ্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল, আর খোকার বয়সও অল্প। তাই সে বলিল, "আচ্ছা আমি খোকার পাতেই বসি, বলিয়া সেই নাগরের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিল।

সন্ধ্যার সময় বৈদ্য রাজবাড়ীতে যাইবার কালে, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেমন আছেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

বেঁধে মারলে করি কি?
তোমার চেয়ে ভালই আছি।"

বৈদ্য বিস্মৃত হইয়া রাজ সকাশে হাজির হইয়া বলিল,—"মহারাজ! আমার বাটীতে গিয়া ব্রাহ্মণের আর এক উপসর্গ বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন বুলি ধরিয়াছে, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, বেঁধে মার্‌লে করি কি ? তোমার চেয়ে ভালই আছি।"

অতঃপর রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলুন, আপনার এ রকম কথা বলার উদ্দেশ্য কি ? আমি বুঝিতে পারিয়াছি আপনি উন্মাদ নন। নিশ্চয়ই কোন কারণে এরূপ বলিয়া থাকেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সকল কথা বলিতে আমার সাহস হয় না, কারণ ইহার মধ্যে আপনারও কিছু সংশ্রব আছে।"

রাজা। আমি আপনাকে অভয় দান করিতেছি, আপনি নির্ভয়ে বলুন, কোন চিন্তা করিবেন না।

তখন ব্রাহ্মণ আদ্যন্ত সকল কথা বলিলেন। রাজা তাহার কথা শুনিয়া বৈদ্যের ও ব্রাহ্মণের পত্নীদ্বয়কে ধৃত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক ব্যভিচারদোষে প্রাণদণ্ড করিলেন এবং নিজ দুহিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণের শুভবিবাহ দিয়া দিলেন।

লাভে ব্যাঙ্‌, অপচয়ে ঠ্যাং।

এক রাজা জ্যোতির্ব্বিদ্ দ্বারা ভাল দিন, নক্ষত্র, মুহূর্ত্তাদি দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিতেন। রাজা যৎকালে পণ্ডিতদিগের দ্বারা শুভলগ্ন স্থির করিয়া লইতেন, রাজার মেথরও অন্তরালে থাকিয়া সেই লগ্ন জানিয়া লইত এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিত।

যথাকালে রাজা ও মেথর উভয়েরই দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। শশিকলার ন্যায় পুত্রদ্বয় ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মেথর ভাবিল, এইত বড়লোক হইবার সময়। আমিও পুত্রকে মৃগয়ার্থ প্রেরণ করি। রাজপুত্র মৃগয়ায় গমন করিলে, মেথর পুত্রও অন্য দিকে শিকারে গমন করিল। রাজপুত্র এক ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আনিলেন, আর মেথর-নন্দন এক ব্যাঙ্‌ (ভেক) শিকার করিয়া আনিল। উপরন্তু আসিবার কালে

উছট্ খাইয়া একখানি পা ভাঙ্গিয়া আনিল। পুত্রের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া লোকে বলিল,—লাভে ব্যাঙ্ অপচয়ে ঠ্যাং।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তি-বিনোদ।

নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ।

১০। কমর আলি (পণ্ডিত)। (পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

কাপি ছন্দ—বিরহ।

শ্যাম কি কৈর্ব্ব তোর পিরীতে।
পাইলি না মোর মার্জ্জি ধরাইতে ॥ ধু।
হাসি হাসি প্রেম করিলা আসি ব্রজেতে।
লাল্‌ছি * দি যৌবন লুটিআ রৈলা মধুপুরেতে ॥ ১
পুরুষের কপট মায়া ন পারে বুঝিতে।
ফাঁকি দিআ গেল মোরে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে ॥ ২
নারীর মরম তুমি ন পার রাখিতে।
প্রেম-পসরা লুট্যা চোরা আর আইসে না ব্রজেতে ॥ ৩
রাখল জাতির এম্‌নি ধারা বুঝিলাম চরিত্রে (?)
হৃদে তোমার কালী কপট মিছা মায়া মুখেতে ॥ ৪
শ্রীকমর আলি কহে ভাব্যা চাহ মনেতে।
পর কভু আপনা নয় মিছা পিরীতে ॥ ৫ ॥ ৫ ॥ ৩৭।

কাপি—বিরহ।

শ্যাম এই আছিল তোর মনেতে।
ত'কেনে প্রেম কৈল্লা গোপতে ॥ ধু।
জাতির কুল মান গেল শ্যামের পিরীতে।
তোর পিরীতে কলঙ্কিণী হৈলুম জগতে ॥ ১
যেখনে গেলা বৃন্দাবনে ধেনু চরাইতে।
বংশীর স্বরে প্রেমবাণ হান্যাছ মোর বুকেতে ॥ ২

* লাল্‌ছি দি——লোভ দেখাইয়া।

বিরহিনী একাকিনী থাকি ব্রজেতে।
কার ভাবে ভুল্যাছ মোরে নাই গো তোমার মনেতে ॥৩
কাঙ্গালিনী কৈল্লা মোরে ব্রজকুলেতে।
গোপাল জাতির এম্‌নি ধারা দয়া নাই তোর মনেতে॥ ৪
শ্রীকমর আলি কহে প্যারি ভাব্যনা মনেতে।
সেই ভোমরা মাখন চোরা আইস্‌ব মধু পানেতে ॥৫॥৬।৩৮।

কাপি—বিরহ।

দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ।
অসৈ তোম্‌রা নি দেখ্যাছ নন্দ্যার চান (চান্দ) ॥ ধু।
ধড়া চূড়া মোহন মুরতি তাহাতে।
গলে বনমালা চূড়া শোভ্যাছে মাথে।
সোণামুখে বাজাএ বাঁশী সদাএ লৈআ রাধার নাম ॥ ১
শূন্ন হৈছে ব্রজপুর শূন্য সিংহাসন।
সব শূন্ন লাগে আমার রসের বৃন্দাবন।
সোণার মন্দির শূন্য দেখি কথ সএ অবলার প্রাণ ॥ ২
এই দুঃখের দুঃখিনী শ্যামে কৈর‍্যাছে মোরে।
কাঙ্গালিনীর মত ফিরি নগর বাজারে।
ধড় থুইআ প্রাণটি লৈআ কোন্ খানেতে গেল শ্যাম ॥ ৩
কহে শ্রীকমর আলি শুন শ্রীমতি।
বিধি পূরাবে তোমার মনের আরতি।
আসিব তোর নন্দ্যার চান্দ ন করিয় অভিমান ॥ ৪॥৭।৩৯।

কাপি—বিরহ।

শ্যাম বিনে না আর অবলার প্রাণ।
আর কাইসে না কালা চান (চান্দ) ॥ ধু।
নিত্য নিত্য বাজাই বাঁশী হর‍্যাছে অবলার প্রাণ।
পিরীত করি ছাড়া গেল সে বড় নিঠুর শ্যাম ॥

বংশীবদন মদনমোহন কোথাএ রৈল মোর কালাচান্দ।
কুলের বধূ এ আকুল কৈল্ল ধৈরয ন মানে প্রাণ॥
শ্রীকমর আলি কহে প্যারি ন করিয় অভিমান।
আসিব তোর কালাচান্দ পূরাবে তোর মনস্কাম॥ ৮।৪০।

কাপি—বিরহ।

বিরহের জ্বালা এ মরি।
কোথাএ গেল প্রাণের হরি॥ ধু।
বাঁকারূপ কালিন্দীর কূলে, দেখি না কদম্বতলে,
আরও বাঁশী বৃন্দাবনে ডাকেনা রাধা প্যারি॥ ১
শয়নে স্বপন দেখি, জাগে (জাগনে?) কান্দিআ থাকি,
সব শূন্য বৃন্দাবন আইসে না বংশীধারী॥ ২
হীন কমর আলি ভণে, ভাব্যনা প্যারি তোর মনে,
আসিব তোর প্রাণের হরি দেইখবা দুই নয়ান ভরি॥৩।৯৪১

কাপি—বিরহ।

প্রাণনাথ ব্রজে ন আইল।
এইরূপ যৌবনবহিল॥ ধু।
এই ভরা যৌবনকালে শ্যাম ব্রজে নাই।
বিরহনী একাকিনী কান্দিয়া গোমাই।
শ্যামের লাগ্যা ভাব্যা ভাব্যা সদাএ তনু মোর শেষ হৈল॥ ১
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ।
হেনক্ষি সময়ে হরি নাই মোর পাশ।
সোণার মন্দির শূন্য আমার বৃথাএ এই জনম গেল॥ ২
যথ ব্রজবাসী নারী পতি করি সং (সঙ্গ)।
যার সেই মনবাঞ্ছা পূরে মন রং (রঙ্গ)।
মোর পিয়া নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রৈল॥ ৩
কহে শ্রীকমর আলি শুন গো প্যারি।
আসিব ব্রজে তোমার প্রাণের হরি।
কুবুজার ভাবে ভুল্যা মথুরাতে শ্যাম রৈল॥ ৪।১০।৪২।

কাপি—বিরহ।

দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ অ শ্যাম কানুর লাগিআ॥ ৪.৮

এই কুঞ্জ বৃন্দাবনে কদম ডালে বসি।
রাধা রাধা বুলিআ সদাএ বাজাএ কানুর বাঁশী।
বাঁশীর স্বরে রাধার প্রাণ নিল হরিআ॥ ১

মথুরাএ হইআছে রাজা শ্রীনন্দের কানাই।
কালিন্দীতে প্রেম কর‍্যাছে তাহে মতে নাই।
পাই আছে কুবুজা রাণী রৈছে ভুলিআ॥ ২

গোকুল নগরে ঘোষে রাধা কলঙ্কিনী।
ছাড়্যা গেল প্রাণনাথে কৈর‍্যা অনাথিনী।
জাতির কুল মান মোর গেল ডুবাইআ॥ ৩

প্রেম হুতাশনে চিত্ত দহে অনুক্ষণ।
উদধি ভক্ষিআ * নারী তেজিমু জীবন।
জীবনে প্রবেশি প্রাণ দিমু তেয়াগিআ॥ ৪

ভানুসুত পানি আদি করিআ মিলন।
কলানিধি সঙ্গে করি ভাবি অনুক্ষণ।
ভাবিতে ভাবিতে তনু যাএ দহিআ॥ ৫

শ্রীকমর আলি কহে রাধের দুই চরণে সার।
মথুরাতে গেল হরি ন আসিব আর।
মিছা প্রেমের ভাবে কেনে রৈছ ভুলিআ॥ ৬॥১১।৪৩।

কাপি—বিরহ।

হাএরে মরি রে প্রেমের যন্ত্রণা।
আর পিরীতি কৈর্ব্ব না॥ ধু।

পিরীত করি কুল মজাইল তাহে নারী বুঝিলাম না।
সদারে বাড়ইলাম পিরীত প্রেম জ্বালাএ প্রাণ বাঁচে না॥
অবলা গোপালের মাইআ প্রেম জ্বালাএ প্রাণ বাঁচে না।
শাশুড়ী ননদী বসি সদাএ করে গঞ্জনা॥ ২

কুলের বধূ আকুল কৈল্ল সে কি জানে মন্ত্রণা।
জাতির কুল মান গেল গোকুলে রৈল ঘোষণা ॥ ৩
রাখাল জাতির হীনমতি প্রেমের বেদন জানেনা।
প্রেম পসরা রসের ভরা ভাঙ্গ্‌লে জোড়া লাগে না ॥ ৪
কহে শ্রীকমর * আলি পিরীত কেমন জাইন্‌লা না।
জগতে কলঙ্ক করি ছাড়াছ প্রাণ বাসনা ॥৫॥১২।৪৪।

১১। পীর মোহাম্মদ। পদ সংখ্যা—১।

তুড়ী।

ন যাইলে (যাইলেম্‌ বা যাইমু ?) মুই মথুরার হাটে,
নৌকা ফিরাইআ দে ॥ ধু।
মুই অভাগিনী, নৌকাতে চড়িলুম,
কানাইআ ধরিল খেবা।
হেনই সময়ে, মোর বৈরী হও,
চলিল মালিআ † দেবা ॥
একি আভাঙ্গা নাও, কিবা বইটা বাহো,
চৌদিগে উঠিল পানি।
এহা কি পরিহাস, জাতি কুল নাশ,
ধনে প্রাণে হইলুম হানি ॥
দধি দুগ্ধ মোর, যতেক আছিল,
সব হইল ঘোল।
যে (?) যেই ঘাঠে কানাই, নৌকাতে চড়িলুম,
সেই ঘাঠ নিআ মোরে তোল ॥

* কমর আলি পণ্ডিতের নিবাস, বোধ হয়, চট্টগ্রাম—পটীয়ার অন্তর্গত 'করলডেঙ্গা' গ্রামে হইবে। তাঁহার রচিত 'রাধার সম্বাদ—ঋতুর বারমাস'ও একটী পাওয়া গিয়াছে। উহার পরিচয় ৭ম বর্ষের 'পরিষদে' ১৮৬ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে দ্রষ্টব্য।

† মালিআ—ভৎর্সনা-দ্যোতক শব্দ ; ইংরেজী Mal এর সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। ওলাউঠা প্রভৃতি রোগকে এদেশে 'মাল্যা পড়া' বলে। "তার কি মাই হৈছে" এস্থলে 'মাইল' অর্থ 'মর'। 'ই' অনেক স্থলে 'আই' হয়. যথা,—চাই (চারি). গাইল (গালি) ইত্যাদি।